সমাজ ও সংস্কৃতি







পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক নির্দিষ্ট নতুন পাঠ্যসূচী (Syllabus)
অনুসারে লিখিত

সমাজ ও সংস্কৃতি

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড : সমাজবিজ্ঞান]

শ্রীবিমলচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম. এ., বি. টি.
ডিপ্লোমা ইন্ সোস্তাল স্টাডি (এডিন্)

ও

শ্রীশোভাকর চট্টোপাধ্যায়, এম. এ.
প্রণীত।

শ র ৎ পু স্ত কা ল য়
৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

প্রকাশ করেছেন ঃ
শ্রীপ্রনবকুসুম সাহা
শরৎ পুস্তকালয়
৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ ঃ এপ্রিল ১৯৬০
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুন ১৯৬০
মূল্য ঃ ছয় টাকা মাত্র

ছেপেছেন ঃ
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন,
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

তৃতীয় ভাগ

নিবেদন

আধুনিক শিক্ষা-সংস্কার-প্রচেষ্টায় শিক্ষাকে জীবন-কেন্দ্রিক করে তোলার উদ্দেশ্যে, শিক্ষার্থীর মনে আবিষ্কারকের মনোবৃত্তি জাগিয়ে তুলতে ও পরিবেশ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান দেবার জন্যে আমাদের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অনেক নতুন বিষয় পাঠ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সমাজতত্ত্ব বা 'Social Studies' এই রকম একটি নূতন বিষয় এবং এই বিষয়টি পাঠ্যতালিকাভুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও আছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ Dr. Cyril Burt এ-সম্বন্ধে বলেন ঃ

"There are many sound reasons, psychological as well as practical, for including a course on Social Studies in the School curriculum....The psychologist has taught us that a human personality is nothing apart from his environment....If we want our young people to grow into happy, mature, well balanced adults, we must be at pains to familiarise them with the complicated and challenging environment into which they are born. We must give them opportunities of finding out something of the inter-relatedness of the things around them, and of something of the bonds that link them to their material and social surroundings." (Dr. Cyril Burt—Foreword to 'The Teaching of Social Studies in Secondary Schools' by James Hemming.)

কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের অধিবাসী সমাজবদ্ধ মানুষের ওপর তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব, সেই বিশেষ-প্রভাবাধীন মানুষ

কী ভাবে তার অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় প্রভৃতি সংক্রান্ত মৌলিক সমস্যাগুলোর সমাধান করেছে এবং সেই সব সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টায় সেই বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে কালক্রমে কী বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থা ও কী ধরণের কৃষ্টি গড়ে উঠেছে—এ সবই সমাজতত্ত্বের আলোচ্য।

এ থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এতদিন ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি প্রভৃতি যে-সমস্ত বিষয় পড়ান হত তা' এই নতুন বিষয়টির অন্তর্গত, কিংবা এও বলা যেতে পারে যে, ভূগোল, ইতিহাস, পৌরনীতি প্রভৃতি বিষয়ের সমাহারই সমাজতত্ত্ব। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজতত্ত্ব ঐ সমস্ত বিষয়ের সমন্বয় আর সে সমন্বয়ের কেন্দ্র ও লক্ষ্য সামাজিক মানুষ। কেন্দ্র আর লক্ষ্যের পার্থক্যের জন্যে সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠন-নীতিও ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি প্রভৃতি বিষয়ের পঠন-পাঠনের নীতির থেকে পৃথক, এর গুরুত্বও সমধিক।

সমাজতত্ত্ব পাঠের উদ্দেশ্য মানুষের সমাজকে এবং সেই সঙ্গে সামাজিক মানুষকে জানা, তার আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। তাই শুধু পুঁথিগত জ্ঞানই সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা দিতে পারে না—তার জন্যে বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতিও প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের মতে, "যেখানেই হউক না কেন, মানবসাধারণের মধ্যে যা কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভাল করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে,—পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে।" (ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, ১৩১২ : শিক্ষা)

ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় বর্তমানে যেভাবে পড়া বা পড়ান হয় তার প্রধান ত্রুটি এই যে তা' আমাদের প্রত্যক্ষ পরিবেশ সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহলী করে তোলে না। ইতিহাসে শের শাহের বিষয় পড়ার সময় আমরা তাঁর ভূমিব্যবস্থা-সংস্কারের কথা পড়ি। আবার আকবর বাদশাহের কথা পড়ার সময় তাঁর ভূমিব্যবস্থা-সংস্কারের কথাও আমাদের পড়তে হয়। তেমনি মারাঠা সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করার সময় পেশোয়াদের ভূমিব্যবস্থা-সংস্কারের ইতিহাসও

আমাদের জানতে হয়। ইংরেজ আমলের নানা ভূমিব্যবস্থা-সংস্কার-প্রচেষ্টার পরিণতি দেখি লর্ড কর্ণওয়ালিস-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। এইভাবে পড়ার ফলে প্রত্যক্ষ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কহীন, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন যেটুকু জ্ঞান লাভ করি তা' মুখস্থ করে রাখা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে আত্মস্থ করা যায় না। আর, এত মুখস্থ করেও আমাদের গ্রামের চারধারের ভূমি-সংক্রান্ত ব্যবস্থা আমাদের অজানাই থেকে যায়।

কিন্তু আমরা যদি আমাদের প্রত্যক্ষ পরিবেশ, আমাদের গ্রাম বা শহর থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিব্যবস্থার কথা জানতে শুরু করি ('Project Method' এই-রকম ক্ষেত্রে অনুসরণীয়) ও পরে তুলনামূলকভাবে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের ভূমিব্যবস্থা এবং সমাজ ও অর্থনীতির ওপর ঐ ব্যবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি, তবেই ইতিহাস ও ভূগোলের সমন্বয়-সাধন সম্পন্ন হয়, শিক্ষার্থীর মনে সেই জ্ঞানলাভে যথেষ্ট উৎসাহ জন্মায় আর লব্ধ জ্ঞান বদ্ধমূল ও কার্যকর হয়।

সমাজতত্ত্ব পাঠনের নীতি হবে পরিবেশ-পর্যবেক্ষণ ও পরিচিতির মাধ্যমে ছাত্রদের মনে অনুসন্ধানের সঠিক মনোভাবটি গঠিত করে জ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন করা। পরে ধীরে ধীরে তাদের কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজে বার করতে উৎসাহিত করতে হবে।

সাধারণ হাটবাজারে বেচা-কেনা দেখে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়, বিভিন্ন স্থানের ও সম্প্রদায়ের মানুষের বিচিত্র পোশাক ইত্যাদি দেখবার সুযোগ হয়। এই থেকেই বিশাল পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির আচার-ব্যবহার, সাজ-পোশাক ও বিচিত্র মানব সভ্যতা সম্বন্ধে কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসাও জাগে।

হাটবাজারে বেচা-কেনা দেখে আর একটা মূল্যবান্ শিক্ষা লাভ করা যায়। তা এই যে—সব গ্রাম বা শহরের মানুষই আধুনিক সভ্য জীবন-যাপনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যের জন্যে পরনির্ভরশীল। সুতরাং সুস্থ সভ্য জীবন ধারণের জন্যে পাশাপাশি গ্রাম বা শহরের লোকেদের—শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও জাতির লোকেদেরও—শান্তিতে ও বন্ধুত্বে বাস

করা দরকার। আদান-প্রদানই সভ্যতার ভিত্তি আর তার জন্যে দরকার মানুষে মানুষে সম্প্রীতি।

সমাজতত্ত্ব শিক্ষা দেবার পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত নীতি স্মরণীয় ও পালনীয় :

"The purpose of a Social Study Course is not to teach young people unquestioning acceptance of any point of view, but to encourage them to think for themselves. Its axiom might be put as 'search out all things : hold fast to that which is good'. Its faith is that truth can prevail in personal and public life only if the members of a community are trained to think and feel clearly, courageously and honestly."

"Social Studies provides an educative social situation in which teacher and pupils are exploring together. The role of the teacher as guide and interpreter in this situation is immensely important."

পাঠদানের উদ্দেশ্য ও পাঠদান-পদ্ধতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলে সমাজতত্ত্ব পাঠদানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা অপ্রাসংগিক নাও হতে পারে।

সমাজতত্ত্ব শিক্ষাদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এই যে শিক্ষার্থী নিজের দেশ ও সমাজের ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক ধারা অনুধাবন করে নিজের দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করবে, তার মনে গণতান্ত্রিক আদর্শ বদ্ধমূল হবে। দেশ ও সমাজের কল্যাণে যৌথ দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনে সে অভ্যস্ত হবে, এবং ক্রমে বিশ্ব-মৈত্রী ও শান্তিতে বিশ্বাসী বিশ্বনাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করবে।

গণতন্ত্রের মূলনীতি ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থের সামঞ্জস্য-বিধান করা, ব্যক্তির ইচ্ছা সমষ্টির ইচ্ছার অধীন করা ও সমষ্টির কল্যাণসাধনে ব্যক্তির নিজেকে নিঃস্বার্থ ও নিরলসভাবে নিয়োগ করা।

তাই, সমাজতত্ত্ব শিক্ষাদানে অভীষ্ট ফল লাভের জন্য শ্রেণী ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, পাঠদানপ্রণালী, খেলাধূলা ও উৎসব-অনুষ্ঠানাদি এমনভাবে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনের যথেষ্ট সুযোগ পায়, সকলে সমান অংশ গ্রহণ করতে পারে, সমান সুবিধা পায় এবং পুরস্কার তিরস্কারের সমান অংশভাগী হয়।*

সমাজতত্ত্ব-পাঠন ছাত্রছাত্রীদের কাছে চিত্তাকর্ষক ও কার্যকর করবার জন্যে বই পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম নিশ্চল ও সচল ছবি দেখাবারও বিশেষ প্রয়োজন আছে ও যখনই এবং যেখানেই সম্ভব তার ব্যবহারও বাঞ্ছনীয়। তাই, এ বিষয় শিক্ষাদানে শিক্ষোপকরণ হিসাবে episcope, diascope, film-strip ও film projector-এর ব্যবহার অত্যাবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ।

* * *

আমাদের এই স্বল্প-পরিসর বইখানিতে সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সব কিছু স্বভাবতঃই সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়নি। অধ্যাপনা বইখানির এই অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করবে: শিক্ষার্থী তার জ্ঞাতব্য তত্ত্ব ও তথ্যগুলি জানবে তার বই, শিক্ষকের অধ্যাপনা ও উপদেশ আর তার নিজের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

আমাদের এই বইখানির উপযোগিতা ও উপকারিতা বৃদ্ধির জন্যে সমস্ত নির্দেশই শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হবে।

শ্রীবিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত

* নিউজীল্যাণ্ড-এর শিক্ষা বিভাগের মতে সমাজতত্ত্ব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য: "To take the main educational part in training pupils to become purposeful and effective citizens of a democracy: to deepen pupils' understanding of human affairs and to open up a variety of fields for active and personal exploration."

নিউ সাউথ ওয়েলস-এর Board of Secondary School-এর মতে এ বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য: "To aid in preparing the youth who pass through the Secondary Schools to play an effective part in an evolving society by giving them basic knowledge about social, political, economic and international matters, useful and meaningful to them as Australian citizens."

উপক্রমণিকা

মানব-সমাজের ক্রমবিবর্তন

ব্যুৎপত্তির দিক থেকে **সমাজ** কথাটার অর্থ দাঁড়ায় 'সহযোগ' ও 'সহ-অবস্থান'। একদল মানুষ যেখানে একই রকম রীতিনীতি আচার-ব্যবহার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি মেনে এক জায়গায় অবস্থান করে—তা সে পাহাড়-পর্বতেই হোক কি বন-জঙ্গলেই হোক কি গ্রাম কি শহরেই হোক—সেখানেই গড়ে ওঠে তাদের সমাজ।

এই সমাজ-গঠনের প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। এক সাধু-সন্ন্যাসী-সংসার-বিরাগী বা উন্মাদ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত লোকেরা ছাড়া সব মানুষই, গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটলের কথায়, 'সামাজিক জীব'। কেননা বিভিন্ন কাজেই মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করার, স্নেহ-ভালবাসা-প্রীতি বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষাও মানুষের সহজাত।

অতি প্রাচীন কালে মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, তখনও বোধ হয় সে বিচ্ছিন্ন একক জীবন যাপন করত না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি জন্তু-জানোয়ারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে, আহার্য সংগ্রহের জন্যে, সেবা-শুশ্রূষা-ভালবাসা পাবার জন্যে সেদিনকার অরণ্যচারী মানুষও বোধ হয় দল বেঁধেই থাকত—সঙ্গিহীন জীবন সেদিনও তার পক্ষে ছিল দুঃসহ।

ক্রমে মানুষ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হতে লাগল ততই তার এই সঙ্গপ্রিয়তা থেকে এক এক ধরণের সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল। এইভাবেই গড়ে উঠল **পরিবার**। এক পুরুষ, তার সঙ্গিনী নারী ও তাদের পুত্র-কন্যা নিয়ে অন্যান্য সকলের থেকে একটু আলাদা ভাবে বাস করতে লাগল। স্নেহ-প্রীতি এবং জৈবিক প্রয়োজনের বন্ধনে বাঁধা হয়ে এইভাবেই বোধ হয় বহু প্রাচীন কালে—কত হাজার হাজার বছর আগে তা সঠিক বলা যায় না—মানুষ পরিবার গঠন করেছিল।

সেই পরিবারে ক্রমে বংশবৃদ্ধি ঘটতে লাগল—ক্রমে বহু শাখা-প্রশাখা বেরুল এই পরিবার-বনস্পতির দেহ থেকে। এই শাখা-প্রশাখাগুলো ক্রমে

প্রধান বনস্পতির আশেপাশে আলাদা আলাদা এক একটা পরিবার গড়ে তুলল। আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা এই বিভিন্ন পরিবার নিয়ে গড়ে উঠল **গোষ্ঠী** (Clan)। সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের এই হল দ্বিতীয় স্তর। গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা একই পরিবার থেকে উদ্ভূত। তাই সেই পরিবার যে রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি মেনে চলত সমস্ত গোষ্ঠীর লোকেরাই তা মেনে চলত। সাধারণতঃ পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীকেই সমস্ত গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের নেতা বা নেত্রী বলে স্বীকার করে নিত এবং তার নির্দেশ মেনে চলত।

ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোষ্ঠীও প্রসারিত হতে থাকে। কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে তখন গড়ে ওঠে এক একটা **উপজাতি** (Tribe)। একই পরিবার থেকে উদ্ভূত উপজাতির লোকেদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকে—একই রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠান তারা মেনে চলে। সমাজ-জীবনের বিবর্তনে উপজাতি-গঠন হল তৃতীয় স্তর।

ক্রমে উপজাতির লোকেরা গড়ে তোলে ছোট ছোট এক একটা **পাড়া** (Locality)। বিভিন্ন পাড়া নিয়ে গড়ে ওঠে **গ্রাম**—উৎপত্তি হয় **গ্রামীণ সমাজের** (Rural Society)। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় গ্রাম গড়ে ওঠে—বিভিন্ন বৃত্তির বিভিন্ন উপজাতির লোকের বাসভূমি এই সমস্ত বড় বড় গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণে সমাজের রূপ বিচিত্র হয়ে ওঠে।

তারপর যখন গড়ে ওঠে বড় বড় শহর তখন যে **পৌরসমাজের** (Urban Society) উদ্ভব হয়, নানা দেশের নানা জাতির লোকেদের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান রীতি-নীতি নিয়ম-কানুনের সমাবেশে তার রূপ হয় বৃহত্তর, বিচিত্রতর।

সমাজ-বিজ্ঞান কাকে বলে?

কেমন করে গড়ে উঠল মানুষের সমাজ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কেনই বা এই সমাজ বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হয়ে উঠল, কেনই বা এক সমাজের রূপ

সরল আবার অন্য এক সমাজের রূপ জটিলতর—প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় দিক থেকে এই সবের কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ যে শাস্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য তাকেই বলা হয় **সমাজবিজ্ঞান** (Sociology)।

তবে বিজ্ঞান বললেও সমাজবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত পদার্থ বিজ্ঞান (Physics), রসায়ন বিজ্ঞান (Chemistry) প্রভৃতি বিজ্ঞানের মতো অভ্রান্ত হতে পারে না। কেননা মানুষ যার বিচার্য উপাদান, তার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হবে কি করে? মানুষ ও তার সমাজের রূপ ও প্রকৃতি গতিশীল, পরিবর্তনশীল—প্রাকৃতিক ঘটনার মতো একই নিয়মের অধীন নয়। তাই মানুষ ও তার সমাজ সম্বন্ধে সর্বক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না—মোটামুটি একটা ঝোঁক (tendency) নির্দেশ করা যায় মাত্র। যেমন বলা যায় যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিভিন্ন ধরণের সমাজ-সংগঠন দেখা যায়, পরিবেশের প্রভাব তার অন্যতম কারণ।

* * *

পরিবেশ কীভাবে সমাজ-সংগঠনকে প্রভাবিত করে এবার তা একটু বিস্তারিত ভাবে বলছি।

মানুষের মৌলিক প্রয়োজন-সাধনে পরিবেশের প্রভাব

মানব সমাজের মৌলিক প্রয়োজন হল তিনটি—অন্ন, বস্ত্র আর আশ্রয়। মানুষের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার আদি উৎসই হল এই অন্ন, বস্ত্র আর আশ্রয় সংস্থানের প্রয়াস। যৌথ প্রচেষ্টা দ্বারা এই তিনটি সমস্যার সহজ সমাধানের বাসনা আর চেষ্টা মানুষের সমাজ-বন্ধনের অন্যতম মূল কারণ। তারপর কালক্রমে পরিবেশ আর প্রচেষ্টার ঐক্যের জন্যে সমাজবন্ধন দৃঢ় হয়েছে, বহুতর নূতন বন্ধনও সৃষ্ট হয়েছে।

মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটাবার সুবিধে বা অসুবিধে প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার ওপর নির্ভর করে। যে-কোন অঞ্চলের অধিবাসী তার জীবন-ধারণের জন্যে সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক

পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় এবং তার অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের উপাদান ও উপকরণ তার প্রাকৃতিক পরিবেশের সহজলভ্য সম্পদ থেকে সংগ্রহ করে। (মনুষ্যেতর জীব সম্পর্কেও এ নীতি প্রযোজ্য। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারায় বহু আদিম প্রাণী ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।)

অরণ্যবাসী আদিম মানুষ জীব-জন্তু শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও বহু মানুষ রয়েছে অরণ্যই যাদের বাসভূমি—পশুপক্ষী শিকার করে কিংবা সহজলভ্য অরণ্যজাত ফলমূল খেয়েই যারা জীবন ধারণ করে। কৃষিকার্যের সম্ভাবনাহীন তৃণভূমির অধিবাসীরা জীবিকার্জনের জন্যে পশুপালনকেই বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। মরুদেশের লোকেরা বণিগ্‌বৃত্তি গ্রহণ করে। সমুদ্রতীরবাসীরা মৎস্য ব্যবসায় অবলম্বন করে। আর যেখানে ভূমি সমতল ও উর্বর এবং বৃষ্টিপাত পরিমিত সেখানকার অধিবাসীরা হয় কৃষিজীবী।

উদাহরণ

প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়—এই তিনের ওপরই গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেগুলো প্রায় নির্দিষ্টও করে দেয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মালয়ের অরণ্যবাসীদের ও এস্কিমোদের জীবনযাত্রা থেকে পাওয়া যায়।

মালয়ের গভীর অরণ্যবাসী সেমাঙ-রা সহজলভ্য বনের বাঁশে ঘর বাঁধে, গাছের পাতা দিয়ে ঘরের ছাউনি দেয়, গাছের ছালের পোশাক পরে আর বনজাত দুরিয়াণ গাছের ফল বা ইয়ামের মূল খায়।

বরফের দেশবাসী এস্কিমোরা বরফ দিয়ে ঘর তৈরী করে, সীল শিকার করে তার মাংস খায়, সীলের চামড়ার পোশাক পরে আর সীলের চর্বি জ্বালিয়ে ঘর আলো করে।

সমাজ ও সভ্যতা গঠনে পরিবেশের গুরুত্ব

অরণ্যবাসী আর বরফের দেশবাসী এই দুই মানব সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা-প্রণালীর পার্থক্য থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের

পার্থক্যের জন্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলে মানুষের অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় সংস্থানের প্রয়াসও বিভিন্ন হয় আর এই বিভিন্নতার ভিত্তিতেই বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতা গড়ে ওঠে। অবশ্য প্রায় অনুরূপ দুই পরিবেশেও যে পৃথক পৃথক জীবনযাত্রা-প্রণালী দেখা যায় না তা নয়।

বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার পথে অগ্রগতির সীমা নির্দেশ করে তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার তারতম্য। যে অঞ্চলে ভূমি সুজলা ও সুফলা সে অঞ্চলে কৃষিকর্মের সাহায্যে জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করা সহজসাধ্য। খনিজ সম্পদও সমাজের সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ। যে দেশ বা সমাজ কৃষিজাত ও খনিজ বিভিন্ন সম্পদকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলের সাহায্যে নানা শিল্পজাত অত্যাবশ্যক আধুনিক দ্রব্যে রূপান্তরিত করতে পারে সেই দেশ বা সমাজের পক্ষে উন্নত জীবন ও জীবনযাত্রা সহজায়ত্ত হয়।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনায় মানুষের প্রয়াস বহুক্ষেত্রে সফল হওয়ায় মানুষ আজ প্রকৃতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে—নিজের প্রয়োজনে আজ সে প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগাতে সমর্থ হচ্ছে। তার ফলে, মনুষ্য সমাজ ও সভ্যতার ওপর প্রকৃতির প্রভাব অনেক পরিমাণে কমেছে। চীন-দেশের বিভিন্ন অংশের সাম্প্রতিক উন্নতি, অষ্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলের আধুনিক খনিশহরের সুস্থ ও উন্নত জীবনযাত্রা প্রভৃতি আধুনিক মানুষের প্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তারের সাক্ষ্য দেয়। আমাদের ভারতবর্ষেও উন্নয়ন-পরিকল্পনার অন্তর্গত বিভিন্ন নদী পরিকল্পনা আমাদের জয়যাত্রার সূচনা করেছে।

বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে আর মানুষের প্রচেষ্টায় আমাদের এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কত বিচিত্র জীবনধারা ও সমাজ গড়ে উঠেছে এখন তার কথা কিছু কিছু বলবার চেষ্টা করব।

বিচিত্র মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে জানতে গিয়ে আমরা দেখতে পাব যে সর্বত্রই অন্ন, বস্ত্র আর আশ্রয় এই তিন মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা চলেছে; চেষ্টা চলেছে কী করে এই তিন সমস্যার সমাধান সহজ করে তুলে

মানুষের জীবনকে সুস্থ ও আনন্দঘন করে তোলা যায়। যে সমাজ প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণে এই তিন সমস্যার যত সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছে সেই সমাজ তত বেশী সুখী।

বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনার সময় একটা সাধারণ ভুল কিন্তু আমাদের বর্জন করতে হবে। মমত্বের মোহে আমরা সাধারণতঃ আমাদের সমাজ ও সভ্যতাকে অন্য কোন সমাজ ও সভ্যতার চেয়ে বড় ভেবে থাকি আর তুলনামূলকভাবে এক সমাজ ও সভ্যতাকে অপর কোন সমাজ ও সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। এ রকম ধারণা অনুদার ও অবৈজ্ঞানিক এবং বিশ্বমৈত্রী ও শান্তির পরিপন্থী।

সমাজতত্ত্ব আলোচনায় কোন সমাজ ও সভ্যতার মান নির্ণয় আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা চেষ্টা করব বিভিন্ন সমাজের ওপর ক্রিয়াশীল বিভিন্ন প্রভাব এবং সমাজের প্রকৃতি ও ধারা অনুধাবন করতে, সমস্ত মানব-গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত ঐক্য আবিষ্কার করতে আর সেই সঙ্গে এই মহাসত্য উপলব্ধি করতে যে, "জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি, সে জাতির নাম মানুষ জাতি।"

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জনসমাজ

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ বা সামাজিক বিবর্তনের ধারা আলোচনা করলে দেখা যায়, মানুষের সামাজিক জীবন গড়ে উঠেছে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিত্য নব নব আবিষ্কারের ফলে শক্তিমান আধুনিক মানুষ নানা প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকৃতির প্রতিকূলতাকে অনেকাংশে জয় করেছে। তবে এ কথাও অনস্বীকার্য যে প্রকৃতির প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করা যায় নি এবং কোনকালে যাবে কিনা তাও বোঝা যায় না।

আধুনিক কোন সমাজে হয়তো দেখা যায়, যে রাষ্ট্রাধীন সংহত চেষ্টায় জনসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিকূলতাকে অংশতঃ জয় করেছে। বিশাল জনসমষ্টির সংহত রাষ্ট্রাধীন প্রচেষ্টা আধুনিক মানুষের এক নূতন শক্তি ; প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মানব-সমাজের এই শক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তবে সর্বক্ষেত্রে নয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ গঠনে প্রকৃতির প্রভাব কতখানি এবং কী পরিমাণেই বা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তাকে পরাজিত করে নিজের নিজের কাজে লাগিয়েছে, পশ্চিম বঙ্গের কৃষিপ্রধান সমাজ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন বিশিষ্ট অঞ্চলের (উত্তর চীন, আমেরিকার 'প্রেইরী' অঞ্চল, মালয় ও হল্যাণ্ডের জুইডার জী*) সমাজ-জীবনের কথা বলার সময় তা আমরা আলোচনা করে দেখব।

প্রথমে আমরা প্রাচীন কালের সমাজ-ব্যবস্থা বোঝবার জন্যে আন্দামানের আরণ্য ফলমূলাহরণকারী ও শিকারীদের সমাজ এবং আলমোড়ার পার্বত্য পশুপালক-সমাজের বিষয় আলোচনা করব।

---

* পৃথিবীর চারটি বিশিষ্ট অঞ্চলের সামাজিক জীবন মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক পাঠ্য করা হয়েছে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সমাজ

অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

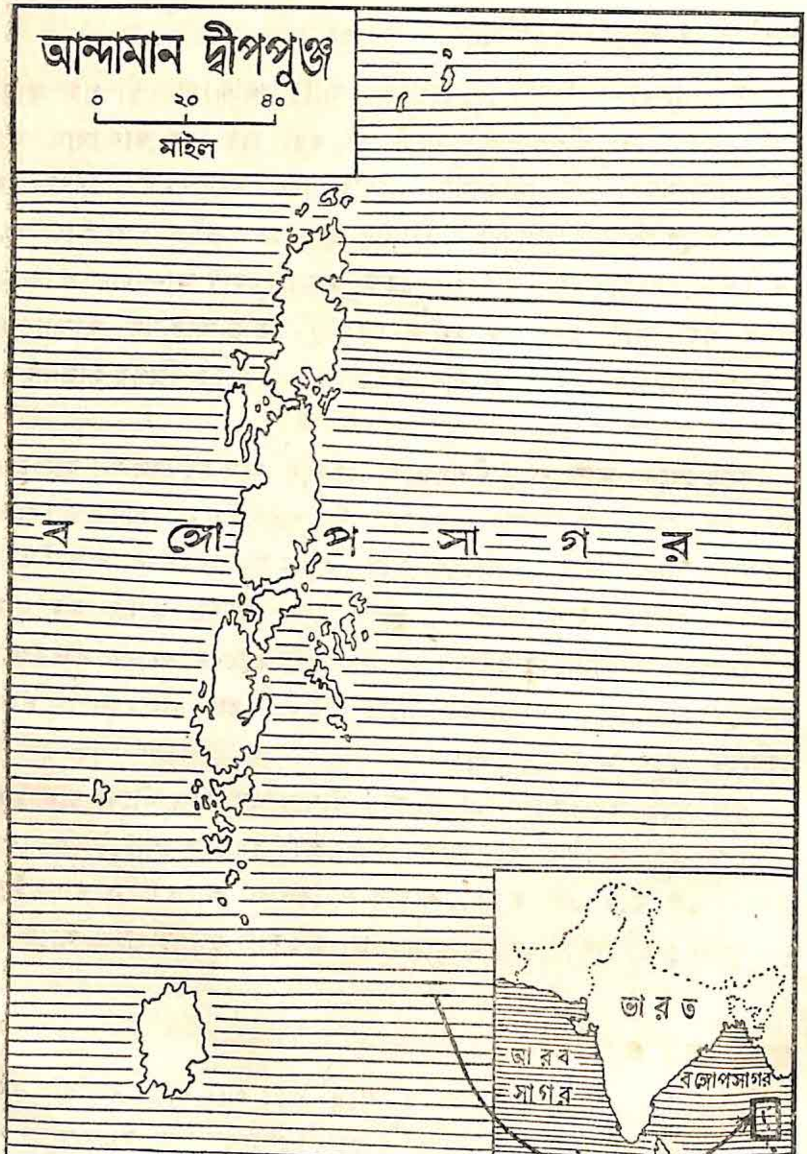
বর্মা থেকে সুমাত্রা পর্যন্ত যে দ্বীপমালা আছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ তারই একটা অংশ। এই দ্বীপপুঞ্জকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—বড় আন্দামান আর ছোট আন্দামান। বড় আন্দামান আবার চারটে অংশ বা দ্বীপে বিভক্ত বলা যায়। উত্তর থেকে দক্ষিণে বড় আন্দামান প্রায় ১৬০ মাইল লম্বা আর প্রস্থে এর কোন জায়গাই ২০ মাইলের বেশী নয়। ছোট আন্দামান প্রায় ২৬ মাইল লম্বা আর প্রায় ১৬ মাইল চওড়া। ছোট আর বড় আন্দামানের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে অগভীর জলরাশি। এই দুই দ্বীপের মাঝখানকার দূরত্ব হল প্রায় ৩০ মাইল।

সমুদ্র থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে দেখলে মনে হয় যেন ঘন বনে ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী। এই দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম Saddle Peak : উচ্চতায় ২৪০২ ফিট্। দ্বীপের মধ্যে জলনিকাশের কোন খাল ইত্যাদি নেই। পাহাড় থেকে বর্ষায় যে জল নামে তাতে অনেক জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে। আন্দামানের তটরেখা ভগ্ন এবং এই তটরেখা বরাবর কতকগুলো পোতাশ্রয়ও আছে। সমুদ্রতীরে আছে বিস্তীর্ণ বহু প্রবালস্তূপ। খাঁড়ি-গুলোতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।

এক সময় আন্দামানে ভারতবর্ষের দ্বীপান্তরিত অপরাধীদের রাখা হত। পূর্বেকার এই বন্দীনিবাসের অংশ ছাড়া প্রায় সমস্ত জায়গাটাই ঘন বনে ঢাকা। এই বনে এক জাতীয় শূয়োর ও বিড়াল আছে। এ ছাড়া ইঁদুর ও বাদুড়ও দেখা যায়। এখানে অনেক জাতের সাপ ও গিরগিটিও আছে।

আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত

আন্দামানের আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র আর প্রায় সারা বৎসরই একই রকম আবহাওয়া থাকে। তাপমাত্রা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে সবচেয়ে কমে ও



আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
০ ২০ ৪০
মাইল
ব ঙ্গো প সা গ র
ভারত
আরব
সাগর
বঙ্গোপসাগর

এপ্রিল-মে'তে সবচেয়ে বাড়ে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মে থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত এখানে বৃষ্টিপাত হয়। পোর্ট ব্লেয়ারে (এখানে বিভিন্ন স্থানে বন্দীনিবাস ছিল) বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ১৩৮"। বঙ্গোপসাগরে মাঝে মাঝে যে বড় ঝড় ওঠে তা আন্দামানের একটু দক্ষিণ হতে ওঠে।

আন্দামানবাসীদের সমাজ

আন্দামানের অধিবাসীরা নিগ্রোজাতীয় এবং আদিম অরণ্যবাসীদের বংশধর। জাতীয় ঐক্য থাকা সত্ত্বেও আন্দামানবাসীরা কিন্তু ভাষা ও কৃষ্টিগতভাবে পৃথক পৃথক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তার মধ্যে প্রধান বিভাগ দুটি—**বড় আন্দামানবাসী** ও **ছোট আন্দামানবাসী**। বড় আন্দামানের দক্ষিণ অংশের Jawara এবং North Sentinel দ্বীপবাসী ও ছোট আন্দামানের অধিবাসীরা একই গোষ্ঠীভুক্ত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর বাসস্থান কিন্তু খুব সুনির্দিষ্ট ভাবে সীমাবদ্ধ নয়।

বড় আন্দামানবাসীরা আবার দশটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর পৃথক স্থানীয় কথ্য ভাষা ও নাম আছে। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নামের আগে Aka শব্দ ব্যবহার করা হয়। গোষ্ঠীগুলির নাম Aka Cori, Aka Kora, Aka Bea—এই রকম। Aka শব্দের অর্থ বোধ হয় 'মুখ'। গোষ্ঠী বিভাগের মূল সূত্র বোধ হয় ভাষা। অবশ্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষার প্রভেদ সামান্য। ছোট আন্দামানবাসীরা নিজেদের Onge বলে। সম্ভবতঃ Onge অর্থ 'মানুষ'।

আন্দামানের সমাজ-ব্যবস্থায় গোষ্ঠীগত প্রভাব খুব বেশী নয়। স্থানীয় কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি সমাজ গঠিত হয় এবং সেই স্থানীয় সমাজই ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী ও তাদের নিজেদের (বা পালিত) অবিবাহিত সন্তানেরা থাকে। স্থানীয় এক এক দলে বিভিন্ন বয়সের ৪০।৫০ জন লোক থাকে। প্রত্যেক স্থানীয় দলের নিজস্ব

ভূমিখণ্ড থাকে। এক দলের লোক যদি অন্য দলের জায়গায় শিকার করতে যেতে চায় তাহলে যে দলের জায়গা সেই দলের অনুমতি নিতে হয়। যে ব্যক্তি যে স্থানীয় সমাজে জন্মায় সে সেই সমাজের সভ্য রূপে জীবন ধারণ করে। অবশ্য এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে যাওয়ায় কোন বাধা বা নিষেধ নেই। তবে যে সমাজে একজন যাবে সেই সমাজকে তাকে নিতে রাজী হতে হবে। দুই ভিন্ন সমাজের স্ত্রী পুরুষের বিয়ে হলে সেই দম্পতি স্বামী বা স্ত্রীর সমাজে বসবাস করতে পারে।

বাসস্থানের পার্থক্য অনুসারে জীবনযাত্রা-প্রণালীর পার্থক্য

বাসস্থানের পার্থক্য অনুসারে আন্দামানবাসীদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়—**সমুদ্রতীরবাসী** আর **অরণ্যবাসী**। এই দুই শ্রেণীর খাদ্যও পৃথক। সমুদ্রতীরবাসীরা মৎস্য ও অন্যান্য জলজ খাদ্যপ্রাণী শিকারে দক্ষ। তারা একরকম নৌকা তৈরী করতে জানে। এই নৌকা শিকার ও ভ্রমণ দুই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রতীরবাসীরাও বনজ ফলমূল গ্রহণ করে এবং তারা বনের শূয়োর শিকার করেও খায়। অরণ্যবাসীরা প্রধানতঃ বনজ ফলমূল খেয়েই জীবন ধারণ করে এবং শূয়োর শিকারে অপর শ্রেণীর চেয়ে তারা বেশী দক্ষ। খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে মোটের ওপর সমুদ্রতীরবাসীরাই অধিক সুবিধা ভোগ করে, কারণ তারা বন ও সমুদ্র এই দুই জায়গা থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে।

স্থানীয় দল হিসাবে এক অরণ্যবাসী দলের অধীনে সমুদ্রতীরবাসী এক দলের চেয়ে বেশী জায়গা থাকে। প্রত্যেক দলের অধিকারভুক্ত সীমানার মধ্যে কয়েকটা জায়গা বসবাসের জন্যে নির্দিষ্ট। বৎসরের অধিকাংশ সময় দলের সকলে একসঙ্গে এক জায়গায় থাকে। সমুদ্রতীরবাসী দলগুলো সমুদ্রের ধারে যেখানে নৌকা চলাচলের সুবিধা আছে সেইরকম জায়গাতেই তাদের বাসস্থান নির্বাচিত করে। বাসস্থান নির্ণয় ব্যাপারে সব ক্ষেত্রেই কাছাকাছি পানীয় জল আছে কিনা তা দেখা হয়। সমুদ্রতীরবাসী দলগুলো

এক বাসস্থানে কয়েক মাসের বেশী বাস করে না। তারা ঋতুভেদে আবহাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য অথবা পশু বা মৎস্য শিকারের সুবিধার জন্য বাসস্থান ত্যাগ করে। এক বাসস্থানে কারো মৃত্যু হলে কয়েক মাসের জন্যে তারা স্থান ত্যাগ করে। আবার বাসস্থানের চারধারে আবর্জনা জমলে সে আবর্জনা পরিষ্কার না করে তারা বরং সেই বাসস্থানই ত্যাগ করে যায়।

অরণ্যবসীদের যাযাবরত্ব সমুদ্রতীরবাসীদের চেয়ে কম। এর একটা কারণ বোধ হয় এই সমুদ্রতীরবাসীরা তাদের জিনিসপত্র নিয়ে নৌকায় চলাচল করে বলে তাদের পক্ষে স্থানবদল সহজ। অরণ্যবাসীরা সমস্ত বর্ষাকাল একই জায়গায় বাস করে। অন্যান্য সময় তারাও ঘুরে বেড়ায়, মাঝে মাঝে শিকারের সুযোগের জন্যে অল্পদিনস্থায়ী বাসস্থান ঠিক করে বা দলের বন্ধু-বান্ধবদের সংগে দেখা করে।

তবে সমুদ্রতীরবাসী বা অরণ্যবাসী দুই দলেরই প্রায় পাকাপাকি বাসস্থান একটা থাকেই। সেটা যেন দলের headquarters। এখানে দলের সবাই থাকতে পারে এতবড় একটা ঘর (Communal hut) বা সুবিন্যস্ত একটা গ্রাম দলের লোকেরা তৈরী করে নেয়। Communal hut একটা ঘর নয়, খুব ঘনসন্নিবিষ্ট অনেকগুলো ঘর: সেটা সবাই মিলে তৈরী করে, এবং এতে সকল পরিবারেরই নির্দিষ্ট অংশ থাকে।

আন্দামানের গ্রাম

নীচের নক্শা দেখে আন্দামানী গ্রামের একটা ধারণা করা যাবে।

(ক) বিবাহিত ব্যক্তিদের পরিবার-সহ থাকার জায়গা।

(খ) অবিবাহিতদের থাকার জায়গা।

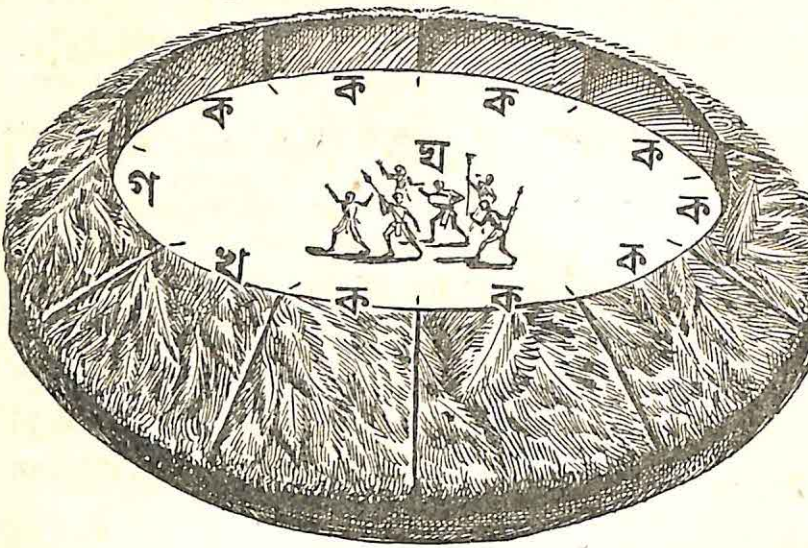
(গ) দলের রান্নার জায়গা।

(ঘ) নাচের জায়গা।

গ্রামের সমস্ত ঘরগুলোর দরজা থাকে ভেতরের নাচের জায়গার দিকে। প্রত্যেক পরিবার যার যার ঘর নিজেরা মেরামত করে নেয়।

খাদ্য ও দৈনন্দিন জীবন

আন্দামানবাসীরা তাদের খাদ্য সমুদ্র ও বন থেকে সংগ্রহ করে। সমুদ্র থেকে পাওয়া মাছ-কাঁকড়া ও বন থেকে পাওয়া নানাবিধ ফল, মূল ও বীজ এবং শূয়োরের মাংস এদের প্রধান খাদ্য। এরা তীরধনুক দিয়ে শিকার করে। কিছুকাল আগে থেকে শূয়োর শিকারে এরা কুকুরও ব্যবহার করছে (ভারতবর্ষ



ও ব্রহ্মদেশ থেকে দ্বীপান্তরিত অপরাধীদের কাছ থেকে এরা শিকারের সময় কুকুরের ব্যবহার শিখেছে)। এরা মাংস আগুনে ঝলসে খায়। এরা সাপ, ইঁদুর, বিড়াল ইত্যাদির মাংসও খায়। শিকার পুরুষদের কাজ আর ফল, মূল প্রভৃতি খাদ্য আহরণ প্রধানতঃ মেয়েদের কাজ। জ্বালানী ও জলও তারাই সংগ্রহ করে। পুরুষরা যখন শিকারে যায় তখন মেয়েরা শিশু সন্তান নিয়ে জ্বালানী কিংবা ফল-মূল সংগ্রহ করে আর না হয় বাড়ীতে বসে জাল বা ঝুড়ি বোনে। দুপুরের দিকে গ্রামে থাকে বুড়োবুড়ীরা বা কয়েকটি ছেলেমেয়ে।

সন্ধ্যায় দিনের সংগ্রহ সমস্ত জিনিস নিয়ে সবাই ঘরে ফেরে। তখন

সন্ধ্যার আহার্য তৈরী হয়—সন্ধ্যার আহারই এদের সারা দিনরাত্রের প্রধান আহার। শূয়োর মারতে পারলে দলের রান্নার জায়গায় সেটা ঝল্‌সিয়ে নিয়ে দলের সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। দলের রান্না পুরুষরা করে। তবে প্রত্যেক পরিবারের রান্না গৃহিণীরাই করে থাকে। অবিবাহিত যুবক যুবতীরা যার যার রান্না নিজেরাই করে। স্ত্রী ও পুরুষের কর্মবিভাগ (Division of Labour) ছাড়া এ সমাজে আর কোন কর্মবিভাগ নেই।

রাত্রের খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর পুরুষরা দু'এক ঘণ্টা নেচে কাটায়। একজন পুরুষ একটি গান ধরে, মেয়েরা তার সংগে সংগে সমবেত স্বরে গান গায় আর সেই গানের তালে তালে নাচ চলে। সন্ধ্যা কাটাবার আরও একটি উপায় আছে। একজন পুরুষ অল্প কথায় এবং বহু অংগভংগী সহকারে তার শূয়োর শিকারের কাহিনী বলে আর শ্রোতারা তাই শোনে। এরকম কোন আমোদ-প্রমোদের পরে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। বিয়ের সময়, বা বিবাদের পর দুই দলের মধ্যে সন্ধিস্থাপন উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশেষ ধরণের নাচ হয়।

ঘরে প্রচুর খাদ্য জমা থাকলে অথবা ঝড় বৃষ্টির দুর্যোগে পুরুষরা ঘরে বসে অস্ত্রাদি তৈরী অথবা মেরামত করে। স্থানীয় বনে সুলভ এক রকম গাছের কাঠ দিয়ে ধনুর কাণ্ড ও আর একরকম গাছের আঁশ দিয়ে ধনুর ছিলা তৈরী হয়।

সুখকর আবহাওয়ায় এক স্থানীয় দলের সংগে অন্য দলের দেখা-সাক্ষাৎ এক মিলন-মধুর সামাজিক ঘটনা। তখন বিভিন্ন দলের মধ্যে নানা রকম উপহার-বিনিময় হয়ে থাকে।

সমাজের অর্থ নৈতিক ভিত্তি

আন্দামানবাসীদের সমাজের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ সাম্যবাদী ধরণের। প্রত্যেক স্থানীয় দলের জমি বা শিকারের এলাকায় কারো ব্যক্তিগত কধিকার নেই। তবে কেউ একটা গাছ দেখে নৌকা তৈরীর উপযুক্ত মনে করে সেটা বাছাই করলে, সে গাছ তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে যায়। (নৌকা তৈরী

ব্যাপারে অবশ্য অন্যান্য ব্যক্তিরা তাকে সাহায্য করে।) কোন কোন ফলের গাছও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য হয়। মালিকের অনুমতি ছাড়া অপর কেউ ফল পাড়ে না এবং অনুমতি নিয়ে পাড়লেও মালিককে ফলের ভাগ দেয়। শিকারের বেলায় যার তীর শূয়োরের গায়ে প্রথম লাগবে নিহত শূয়োর তারই হবে। যে গাছে উঠে মৌচাক কাটে সেটাও তার সম্পত্তি হয়। কোন অস্ত্র যে পুরুষ তৈরী করে তা তার। কোন স্ত্রীলোক যা কিছু তৈরী করে তা তার। কোন স্ত্রীর সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী করতে পারে না।

আন্দামানবাসীরা উপহার দেবার ছলে পরস্পরের দ্রব্যাদি সর্বদাই বিনিময় করে। কেউ কারো কাছে কিছু চাইলে সেটা না দেওয়া অভদ্রতা। বয়সে বড় কেউ ছোট কারো কাছে কিছু চাইলে সে তা দেবেই। উদারতা আন্দামানবাসীদের চরিত্রের এক বিশেষ ধর্ম।

শাসন-পদ্ধতি

আন্দামানের গ্রামে কোন শাসন-ব্যবস্থা নেই। বয়োবৃদ্ধেরাই সমস্ত সামাজিক ব্যাপারে ব্যবস্থাদি করে। সমাজে বয়োবৃদ্ধের সম্মান যথেষ্ট। তবে বয়োবৃদ্ধের স্বেচ্ছাচারিতা নেই, তাই বয়ঃকনিষ্ঠের বাধ্যতা স্বাভাবিক। বয়োবৃদ্ধের নামের আগে কনিষ্ঠেরা সম্মানসূচক Mai বা Maia (ইংরেজী Mr.-এর মত) এবং বয়োবৃদ্ধাদের নামের আগে Mimi ব্যবহার করে। শিকারে নিপুণতা, দয়া, উদারতা, শান্ত স্বভাব প্রভৃতি গুণের অধিকারীরাও সমাজে বিশেষ সম্মানভাজন বলে গণ্য হয়।

অলসতা এ সমাজে এক অতি নিন্দনীয় দোষ। কতকগুলো কাজ (যেমন মোম পোড়ান) আচার-বিরোধী এবং আন্দামানবাসীরা বিশ্বাস করে যে এর জন্যে সমস্ত সমাজের ওপর অভিশাপরূপে ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে। এও তারা বিশ্বাস করে যে আচার-বিরোধী কাজের ফলে অনাচারী ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

চিকিৎসকদের অতি-প্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। জাদু-বলে তারা একজনকে অসুস্থ করতে, এমনকি মেরে ফেলতেও পারে। শিশুরা অশোভন আচরণের জন্যে কোন শাস্তি পায় না। বিয়ে সব সময় বড়রাই ঠিক করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের খুব অল্প বয়সেই উভয় পক্ষের পিতা বাগ্‌দান করে ছেলে ও মেয়ের বিয়ে ঠিক করে রাখেন।

শিশুর আদর

আন্দামানের সমাজে শিশুরা সবারই আদরের। মায়েরা নিজেদের গর্ভজাত শিশু ছাড়া অপর শিশুকেও নিজেদের স্তন্য পান করায়। পুরুষেরা নিজেদের ছেলেমেয়ে ভিন্ন অপর শিশুকেও আদর আহ্লাদ করে। কোন শিশুর পিতামাতার মৃত্যু হলে অপর কোন পিতা-মাতা অনাথ শিশুটিকে পোষ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং নিজের সন্তানের মতই লালন পালন করে।

জীবনের স্তরবিভাগ

আন্দামানবাসীদের জীবনের শৈশব, যৌবন থেকে বিবাহ ও তার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই তিন সুনির্দিষ্ট স্তরে সামাজিক জীবন ও কর্তব্য তিন রকম। শিশুরা খুব ছোটবয়সেই পিতামাতা বা পালক পিতামাতার সংগে তাদের পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করে। বিয়ের পর ছেলেমেয়েরা আলাদা বাস করে। বিশেষ সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান করে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের যৌবনাগম ঘোষণা করা হয়।

সৌন্দর্যানুরাগ

আন্দামানবাসীরা নিজেদের সুন্দর দেখাবার জন্যে সাধারণ মাটি, সাদা মাটি ও এক রকম লাল রঙ গায়ে মাখে। সাধারণ নাচের সময় শুধু মুখে রঙ মাখে। কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে সারা গা রাঙায়।

ভূত-প্রেতে বিশ্বাস

আন্দামানবাসীরা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে। তাদের ধারণা যে, কোন ভূত বনে থাকে আবার কোন ভূত সমুদ্রে থাকে। উত্তর আন্দামানে ভূতপ্রেতকে 'Lao', 'Lau' বা 'Yau' বলে, দক্ষিণ অঞ্চলে ভূতের Cauga' নাম প্রচলিত। আকাশ-চারী ভূতপ্রেতে বিশ্বাস দক্ষিণ অংশে প্রচলিত। এদের নাম 'Morua' বা 'Morowin'। ভারতবর্ষ ও বর্মা থেকে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত অপরাধীদেরও 'Lau' বা Cauga বলা হত। এককালে তারা ইউরোপীয়ানদেরও 'Lau' বলত। আমাদের দেশের ভূতের মত ও-দেশের ভূতেরও নাকি হাত-পা খুব লম্বা, চেহারাও তাদের ভয়ানক বিকট। আন্দামানবাসীরাও বিশ্বাস করে যে ভূতেরা মৃত ব্যক্তির আত্মা। ওখানকার ভূতও বনের ভেতর নির্জনে মানুষকে আশ্রয় করে তাকে মেরে ফেলে। ভূত নিয়ে কারবারী (যারা নাকি ভূতের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ করে ভূতকে কাজে লাগায়) সে দেশেও আছে।

ভূত যেমন আছে তেমনিই ভূত তাড়াবার ওষুধও আছে। ভূত তাড়াতে বা ভূতকে দূরে রাখতে আগুন, মানুষের হাড়, মৌচাকের মোম, গায়ে মাখা লাল রঙ নাকি উপকারী। রাতে চলাফেরা করবার সময় ও-দেশের লোকেরা আগুন নিয়ে চলে। ও-দেশে কেউ শীষ দেয় না, শীষ নাকি ভূতকে কাছে টেনে আনে।

আন্দামানীদের দেবতা

আন্দামানবাসীরা প্রাকৃতিক নানা বস্তু—যেমন সূর্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ প্রভৃতিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে। কোন কোন মতে সূর্য চন্দ্রের স্ত্রী, আর তারাগুলো তাদের ছেলেমেয়ে ; অন্যমতে চাঁদ স্ত্রী, তার স্বামীর নাম 'Maia Tok'; সূর্য পুরুষ।

আবহাওয়া বা ঋতুভেদ অনুসারে আন্দামানবাসীরা বছরকে দু'ভাগে ভাগ করে। প্রত্যেক অংশ এক এক দেবতার অধীন। এক দেবতার নাম 'Biliku' বা 'Bilik' বা 'Pulaga'. অপর দেবতার নাম 'Tarai' বা 'Teriya' বা

'Daria'। 'Biliku'র অধিষ্ঠান উত্তর ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুতে, আর 'Tarai'র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুতে। বৃষ্টি, বজ্র আর বিদ্যুৎ 'Tarai'র অধীন আর 'Biliku'র রাগে আসে ঝড়।

আন্দামানের সমাজ-ব্যবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের প্রাধান্যের কোন তফাৎ নেই। তাই এই দেবতারা পুরুষ বা স্ত্রী সে বিষয়ে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না।

রোগের কারণ ও চিকিৎসা

অন্যান্য আদিম সমাজের চিকিৎসক বা জাদুকর বা Shamanদের মত, এ-সমাজেও কোন অতীন্দ্রিয় (supernatural) ক্ষমতা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ খাতির আছে। এ ব্যাপারে পুরুষদেরই বিশেষ প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। বিভিন্ন রোগের সংগে বিভিন্ন অতীন্দ্রিয় কারণ প্রায়ই যুক্ত করা হয় এবং রোগের চিকিৎসাও সেই ভাবেই হয়। নানা রকম মাটি গায়ে বা অসুস্থ স্থানে লেপে বা গাছ-পাতা ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। আগুনের কাছে ভূত-প্রেত আসে না বলে রোগীর কাছে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়।

আন্দামানবাসীরা মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর হাড় দিয়ে নানা অলঙ্কার তৈরী করে পরে। এই অলঙ্কার ব্যবহারের মূলে সৌন্দর্যবৃদ্ধির চেয়ে ভূতপ্রেত বা রোগকে দূরে রাখার চেষ্টাই প্রধান। শরীরের যে অংশে রোগ বা ব্যথা হয় সে অংশ (যেমন মাথা ব্যথায় কপাল, দাঁত ব্যথায় গাল) বলি দিয়ে বা উৎসর্গ করে রোগ সারাবার প্রথা অতি সাধারণ। চামড়া, কাঁচ ইত্যাদি দিয়ে রুগ্ন অংশের নানা জায়গায় অগভীর করে কেটে দেওয়া হয়। মেয়েরাই এ সমস্ত ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করে থাকে।

লোহার ব্যবহার

আন্দামানবাসীরা লোহার ব্যবহার জানে। এই আদিম সমাজে বহু পূর্ব থেকেই লোহার ব্যবহারের প্রচলন দেখে কেউ কেউ অনুমান করেন, অতি প্রাচীন কাল থেকেই সমুদ্রগামী জাহাজ বা ঝড়ে ভাঙা জাহাজ থেকে লোহা পেয়ে এরা তার ব্যবহার শিখেছিল।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সমাজ সম্বন্ধে লক্ষণীয়

(১) আন্দামানবাসীরা নিগ্রোজাতীয় অরণ্যবাসী। তাদের সমাজ আরণ্যে। (২) আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সমাজ মূলতঃ কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত। (৩) সমাজ ব্যবস্থায় পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট। আহার্য, গৃহ নির্মাণের উপকরণ ও আচ্ছাদন (আচ্ছাদন সম্পর্কে আন্দামানবাসীরা উদাসীন) সবই পরিবেশ থেকে সংগৃহীত হয়। (৪) প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের জীবন-ধারণের পক্ষে প্রতিকূল না হওয়াতে দীর্ঘ জীবন সম্ভব এবং স্বাভাবিকভাবে অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধেরা সমাজে নেতৃত্ব ভোগ করে (প্রতিকূল পরিবেশে বহু সমাজে দীর্ঘ জীবন অসম্ভব এবং যে বৃদ্ধ নিজে আহার সংগ্রহ করতে না পারে তার সামাজিক আদর আদৌ নেই, এমন কি তার খাদ্য সংস্থানের দায়িত্বও সমাজ নিতে চায় না)। (৫) সমাজে স্ত্রী-পুরুষের কর্মবিভাগ ছাড়া কোন কর্মবিভাগ বা তজ্জনিত জাতি বা শ্রেণীভেদ নেই। (৬) বয়স অনুসারে বিভিন্ন আচার আচরণের বিধি নিষেধ আছে। (৭) এ-সমাজে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন পারিবারিক রীতিনীতির চেয়ে সামাজিক রীতিনীতি বেশী মানতে হয় এবং এর উদ্দেশ্য ব্যক্তি সমগ্র সামাজিক জীবনের জন্য প্রস্তুতি। একই স্তন্যপায়ী শিশু ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে নানা মায়ের স্তন্য পান করে—এ রীতি ও পোষ্য গ্রহণের রীতি থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় যে শিশুকে বিশেষ পিতামাতার সন্তান হিসেবে না দেখে সমাজের সভ্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

॥ খ ॥ আলমোড়ার পার্বত্য সমাজ

অবস্থান, আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত

আলমোড়া হল উত্তর প্রদেশের কুমায়ূন বিভাগের একটা জেলা (নৈনিতাল, গাড়োয়াল আর আলমোড়া এই কটি জেলা নিয়ে তৈরী কুমায়ূন বিভাগ)। আলমোড়ার পূর্বদিকে নেপাল। কালীনদী নেপালকে আলমোড়া থেকে পৃথক করেছে। আলমোড়ার উত্তরে তিব্বত ও দক্ষিণে নৈনিতাল জেলা। আলমোড়ার পশ্চিমে পর্বতশ্রেণী। সারা জেলাটাই হিমালয় পর্বতমালার অন্তর্গত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এই জেলার ভূ-ভাগের উচ্চতা ১০০০ ফিট্ থেকে ২৫৬৬০ ফিট্ (নন্দাদেবী শৃঙ্গের উচ্চতা)। এ-জেলার ভূমির অধিকাংশই বন ও পাহাড়; আবাদী জমি এবং কর্ষণযোগ্য পতিত জমি অল্প। এই-জেলার প্রধান নদী কালী। কোশী ও পশ্চিম রামগংগা ছাড়া এ জেলার সব নদীই কালীর সংগে মিলেছে; আর প্রধান প্রধান সব নদীরই গতি দক্ষিণ-পর্ব দিকে। এখানে সব নদীই ওপর থেকে বেগে নীচে নামছে। যে সমস্ত জায়গায় নদী-প্রবাহের সংগে পলিমাটি এসে জমেছে ও সেচের জন্যে নদীর জল সহজে পাওয়া যায় সেই সমস্ত জায়গা যথেষ্ট উর্বর। এখানকার আবহাওয়া পর্বতশ্রেণীর অবস্থান আর উচ্চতা এবং ভূমি-প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। পাহাড়িয়াদের হিসাব মত এখানে তিনটি ঋতু:

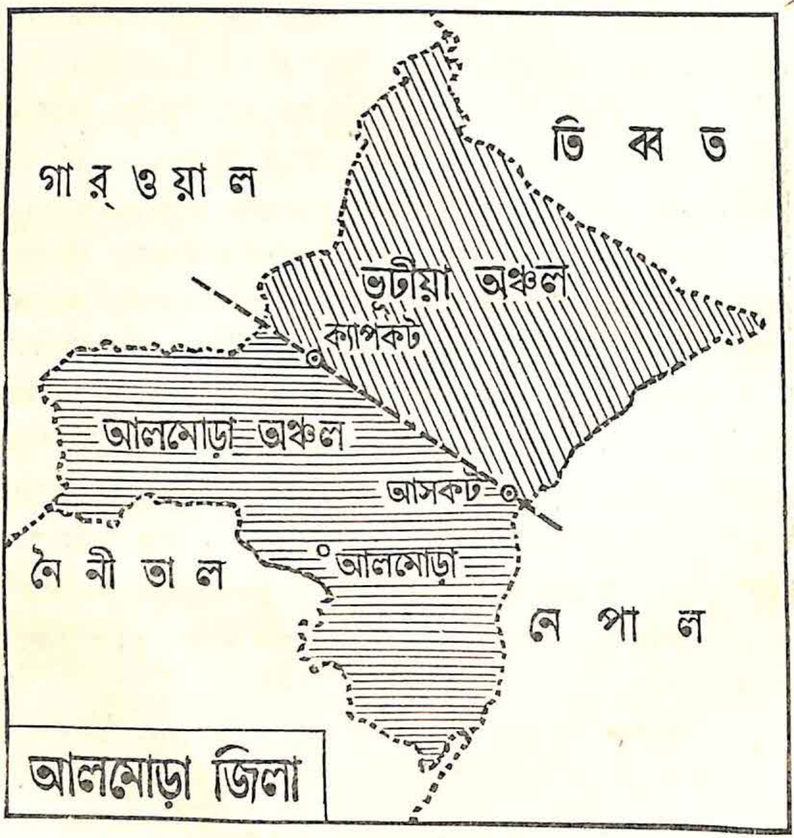
(১) **রুরী** বা গ্রীষ্মকাল—ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত;

(২) **চৌমাস** বা বর্ষাকাল—জুনের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত;

(৩) **হিউন** বা শীতকাল—সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত।

পাহাড়ের অবস্থান ও উচ্চতার পার্থক্যের জন্যে বৃষ্টিপাত সব জায়গায় সমান নয়। জেলার এক অংশের বৃষ্টিপাতের গড় ৪০ (আলমোড়া), অন্যত্র

(রাণীক্ষেত) ৯৮"। এ-জেলার উত্তরাংশ প্রায় সারাবছর বরফে ঢাকা থাকে, তাই খুব ঠাণ্ডা আর গাছপালাশূন্য। অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত মাটি যখন বরফে সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে তখন মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীরা দক্ষিণে চলে যায়। দক্ষিণ অংশের আবহাওয়া সাধারণ ভারতীয় আবহাওয়ার মত।

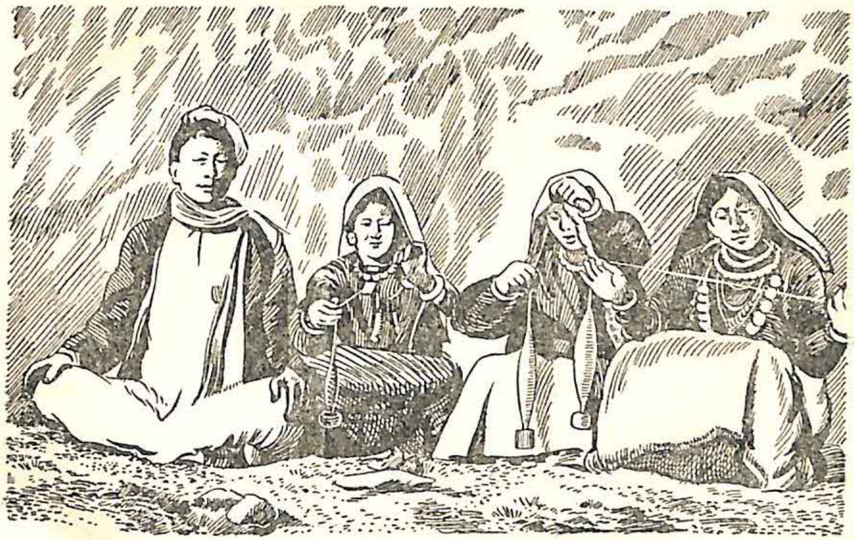


প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য আলমোড়া সারা ভারতে বিখ্যাত। এখানকার পাহাড়ের জলধারা উত্তর প্রদেশের অনেক সেচ খালের জল সরবরাহ করে। এখানে পাহাড়ে দামী কাঠ, জ্বালানী ও

ঘাস পাওয়া যায়। এখানকায় পার্বত্য পরিবেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত, বিভিন্ন ভাষাভাষী ও রীতিনীতি-অবলম্বী শক্তিশালী ও কষ্টসহিষ্ণু এক মনুষ্য সমাজ বাস করে।

ভূ-প্রকৃতি ও কৃষি

মানচিত্রে দেখতে পাবে যে, **অ্যাসকট** (Askot) ও **ক্যাপকট** (Capkot) এক কল্পিত রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। এই কল্পিত রেখা আলমোড়া জেলাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। এ-রেখার উত্তর-পূর্ব অংশের নাম **ভোট** বা **ভোটীয়া** অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের নাম **আলমোড়া** অঞ্চল।



ভোট পরিবার

আলমোড়া অঞ্চলে অসংখ্য পাহাড় ও উপত্যকা আছে। প্রত্যেক উপত্যকাতেই নিম্নাভিমুখী জলস্রোত আছে। এই জলস্রোতগুলো নীচে গংগা প্রভৃতি কোন প্রধান নদীর কোন শাখার সংগে মিলেছে। উত্তরের উঁচু

পাহাড়গুলোতে প্রচুর ওক্ আর রডডেনড্রন গাছ আর মাঝারি পাহাড়গুলোতে পাইন বন আছে।

ভূ-প্রকৃতি যাই হোক, যেখানে প্রচুর রোদ ও সেচের জল সুলভ সেখানেই কৃষিকাজ হয়। অন্তর্বর্তী পাহাড় আর জলস্রোত ইত্যাদির জন্য কোন উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চাষ-আবাদ সম্ভব নয়। তাই, কৃষিক্ষেত্রগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত। পাহাড়ের তলার জমি থেকে চাষ সুরু হয়। তবে জনসংখ্যার চাপে প্রয়োজন হলে ক্রমশঃ পাহাড়ের ওপর আবাদ করতে হয়। পাহাড়ের ওপরে ধাপে ধাপে ক্ষেত তৈরী করে চাষ-আবাদ হয় (Terrace Cultivation)। এই ক্ষেতগুলো যেন কোন জলস্রোতের ধার থেকে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত সিঁড়ির সারি। পাহাড়ের ওপরের দিকে বনের ধারের জমিতে যে চাষ হয় সেখানে ধাপ (Terrace) তৈরী করা হয় না। এখানকার চাষকে **খিল** বা **খাটিল** চাষ বলে। খিল বা খাটিল চাষ সারাবছর হয় না। এ চাষ সাময়িক।

পাহাড়ে চাষের জন্যে সূর্যের উত্তাপের গুরুত্ব খুব বেশী। যাতে বেশ ভাল মত রোদ পড়ে এমন পাহাড়ে জমি ছায়া-ঢাকা জমির চেয়ে অনেক মূল্যমান। স্থানীয় ভাষায় রোদ পড়ে এমন জমিগুলিকে 'Tailo' ও ছায়া-ঢাকা জমিকে 'Saylo' বলে। রোদের জমিগুলি একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত আবাদ করা হয়। কিন্তু ছায়া-ঢাকা জমি প্রয়োজনের চাপে বাধ্য না হলে আবাদ করা হয় না। রোদের জমির ফলন অনেক বেশী। পাহাড়ের ওপরের দিকে যেখানে চাষের জমির শেষ হয় সেইখান থেকে বনের সুরু। এই সমস্ত বন থেকে কাঠ, জ্বালানী, আর ঘাস পাওয়া যায়। এই বনগুলিই গ্রামবাসীদের গৃহপালিত পশুর চারণ-ভূমি।

গ্রাম ও লোকবসতি

পাহাড়গুলোর তলদেশ স্যাঁৎসেঁতে আর গরম, ওপরের দিক খুব ঠাণ্ডা। তাই, এখানকার গ্রামগুলো, চাষের জমির কাছে, মাঝামাঝি জায়গায় গড়ে

উঠেছে—গ্রামগুলো পশুচারণের অসুবিধা হবে বলে বন থেকে বেশী দূরে নয়, আবার বন্য পশুর উৎপাত এড়াবার জন্য বনের খুব ধারেও নয়। লোকবসতির জন্যে জায়গা নির্বাচনের সময় যেখানে পানীয় জল সহজে এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেই রকম জায়গার কথাই সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হয়। তাই দেখা যায়, বেশীর ভাগ গ্রামের কাছেই ঝরনা; কোথাও ঝরনার জল নালা কেটে গ্রামে আনা হয়, কোথাও বা ঝরনার কাছে জলাধার প্রস্তুত করা হয়।

কোন নির্দিষ্ট পাহাড় ঘিরে এক রকম মাটিতে এক রকম ফসল ফলে এবং একই রকম ঘর-বাড়ী তৈরী করে এক গোষ্ঠীর লোক বসবাস করে। বিভিন্ন উচ্চতায় মাটির বিভিন্নতা এবং নদী ও বনের নৈকট্য বা দূরত্বের জন্যে বিভিন্ন রকম গ্রাম গড়ে ওঠে। উচ্চতায় ৩০০০ থেকে ৫০০০ ফিট্-এর মাঝামাঝি জায়গাগুলোতে চাষ-আবাদ ভাল হয়, ৫০০০ ফিট্-এর বেশী উঁচু জায়গায় ফসল ভাল হয় না। চাষ-আবাদের যোগ্য জমির কাছাকাছি জনবসতি গড়ে ওঠে—অন্যান্য জায়গা জনবিরল।

অধিবাসীদের উপজীবিকা

আলমোড়া অঞ্চলে জমি খুব উর্বর; প্রায় সারা জেলারই খাদ্য এই অঞ্চলে জন্মায়। তবে কৃষি এ-অঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা হলেও কৃষিকাজ খুবই কষ্টসাধ্য—কারণ বন্যা, শিলাবৃষ্টি, ধস, নানা বন্যপশুর উৎপাত, মানুষ ও পশুর স্বল্পজীবন ইত্যাদি প্রতিবন্ধক তো আছেই; তাছাড়া, চাষীকে নীচে বহুদূর থেকে উঁচু পাহাড়ের ধাপে গরু, যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি তুলতে হয়, আবার দুর্গম পথ বেয়ে উৎপন্ন দ্রব্য বাড়ীতে বা বাজারে আনতে হয়।

কিন্তু এত কষ্টসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও কৃষিকাজ যে এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধান উপজীবিকা বলে গ্রহণ করেছে তার কারণ অপর সম্ভাব্য জীবিকার্জনের পথ—পশুপালন—আরও কষ্টকর। এই কষ্টসাধ্য কৃষির কাজেও পশুপালনের চেয়ে আরাম ও নিরাপত্তা বেশী, তাছাড়া স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়ানোর দুর্গতিও নেই।

গ্রাম ও শহর

এখানে সমাজ কৃষিজীবী বলে অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামের জন্যে জনসাধারণের দলগত টান খুব বেশী। গ্রামের নাম অনুসারে গ্রামবাসীরা পদবী গ্রহণ করে—যেমন মাসির অধিবাসীরা মাসিয়াল।

এ-অঞ্চলে শহর মাত্র দু'টি—আলমোড়া ও রাণীক্ষেত। মোটর চলাচলের ব্যবস্থা হওয়াতে শহরগুলোর উন্নতি হয়েছে।

উৎপন্ন ও বাণিজ্য দ্রব্য

আলমোড়া অঞ্চলে উৎপন্ন প্রধান খাদ্যশস্য হল **মাডুয়া, ধান ও গম**। প্রত্যেক গ্রাম খাদ্যশস্যে আত্মনির্ভরশীল হতে চেষ্টা করে। খাদ্যশস্য ছাড়াও কিছু কিছু ফসল এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা বিক্রীর জন্যে জন্মায়। সে-সবের দাম থেকে তারা খাজনা দেয় ; শীতের কাপড়, লবণ, গুড় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনে। এই সমস্ত ফসলের মধ্যে আলুই প্রধান। বিক্রীর জন্যে উৎপন্ন অন্যান্য জিনিস হল—আদা, লঙ্কা, হলুদ, গাঁজা, আখ ইত্যাদি। শহরের কাছাকাছি অঞ্চলে শাকসব্জী জন্মান হয়। এই অঞ্চলে নানা ফলও জন্মায় ; দিনে দিনে ফলের ব্যবসা বেশ বেড়েই উঠছে। এখানে সূতো কাটা ও তাঁতে কাপড় বোনারও কিছু প্রচলন আছে। অধিকাংশ জায়গায় কেবল ডোমেরাই সূতো কাটে ও কাপড় বোনে।

আলমোড়াবাসীদের শীতাবাস

নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত পাহাড়ে ভীষণ শীত ; বরফও পড়ে খুব। তৃণলতা সব মরে যায়। গরু প্রভৃতি পশুর কোন খাদ্যই থাকে না। কৃষির কোন কাজও থাকে না। এই সময়টা পাহাড়ের সবচেয়ে খারাপ সময় ; অভাব আর বেকারী বেড়ে যায়, ওদিকে খুব বেশী ঠাণ্ডার দরুণ জীবনধারণের খরচও (cost of living) তখন বেশী। শীতের এইসব অসুবিধে এড়াতে তখন পাহাড়ীরা দক্ষিণে সরে আসে। খারিফ (শরৎকালীন ফসল)

তোলা হয়ে গেলেই গ্রামবাসীরা পরিবার আর গরু-ছাগল নিয়ে দক্ষিণে রওনা দেয় আর সারা শীতটা খড়ের কুঁড়েঘরে কাটায়। গ্রামের জ্যোতিষী সকলের যাত্রার জন্যে একটা শুভদিন ঠিক করে দেয়। সেই দিনটির সাত-আটদিন আগে থেকে যাত্রার আয়োজন স্থরু হয়। নির্দিষ্ট দিনে গ্রামবাসীরা ভাল পোশাক পরে, গ্রামের দেবতাকে প্রণামী দিয়ে (প্রণামীটা পরিবারের প্রধানরা দেয়) প্রণাম করে যাত্রা করে। শিশু সন্তানের মা পথে ভূত-প্রেতের উপদ্রব থেকে শিশুকে রক্ষা করার জন্যে রক্ষাকবচ ধারণ করে। সাধারণতঃ এক গ্রামের বা পাশাপাশি কয়েকটা গ্রামের সকলে একসংগে যাত্রা করে পথ চলে। শীতের বাসস্থানে গৃহস্থালীর সব কিছুই লাগবে, তাই সবই সংগে তুলে নেওয়া হয়। মালপত্র লোকের মাথায়, গরুর গাড়ীতে বা টাট্টু ঘোড়ার পিঠে নেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের সংগে তাদের সব গৃহপালিত জন্তুও চলে। একটা দল দিনে দশ পনের মাইল পথ অতিক্রম করে। এইরকম সপ্তাহখানেক চলে তারা তাদের শীতাবাসে গিয়ে পৌছোয়। তবে পথে মাঝে মাঝে থামতে হয়।

গন্তব্যস্থলে পৌছে প্রত্যেক দল নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গায় বাসা বাঁধে। প্রত্যেক গ্রামের বা পাশাপাশি গ্রামের দলবদ্ধ অধিবাসীদের এই অস্থায়ী বাসস্থান আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা থাকে—বহুপুরুষ ধরে তারা একই জায়গায় বাসা বাঁধে। নিরাপত্তার জন্যে দলের বিভিন্ন পরিবারের বাসস্থান খুব কাছাকাছি হয়। এখানকার কুঁড়েঘরগুলোতে মানুষ আর তার পালিত প্রাণীরা পাশাপাশিই থাকে।

পশুপালন

আল্পস্ ও পিরেনীজ পর্বতমালার মত হিমালয়েও পশুপালন ও পশুখাদ্য সংরক্ষণের বিশেষ রীতি গড়ে উঠেছে; ঋতুভেদে যেখানে খাদ্য স্থলভ সেখানে গবাদি পশু নিয়ে যাওয়ার রীতি (Transhumance) হিমালয় অঞ্চলে আছে। গবাদি পশু যখন পাহাড়ের উঁচুতে গোচারণের পক্ষে স্থবিধাজনক

এলাকায় থাকে তখন নীচে যে ঘাস জন্মায় তা শীতকালের জন্যে রক্ষিত থাকে। বিভিন্ন সময়ে গবাদি পশু স্থানান্তরিত করা হয়।

গোচারণ ভূমিগুলি সাধারণতঃ ওক্ বনের মধ্যে, সমুদ্র থেকে উচ্চতায় ৮০০০ থেকে ১০০০০ ফিটের মধ্যে, অবস্থিত।

শক্ত-সমর্থ কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষের (রাখাল) সংগে এক গ্রামের অথবা পাশাপাশি গ্রামের গরু, মহিষ কোন নির্দিষ্ট চারণভূমিতে পাঠান হয়। যাত্রার দিন এই উপলক্ষে একটু উৎসবেরও অনুষ্ঠান করা হয়।

গোপালকদের প্রধান কাজ রাখালগিরি করা এবং বাসেব জন্য অস্থায়ী ঘর তৈরী করা। অবসর সময় পুরুষেরা কাঠের যন্ত্রপাতি তৈরী করে। স্ত্রীলোকেরা ঘাস কাটে। রাখালদের অস্থায়ী বাসগৃহকে **খড়াক** **(Kharak)** বলে।

এক উপত্যকায় অবস্থিত কতকগুলো গ্রামের এক **যৌথ গোচারণ-ভূমি** (**খাটা—Khata**) থাকে। সে জায়গার মালিকানা কোন ব্যক্তির নয়, যে-অঞ্চলের গবাদি পশু সেখানে চরতে আসে মালিকানা যৌথভাবে সেই অঞ্চলের সমাজের।

সমাজে নারীর স্থান

আলমোড়া অঞ্চলের পাহাড়ে সমাজে মেয়েদের মর্যাদা বড় কম। তাদের সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কৃষিকাজ আর ঘরের কাজ মিলিয়ে একজন মেয়েকে পুরুষের চেয়ে খাটতে হয় বেশী। এখানকার সমাজে এক পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত রয়েছে।

স্ত্রী ত্যাগ, মেয়েদের মৃত্যু ও আত্মহত্যা ইত্যাদি সমাজে মেয়েদের অনাদরের কথা প্রমাণ করে। মেয়েদের এই দুর্ভাগ্যের কারণ—প্রকৃতির অদাক্ষিণ্য এবং সামাজিক বিকাশের বিশেষ ধারা। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা পশুপালক থেকে কৃষক হয়েছে। পশুপালনের যুগে মেয়েরা পুরুষদের কাছে পালিত পশুর চেয়ে বেশী সম্মান পেত না। তারপর দুষ্কর কৃষিকাজে পুরুষ মেয়েদের সাহায্য নিল এবং আজও স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে মেয়েদের পুরুষরা

ব্যবহার করছে তাদের অধীন সহায়করূপে—সুখ-সম্মানের সমান অংশীদার-রূপে নয়। যার অনেক জমিজায়গা রয়েছে তেমন পুরুষ একাধিক সাহায্যকারীর প্রয়োজনবোধে আজও বিনা দ্বিধায় একাধিক মেয়েকে বিয়ে করে। সমাজে মেয়েদের এই অমর্যাদা সমাজের অনগ্রসরতাই প্রমাণ করে।

হাট-বাজার

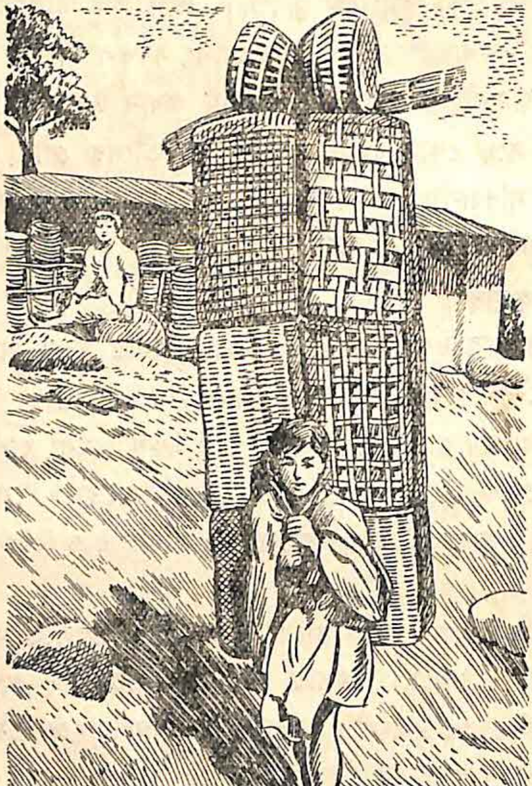
পার্বত্য অঞ্চলে বেচা-কেনা এক সমস্যা। প্রাত্যহিক বাজার এ-অঞ্চলে নেই। সপ্তাহে একবার কি দু'বার কোন খোলা, সমতল জায়গায় হাট বসে। এ-সব হাটে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বেচা-কেনাই প্রধান উদ্দেশ্য—হাট-বার বা হাটের জায়গার সঙ্গে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা তীর্থের যোগ থাকে না। শীতকালে যখন অধিবাসীরা পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে চলে আসে তখন এইরকম হাট বেশীবার বসে। হাটে সবার সঙ্গে সবার দেখা হয়।

মেলা ও তার গুরুত্ব

ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে হাটের চেয়ে মেলার গুরুত্ব অনেক বেশী। প্রত্যেক মেলা কোন পবিত্র তীর্থস্থান ও ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। শীতকালেই মেলা বসে। আলমোড়া জেলায় বছরে প্রায় একশ' মেলা বসে। এইসব মেলায় এক থেকে কুড়ি হাজার পর্যন্ত লোক জমা হয়। মেলাগুলোতে বিভিন্ন রকমের খাদ্যসামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও বিলাসদ্রব্য বেচা-কেনা করা হয়।

মেলার জায়গা কোন নদীর ধারে হলে, মেলা উপলক্ষে নদীতে স্নান এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে। মেলার জায়গার কাছাকাছি কোন মন্দির থাকলে, সেই মন্দিরের দেব-দেবীর পূজোও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে। মেলায় ছেলেবুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ সবাই উৎসবের সাজে সেজে আসে এবং খুব বেচা-কেনা হয়। মেলার দিনে হালচাষ ইত্যাদি বন্ধ থাকে। এরকম যেসব দিনে চাষের কাজ বন্ধ থাকে সেই দিনগুলোকে **অজোতা** (Ajota) বলে। এ-অঞ্চলে সবচেয়ে বড় মেলা **বাগেশ্বর মেলা**। এ-মেলায় প্রায় বিশ হাজার লোক জড়ো হয়।

"সরযূ ও গোমতী নদীর সঙ্গম স্থলে বাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির। সেখানে প্রতিবৎসর মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে স্নানের জন্য প্রায় বিশ হাজার লোকের সমাগম হয়। কুমায়ুনী ও ভোটিয়া ভিন্ন যুক্ত প্রদেশের সমতল খণ্ডের বহু লোকও সেখানে উপস্থিত হয়। পাহাড়ী ভোটিয়াগণ সারা বৎসর নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া যে সকল কম্বল, শাল, গালচে প্রভৃতি



ঝুড়ি চাঙ্গারি নিয়ে মেলায় চলেছে

তৈয়ারী করে তাহা বাগেশ্বরের মেলায় বেচিতে আসে। তাহাদের দেশে পাহাড়ের গায়ে ঘাস জন্মায় বলিয়া ভেড়া, ছাগল এবং পাহাড়ী ঘোড়া পোষার সুবিধা হয়।

এই সকল ঘোড়া পাহাড়ী পথে মাল লইয়া যাওয়া আসার পক্ষে খুব উপযোগী ; বাগেশ্বরের মেলায় তাই পাহাড়ী জন্তু-জানোয়ারের বিক্রয়ও যথেষ্ট হয়। ভোটিয়াগণ কম্বল এবং ভেড়া ছাগল ভিন্ন তিব্বত হইতে সংগ্রহ করা কস্তুরী, নানাবিধ জন্তুর চামড়া, সোরা, মোম, তিব্বতী ঔষধপত্রও বিক্রয়ের জন্য লইয়া আসে, এমন কি তাহাদের নিকট বাসন ও তিব্বতী কাঠের কাজও কিনিতে পাওয়া যায়। দানপুর অঞ্চলের লোকে বাগেশ্বরের মেলায় নানাবিধ ঝুড়ি, বাক্স, পেঁটরা ছাড়া চামড়া, লোহা, তামা ও মাটির বাসন লইয়া আসে। এদিকে আলমোড়া জেলার ব্যবসায়িগণ আবার পাহাড়ীদের কাছে বিক্রয় করিবার জন্য নিম্নলিখিত জিনিসপত্র আমদানি করে : সূতী কাপড়, ছাতা, তৈল, নুন, চিনি, গুড়, শস্য, সাবান, আরসি, বোতাম, রুমাল, ঘড়ি, বাঁশি, তালাচাবি, তাস, রবার বা কাঁচকড়ার খেলনা, টিন ও এলুমিনিয়মের বাসন, টর্চ ইত্যাদি।

পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষ নিজেদের জিনিস বেচিয়া যে পয়সা রোজগার করে, তাহার অনেক অংশ এই সকল খেলো মনোহারী জিনিসের পিছনে নষ্ট করিয়া ফেলে।" (হিন্দু সমাজের গড়ন : নির্মলকুমার বসু : পৃঃ ৮৫-৬)

ধর্ম ও উৎসব অনুষ্ঠান

আলমোড়ার পার্বত্য অধিবাসীরা জাতিতে মঙ্গোলীয় কিন্তু ধর্ম অনুসারে তারা প্রায় সবাই হিন্দু।

এ-অঞ্চলের প্রকৃতির নির্দয়তা অসহায় অধিবাসীদের মনে নানা কুসংস্কার জন্মিয়েছে এবং ভয়ে তারা নানা দেব-দেবীর ভক্ত হয়ে উঠেছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিকূলতা জয় করতে এরা কঠোর শারীরিক শ্রম করে, কিন্তু তবুও দুর্জয় শীতের কাছে এদের হার মানতে হয় ; তখন ঘর-বাড়ী, খেতখামার ছেড়ে তাদের চলে যেতে হয় অস্থায়ী শীতাবাসে।

বিভিন্ন ঋতুতে ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সংযুক্ত নানা উৎসব এ-অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে **বসন্ত-পঞ্চমীই** প্রধান। বাংলাদেশের মতই এখানেও বসন্ত-পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজো হয়। সেদিন সবাই

হল্‌দে পোশাক পরে। তারপর বসন্তকালে (মার্চ মাসের মাঝামাঝি), পাহাড় ভরে যখন ফুল ফোটে, তখন এদের **ফুলদেই** উৎসব। চৈত্রের প্রথম ও শেষ দিন এদিকে বিশেষ আমোদ-প্রমোদের দিন। কোন কোন অঞ্চলে সারা চৈত্র মাসটাই আমোদ-আহ্লাদে কাটান হয়। আমাদের দেশের গাজনের দলের মত গায়ক-বাদকের দল নেচে গেয়ে বেড়ায়। শ্রাবণের প্রথম দিনে এদের বর্ষা-উৎসব **হরিয়ালা** (haryala)। ভাদ্রমাসের প্রথম দিন এদের **ঘি-সংক্রান্তি**। সেদিন সবাই মাখন খায়, কপালে মাখনের ফোঁটা দেয়। শীতের আরম্ভে (সেপ্টেম্বরের মাঝামঝি) এরা গ্রামের মধ্যে কোন খোলা জায়গায় কাঠ-খড় পুড়িয়ে বাংলাদেশের 'বুড়ীর ঘর পোড়ান'র মত এক উৎসব করে।

শস্য বপন ও কর্তনের সময় নানা উৎসব হয়। আমাদের নবান্নের মত উৎসব এ-অঞ্চলেও প্রচলিত রয়েছে। নবান্নের দেবতা, জমি আর ফসলের দেবতা **ভূমিয়ান**। গরুর দেবতা **বাধন** আর **চমু**। গাইয়ের বাছুর হলে এগার দিনের দিন বাধনের আর বাইশ দিনের দিন চমুর পূজো করা হয়। তাতে এই দুই দেবতাকে গাইয়ের দুধ উৎসর্গ করা হয়।

এ অঞ্চলের উৎসবাদিতে কৃষিপ্রধান সমাজের প্রভাব সুস্পষ্ট।
দোলনায় দোল-খাওয়া এ-অঞ্চলের লোকেরা খুব পছন্দ করে।
মেলা উপলক্ষে এরা ঢোল বাজিয়ে নাচ-গান করে।

আলমোড়ার পার্বত্য সমাজ সম্বন্ধে লক্ষণীয়ঃ

(১) আলমোড়ার পার্বত্য অধিবাসীরা জাতিতে মঙ্গোলীয়।

(২) এদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট।

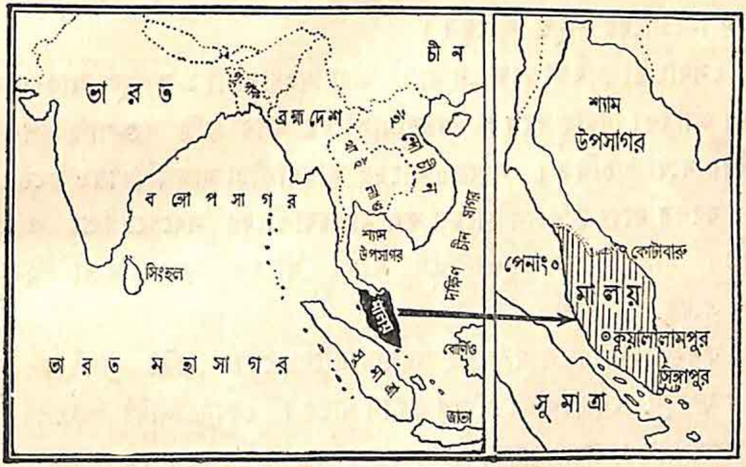
(৩) পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার জন্যে এদের দুই বৃত্তি—কৃষি ও পশুপালন। এই দুই স্বতন্ত্র বৃত্তি অবলম্বনের ফলে এরা একদিকে নির্দিষ্ট অঞ্চলের স্থায়ী কৃষিজীবী অধিবাসী, অন্যদিকে যাযাবর পশুপালক। এদের স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই বাসস্থান। এদের সমাজ ও অর্থনীতিতে দুই বৃত্তির প্রভাবই লক্ষিত হয়।

(৪) এদের সমাজে স্ত্রী-পুরুষের কর্মবিভাগ আছে। স্ত্রী-পুরুষ সমান সামাজিক মর্যাদার অধিকারী নয়।

মালয়ের সমাজ

অবস্থান, আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত

মালয় উপদ্বীপ—তিন দিক এর জলে ঘেরা। এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এই দেশের চতুর্দিকে উপকূলের সংকীর্ণ সমভূমি ছাড়া অধিকাংশই পর্বতময়। এই দেশ নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত : এখানকার আবহাওয়া



মালয়

উষ্ণ ও আর্দ্র। সারাবছর এখানে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির ফলে সারা দেশ—পর্বত থেকে সমুদ্র পর্যন্ত—গভীর বনে ভরা।

কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ

মালয়ের প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হল ধান, রবার, নারিকেল ও মসলা। এখানে সাগু, আনারস, কলা, তামাকও যথেষ্ট জন্মায়। টিন ও আকরিক লৌহ মালয়ের প্রধান খনিজ সম্পদ। এত রবার ও টিন পৃথিবীর আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। পৃথিবীর রপ্তানী রবারের অর্ধেক ও টিনের প্রায় অর্ধেক এখান থেকেই যায়।

মালয়ের জঙ্গলে প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মায় এবং নানা দেশে রপ্তানী হয়।

এখানে কাঠের ব্যবসাও গড়ে উঠেছে। এখানকার বনজ গাটাপার্চা বিদেশে রপ্তানী হয়।

আদিম অধিবাসী ও তাদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি

মালয়ের গভীর বনে এদেশের আদিম অধিবাসী সেমাং-রা বাস করে। জাতি হিসেবে এরা মঙ্গোলীয়। এদের আকৃতি খর্ব—গায়ের রঙ শ্যাম-কৃষ্ণ, নাক চ্যাপ্টা ও মাথার চুল কোঁকড়ানো। (আকৃতিতে এদের সঙ্গে নিগ্রোদের সাদৃশ্য আছে।)

সেমাং-রা কৃষিকাজ জানে না। এরা অরণ্যবাসী ঃ ফলমূল আহরণ করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। অরণ্যবাসীদের অপর বৃত্তি পশু-পাখী শিকারও এদের মধ্যে প্রচলিত। সমুদ্রের ধারের অধিবাসীরা মাছ শিকারও করে।

ফলের মধ্যে ছুরিয়ান গাছের ফল মালয়বাসীদের সবচেয়ে প্রিয় ও প্রধান খাদ্য। নানা গাছের মূলও এরা খায়। গাছের মূলের মধ্যে ইয়ামের মূল এদের প্রিয় খাদ্য।

ফলমূলাহারী বলে মালয়ের অরণ্যবাসীদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই। খাদ্য ফলমূল বনের বিভিন্ন অংশে ছড়ান থাকে। কোন নির্দিষ্ট অংশের খাদ্য নিঃশেষ হয়ে গেলে অরণ্যবাসীদের বনের অন্য অংশে সরে যেতে হয়। ঋতু অনুসারে বিভিন্ন ফলমূল জন্মায়; তাই ঋতুভেদেও বাসস্থানের বদল হয়। কোন দল এক স্থানে তিন চারদিনের বেশী বাস করে না।

সেমাং-রা ছোট ছোট দলে বাস করে ও একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায়। শিশুসন্তানসহ পঁচিশ-ত্রিশজনে এক দল হয়। বনের এক নির্দিষ্ট অংশে বহু লোকের প্রয়োজনীয় ফলমূল সংগ্রহ সম্ভব নয় বলেই এদের দল খুব বড় হয় না।

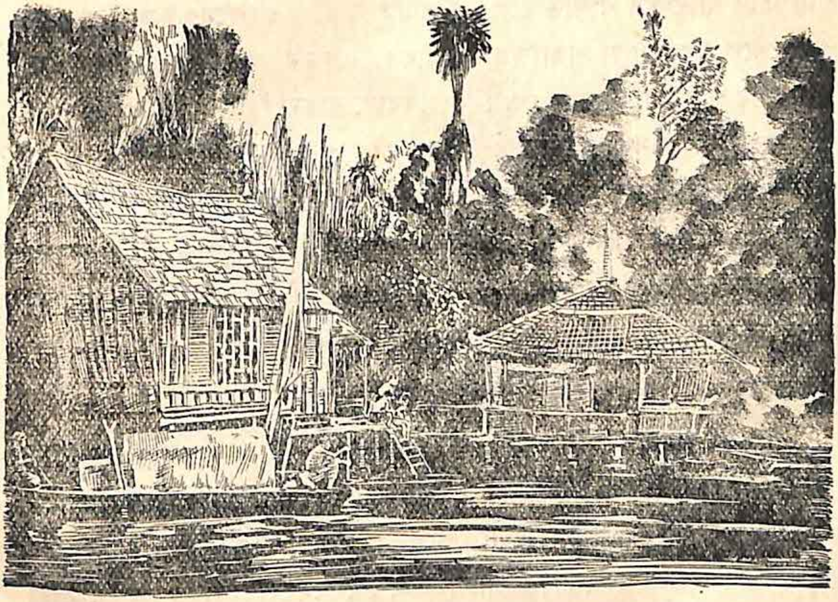
সামাজিক রীতিনীতি

বিভিন্ন দলে ঝগড়া-বিবাদ বা সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে এক দল বনের এক নির্দিষ্ট অংশ অধিকার করে। এক দলের এলাকা সাধারণতঃ কুড়ি বর্গমাইলের বেশী হয় না।

পারিবারিক সম্বন্ধের ওপর ভিত্তি করেই (যেমন পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি) এদের দল গঠিত হয়।

আহার্য অনুসন্ধানে এক দল অন্য দলের এলাকায় আসে। তখন দুই দলে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। এরকম দেখা-সাক্ষাৎ কেবলমাত্র নিকটবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন দলের মধ্যেই সম্ভব।

নিকটবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন দলের মধ্যে এইভাবে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হবার ফলে ক্রমশঃ কয়েকটি দল মিলে এক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে,—পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা জন্মায়।



মালয়—জলের ধারে মালয়বাসীদের কুঁড়েঘর

এক দলের পুরুষ অন্য দলের স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে পারে, করেও। বিয়ের পরে পুরুষ কিছুদিন তার স্ত্রীর দলে বাস করে, পরে নিজের দলে ফিরে আসে।

মালয়ে অরণ্যবাসীদের মধ্যে বহু আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত রয়েছে। কাছা-

কাছি বাস করে এমন বিভিন্ন দল (যারা কালক্রমে এক-গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে গেছে) একই ভাষায় কথা বলে। ভাষা সমাজবন্ধনও দৃঢ় করে। তাই বিয়েথা'ও এইরকম এক-ভাষাভাষী বিভিন্ন দলের মধ্যেই হয়ে থাকে। দূরবর্তী দুই দলের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য বা কোন সামাজিক সম্বন্ধ থাকে না।

আহার্য ফলমূল আহরণে এক দল অন্য দলের এলাকায় প্রবেশ করলেও সেমাংদের প্রিয় দুরিয়ান ফল প্রত্যেক দল শুধু নিজ এলাকা থেকেই সংগ্রহ করতে পারে। প্রত্যেক দলের অধীনে বহু দুরিয়ান গাছ থাকে এবং গাছগুলো দলের প্রত্যেকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকের ভাগের গাছ তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়। একজনের পক্ষে অপরের গাছ থেকে ফল নেওয়া সামাজিক অপরাধ। একজন অপর জনের বা এক দল অপর দলের গাছ থেকে ফল নিলে বিবাদ, সংঘর্ষ ইত্যাদি ঘটে থাকে।

মহুয়া ফলের সময় আমাদের দেশে সাঁওতালরা যেমন আনন্দে মেতে ওঠে, দুরিয়ান ফলের সময় সেমাং-রাও তেমনি আমোদে কাল কাটায়। তখন আর কোন কাজ নেই—দুরিয়ান ফল আহরণ আর প্রচুর খাওয়া নিয়েই দিন কেটে যায়। সব দেশে, সব কালে গৃহিণীদের সঞ্চয়ে মন—সেমাং স্ত্রীলোকেরাও দুরিয়ান ফল সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করে।

বাসস্থান

মালয়ের জঙ্গলে বাঁশ ও বেত জন্মায়, তাই দিয়ে সেমাং-রা তাদের অস্থায়ী বাসস্থান তৈরী করে। ঘরের ছাউনী দেওয়া হয় জাম গাছের পাতায়। মালয়ে প্রচুর বৃষ্টি হয়; তাই এখানে ঘরের ছাউনী বেশ পুরু করে দিতে হয়। প্রচুর বৃষ্টি হয় বলেই এখানকার মাটি ভিজে, স্যাঁতসেঁতে। তাই, অধিবাসীরা মাটিতে শুতে পারে না; ঘরের মধ্যে বাঁশের উঁচু মাচান বাঁধে। স্ত্রীলোকেরা ঘর-তৈরীর কাজ করে।

শিকারের হাতিয়ার

সেমাং-রা লতার ফাঁদ পেতে পাখী ধরে।

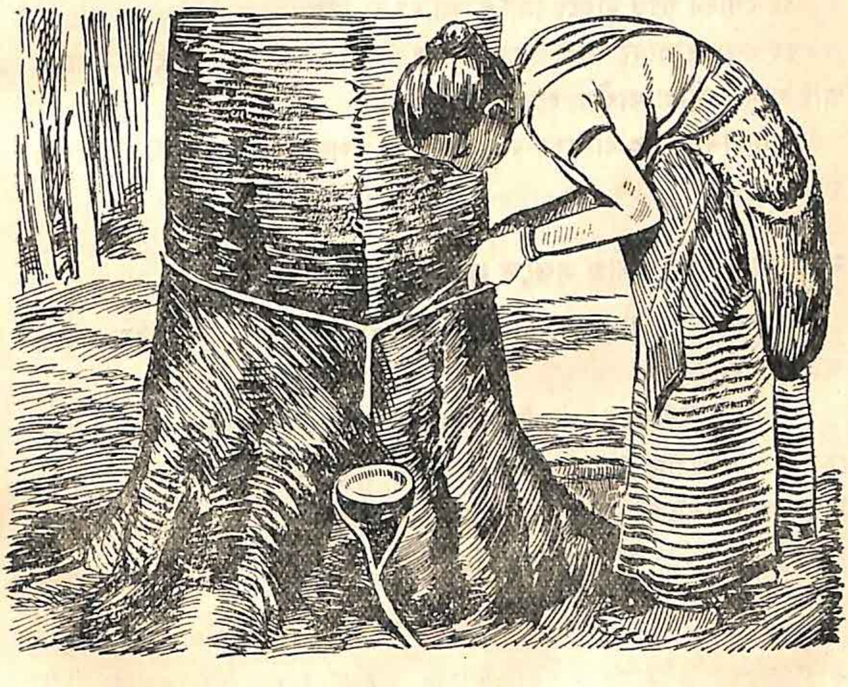
এদের পশু শিকারের প্রধান অস্ত্র তীরধনু। সহজলভ্য বাঁশ দিয়ে এরা

তীরধনু তৈরী করে। তীরের ডগায় বিষ মাখিয়ে নেওয়া হয়। তীরধনু দিয়ে এরা বুনো শূয়োর, খরগোস, কাঠবিড়ালী, ইঁদুর ইত্যাদি মেরে এইসব জীবজন্তুর মাংস খায়।

মাছ শিকারের অস্ত্র তৈরী হয় পাম গাছের শুকনো পাতা থেকে। পাতাকে সরু করে কেটে কোঁচের মত ব্যবহার করে তা দিয়ে সেমাং-রা মাছ গেঁথে তোলে।

আধুনিক সমাজ

যাযাবর সেমাংদের আরণ্য সমাজের পাশাপাশি মালয়ের বাণিজ্যকেন্দ্র



মালয়—রবার-ক্ষেত্রে কার্যরতা নারী শ্রমিক

শহরগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে নানা দেশ থেকে আগত বিদেশীদের

এক আধুনিক সভ্যসমাজ গড়ে উঠেছে। শহরগুলোতে ইউরোপীয়, চীনা, ভারতীয় প্রভৃতি নানা জাতি বাস করে।

অনেক দিন আগে মালয়ে মুসলমানরা ও চীনারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তারপর বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যলোভী ইউরোপীয়েরা এ-দেশে আসে। তারা এখানে রবার-বাগিচা স্থাপন করে—আজকাল রবার সভ্য জগতের এক অত্যাবশ্যক জিনিস। ক্রমে তারা এখানকার খনিজ সম্পদেরও মালিক হয়ে ওঠে। কালে কালে এ-দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব তাদের হাতে যায়। মুসলমানেরা, চীনারা ও ভারতীয়েরা তখন তাদের আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হয়—তাদের অধীনে রবার-বাগিচায় আর খনিতে মজুরী করে।

এই সেদিন পর্যন্ত মালয়ে ব্রিটিশ আধিপত্য ছিল।

বহু আন্দোলনের পর আজ ব্রিটিশ আধিপত্য শেষ হয়েছেঃ মালয় আর মালয়বাসীরা স্বাধীন হয়েছে।

কুয়ালা-লামপুর মালয়ের রাজধানী এবং **পেনাং** (বা জর্জ টাউন) প্রধান বন্দর।

মালয়ের আদিম সমাজ সম্বন্ধে লক্ষণীয়ঃ

মালয়ের আদিম অধিবাসীরা মঙ্গোলীয়। মালয়ের আদিম সমাজ আরণ্য সমাজ।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট। মানুষের চেষ্টায় পরিবেশের কোন পরিবর্তন হয় নি বা কোন কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্ট হয় নি। অধিবাসীদের আহার, আবাস, অস্ত্রশস্ত্র, আর জীবনযাত্রা-প্রণালী সবকিছুই প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উত্তর-চীনের সমাজ

অবস্থান, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও প্রভাব

খাস চীন, অন্তর্মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, সিনকিয়াং ও তিব্বত নিয়ে **চীন-গণতন্ত্র** (People's Republic of China) গঠিত। মাঞ্চুরিয়া আর তিব্বত নিয়ে খাস চীনের আয়তন প্রায় ৩৫ লক্ষ বর্গমাইল ; জনসংখ্যা প্রায় ৬০ কোটি।

চীনের জনসাধারণ জাতিতে মঙ্গোলীয়। ধর্মে এ-দেশের অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধ ; কিছু মুসলমান, খৃস্টান ও কনফুসীয় ধর্মের লোকও আছে।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে চীন অসাধারণ। এখানে মরু অঞ্চলে বছরে ১" বৃষ্টিপাত থেকে সুরু করে পার্বত্য অঞ্চলে ১০০" পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। বিস্তীর্ণ বনভূমি ও তৃণগুল্মহীন ভূখণ্ড দুই-ই এখানে আছে। দক্ষিণ-চীনে লোকে সাধারণতঃ তিনবার ভাত খায়, কিন্তু অন্যত্র লোকে বছরে একবারও ভাত খায় না। পৃথিবীর প্রায়-সর্ব-জাতি-অধ্যুষিত আধুনিক নগর **সাংহাই**-র কাছেই প্রাচীন গ্রামাঞ্চল আজও দেখতে পাওয়া যায়।

এখানে মানুষ আর প্রকৃতি পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ একদিকে যেমন মানুষের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে তেমনি আবার দেশের বিশাল জনসংখ্যা জীবিকা সংস্থানের জন্যে সর্বত্রই প্রাকৃতিক পরিবেশকে নিজেদের অনুকূলে পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করছে।

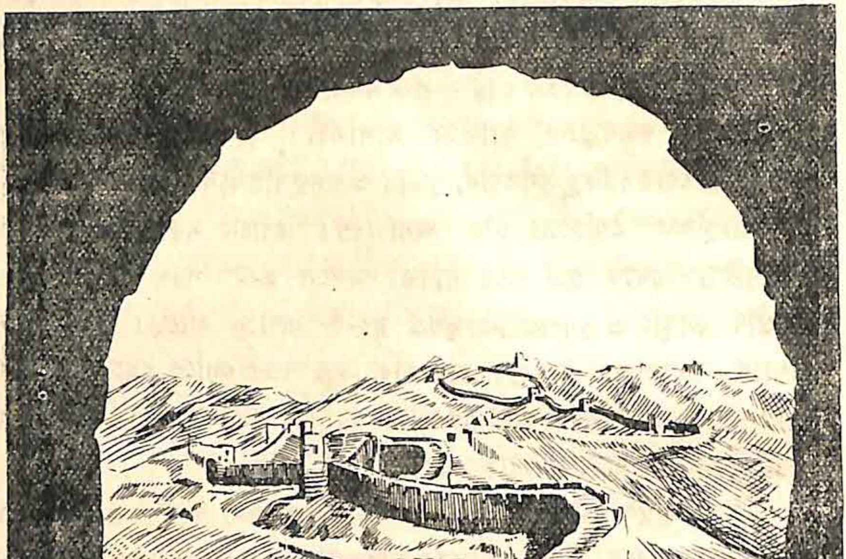
সভ্যতার প্রাচীনতা ও কৃষ্টিগত ঐক্য

চীনের সমাজ ও সভ্যতা প্রায় চার হাজার বছরের পুরনো। আয়তন ও জনসংখ্যায় বিশাল এই দেশের কৃষ্টি সমাজের সমস্ত স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে—এখানকার রিকশওয়ালারও মুখস্থ আছে মহামানব কনফুসিয়াসের বাণী।

সমস্ত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিশাল চীনের কৃষ্টিগত ঐক্য ও এ-দেশের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়। এ দেশে নানা কথ্য ভাষা থাকলেও সারা দেশের লিখিত ভাষা এক। দেশের বিভিন্ন অংশে আধুনিকতার তারতম্য আছে, কিন্তু জীবনদর্শন অভিন্ন। জীবনদর্শনের অভিন্নতার মূলে কনফুসিয়াসের ও অন্যান্য সন্তদের শিক্ষা বিশেষ প্রভাবশীল।

চীনের প্রাচীর

আধুনিক যানবাহন প্রচলিত হবার আগে পর্যন্ত চীনদেশ প্রাকৃতিক



চীনের প্রাচীর

প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। চারিদিকের উচ্চ মালভূমি, শুষ্ক মরুভূমি,

বন আর সমুদ্র চীনদেশকে সমস্ত রকম বাহঃপ্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছিল। প্রাচীন কালে উত্তরদিকের মোঙ্গলরা প্রায়ই চীনের সীমা লঙ্ঘন করে উৎপাত করত। তাদের উৎপাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যই **সম্রাট চীন-সী** ২২৩ খৃস্টপূর্বাব্দে সুবিখ্যাত **চীনের প্রাচীর** নির্মাণ করেন।

সুদূর অতীতে বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ

সুদূর অতীতকাল থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব। ভগবান্ বুদ্ধের বাণী চীন ভারতবর্ষ থেকেই লাভ করে আজ থেকে প্রায় দু' হাজার বছর আগে। সেকাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রাচ্য দেশের দুই জাতি, ভারতীয়েরা আর চীনারা, সম্প্রীতিতে বাস করে আসছে এবং প্রাচ্য দেশের ভবিষ্যৎ গৌরব এই দুই জাতির সম্প্রীতির ওপরই নির্ভর করছে।

মধ্য যুগে ইউরোপ থেকে বিখ্যাত পর্যটক **মার্কো পোলো** (Marco Polo) ও কয়েকজন জেসুইট্ ধর্মপ্রচারক চীন পরিভ্রমণ করেন। মার্কো পোলো চীনের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশের নানা পার্থক্য লক্ষ্য করে এই দুই অংশের দুই নাম দেন—উত্তরাংশের নাম দেন **ক্যাথে** এবং দক্ষিণ-চীনের নাম দেন **মঞ্জি**।

খৃস্টপূর্ব ১২৮ অব্দে চীনের **চ্যাং চিয়েন** পামীর অতিক্রম করে বুখারায় গিয়ে হাজির হন। ৪১৩ খৃস্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য **ফা-হিয়েন** সিনকিয়াং-এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ৩০০ খৃস্টাব্দে কয়েক-খানা আরব জাহাজ চীনের উপকূলে গিয়েছিল।

দক্ষিণ ও উত্তর চীনের তুলনা

সমগ্রভাবে দেখতে গেলে বলা যায় যে চীন নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ চীনের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা পৃথক। প্রাকৃতিক অঞ্চল হিসেবে খাস চীনকে তিনটি পৃথক অঞ্চলে ভাগ করা যায় : দক্ষিণ-চীন মধ্য-চীন আর উত্তর-চীন।

দক্ষিণ-চীন উর্বর—এ-অঞ্চলে প্রচুর ধান জন্মায়। **উত্তর-চীন** রুক্ষ,

এখানকার মাটি পীতবর্ণ। গম এ-অঞ্চলের প্রধান ফসল ; তবে কৃষিকাজ খুবই কষ্টসাধ্য। চীনের উত্তর-পশ্চিমে কোন উঁচু পাহাড় না থাকায় শীতে সাইবেরিয়ার ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস উত্তর-চীনে অত্যন্ত তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী শীত সৃষ্টি করে। দক্ষিণ-চীনে যখন বসন্ত, উত্তর-চীনে তখনও শীত—মাঠে ফসল হয় না এবং মাঝে মাছে বালুর ঝড় ওঠে। শস্য-সম্পদে উত্তর-চীন দক্ষিণ-চীন থেকে অনেক হীন। উত্তর-চীনে তিন-চার মাস মাত্র কৃষিকাজ চলে ; দক্ষিণ-চীনে বার মাসই চাষ-আবাদ সম্ভব।

উত্তর-চীন

জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি সমগ্র চীনেরই এক মহাসমস্যা। রুক্ষ উত্তর-চীনে এ সমস্যা অনেক বেশী সাংঘাতিক। লোকসংখ্যার অনুপাতে চাষের জমির পরিমাণ সেখানে কম। চাষের জন্যে যথেষ্ট বৃষ্টি দরকার, কিন্তু উত্তর-চীনে যথেষ্ট বৃষ্টি হয় না। এখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় মাত্র ২০″। অনাবৃষ্টির ফলে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষও দেখা দেয়। অনাবৃষ্টির জন্যে চীনে ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাতে প্রায় এক কোটি লোক প্রাণ হারায়। একই কারণে ১৯২০-২১ খৃস্টাব্দে আবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। তাতেও প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ হয়।

উত্তর-চীনের প্রধান নদী **হোয়াং-হো**। এই নদীস্রোত তিব্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে লোয়েস-এর মধ্য দিয়ে চীনে প্রবেশ করেছে (চীনদেশে নদীকে 'হো' বা 'কিয়াং' বলে)। হোয়াং-হো-তে বন্যা আসে আকস্মিকভাবে আর তার ফলে এখানকার লোকের বড় দুঃখকষ্ট ও অনিষ্ট হয়। এই জন্যে এই নদীকে 'চীনের দুঃখ' (China's sorrow) বলা হয়। কিন্তু চীনের চাষীর দার্শনিক মনোভাব আর স্বাভাবিক প্রফুল্লতা তাকে সমস্ত দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করবার সাহস জোগায়।

এই হোয়াং-হো নদীর অববাহিকাতেই উত্তর-চীনের লোকবসতি। এই অববাহিকার আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ বর্গমাইল। এর মধ্য অংশ পীতবর্ণ

লোয়েস মাটিতে গড়া। গোবি মরুভূমি থেকে পীত ধূলিকণা বাতাসে উড়ে এসে এই অঞ্চলে সঞ্চিত হয়ে লোয়েস মাটিতে পরিণত হয়েছে।

হোয়াং-হো নদীর ধারেই প্রায় চার হাজার বছর আগে চীনের মানুষ তাদের সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। চীনের কৃষক-সমাজ পৃথিবীতে সে-যুগে মাটি চষে ফসল ফলিয়েছে এবং আজও কৃষি এ-দেশের প্রধান উপজীবিকা। চীনের কৃষকের কৃষিকাজে অভিজ্ঞতা অতি দীর্ঘ।



চীনের চাষী

চীনের জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক **কনফুসিয়াস** উত্তর-চীনে সাণ্টুং অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাই, সে অঞ্চল চীনের ইতিহাসের সঙ্গে নানাভাবে

জড়িত। কনফুসিয়াসের বংশধরেরা 'কুং' পদবী ধারণ করে আজও এ-অঞ্চলের অধিবাসী।

সাণ্টুং উপদ্বীপ পর্বতময়। এখানে তূলা ও রেশম উৎপন্ন হয়। সারা চীনই রেশমের দেশ। এখান থেকে অনেক রেশম বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। এখানে প্রত্যেক বাড়ীতে তুঁত গাছ আছে। সেই সব গাছে গুটিপোকার চাষ হয়। সাধারণতঃ মেয়েরাই গুটিপোকার চাষ করে। কোন কোন জায়গায় রেশমের চাষ অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা।

সান্‌সি ও হোনান প্রদেশে প্রচুর কয়লা এবং সান্‌সিতে লোহা পাওয়া যায়।

চীনের অতি প্রাচীন শহর এবং রাজধানী **পিকিং** উত্তর-চীনে অবস্থিত।

উত্তর-চীনের কৃষিজীবী সমাজ

উত্তর-চীনের অধিবাসীদের বহুকাল ধরে প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। লোকসংখ্যার অনুপাতে চাষের যোগ্য জমি কম—তাই যতটুকু জমি চাষ-আবাদের যোগ্য তা' থেকেই যথাসাধ্য খাদ্যশস্য উৎপন্ন করার চেষ্টা করতে হয়। তার জন্যে এখানকার অধিবাসীরা **গভীর চাষ প্রণালী** (Intensive Cultivation) অবলম্বন করেছে। এখানে দুই জমির মধ্যে অপরিসর আল থাকে। চাষের কাজে বলদ, খচ্চর ও গাধার ব্যবহার এ-দেশে বহুদিন থেকেই প্রচলিত। এ-দেশের চাষীরা হাত দিয়েই ফসল কাটে। চাষের জন্যে যন্ত্রের ব্যবহার এ-দেশে সবেমাত্র সুরু হচ্ছে।

কৃত্রিম সার তৈরী বা ব্যবহারের ব্যবস্থা এদেশে ছিল না বা আজও তেমন নেই। এ-দেশে মানুষের মল সাররূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

উত্তর-চীনে দেশের প্রধান ফসল গম ছাড়া সয়াবীন, বার্লি, জোয়ার ও মিষ্টি আলু উৎপন্ন হয় এবং এ-সবই এ-দেশের খাদ্য।

উত্তর-চীনে চা হয় না। কিন্তু প্রত্যেক চীনাবাসী চা পান করে থাকে। এরা চায়ে দুধ মেশায় না। দুধহীন কালো চা-ই এরা পান করে।

চা, তেল, লবণ উত্তর-চীনে আমদানী করতে হয়।

কৃষিজীবী উত্তর-চীনের অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী। শতকরা ৮০ জন লোক গ্রামে বাস করে। কৃষিজীবী দরিদ্র চীনাবাসীদের ঘর-বাড়ীর সঙ্গে আমাদের গ্রামের ঘর-বাড়ীর যথেষ্ট মিল আছে। এদের ঘরের ছাদ খড়ের বা মাটির আর দেওয়াল বাঁশের ওপর মাটি লেপে তৈরী করা হয়।

নব জাগরণ

১৯৪৯-এ চীনে এক নবজাগরণ এসেছে; কম্যুনিস্ট নেতা মাও-সে-তুং চিয়াঙ-কাইশেক-পরিচালিত জাতীয়তাবাদী সরকারকে বিতাড়িত করে চীনে সাম্যবাদী সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তখন থেকেই সারা চীনের জীবনে এক নতুন সাড়া জেগেছে—এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। নতুন সরকার চীনের অর্থনৈতিক উন্নতির নানা পরিকল্পনা রচনা করে কাজ সুরু করেছেন। উত্তর-চীনেও নতুন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ সুরু হয়েছে।



মাও-সে-তুং

দেশের সমস্ত জমি এখন চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে—চাষী আজ জমির মালিক। আগে চীনে চাষীরা, আমাদের দেশের চাষীদের মত, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে চাষ করত। জমির ক্ষুদ্রতার জন্যে চাষীর শ্রম ও অর্থের অপচয় হত। এখন **যৌথ খামার** (Collective farm) গড়ে সমবায় প্রথায় চাষ-আবাদ হচ্ছে। চাষীকে সাহায্য করছেন সরকার—সার, বীজ আর কৃষিঋণ দিয়ে। চাষে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও সুরু হয়েছে।

নূতন চীন গড়তে রাশিয়া অর্থ, যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞের পরামর্শ দিয়ে নানা ভাবে বিশেষ সাহায্য করছে।

উত্তর-পশ্চিম চীনে প্রায় এক কোটি একর পতিত জমি উদ্ধারের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিল্পোন্নতির পথেও নূতন চীন সদ্যজাগা শক্তি, সাহস আর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। পুরান পিকিং শহর অতি অল্পকালের মধ্যেই এক আধুনিক শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

রেল আর বিমানের সাহায্যে দেশে এখন লোক ও মাল চলাচলের অনেক সুবিধে হয়েছে।

ভারত ও নূতন চীনের জাগরণ প্রাচ্যের জাগরণ—এ জাগরণ সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। আজ সারা পৃথিবী আশা করছে যে, প্রাচ্যের এই দুই মহাশক্তি হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে কল্যাণ ও মৈত্রীর বাহন হবে।

উত্তর-চীনের সমাজ সম্বন্ধে লক্ষণীয় ঃ

উত্তর-চীনের অধিবাসীরা জাতিতে মঙ্গোলীয়। উত্তর-চীনের সমাজ কৃষিজীবী সমাজ ও সেরূপ সমাজের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এ সমাজে বিদ্যমান। নূতন চীনের জাগরণ ও উন্নয়ন-প্রচেষ্টার সাফল্য এই সত্য প্রমাণ করে যে মানব-সমাজ সর্বক্ষেত্রে প্রকৃতির দাস নয়, আধুনিক মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে ও রাষ্ট্রাধীন সংহত চেষ্টায় প্রকৃতির প্রতিকূলতা জয় করতে পারে।

Zuyder Zee-র ওলন্দাজ সমাজ

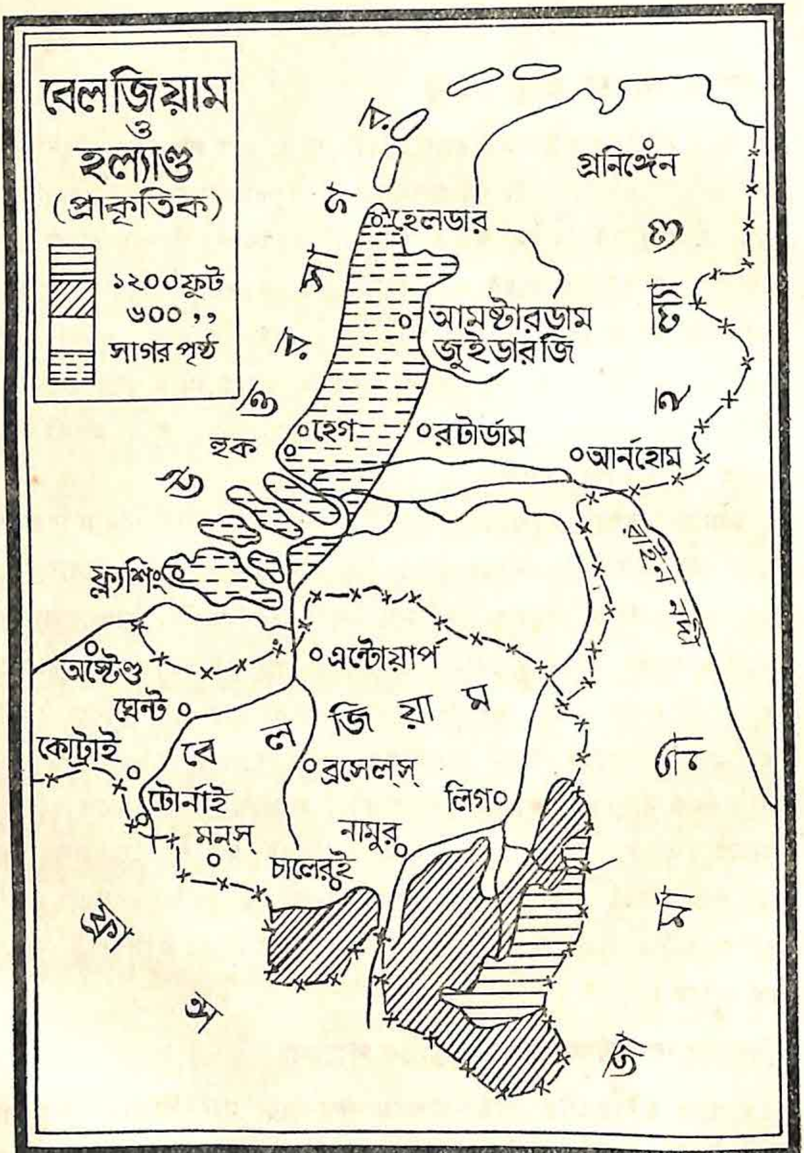
অবস্থান, আয়তন ও ভূ-প্রকৃতি

উত্তর সাগরের তীরে ইউরোপের ছোট একটা দেশ **হল্যাণ্ড**। এখানকার অধিবাসীদের বাংলায় বলা হয় **ওলন্দাজ**। ওলন্দাজরা আমাদের অপরিচিত নয়। ইউরোপের বিভিন্ন জাতি যখন বাণিজ্য বিস্তার করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে প্রথম আসতে আরম্ভ করে তখন এই ওলন্দাজরাও এ-দেশে এসেছিল —বাণিজ্য-উপনিবেশও স্থাপন করেছিল। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজদের বাংলাদেশে একাধিপত্য বিস্তার করার আগে পর্যন্ত ওলন্দাজরা তাদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়েছিল, তখন হুগলী ছিল তাদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।

হল্যাণ্ড দেশটা আয়তনে আমাদের পশ্চিম বাংলার বর্ধমান বিভাগের মত। এর আয়তন সাড়ে বার হাজার বর্গমাইলের কিছু বেশী ও লোকসংখ্যা প্রায় আশী লক্ষ। হল্যাণ্ড খুব নীচু—তাই এর এক নাম **নেদারল্যাণ্ডস্** (Netherlands) বা নীচু দেশ। এ-দেশের প্রায় সিকিভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে একশ' ফিট নীচু। তাই, স্বভাবতঃ সমুদ্রের জলের এদেশকে ডুবিয়ে দেবার কথা এবং এককালে সত্যই এ-দেশের এক বিশাল অংশ জলের তলাতেই ছিল। কিন্তু মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টার কাছে প্রকৃতিকে হার মানতে হয়েছে। হল্যাণ্ডে একটা চলতি কথা আছে—"ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সমুদ্র আর মানুষ সৃষ্টি করেছে তার তীর।" সত্যই, ওলন্দাজরা বহুশত বৎসরের চেষ্টায় সমুদ্রকে হটিয়ে দিয়ে আজ নিজেদের বাস আর চাষের জমি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে।

অধিবাসীদের কর্মক্ষমতা ও প্রকৃতির পরাজয়

হল্যাণ্ড ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমে শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে কৃষির উপযোগী প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবহাওয়ার গুণে


বেলজিয়াম
ও
হল্যাণ্ড
(প্রাকৃতিক)
১২০০ফুট
৬০০ ,,
সাগর পৃষ্ঠ
গ্রনিঙ্গেন
হেলডার
আমষ্টারডাম
জুইডার জি
হেগ
রটার্ডাম
হুক
আর্নহেম
ফ্ল্যাশিং
এন্টোয়ার্প
অষ্টেণ্ড
ঘেন্ট
কোট্রাই
টোর্নাই
ব্রসেলস্
লিগ
মনস্
নামুর
চালেরুই
বে ল জি য়া ম
রাইন নদী

এ-দেশের লোকের কাজ করবার ক্ষমতা অসাধারণ। জনসাধারণ সেই কর্ম-ক্ষমতার সাহায্যেই সাগরকে জয় করেছে। মনে হয় প্রকৃতির প্রতিকূলতাই তাদের কর্মশক্তিকে উদ্দীপিত করেছে এবং সেই প্রতিকূলতাকে জয় করে তারা সেদেশে এক সুস্থ সভ্য সমাজ গড়ে তুলেছে।

সমুদ্রের বা নদীর প্লাবন থেকে দেশকে রক্ষা করতে দেশবাসীরা বালি আর মাটি দিয়ে সমুদ্র আর নদীর পাড়ে বহু বাঁধ নির্মাণ করেছে। বাঁধ দিয়ে প্লাবন আটকে নিয়ে বাঁধের অপর দিকের নীচু জায়গার জল 'পাম্প' করে বের করে দেওয়া হয়েছে। জল 'পাম্প' করার শক্তি সরবরাহ করার জন্যে বাঁধের ধারে ধারে অসংখ্য 'Windmill' স্থাপন করা হয়েছে। নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এগুলো বাতাসে চলে। এখন বহু জায়গায় বৈদ্যুতিক 'পাম্প' স্থাপিত হলেও আজও অসংখ্য Windmill রয়েছে। বৈদ্যুতিক 'পাম্প' সর্বত্র ব্যবহার না করবার কারণ দেশবাসীর সংরক্ষণশীলতা নয়, এর কারণ 'Windmill'-এ সস্তায় ভাল কাজ হয়।

'Windmill'-এর সাহায্যে 'পাম্প' করে যে জল বের করে দেওয়া হয়, সেই জল নিকাশের জন্যে দেশবাসীরা অসংখ্য ছোট ছোট খাল কেটেছে। এই সমস্ত খাল সারাদেশ ছেয়ে আছে। এই সমস্ত খাল দিয়ে লোক ও মাল-পত্রের চলাচল হয়। এখানে নৌকোয় চলাচল সহজ ও সুলভ।

বাঁধ, বাঁধের ওপর দিয়ে সুন্দর ও প্রশস্ত রাস্তা, খাল আর 'Windmill', এগুলো হল হল্যাণ্ডের বিশেষত্ব।

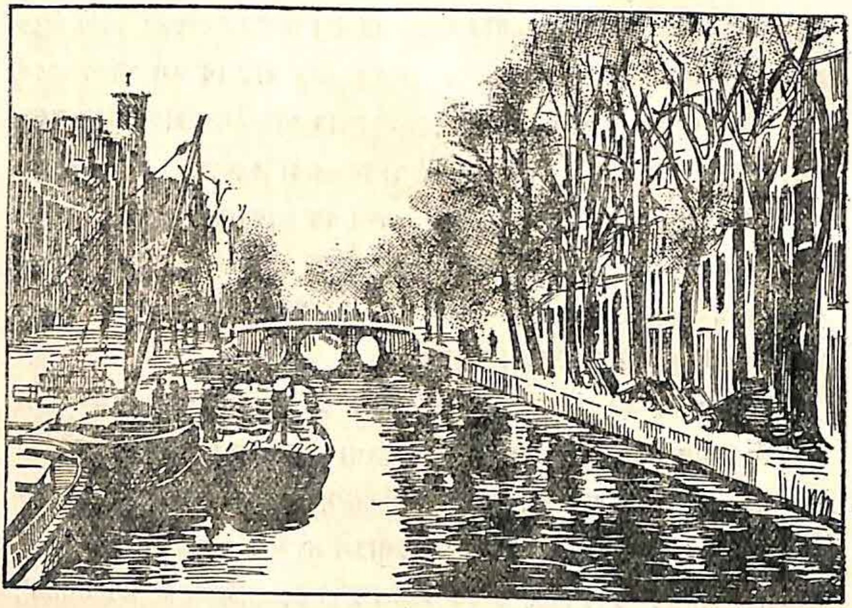
জল সরিয়ে দিয়ে যে জমি উদ্ধার করা হয় তাকে বলে 'Polders'।

Zuyder Zee : গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য

হল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম ভাগে **জুইডার জী** (Zuyder Zee) নামে এক অগভীর সাগরাংশ আছে। দেশবাসীর অক্লান্ত চেষ্টায় এই Zuyder Zee-র অনেক অংশই আজ চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে।

১৯৩২ খৃস্টাব্দে উত্তর সাগর থেকে ফ্রীজল্যাণ্ড পর্যন্ত এক লম্বা বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। তার ফলে সাগরের জল Zuyder Zee-তে ঢুকতে পারে না।

Zuyder Zee-র জল বের করে দিয়ে চারটে Polders সৃষ্টি করা হবে। এর মধ্যে দু'টি Polders-এ চাষ-আবাদ সুরু হয়ে গেছে। চার ভাগের মধ্যে এক ভাগকে একটা পানীয় জলের হ্রদ করা হবে। এই পরিকল্পনা শেষ হলে সাড়ে পাঁচ লক্ষ একর চাষের যোগ্য জমি তৈরী হবে।



আমস্টারডাম : হল্যাণ্ডের বাণিজ্যকেন্দ্র ও রাজধানী

Zuyder Zee-র বাঁধগুলোর ধারে ধারে অনেক ছোট ছোট শহর ও কৃষি-ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। কঠোর পরিশ্রম করে স্থানীয় অধিবাসীরা যে জমি উদ্ধার করেছে আজ তাতে তারা কঠোর পরিশ্রম করেই রাই, ওট, গম, আলু আর সব্‌জী উৎপন্ন করছে। গোচারণের জন্যে বিস্তীর্ণ জমি পাওয়াতে অধিবাসীরা গোপালনেও অত্যন্ত মনোযোগী হয়েছে। দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির জন্যে হল্যাণ্ড আজ সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। এখান থেকে প্রচুর মাখন ও পনীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়ে যায়।

Zuyder Zee-র তীরেই বিখ্যাত হীরক-শিল্পকেন্দ্র **আমস্টারডাম** শহর অবস্থিত। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য এ অঞ্চলের লোকেদের প্রধান উপজীবিকা। উত্তরাংশের সমুদ্রতীরবাসীদের অনেকের উপজীবিকা মৎস্যশিকার। এখান থেকে প্রচুর মাছ রপ্তানী হয়।



Zuyder Zee-র ধীবর পল্লী

ওলন্দাজদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সামাজিক আদব-কায়দা

ওলন্দাজেরা ঘর-বাড়ীর পরিচ্ছন্নতায় খুব মনোযোগা—প্রতি শনিবার সকালে গৃহিণীরা বাড়ী-ঘর খুব যত্ন করে ঝাড়পোছ করে ; এদের বাড়ীর পিতল আর তামার বাসনপত্র সব ঝক্‌ঝক্ করে।

এদের পোশাকের মধ্যে কাঠের জুতো বিশেষত্বপূর্ণ। জলের দেশে চামড়ার জুতোর চেয়ে কাঠের জুতোয় সুবিধে অনেক বেশী। শীতকালে, বা জুতো পায়ে বড় হলে, এরা জুতোর মধ্যে খড় দিয়ে জুতো পরে। জুতো পরে কেউ ঘরে ঢোকে না। জুতো দরজায় রেখে যাওয়া এখানকার সামাজিক রীতি। বাইরে রাখা জুতো দেখে লোকে বোঝে ঘরে কে বা কতজন লোক আছে।

এ-দেশে মেয়েরা পাঁচশ' বছর ধরে ধাতু আর লেস্ (lace)-এর তৈরী একরকম টুপী পরে। পরিধানকারীর ধর্মমত (Roman Catholic অথবা Protestant Christian) আর গ্রাম অনুসারে টুপীর অলংকার পৃথক হয়। সুতরাং অভিজ্ঞ ব্যক্তি টুপী দেখে বলে দিতে পারে পরিধানকারী কোন্ ধর্মমতাবলম্বী ও কোন্ গ্রামের অধিবাসী।

দৈনন্দিন কার্যতালিকা

এ-দেশের গ্রাম বা শহরের ছেলেমেয়েরা খুব সকালে উঠে রুটি, মাখন, পনীর আর প্রচুর দুধ খেয়ে স্কুলে যায়। এখানে ছোট বড় সব শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা একই স্কুলে যায়। ছেলেমেয়েরা দুপুরে খাবার খেতে স্কুল থেকে বাড়ী আসে। দুপুরের খাবারের সঙ্গেও এরা প্রচুর দুধ খায়।

এ-দেশে স্কুলের ছেলেমেয়েরা সাইকেল-এ স্কুলে যাতায়াত করে। সব বয়সের ও বৃত্তির লোকদের মধ্যেই সাইকেলের ব্যবহার খুব প্রচলিত। এ-দেশে রাস্তায় যেন সাইকেল-এর মিছিল চলে।

বাড়ী বাড়ী ঘুরে দুধ, পনীর ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্যে একরকম কুকুরে-টানা হাল্কা গাড়ী ব্যবহার করা হয়।

যারা আপিসে কাজকর্ম করে তারা সকাল আটটায় কাজে যায়। সকালে কাজ আরম্ভ করে বলে তাদের ছুটিও সকাল সকাল হয় এবং তারা বিকেলে নানারকম খেলা-ধূলো ও আমোদ-প্রমোদের প্রচুর সময় পায়।

সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও উৎসব-অনুষ্ঠান

দেশে সকলেই বাড়ীর সামনে একটু বাগান করে। গ্রীষ্মে নানা রঙের ফুলে ভরা বাগান গৃহস্থ এবং পথচারীদের আনন্দের কারণ হয়। কোন কোন

শহরে আইন আছে যে, রাস্তা থেকে বাগান দেখায় বাধা সৃষ্টি করে এমন উঁচু বেড়া দিয়ে বাগান ঘেরা যাবে না।

পরিবারের সকলে মিলে সমুদ্রের ধারে বা অপর কোন দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যাওয়া এ-দেশে বহুল প্রচলিত।

প্রতি বৎসর ৫ই ডিসেম্বর Santa Claus বা St. Nicholas' Day এদেশে জাতীয় উৎসব হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়। এটা প্রধানতঃ শিশুদেরই উৎসব। এদিন একজন অপরকে প্রচুর উপহার দেয়।

এখানকার চাষী ছেলেরা বাড়ীর কাছাকাছি কনে বাছাই করে বিয়ে করে। অনেকদিন ধরে নানা আনন্দ-উৎসবের মধ্যে বর-কনে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পরিচিত হয়। এই রকম উৎসব উপলক্ষে সারারাত্রি ধরে ভোজ আর নাচ-গান চলে।

ওলন্দাজ সমাজ ও শাসনতন্ত্র

হল্যাণ্ডের সমাজে তিন শ্রেণী—**জমিদার, বাণিজ্যজীবী** ও **চাষী**। শ্রেণী-বিদ্বেষ উল্লেখযোগ্য নয়। বিভিন্ন শ্রেণী পরস্পরের সহযোগিতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সচেতন। এখানে **রাজতন্ত্র** প্রতিষ্ঠিত। সকল শ্রেণীই রাজতন্ত্রের অনুগত।

ওলন্দাজ সমাজ সম্বন্ধে লক্ষণীয় ঃ

ওলন্দাজেরা জাতিহিসেবে শ্বেতজাতি এবং ধর্মমত অনুসারে খৃস্টান। এদের সমাজ উন্নত ও আধুনিক। বৃত্তিহিসেবে এরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী।

এদের জীবনযাত্রায় পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রতিকূল পরিবেশের পরিবর্তন-উদ্দেশ্যে এরা অধ্যবসায়ের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করেছে। দেশের পরিবর্তিত পরিবেশ আধুনিক জীবনের ওপর প্রভাবশীল। শৈত্যপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এই দেশের অধিবাসীকে কর্মঠ করেছে।

প্রেইরী-অঞ্চলের সমাজ

অবস্থান, আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত

উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগ সমভূমি। সমুদ্র থেকে বহু দূরে এই অঞ্চল। এ-অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্মের মাত্রা অধিক। এখানে বৃষ্টি হয় কম। গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই সাধারণতঃ বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টিপাতের গড় সাধারণতঃ ২০″। যথেষ্ট বৃষ্টি হয় না বলে এখানে বড় বড় গাছপালা জন্মায় না। তাই, এখানে সৃষ্ট হয়েছে দিগন্তব্যাপী তৃণভূমি। এই তৃণভূমির ঘাস কিন্তু আমাদের দেশের ঘাসের মত সবুজ নয়—রোদে-পোড়া হল্‌দে।

এই তৃণভূমির নাম **প্রেইরী-অঞ্চল** (Prairies) এবং এখানকার আদিম অধিবাসীদের বলে **রেড ইণ্ডিয়ান** (Red Indian)।

রেড ইণ্ডিয়ান নামের ইতিহাস

এদের এই নামের পেছনে যে কাহিনীটি রয়েছে সেটি বোধ হয় তোমরা জান ; তবুও একবার সংক্ষেপে বলছি।

খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইটালীয় নাবিক ক্রীস্টোফার কলম্বাস স্পেনের রাজা-রাণীর অর্থানুকূল্যে স্পেন থেকে ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে বের হন। ১৪৯২ খৃস্টাব্দে তিনি আমেরিকায় পৌছন। সেখানে পৌছে তিনি কিন্তু ভাবলেন যে India অর্থাৎ ভারতবর্ষেই পৌছেছেন। তাই সেখানকার অধিবাসীদের নাম দিলেন ইণ্ডিয়ান (Indian)। আজও উত্তর আমেরিকার দক্ষিণের দ্বীপপুঞ্জের নাম পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (West Indies)।

পরে অবশ্য এই ভুল ভাঙ্গে এবং পর্টুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন। প্রকৃত ভারতবাসী আবিষ্কৃত হবার পরে

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের গায়ের রঙ অনুসারে নাম দেওয়া হল রেড ইণ্ডিয়ান। এদের গায়ের আসল রঙ কিন্তু লাল নয়। এরা গায়ে লাল রঙ মাখে বলেই হয়ত ওরকম নামকরণ হয়েছে। তবে অনেক সময় খোলা জায়গায় কাটায় বলে এদের গায়ের রঙ রোদে-পোড়া তামাটে লাল।

রেড ইণ্ডিয়ানদের জীবনযাত্রা-প্রণালী

আদিম রেড ইণ্ডিয়ানদের জীবনযাত্রা ছিল অরণ্যবাসী শিকারীদের মত। এরা তীরধনু দিয়ে পশু শিকার করে আর মাছ ধরে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। শিকারলব্ধ নানা জিনিস থেকে পোশাক ও বাসস্থান তৈরী করত আর জলপথে যাতায়াত করত হাল্কা কাঠ আর বার্চ গাছের ছাল দিয়ে তৈরী নৌকোয়।



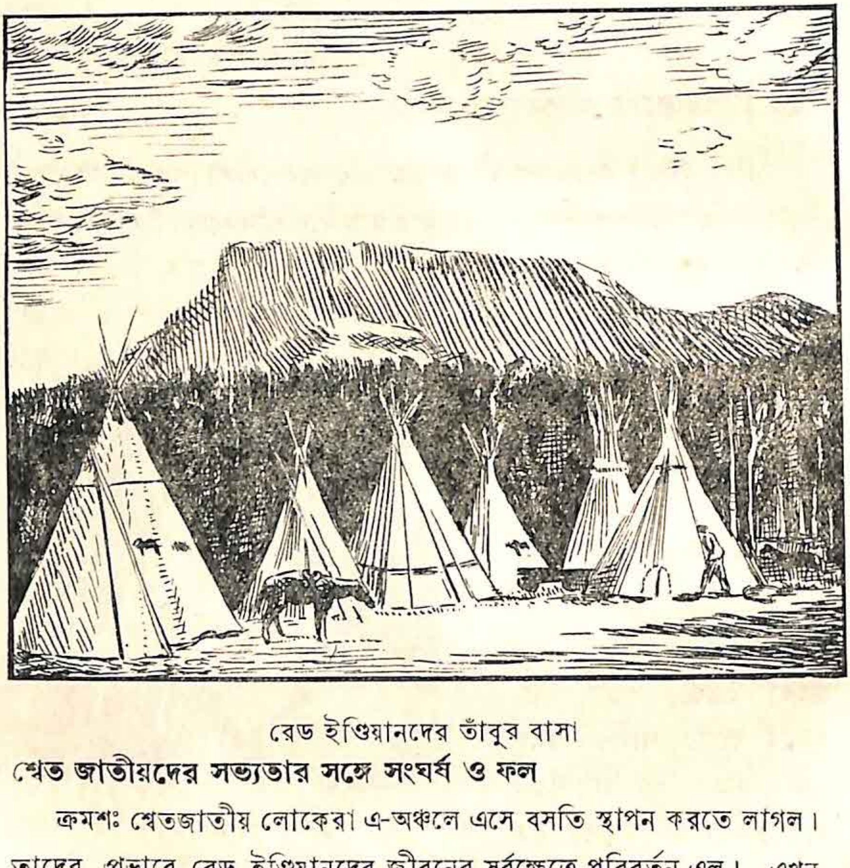
রেড ইণ্ডিয়ান সর্দার

শিকার-করা পশুর মোটা চামড়ার জামা এরা পরত, পাতলা নরম চামড়া দিয়ে জুতো তৈরী করত আর মাথায় পাখীর পালক গুঁজে এরা সাজত। এরা বাস করত তাঁবুতে। সে তাঁবুও তৈরী হত পশুর চামড়ায়। এদের চুল কালো আর লম্বা।

রেড ইণ্ডিয়ানরা বাস করত দলবদ্ধ হয়ে। এদের দলপতিদের পোশাকে জাঁকজমক থাকত খুব। তারা কানে দুল, গলায় মালা আর মাথায় নানা রঙ-এর পাখীর পালকের মুকুট পরত।

স্বভাবতঃ এরা ছিল যাযাবর। তাঁবু বয়ে বয়ে এক জায়গা থেকে অন্য

জায়গায় ঘুরে বেড়াত এরা। শিকারী জাতির পক্ষে এই যাযাবরত্ব স্বাভাবিক। এদের মেয়েদের কাজ ছিল তাঁবু খাটান আর গুটোন। তাই, রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েদের কাছে এ কাজ ছিল অবশ্য শিক্ষণীয়।



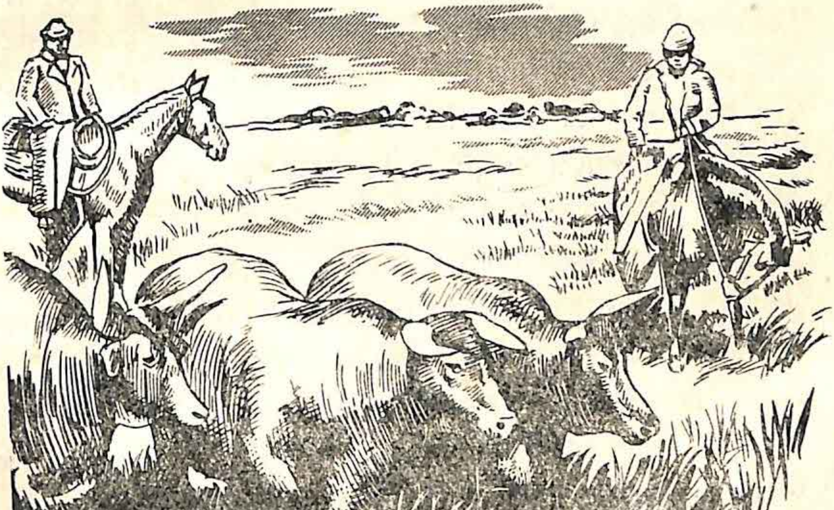
রেড ইণ্ডিয়ানদের তাঁবুর বাসা

শ্বেত জাতীয়দের সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষ ও ফল

ক্রমশঃ শ্বেতজাতীয় লোকেরা এ-অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করতে লাগল। তাদের প্রভাবে রেড ইণ্ডিয়ানদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন এল। এখন তারা কোট-প্যাণ্ট পরে, মাথায় টুপী দেয়। তীরধনু এখন আর তাদের হাতিয়ার নয়, বন্দুকের ব্যবহার তারা শিখেছে। শ্বেতজাতীয় লোকেরা তাদের অঞ্চলে ঘোড়া আমদানী করেছে—এখন তারা ঘোড়ায় চড়ে; শুধু চড়েই না, ঘোড়ায় চড়তে তারা ওস্তাদ।

যাযাবরত্বও এদের আর নেই বলা চলে। এরা এখন সরকারের নির্দিষ্ট অঞ্চলে ঘরবাড়ীতে বাস করে। এখন এরা কাঠ দিয়ে ঘর তৈরী করে। ঘরের কাঠের দেওয়ালে এরা জমকালো রঙ দেয় এবং নানা প্রাণীর ছবি (সাপ,কুকুরের মাথা প্রভৃতি) আঁকে। এদের কারো কারো নিজস্ব খেতখামারও আছে।

তবে এদের জীবন বর্তমানে অনেকটা শ্বেতজাতীয় লোকদের মত হয়ে উঠলেও, আজও এরা শিকারে নিপুণতা হারায় নি। পশু শিকারের ও মাছ-ধরার কৌশল এরা আজও শেখে। মারামারি করা আজও এদের মধ্যে আছে ; খুব বেশী শারীরিক ব্যথা পেলেও এরা চীৎকার করে কাঁদে না। সাধারণতঃ মনের ভাব বাইরের আচরণে এরা প্রকাশ করে না।



.. গরুর পাল দেখাশোনা করে

এরা পশু ধরতে একপ্রান্তে গাঁট দেওয়া একরকম দড়ি ব্যবহার করে—এর নাম **ল্যাসো** (Lasso)। খুব দ্রুত ধাবমান পশুর মাথার ওপর ল্যাসো ছুঁড়ে এরা সে পশুকে ধরে ফেলে। এরা নিহত পশুর চামড়া বিক্রী করে।

রেড ইণ্ডিয়ানদের জীবিকার্জনের পথ বর্তমানে বদলে গেছে। শিকারী রেড ইণ্ডিয়ানরা আজ গো-পালক হয়েছে। প্রেইরী-অঞ্চলে গো-পালন বহুল প্রচলিত। বহু গো-খামার (Cattle farm) এ-অঞ্চলে গড়ে উঠেছে—এগুলির ইংরেজী বিশেষ নাম **র‍্যাঞ্চ** (Ranch) আর এদের মালিককে বলা হয় **র‍্যাঞ্চার** (Rancher)। এক এক র‍্যাঞ্চ-এ হাজার হাজার গরু থাকে। শ্বেত মালিকের অধীনে রেড-ইণ্ডিয়ানরা গো-পালকের কাজ করে। ঘোড়ায় চড়ে, রোদ থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য মস্ত মস্ত টুপী পরে এরা গরুর পাল দেখাশোনা করে। এদের এই বিশেষ ধরনের টুপীকেই Cowboy hat বা গো-পালকের টুপী বলা হয় (Boy Scout-রা যে টুপী পরে সেগুলোও Cowboy hat)।

র‍্যাঞ্চ-এ পালিত গরুগুলো ঘাস খেয়ে বেশ মোটাসোটা হলে সেগুলোকে বিক্রী করার জন্যে দলে দলে শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। তৃণভূমি থেকে শহরে নিয়ে যেতে পথে অনেকদিন কাটে। গরুর পালের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে চলে রেড ইণ্ডিয়ানরা—পথে তাঁবু খাটিয়ে তারা রাত কাটায়। গরুর দল বাঁধতে এরা খুব লম্বা ল্যাসো ব্যবহার করে। শহরে গরু বেচে ফেরার সময় এরা পরিবারের লোকজনদের জন্যে শৌখিন জিনিস কিনে আনে।

প্রেইরী-অঞ্চল জনবিরল বলে কাছাকাছি স্কুল নেই—অনেক দূরে দূরে এক একটা স্কুল। তাই রেড ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ আজও কম। যে ক'টা স্কুল আছে তাও ছোট ছোট। অনেক স্কুল-বাড়ীতে একটা মাত্র ঘর আর একজন মাত্র শিক্ষক—আমাদের দেশের পাঠশালার মত। ছাত্র শিক্ষক প্রায় সবাই ঘোড়ায় চড়ে স্কুলে আসে। যতক্ষণ স্কুল চলে ততক্ষণ ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রাখার জন্যে প্রত্যেক স্কুলেই আস্তাবল আছে।

পাখী, ফুল, ফল

রেড ইণ্ডিয়ানরা আগে মাথায় নানা রঙ-এর পাখীর পালক পরত—একথা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে প্রেইরী-অঞ্চলে অনেক সুন্দর সুন্দর পাখী আছে। এ-অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা ডাক শুনেই অভ্রান্তভাবে বলে দিতে পারে কোন্‌টা

কোন্ পাখীর ডাক। বসন্তে আর গ্রীষ্মে এ-অঞ্চলে বহু রঙীন ফুল ফোটে। এখানে ষ্ট্র-বেরী, ক্র্যানবেরী ফল হয়। ফল পাকলে ছোটদের মজা দেখে কে!

শীতে প্রেইরী অঞ্চল বরফে ঢেকে যায়। ছোটরা তখন বরফের ওপর নানারকম খেলা করে সময় কাটায়।

উৎপন্ন দ্রব্য

এ অঞ্চলের আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন। শীতে এখানকার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির চেয়ে ৪০ থেকে ৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট্ পর্যন্ত নীচে নেমে যায়। মাঝে মাঝে **চিনুক** (chinook) নামের এক গরম ও শুকনো বাতাস পশ্চিম দিক থেকে বইতে থাকে। তখন বরফ গলতে আরম্ভ করে। এখানে রৌদ্রোজ্জ্বল গ্রীষ্ম স্বল্পস্থায়ী, বৃষ্টিপাতও অপ্রচুর। এই অঞ্চল তাই স্বভাবতঃই তৃণভূমি। তবে এই তৃণভূমি অঞ্চল ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংলগ্ন অঞ্চল (ডাকোটা, মিনেসোটা) পৃথিবীর বৃহত্তম গম-উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলো অন্যতম। এ-অঞ্চলের স্বল্পস্থায়ী রৌদ্রোজ্জ্বল গ্রীষ্ম, বিশেষতঃ যখন বৃষ্টি হয় সেই সময়টা, গম উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

প্রেইরী-অঞ্চলে উইনিপেগের চারধারে বিদেশীদের বসবাস ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই স্বরু হয় এবং খুব ধীরে ধীরে তা বিস্তার লাভ করে। ক্রমশঃ বহির্জগতের সঙ্গে এ-অঞ্চলের যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়। পশ্চিমদিকে রেলপথ সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীরা এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। এখন চাষের যোগ্য জমি সবই আবাদ হয়ে গেছে এবং বড় বড় খামারে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ করে যে যে অঞ্চলে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় সেই সেই অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপন্ন হচ্ছে।

প্রেইরী-অঞ্চলের চাষী গ্রীষ্মে দিগন্তবিস্তৃত গম ক্ষেতের মাঝখানে আর শীতে বরফে-ঢাকা বিস্তীর্ণ সমভূমিতে বাস করে।

এখানকার উৎপন্ন গম আধুনিক শহর উইনিপেগ আর শাসকাটুনে সংগৃহীত হয় আর চাষীরা এই দুই শহর থেকে প্রয়োজনীয় শিল্পজাত

জিনিসপত্র সংগ্রহ করে। গম রেলপথে ফোর্ট উইলিয়ম ও পোর্ট আর্থার বন্দরে চালান যায়। এই সব বন্দর থেকে জলপথে এই গম যায় বাফেলো, মন্ট্রিলে। অবশেষে নিউ ইয়র্ক বা মন্ট্রিল থেকে এই গম চালান যায় ইউরোপে। বৃটেন এ-অঞ্চলের গমের প্রধান খরিদ্দার। ভ্যানকুভার বন্দর থেকে পানামা খাল দিয়েও এ অঞ্চলের গম ইউরোপে চালান যায়।

প্রেইরী-অঞ্চলের চাষী মাত্র একটা ফসলের ওপর নির্ভরশীল বলে কোন কারণে ফসল ভাল না হলে তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা দেখা দেয়। ১৯৩১-এর অর্থনৈতিক মন্দা ও পরবর্তী কয়েক বৎসরের অনাবৃষ্টির জন্যে এ-অঞ্চলের অনেক চাষী চাষ ছেড়ে দেয়, ফলে হাজার হাজার একর জমি অনাবাদী পড়ে থাকে। ক্রমে ভূমিক্ষয় সুরু হয় ও এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। কোন কোন স্বল্পবৃষ্টি অঞ্চলের অধিবাসীরা আবার গো-পালন (ranching) সুরু করে।

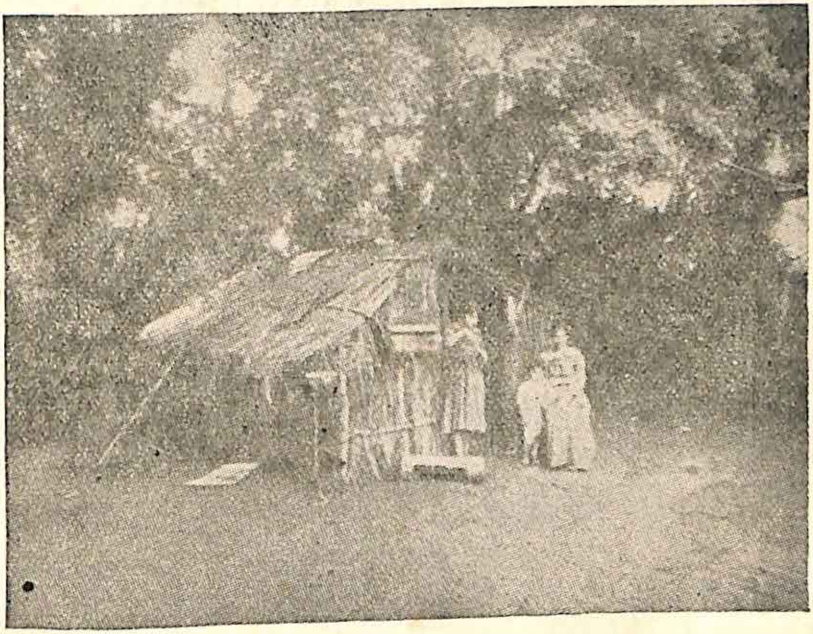
প্রেইরী-অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। সেই কয়লার প্রায় সবটাই এখানকার রেল-চালনায় ব্যবহৃত হয়। এখানে শীতকালে যখন চাষীদের কাজ থাকে না তখন তারা খনিতে মজুরী করে। তাই, এখানে শীতকালে খনিতে গ্রীষ্মকালের দ্বিগুণ মজুর মজুরী করে আর তখন খনি থেকে বেশী কয়লাও তোলা হয়।

প্রেইরী-অঞ্চলের সমাজ সম্বন্ধে লক্ষণীয় ঃ

এ-অঞ্চলের আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানরা জাতি হিসেবে মূলতঃ মঙ্গোলীয়। এদের আদিম জীবনযাত্রায় পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট।

প্রেইরী-অঞ্চলের আধুনিক সমাজে বহু জাতির সম্মেলন হয়েছে। কৃত্রিম পরিবেশের প্রভাবে আদিম অধিবাসীদের জীবনধারাও অনেক বদলে গেছে। এ-সমাজে বৃত্তিগত ও আর্থিক বিভিন্ন শ্রেণী আছে এবং তাদের জীবনযাত্রায় পার্থক্য আছে। তবে আধুনিক জীবনেও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য।

[উত্তর আমেরিকার প্রেইরী-অঞ্চলের মত দক্ষিণ আমেরিকায় আর্জেন্টিনাতেও তৃণভূমি আছে। সেখানকার তৃণভূমিকে বলা হয় **পাম্পাস** (Pampas)। পশুপালন (ভেড়া, ঘোড়া, গরু—প্রেইরী-অঞ্চলের মত শুধু গরু নয়) একসময় এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের পেশা ছিল। ক্রমে এরা কৃষিকাজ শেখে এবং আজ এরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। তবে পশুপালন



গাউচো পরিবার

এরা পরিত্যাগ করে নি। আর্জেন্টিনা-বাসীরা মেষপালক। যে দেশে মেষপালন বহুপ্রচলিত সেদেশে পশম উৎপন্ন হবেই। তাই পৃথিবীতে আর্জেন্টিনা পশম উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। আর্জেন্টিনার রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে ভেড়ার মাংস ও পশম প্রধান। শ্বেতজাতীয় জমিদারেরা এ দেশের বহু উন্নতি করেছে। এদেশে এখন রেলপথ, রাজপথ, বিমানপথ ইত্যাদি বহু আছে। পাম্পাস অঞ্চলের প্রধান ফসল গম, যব আর ভুট্টা।

আর্জেন্টিনার অধিবাসীরা রেড ইণ্ডিয়ান আর গাউচো (Gaucho)। গাউচো-রা রেড ইণ্ডিয়ান আর স্প্যানিশ (Spanish) এই দুই জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। এদের প্রধান বৃত্তি পশুপালন আর ক্ষেতখামার পাহারা দেওয়া। ঘোড়া এদের নিত্যসঙ্গী।

প্রেইরী আর পাম্পাস অঞ্চলের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। উষ্ণ আবহাওয়ায়ও তৃণভূমি আছে; যেমন দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা ও ব্রেজিলের তৃণভূমি এবং আফ্রিকার সুদান অঞ্চলের তৃণভূমি। তবে এখানে চাষ-আবাদ বা পশুপালন কিছুই সম্ভব নয়। তাই এখানকার অধিবাসীরা যাযাবর আর শিকারী।]

কৃষিপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ

পুরাণ, মহাকাব্য ও ইতিহাসে বঙ্গদেশ

বলি নামে এক পৌরাণিক রাজার ছিল পাঁচ ছেলে। তাদের নাম **অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম** ও **পুণ্ড্র**। তাদের পাঁচজনের নামে ভারতের পাঁচটি জনপদের নামকরণ হয়—**অঙ্গদেশ** (বিহারের ভাগলপুর বিভাগ), **বঙ্গদেশ** (ঢাকা বিভাগ), **সুহ্মদেশ** বা **রাঢ়দেশ** (বর্ধমান বিভাগ), **পুণ্ড্র দেশ** (রাজসাহী বিভাগ) ও **কলিঙ্গদেশ** (উড়িষ্যার অংশ)।

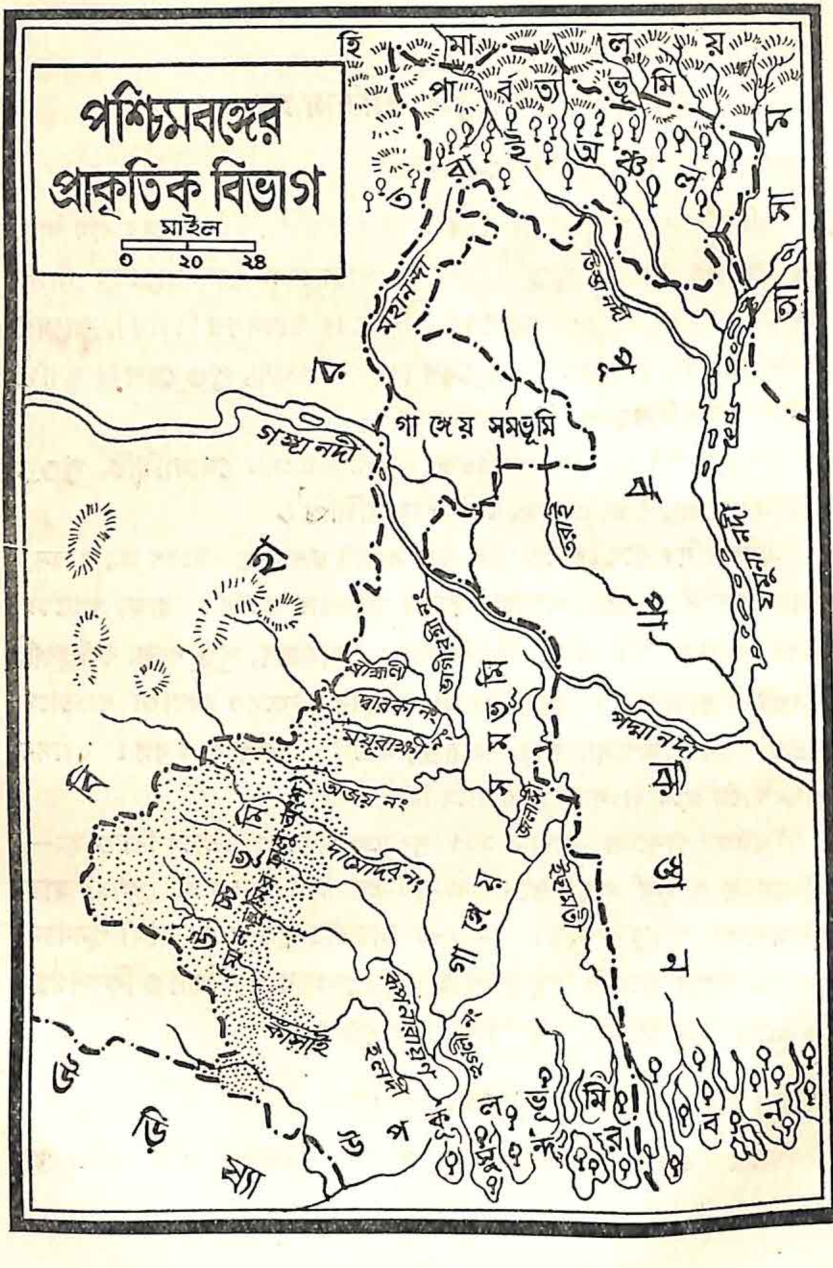
মহাভারতের যুগে বঙ্গদেশ বিভক্ত ছিল সাত ভাগে : **মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকীকচ্ছ, সুহ্ম, প্রসুহ্ম, অঙ্গ** ও **তাম্রলিপ্তি**।

ঐতিহাসিক যুগে দেখতে পাই **গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত** বঙ্গদেশ জয় করেন। সপ্তম শতাব্দীতে **রাজা শশাঙ্ক** বঙ্গদেশ পুনরুদ্ধার করেন। রাজা শশাঙ্কের সময়ে বঙ্গদেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল : **কামরূপ, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট** ও **তাম্রলিপ্ত**। **রাজা বল্লাল সেনের** আমলেও বঙ্গরাজ্য পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল—**মিথিলা, রাঢ়, বরেন্দ্র, বগড়ী** বা **বকদ্বীপ** ও **বঙ্গ**। মোগল শাসনকালে সুবে বাংলা আঠার ভাগে বিভক্ত ছিল।

ইংরেজ শাসনের শেষে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে বঙ্গদেশ দুভাগে বিভক্ত হয়—**পশ্চিমবঙ্গ** ও **পূর্ব পাকিস্তান**। ১৯৫০-এর ১লা জানুয়ারী **কোচবিহার** পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৬-এ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য পুনর্গঠন উপলক্ষে বিহার রাজ্যের কিছু অংশ (**মানভুম জেলার পুরুলিয়া ও কিষণগঞ্জ মহকুমার কিছু অংশ**) পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ

পশ্চিম বঙ্গের আয়তন এখন ৩৩২৭৯ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ২৬১৬০০০০।



পশ্চিমবঙ্গের
প্রাকৃতিক বিভাগ
মাইল
গঙ্গা নদী
গাঙ্গেয় সমভূমি
পদ্মা নদী
মহানন্দা
ব্রাহ্মণী
দ্বারকা নং
ময়ূরাক্ষী নং
অজয় নং
দামোদর নং
কাঁসাই
হলদী
জলঙ্গী

পশ্চিম বঙ্গের উত্তরে হিমালয়, পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান ও আসাম, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্য।

পশ্চিম বঙ্গের উত্তরাংশের তিনটি জেলা—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার (এ অঞ্চলের আয়তন প্রায় ১০০০ বর্গমাইল)—হিমালয়-অঞ্চলে অবস্থিত ; অন্যান্য অংশ সমভূমি অঞ্চলে।

পাহাড়ের তলদেশের অরণ্য অঞ্চলকে বলা হয় **তরাই**—শিলিগুড়ি আর কার্শিয়াংএর পূর্বাংশের নাম **দার্জিলিং তরাই**। কালিম্পং আর ভূটানের দক্ষিণে, তিস্তা আর সংকোশের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের নাম **ডুয়ার্স**।

পশ্চিম বঙ্গের সমভূমি অঞ্চল তিন ভাগে বিভক্ত—(১) মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ; (২) ২৪ পরগণা, কলিকাতা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ ; (৩) বর্ধমান বিভাগ। নদীর জলধারা এই তিন অংশকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

ভূপ্রকৃতি অনুসারে পশ্চিম বঙ্গ দু ভাগে বিভক্ত ঃ এক ভাগ আগ্নেয় শিলায় গঠিত, অপর ভাগ পাললিক শিলায়। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত গলিত পদার্থ ঠাণ্ডা হয়ে **আগ্নেয় শিলার** উৎপত্তি হয়। ক্রমে ঐ শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়, এবং জল বা বায়ু দ্বারা বাহিত হয়ে জলের নীচে স্তরে স্তরে জমা হয়। কালক্রমে জল ও ওপরের স্তরের চাপে ও নানা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কণাগুলো জমাট বেঁধে আর এক রকম শিলায় পরিণত হয়। এই রকম শিলা পলি থেকে সৃষ্ট হয় বলে এর নাম **পাললিক শিলা**। চাপে আর তাপে আগ্নেয় শিলা ও পাললিক শিলা রূপান্তরিত হয়ে এক নতুন রকম শিলার সৃষ্টি হয়। তাকে **রূপান্তরিত** বা **পরিবর্তিত শিলা** বলে। আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চল প্রধানতঃ আগ্নেয় শিলা ও পরিবর্তিত শিলায় গঠিত আর তাই খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই অঞ্চল ছাড়া পশ্চিম বঙ্গের বাকী অংশের বেশীর ভাগই পাললিক শিলায় গঠিত আর সেই জন্যেই উর্বর ও কৃষির উপযোগী।

স্তরীভূত শিলা যে মাটি দিয়ে ঢাকা থাকে কৃষির কাজ তার স্বভাবের ওপর নির্ভর করে। পশ্চিম বঙ্গের মাটি মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়: **এঁটেল** আর **দোআঁশ**। দোআঁশ মাটিতে সব ফসলই ফলে। নদীর ধারের মাটি বালিতে ভরা—তাই তার নাম **বেলে মাটি**। বেলে মাটিতে এক স্তর পলি পড়লে তবে তাতে চাষ হয়।

নদ-নদী

পশ্চিম বঙ্গের ভূমি উত্তরের উঁচু পার্বত্যভূমি থেকে দক্ষিণে এবং পশ্চিম দিকে বর্ধমান বিভাগের প্রান্তভাগে ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে পূর্বদিকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে এসেছে। তাই এই রাজ্যের প্রায় সব নদীরই গতি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

গঙ্গা আর তার শাখা **ভাগীরথী** ও **পদ্মা** এ রাজ্যের প্রধান নদী। **দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী** ও **রূপনারায়ণ** ভাগীরথীর উপনদী। **তিস্তা** ও **মহানন্দা** উত্তরাংশের প্রধান নদী।

জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত

পশ্চিম বঙ্গের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। সমুদ্র কাছে বলে এখানে শীত বা গ্রীষ্ম খুব বেশী নয়। তবে বর্ধমানের খনি-অঞ্চল, এবং মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়া গ্রীষ্মে খুব গরম; উত্তরাংশে দার্জিলিং অঞ্চল শীতে খুব ঠাণ্ডা।

গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এ রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় হিমালয়ের কাছাকাছি অঞ্চলে প্রায় ১০০", দক্ষিণ বঙ্গে প্রায় ৬০" ও বর্ধমান বিভাগে প্রায় ৫০" থেকে ৫৫"। কলকাতায় বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৬২"।

জাতিগঠন

দেহের গঠন, মুখের আকৃতি, গায়ের রঙ, মাথার চুল ও নানারকম খাদ্য ইত্যাদি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে বাঙ্গালী জাতি নানা জাতির

সংমিশ্রণে উৎপন্ন। তবে মোটামুটি এই পাঁচটি জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় – **নিগ্রো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য ও ভোটচীন** (Tibeto-Chinese)।

ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোজাতীয় মানুষেরাই হয়ত ভারতের তথা পশ্চিম বঙ্গেরও আদিম অধিবাসী। তারা কৃষিকর্ম জানত না—বনের ফলমূল খেয়ে আর পাথরের তৈরী অস্ত্র দিয়ে মাছ-পশু শিকার করে তারা জীবন ধারণ করত।

ইন্দোচীন থেকে অস্ট্রিক জাতির মানুষরা আসামের উপত্যকা ডিঙিয়ে এদেশে আসে। তারা কৃষিকর্ম জানত—কাঠের ব্যবহার জানত। তারা কাঠ দিয়ে লাঙ্গলের ফলা ও জলপথে চলাচলের জন্যে ডোঙা তৈরী করতে পারত। তারা তীরধনু দিয়ে শিকার করত। অস্ট্রিকদের সভ্যতা ছিল গ্রামীণ।

দ্রাবিড় আর অস্ট্রিক দুই জাতিই সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের মধ্যে দ্রাবিড়রা প্রথম এসেছিল না অস্ট্রিকরা, তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে দ্রাবিড়রা এসেছিল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আর অস্ট্রিকরা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। প্রবেশ-পথের সান্নিধ্য থেকে অনুমান করা যায় যে অস্ট্রিকরা দ্রাবিড়দের আগে বাংলা দেশে এসেছিল।

দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল নাগর সভ্যতা। অনেকের মতে তারা মোহেন-জো-দারো আর হরপ্পায় নাগর সভ্যতার পত্তন করেছিল। তারা চাষ-আবাদ জানত। যব আর গমের চাষ বোধ হয় দ্রাবিড়রাই ভারতে প্রথম প্রবর্তন করে।

বাঙ্গালীর রোজকার জীবনে ধান, পান, সুপারি, হলুদ, কলা প্রভৃতির ব্যবহারে ও নানা ধর্মীয় আচরণে অস্ট্রিক প্রভাব আজও সুস্পষ্ট। তাই বাঙ্গালী জীবনে নিগ্রো-দ্রাবিড় সংমিশ্রণের সঙ্গে অস্ট্রিক প্রভাবের প্রাধান্যও স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে।

দ্রাবিড়দের পর উত্তর ভারতে এল আর্যরা। ক্রমে ক্রমে সারা ভারতেই তাদের আধিপত্য বিস্তারিত হল, সেই সঙ্গে তাদের সভ্যতা এবং ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থাও। বাংলা দেশও এ প্রভাব থেকে মুক্ত রইল না। আর্যদের

প্রবর্তিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কালক্রমে বাংলা দেশেও প্রচারিত হল। কিন্তু সেই সঙ্গে পুরাকালের নানা দেবদেবী ও তান্ত্রিকতাও বাংলা দেশে রয়েই হল। ফলে আর্য আর অনার্যের সংমিশ্রণে গড়ে উঠতে লাগল বাঙ্গালীর জীবন, ধর্ম আর সংস্কৃতি। অস্ট্রিকদের কাছ থেকে বাঙ্গালী পেল কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সভ্যতা, দ্রাবিড়দের কাছ থেকে বাণিজ্যবুদ্ধি ও নাগর সভ্যতা আর আর্যদের কাছ থেকে পেল কল্পনা আর পরিচালনা-বুদ্ধি।

আর্যদের পরে আসে ভোট-চীনারা। চীন থেকে তিব্বতে এবং তিব্বত থেকে হিমালয় ডিঙিয়ে এরা এদেশে আসে। এরা অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আর্য সভ্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে পূর্ব আর উত্তর বঙ্গের জনসমাজে মিশে যায়।

মধ্যযুগে মুস্লিম সভ্যতা বাঙ্গালীর জীবন ও সমাজের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। তারপর আসে ইউরোপীয় প্রভাব। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজ ক্রমে ক্রমে এদেশে এল। এই সব ইউরোপীয়দের মধ্যে ইংরেজদের প্রভাবই বাঙ্গালীর জীবন ও সংস্কৃতিতে সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট। কলকাতা ছিল ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও রাজধানী। বাঙ্গালী তাই অপরের চেয়ে আগে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠতম সংস্পর্শে এসে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা বেশী করে গ্রহণ করেছিল।

বাংলা ভাষা—উৎপত্তি ও সমৃদ্ধি

বাঙ্গালীর ভাষার মূল হল সংস্কৃত ভাষা। অনুমান ২০০ খৃস্টাব্দে এদেশে 'ইণ্ডো-এরিয়ান'-শাখার অন্তর্গত প্রাকৃত ভাষার চলন ছিল। সেই প্রাকৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষা এসেছে। এই প্রাকৃত ভাষা ৮০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি 'মাগধী' অপভ্রংশের রূপ নেয় এবং তাই থেকে দশম শতাব্দীতে প্রাচীন বাংলা ভাষা রূপ লাভ করে। অবশ্য সে-কালের সেই বাংলা ভাষা আজকের বাঙ্গালী সহজে বুঝতে পারবে না। পরে প্রাকৃত, মৈথিলী, ফারসী, আরবী, উর্দু, পর্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে—ভারতের যে কোন রাজ্যের সাহিত্যের চেয়ে আজ বাংলা

সাহিত্য অনেক বেশী উন্নত ও সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল পুরস্কার' প্রাপ্তি বাংলা সাহিত্যের এই উৎকর্ষের বিশ্ব-স্বীকৃতির প্রমাণ।

উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্প

পশ্চিম বঙ্গের সমতল ভূমিতে **ধান** ও **পাট** প্রধান ফসল। ধান বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্যশস্য। পশ্চিম বঙ্গে তিনরকম ধান উৎপন্ন হয় : **আউশ, আমন** ও **বোরো**। আউশ ও বোরো ধান সব জেলায় উৎপন্ন হয় না ; তবে বেশীর ভাগ জমিতেই আমন ধান উৎপন্ন হয়। চাষীরা আমন ধান অগ্রহায়ণ মাসে কেটে ঘরে তোলে।

পাট বেচে চাষীরা যে নগদ টাকা পায় তাই দিয়ে প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্য কেনে। পাট বিদেশে চালান যায়। ধান আর পাট ছাড়া **আখ, গম, ডাল, কলাই, আলু** প্রভৃতি ও **তৈলবীজ**ও কিছু কিছু উৎপন্ন হয়। এ রাজ্যের উত্তরাংশে **তামাক,** দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে **চা** এবং দার্জিলিং জেলার মংপুতে সিংকোনা জন্মায়। সিংকোনা থেকে ম্যালেরিয়ার ঔষধ **কুইনাইন** তৈরী হয়।

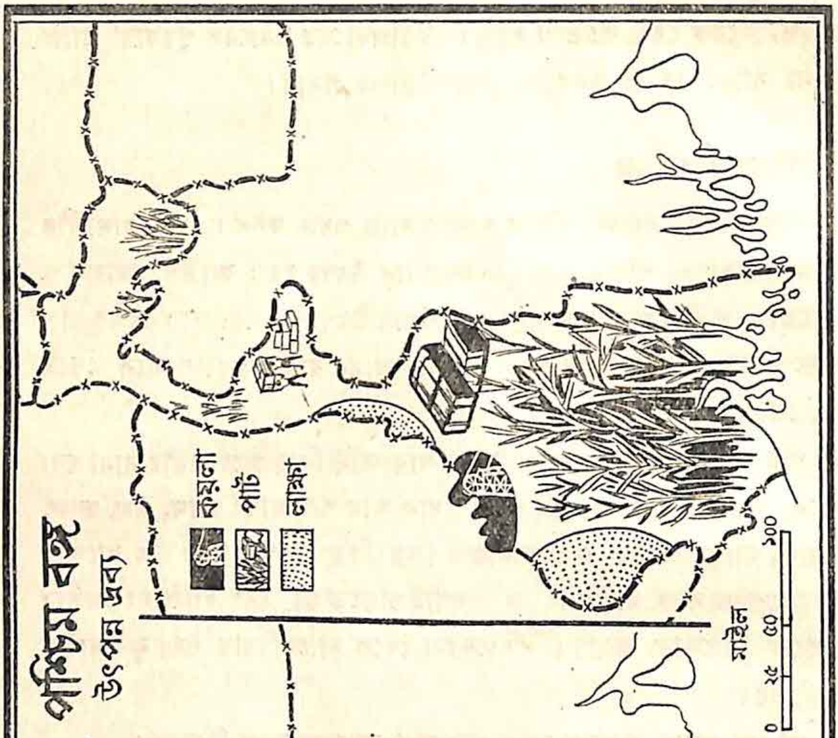
মুর্শিদাবাদ ও **মালদহ** জেলা **রেশম** ও **আমের** জন্যে বিখ্যাত।

তরাই আর **ডুয়ার্সে**র বনে **শাল** ও **জারুল** কাঠ পাওয়া যায়। **সুন্দরবনে সুন্দরী** ও **গরান** কাঠ পাওয়া যায়।

রাণীগঞ্জ অঞ্চলে প্রচুর **কয়লা** পাওয়া যায়।

কলকাতার কাছাকাছি হুগলী নদীর দু'ধারে অনেক কলকারখানা আছে। এ অঞ্চলে **পাটশিল্প** প্রধান। **কাপড়, চীনেমাটি ও কাঁচের জিনিসপত্র, কাগজ, দিয়াশলাই, ঔষধ, চামড়ার দ্রব্য, রং, মোটরগাড়ী** প্রভৃতি তৈরী করবার কারখানাও এ অঞ্চলে আছে।

পশ্চিম বঙ্গের দ্বিতীয় শিল্পাঞ্চল **রাণীগঞ্জ**-এর খনি অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত। এ অঞ্চলে **লৌহ** ও **ইস্পাত** এবং **অ্যালুমিনিয়াম**-এর কারখানা আছে।


পশ্চিম বঙ্গ
উৎপন্ন দ্রব্য
কয়লা
পাট
লাক্ষা
চা
রেশম
ধান
মাইল
০ ২৫ ৫০ ১০০

কুটিরশিল্পের মধ্যে মুর্শিদাবাদের রেশমী কাপড়, শান্তিপুরের তাঁতের কাপড় কৃষ্ণনগরের মাটির জিনিসপত্র, খাগড়ার পিতল-কাঁসার বাসন তৈরী প্রসিদ্ধ।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five-Year Plan) অনুসারে বর্ধমান জেলার **চিত্তরঞ্জনে** (চিত্তরঞ্জন এক সুপরিকল্পিত শিল্পনগর—এর নামকরণ হয়েছে বাংলার চিরস্মরণীয় নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নামানুসারে) রেল ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা ও **দুর্গাপুরে** লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হয়েছে। দুর্গাপুরও পরিকল্পিত শিল্পনগর। এই নগর ও এখানকার কারখানা তৈরী হচ্ছে। এখনও এখানকার কাজ শেষ হয় নি বা উৎপাদন সুরু হয় নি।

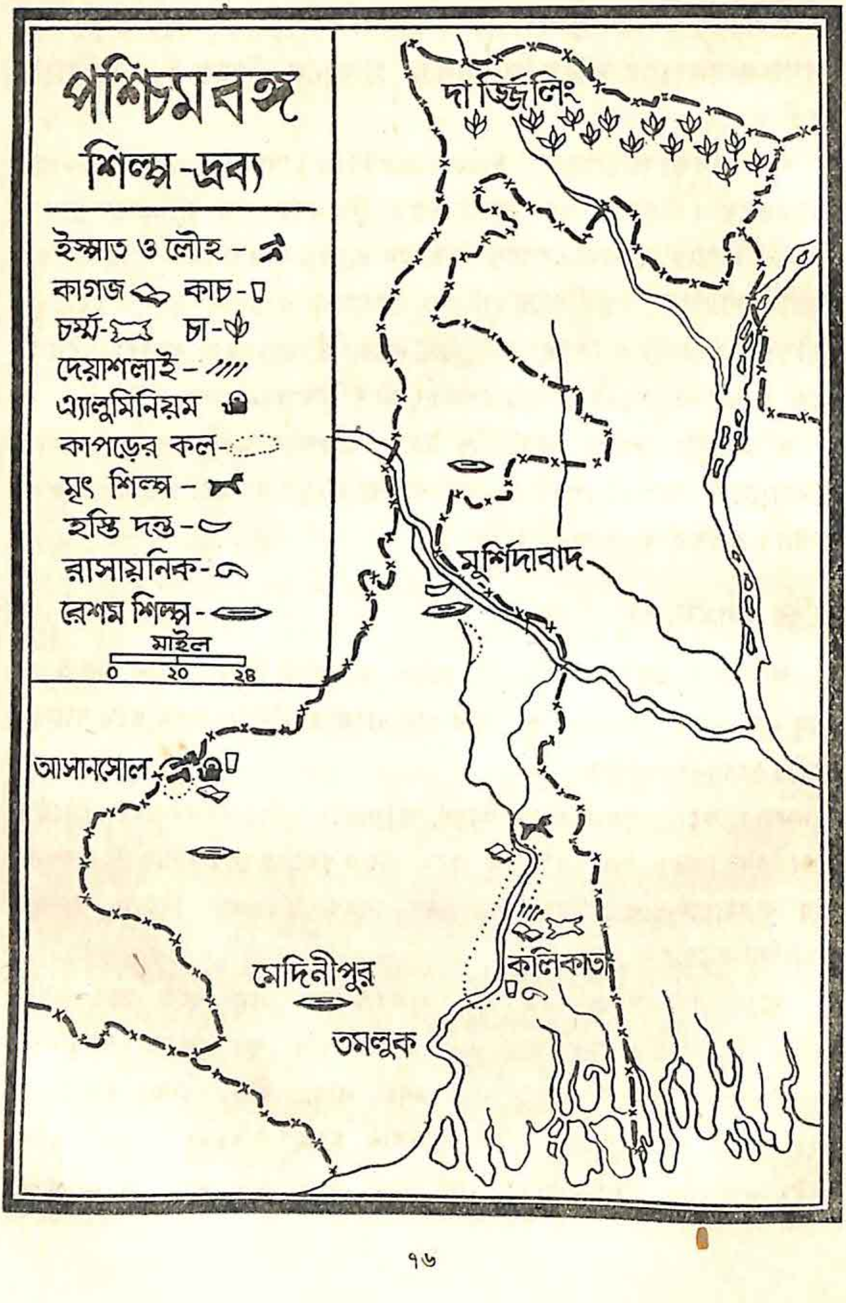
পশ্চিম বঙ্গে শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সত্ত্বেও আজও কিন্তু এ রাজ্যের অধিবাসীদের অধিকাংশেরই উপজীবিকা কৃষি—বাংলা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৫৭·২ জনই চাষী।

কৃষির অনগ্রসরতা—কারণ

অধিকাংশ লোকের জীবিকা হলেও কৃষিকাজ কিন্তু এখানে উন্নত ও আধুনিক নয়। প্রায় একশ' বছর ধরে বাংলার জমিতে ফলন কমে যাচ্ছে, চাষীর দুঃখদুর্দশা বাড়ছে।

ফলন কমে যাওয়ার প্রধান কারণ, কালক্রমে ভূমির উর্বরতা কমে গেছে। এখন আশানুরূপ ফলন বাড়াতে হলে উন্নত ধরণের কৃষি-প্রণালী অবলম্বন, সার ব্যবহার, ভাল বীজ বপন, উত্তম সেচব্যবস্থা, বন্যা নিরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রয়োজন।

আর একটা কারণ এই যে, পুরুষানুক্রমে ভাগ হতে হতে এখন চাষের জমি অতি ক্ষুদ্র হয়ে পড়েছে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষেতে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ সম্ভব নয় এবং সার, বীজ, সেচ ইত্যাদির জন্যে যথেষ্ট খরচ করেও যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায় না। তাই, আজ চাষী প্রাণপাত পরিশ্রম করেও পেট ভরে খেতে পায় না : তার দেহ-


পশ্চিমবঙ্গ
শিল্প-দ্রব্য
ইস্পাত ও লৌহ -
কাগজ
কাচ -
চর্ম্ম-
চা -
দেয়াশলাই -
এ্যালুমিনিয়ম
কাপড়ের কল-
মৃৎ শিল্প -
হস্তি দন্ত -
রাসায়নিক -
রেশম শিল্প -
মাইল
০
২০
২৪
দার্জিলিং
মুর্শিদাবাদ
আসানসোল
মেদিনীপুর
কলিকাতা
তমলুক

মনে বল নেই, সাহস নেই। নিজের অবস্থার উন্নতির জন্যে যে উদ্যম আর উৎসাহ দরকার তা তার নেই—চাষ-আবাদ সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দরকার, তা-ও নেই।

প্রতিকার-ব্যবস্থা

এক দিকে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ফলে কৃষির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে জমির ফলন কমছে। তাই ভারতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতি প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন বলে স্বীকৃত হয়েছে এবং কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্যে সর্বাংগীন চেষ্টা হচ্ছে। কৃষককে আজ সাধারণ লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে; উন্নত কৃষি-প্রণালী সম্বন্ধে তাকে উপদেশ-নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে; ভাল বীজ, সার ইত্যাদি স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে; কৃষি ঋণের ব্যবস্থা সুলভ করা হচ্ছে ও কৃষক সমাজে সমবায় প্রথা প্রচলনের চেষ্টা হচ্ছে। ভূমিহীনের ভূমি-সংস্থানের জন্যে, প্রকৃত চাষীর হাতে জমির মালিকানা দেবার জন্যে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করা হয়েছে (১৯৫৩)। চাষের মোট জমি বাড়াবার জন্যে পতিত জমি উদ্ধার করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ন' লক্ষ একর, তার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে। কৃষির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্যে নতুন নতুন শিল্প প্রচেষ্টা, বিভিন্ন স্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, এবং কুটিরশিল্পের উন্নতি সাধনের চেষ্টা সুরু হয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গের গ্রাম

কৃষিপ্রধান পশ্চিম বঙ্গের জনসংখ্যার অধিকাংশই (৭৫%) গ্রামে বাস করে। পশ্চিম বঙ্গে জনবসতি আছে এমন গ্রামের সংখ্যা ৩৫ হাজার এবং শহর মাত্র ১১৪টি।

কৃষিক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেই অধিকাংশ গ্রাম গড়ে উঠেছে। কৃষককে তার জমির কাছাকাছি থাকতে হয়, তাই কৃষকেরা গ্রামবাসী। গ্রামবাসীদের ক্ষেতের একপাশে তাদের বাড়ীঘর। গৃহস্থের বাড়ীর চারদিকে তার নিজস্ব

এলাকায় ফলের গাছের বাগান, জ্বালানী কাঠের গাছ : এক গৃহস্থের সীমানা ছাড়িয়ে আর এক গৃহস্থের বাড়ী। এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ী যাবার পথ থাকে। গ্রামে প্রত্যেকের জন্যে প্রত্যেকের সহানুভূতি আছে—সকলের সঙ্গে সকলের সামাজিক সম্বন্ধ আছে।

প্রত্যেক গ্রামের সীমা মাঠ, রাস্তা, খাল বা জঙ্গল দিয়ে চিহ্নিত। এক গ্রামের মাঠের, রাস্তার, খালের বা জঙ্গলের অপর ধারে আর একটা গ্রাম সুরু।

কোন কোন গ্রাম খাল বা নদীর ধারে অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ চলাচলের পথের ধারে অথবা কয়েকটি রাস্তার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। সেই সমস্ত জায়গায় হাট-বাজার-বন্দর গড়ে ওঠে। এ রকম জায়গায় থানা, ডাকঘর ও নানা সরকারী অফিস ইত্যাদি স্থাপিত হয়।

রাস্তা-ঘাট ও পরিবহন-ব্যবস্থা

গ্রামবাসীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে এবং লোক ও মাল চলাচলের জন্যে ভাল ব্যবস্থা থাকার খুব প্রয়োজন। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সন্তোষজনক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না এবং আজও নেই। গ্রামের জীবনের অবনতির বা আশানুরূপ উন্নতি না হবার এটা একটা কারণ। গ্রামাঞ্চলে পায়ে-চলার রাস্তা কাঁচা—বর্ষায় তা দুর্গম। বর্ষায় খাল-পথে নৌকো চলে বটে, কিন্তু গ্রীষ্মে সে-সমস্ত খালে জল থাকে না, নৌকো চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য যে রেলওয়ে বা স্টীমার বা উড়োজাহাজ দিয়ে গ্রামে গ্রামে লোক বা মাল চলাচলের ব্যবস্থা করা যায় না।

গ্রামাঞ্চলে মাল চলাচলের সাধারণ বাহন গরুর গাড়ী ও নৌকো। কোন কোন অঞ্চলে ঘোড়ার পিঠেও মাল চালান যায়।

পশ্চিম বঙ্গের উত্তরাংশে পরিবহন-ব্যবস্থা খুবই অপ্রচুর আর এই অব্যবস্থা ঐ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির পথে এক প্রকাণ্ড বাধা।

স্বাধীনতা লাভের পর সরকার রাস্তাঘাটের অভাব দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাস্তাগুলোকে নিম্নলিখিত চারভাগে ভাগ

করে সংস্কার ও নির্মাণের প্রচেষ্টা চলছে। (১) **জাতীয় সড়ক** (National Highways)—এগুলো ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দর ও রাজধানীকে সংযুক্ত করবে। পশ্চিম বঙ্গে ২৫১ মাইল জাতীয় সড়ক নির্মিত হবে। (২) **প্রাদেশিক সড়ক** (Provincial Highways)—এগুলো জেলার বড় বড় শহরগুলোকে সংযুক্ত করবে। পশ্চিম বঙ্গে ৫৩৫ মাইল প্রাদেশিক সড়ক ইতিমধ্যেই নির্মাণ করা হয়ে গেছে। (৩) **জেলা সড়ক** (District Roads)—এগুলো জেলার শহর আর গ্রামগুলোকে সংযুক্ত করবে। এগুলো জাতীয় ও প্রাদেশিক সড়কগুলোর সঙ্গে মিলবে। (৪) **গ্রামের রাস্তা**—এগুলো বিভিন্ন গ্রামকে সংযুক্ত করবে এবং জেলা সড়কগুলোর সঙ্গে মিশবে। এরকম রাস্তা ৩৬৩ মাইল নির্মিত হয়ে গেছে।

উত্তর বঙ্গের সমস্যা সমাধানের জন্যে এক বিশেষ পরিকল্পনা রচিত ও গৃহীত হয়েছে। এই পরিকল্পনা শেষ হলে কলকাতা থেকে মালদহ পর্যন্ত একটানা রাস্তা হয়ে যাবে।

বিভিন্ন ধরণের যতখানি রাস্তা নির্মিত হয়েছে তার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নতি দেখা দিয়েছে। বহু জায়গায় যাত্রিবাহী মোটর বাস ও মালবাহী মোটর ট্রাক চলাচলের সুযোগ হয়েছে।

খরিদ-বিক্রয়ের ব্যবস্থা

গ্রামের মানুষ তাদের উৎপন্ন জিনিসপত্র হাট-বাজার-বন্দরে এনে বিক্রী করে এবং সেখান থেকে তাদের আবশ্যক শিল্পজাত জিনিসপত্র খরিদ করে। কতগুলো নিত্যব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্যও—যেমন, তৈল, লবণ, মশলা প্রভৃতি—গ্রামবাসীকে হাট-বাজার-বন্দর থেকে সংগ্রহ করতে হয়।

হাট-বাজার-বন্দরের বেচা-কেনা ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের নানা প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ-বিক্রয়ের এক অভিনব প্রথা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। "ভারতবর্ষে যাহারা গ্রামের মধ্যে বসবাস করিত, তাহাদের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য···ভারতবর্ষের সর্বত্র বংশপরম্পরায় চাকুরিয়া বা শিল্পীদের বাঁধিয়া রাখিবার

নানাবিধ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যাহা নিত্য প্রয়োজন হয় না, অথচ যাহার জন্য বিশিষ্ট কারিগরগণকে গ্রামে বাঁধিয়াও রাখা যায় না। ধরুন, পিতল কাঁসার বাসনের কাজ। তাহা তো নিত্য খরিদ বা মেরামতের দরকার নাই; আর ছোটখাটো গ্রামের পক্ষে একজন করিয়া কাঁসারি পোষাও সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় দুই তিন প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে। পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন জেলায় কাঁসারিগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ভাঙা বাসনপত্র মেরামত করিয়া দেয়, অথবা একেবারে অচল হইলে সেগুলির বদলে বাকি দাম লইয়া গৃহস্থকে নূতন বাসন বিক্রয় করে। কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁসারি এক গ্রামে কিছুদিনের জন্য থাকিয়া যায়; এমন কি পুরানো বাসন গলাইয়া হয়তো পিতলের ধান মাপিবার জন্য কুন্‌কের মত জিনিস ঢালাই করিয়াও দেয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভাল আর একটি খরিদ-বিক্রির ব্যবস্থা ভারতের সর্বত্র আজও প্রচলিত রহিয়াছে।"

"চাষীর দেশে সকল সময়ে ক্ষেতে ভারি কাজ থাকে না। যে সময়ে ফসল-কাটা শেষ হইয়া যায়, শস্য বিক্রয়ের পরে চাষীর হাতে কিছু পয়সা আসে, সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে মেলা বসে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নানা জায়গায় কোনও ঠাকুর-দেবতার পূজাপার্বণ উপলক্ষে মেলা বসার রীতি প্রচলিত আছে। কোথাও বা দুই নদীর সঙ্গমস্থলে কোনও শুভ দিবসে স্নানের জন্য বহু মানুষের সমাগম হয়। এই সকল মেলার মধ্যে, সকল মেলায় না হইলেও অন্তত অনেক মেলাতে, বিস্তর কেনাবেচার কাজ হয়। বিশেষ বিশেষ মেলায় বিশেষ বিশেষ জিনিস খরিদ-বিক্রয়ের প্রথা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহার ফলে গৃহস্থ বুঝিয়া সুঝিয়া নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য মেলা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনে। সারা বৎসর কাজের পর সে যে কেবল মেলায় একটু আনন্দ উৎসব করিতেই যায় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারও কিছু সারিয়া আসে।" (হিন্দুসমাজের গড়ন : নির্মলকুমার বসু : পৃঃ ৮৪-৫)

গ্রাম্য সমাজে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা

পশ্চিম বঙ্গের তথা ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজকে বুঝতে গেলে হিন্দু-সমাজে কৌলিকবৃত্তিকে আশ্রয় করে যে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা এবং কালক্রমে সে ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন বোঝা দরকার।

"হিন্দুসমাজের মধ্যে কৌলিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া যে উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে শোষণ ও শ্রেণীগত অসমতা থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন, নূতন স্থানে গ্রামপত্তনের সম্ভাবনা, বিদেশে শিল্পজাত মাল বিক্রয় এবং প্রতি কুল অথবা জাতির দেশাচার বা কুলাচার পালনে স্বাধীনতা থাকার কারণে তাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া টিকিয়া রহিল। মুসলমান আমলে, আমাদের অনুমান হয়, শহরের আশেপাশে প্রাচীন ব্যবস্থার কিছু অদলবদল হইলেও গ্রামে উহা কায়েমী অবস্থায় টিকিয়া গিয়াছিল ; এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শিল্পসামগ্রী উৎপাদন ও বিদেশে বিক্রয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশ হইতে প্রভূত ধনসম্ভার আকর্ষণ করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিল।"

"খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক শত বৎসর এই সম্পদের লোভে যেমন পাঠান, তুর্ক বা মোগলজাতি ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে, তেমনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজ বণিককুল ভারতে আকৃষ্ট হইয়া নূতন এবং আরও সূক্ষ্ম উপায়ে ধনসংগ্রহের চেষ্টা করিতে থাকে। শেষ দুই শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের ধনোৎপাদন ব্যবস্থায়ও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্যেও তাহার প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতে থাকে।" (হিন্দুসমাজের গড়ন : নির্মলকুমার বসু : পৃঃ ১১৭)

"বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির মধ্যে শিক্ষিতের হার বেশি। তাহাদের মধ্যে স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠিত লোকের হার কম, মধ্যবিত্তের সংখ্যা অধিক। এক, কায়স্থের মধ্যে কিছু চাষের প্রাদুর্ভাব আছে, নয়তো চাষের দিকে ব্রাহ্মণ বৈদ্য অগ্রসর হয় নাই। শিল্পের দিকেও ইহাদের গতি অতিশয় ক্ষীণ।"

"যে সকল জাতির মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব ক্ষীণ, তাহাদের গতি দুই মুখে অথবা তিন মুখে চলিয়াছে। চামার ও মুচি স্ববৃত্তিতে মাঝারি সংখ্যায় রহিয়া গিয়াছে, চাষীর সংখ্যাও তাহাদের মধ্যে মন্দ নয়। তাহারা হাতের কাজ করিত, স্ববৃত্তি কমিয়া আসায় অন্যান্য হাতের কাজের দিকে ঝুঁকিবার ফলে, তাহাদের মধ্যে শিল্পের উপর নির্ভরশীল লোকের হার উর্ধ্বমুখী হইয়া আছে। কামারদের মধ্যে শিক্ষিতের হার অপরাপর শিল্পীকুল অপেক্ষা অধিক হওয়ার জন্য এবং তাহাদের দক্ষতার জন্য, স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠান কমিয়া আসিলেও, তাহাদের অন্য শিল্পবৃত্তির দিকে যাওয়া সহজ হইয়াছে।"

"সমাজের সেবক, ধোপা বা নাপিতের মধ্য স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠিত লোকের হার এখনও কম নয়। চাষের দিকেও তাহাদের গতি মধ্যম, কিন্তু শিল্প বা মধ্যবিত্ত বৃত্তিগুলির দিকে তাহাদের গতি ক্ষীণ।"

"বাগদি, বাউরি অথবা নমঃ প্রভৃতি জাতি পূর্বেও যেমন অশিক্ষিত ছিল, আজও তেমনই রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে চাষ ও মজুরীতে অধিষ্ঠিতদের সংখ্যা বেশ উচ্চ। তাহাদের মধ্যে মধ্যবিত্তের বৃত্তি অথবা শিল্পের অভিমুখে গতি অতিশয় ক্ষীণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।"

"মোটের উপর বলা চলে যে, ইংরেজী শাসন এবং ধনতন্ত্র বিস্তারের ফল বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। যাহারা পূর্বেও চাকরি করিত, আজও তাহারা চাকরি করিতেছে। যে সকল শিল্প ধনতন্ত্রের আঘাতে পর্যুদস্ত হইয়াছে সেই সকল জাতির মধ্যে পরিবর্তনের মাত্রা বেশি। বিদেশে চামড়া চালান দেওয়ার ফলে মুচির বৃত্তি অনেকাংশে নষ্ট হইয়াছে, তাহারা স্ববৃত্তি খানিক অংশে ত্যাগ করিয়া চাষ বা অন্য শিল্পে মজুরি করিতেছে। বিদেশী ও স্বদেশী মিলের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ায় তাঁতীকে চাষের দিকে ঝুঁকিতে হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাঁতের কাপড়ের বাজার আছে বলিয়া তাহারা স্ববৃত্তি সম্পূর্ণ পরিহার করে নাই। কিন্তু কুমোরের হাঁড়িকুড়ি সস্তা হওয়ায় বিলাতি শিল্পের আঘাতে তাহা আজও বিধ্বস্ত হয় নাই; বহু

কুমোর স্ববৃত্তির দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।" (হিন্দুসমাজের গড়ন : নির্মলকুমার বসু : পৃঃ ১২৫-৩৩)

গ্রামের শাসন-ব্যবস্থা

গ্রামের স্থানীয় শাসন ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা পরিচালিত। উভয় ব্যবস্থাতেই স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের ওপর স্থানীয় শাসন-পরিচালনের দায়িত্ব থাকে।

আহার, বাসস্থান ও পরিচ্ছদ

পশ্চিম বঙ্গের গ্রাম্য সমাজের অধিবাসীদের আহার ও ঘরবাড়ীর উপাদান স্থানীয় পরিবেশ থেকেই সংগৃহীত হয়। ভাত, মাছ, তরকারী বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে বাঁশ-বেত-খড়ের ঘরেই বাঙ্গালীর বাস। কাঠ-টিনের ব্যবহারও প্রচলিত আছে। গরীব লোকেরা তালপাতা দিয়েও ঘরের ছাউনি দিয়ে থাকে।

গ্রামাঞ্চলে পাকা বাড়ীর সংখ্যা কম। ধনীর বাসগৃহ এবং মন্দির বিহার ইত্যাদি নির্মাণে ইটের ব্যবহার বাংলা দেশে বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে।

বাংলা দেশের গৃহনির্মাণ-পদ্ধতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পল্লী অঞ্চলে বাঁশ বা কাঠের খুঁটির ওপর মাটির দেয়াল বা বাঁশের চাঁচারির বেড়ায় ঘেরা দোচালা, চৌচালা, আটচালা প্রভৃতি বাংলা দেশের গৃহনির্মাণ-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

বস্ত্র বিষয়েও বাঙ্গালী স্বাবলম্বী ছিল। আজও বাংলা দেশের তাঁত শিল্প বিখ্যাত। বাংলা দেশে তাঁতে আর মিল-এ যে পরিমাণ কাপড় বোনা হয় সে পরিমাণ সুতো বা সে পরিমাণ সুতোর তুলো উৎপন্ন হয় না। তুলো যে মাটিতে ভাল জন্মায় সে মাটি বাংলা দেশে নেই।

পশ্চিম বঙ্গের আবহাওয়ায় বৎসরের অধিকাংশ সময় গায়ের কোন আচ্ছাদন না হলেও চলে। বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চলে জুতো পরে পথ-চলা যায় না।

প্রাকৃতিক কারণে ও গ্রামবাসীদের দরিদ্রতার জন্যে গ্রামবাসীরা অতি-অল্প পোশাক পরে; তাদের কোমরের ওপর থেকে গায়ের ওপরের দিক খোলা থাকে—পা খালি থাকে। তবে শহুরে, ধনী বা তথাকথিত ভদ্র বাঙ্গালীর সাজ-পোশাকে অনাবশ্যক বাহুল্য আছে বলা চলে। এককালে কিন্তু ভদ্র বাঙ্গালীও দ্বিবস্ত্রই যথেষ্ট মনে করতেন—ধুতি-চাদরই পরতেন। আজও ধুতি-চাদরই বাঙ্গালীর নিজস্ব পোশাক বলে প্ররিচিত।

গ্রাম বাংলার কৃষ্টি

বাংলার গ্রামীণ কৃষ্টি রূপ লাভ করেছে বাংলার গ্রামবাসীদের নানা সৃষ্টিতে। বাংলার গ্রামের শিল্পীর সৃষ্টি দেব-দেবীর মূর্তি ও চাল-চিত্র, পটের ছবি, মাটির সরায় বা কাঠের পীঁড়িতে আঁকা চিত্র, আলপনা প্রভৃতিতে বিচিত্র ও মনোরম রূপ লাভ করেছে।

বাংলার কবিগান, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, বাউল, জারী এবং আরও নানারকম লোকসঙ্গীত বাংলার গ্রামবাসীর মনের অশেষ সম্পদের ও সৃজনী-প্রতিভার বিচিত্র প্রকাশ। ঢাক আর ঢোল বাংলার নিজস্ব বাদ্য।

এক সময় গ্রামবাসী বাঙ্গালী অবসর-বিনোদন করত তাস, পাশা, দাবা খেলে আর দশে মিলে সন্ধ্যেবেলায় খোল বাজিয়ে কীর্তন করে। তখন সামাজিক আমোদ-প্রমোদ ও শিক্ষার বাহন ছিল যাত্রা ও কবিগান, গৌর-লীলা বা কৃষ্ণলীলা কীর্তন, কথকঠাকুরের মুখে পুরাণ পাঠ ও কথকতা।

গ্রামে গ্রামে লাঠি খেলা, হাডুডু খেলা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। বছরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন কোন গ্রামে ষাঁড়ের দৌড়, মুরগীর লড়াই প্রভৃতি হত।

আজ বাংলার গ্রাম্য সমাজে এ সমস্ত প্রায় লোপ পেতে বসেছে। গ্রামের সমাজের অবস্থা বদলেছে ও বদলাচ্ছে, কালের প্রভাবে মানুষের রুচি বদলেছে এবং এ পরিবর্তন স্বাভাবিক বলেই মেনে নিতে হয়। আজকে গ্রাম্য সমাজে একটা পরিবর্তনের যুগ চলছে। পুরনো যা তা গেছে, তবে মৃত প্রাচীন থেকে নবীন এখনও জন্ম নেয় নি। এখনকার অবস্থা ফসল-তোলা ক্ষেতের মত—

পুরনো ফসল উঠে গেছে কিন্তু নতুন বীজের অঙ্কুর-উদ্‌গম এখনও হয় নি। তবে আশা করা যায় যে, কালের উপযোগী নতুন গ্রাম আর গ্রামীণ সমাজ অদূর ভবিষ্যতেই আবার গড়ে উঠবে।

পশ্চিম বাংলায় শহর

আগেই বলা হয়েছে যে পশ্চিম বাংলায় ১১৪টি শহর আছে এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ জন শহরে বাস করে।

যে সমস্ত জায়গায় পৌর-ব্যবস্থার পরিচালক মিউনিসিপ্যালিটি সেই সমস্ত জায়গাকে **শহর** বলা হয়।

পশ্চিম বাংলার শহরগুলোকে মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে : **আবাসিক, শিল্পপ্রধান, খনিপ্রধান** ও **বাণিজ্যপ্রধান**।

আবাসিক শহরগুলোর অধিকাংশ গড়ে উঠেছে সরকারী দপ্তরকে কেন্দ্র করে। জেলা বা মহকুমা দপ্তর যেখানে যেখানে রয়েছে সেই সমস্ত জায়গার প্রায় সবগুলোই শহর।

শিল্পপ্রধান শহরগুলো গড়ে উঠেছে কোন শিল্পকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে। পশ্চিম বাংলায় শিল্পপ্রধান শহর তেত্রিশটি। এগুলোর মধ্যে অধিকাংশই গড়ে উঠেছে কলকাতার চারধারে, হুগলী নদীর দুই তীরে।

ক্যানিং ও ধুলিয়ানে বাণিজ্য ও জাহাজ-চলাচল উপলক্ষে শহর গড়ে উঠেছে। মেমারী, সাঁইথিয়া, দুবরাজপুর ও হিলীতে শহর গড়ে উঠেছে চালের কলকে কেন্দ্র করে। আসানসোল, অণ্ডাল, খড়্গপুর, কাঁচড়াপাড়া আর শিলিগুড়ি প্রধানতঃ রেলওয়ে শহর। তবে অণ্ডালে কয়লা শিল্প, কাঁচড়াপাড়ায় পাট শিল্প ও শিলিগুড়িতে কাঠ-চেরার কলকারখানা আছে।

বরাকর, দিশেরগড় ও নিয়ামৎপুর খনিপ্রধান শহর।

শিল্পাঞ্চল

পশ্চিম বাংলার শিল্পগুলি চারটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থিত : (১) হুগলী-হাওড়া অঞ্চল, (২) ব্যারাকপুর-কলকাতা-বজবজ অঞ্চল, (৩) আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চল, (৪) দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি অঞ্চল।

হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে **হুগলী-হাওড়া অঞ্চল**। এ অঞ্চলে বহু পাটকল কাপড়ের কল আর চালের কল আছে; নানারকম শিল্পও গড়ে উঠেছে। হাওড়া, শিবপুর, বালী, উত্তরপাড়া, বঁ্যাটরা, বাউড়িয়া, শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়া এ-অঞ্চলের প্রধান শিল্পকেন্দ্র। উত্তরপাড়ায় মোটর গাড়ী তৈরীর এক বিরাট কারখানা গড়ে উঠেছে।

ব্যারাকপুর-কলকাতা-বজবজ অঞ্চল হুগলী নদীর পূর্বতীরে। পাটকল, কাপড়ের কল, কাগজের কল, দিয়াশলাইয়ের কারখানা, চীনামাটির কারখানা, জুতোর কারখানা ও নানা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এ অঞ্চলে রয়েছে। কলকাতা, বরাহনগর, বেলঘরিয়া, টিটাগড়, নৈহাটি, হালিসহর, মেটিয়াবুরুজ, বাটানগর, বেহালা, বজবজ প্রভৃতি এ-অঞ্চলের প্রধান শিল্পকেন্দ্র। বাটানগর বাটার জুতোর কারখানার জন্যে প্রসিদ্ধ।

আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চল (বর্ধমান জেলা) কয়লা-খনি অঞ্চল। এ অঞ্চলে যত কয়লা পাওয়া যায় ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এত কয়লা পাওয়া যায় না। এ অঞ্চলের খনি থেকে প্রথম কয়লা তোলা সুরু হয় ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে। এ অঞ্চলের কয়লা আসানসোল থেকে বিভিন্ন জায়গায় চালান যায়।

কলকারখানা চালাতে কয়লা লাগে। তাই, যেখানে সস্তায় কয়লা পাওয়া যায় সেখানেই নানা শিল্প গড়ে ওঠে আর তাই এ অঞ্চলের কয়লা-খনিকে কেন্দ্র করে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, চীনামাটি ও সাইকেল তৈরীর কারখানা গড়ে উঠেছে। বার্ণপুর, কুলটি ও বরাকর লোহার কারখানার জন্যে বিখ্যাত। বার্ণপুরে লোহা আর ইস্পাতের কারখানা, **স্টীল কর্পোরেশন অফ বেঙ্গল,** অবস্থিত। কুলটি ও বরাকরে রয়েছে **ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীর** লোহা আর ইস্পাতের কারখানা।

আধুনিক শিল্পনগরী চিত্তরঞ্জন

আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কিছুদিন হল এক আধুনিক শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে এই নগরীর নামকরণ করা হয়েছে **চিত্তরঞ্জন**।

এখানে সরকারী রেল ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এতদিন আমাদের দেশের বহু টাকা রেলওয়ে-ইঞ্জিন কিনতে বিদেশে চলে যেত। সেই টাকা দেশে রাখতে ও সেই টাকায় অন্যান্য অধিকতর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে দেশে ইঞ্জিন তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৫০ খৃস্টাব্দ থেকে চিত্তরঞ্জনে ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে। ১৯৫০-৫১য় সাতখানা ইঞ্জিন তৈরী হয়। এখানকার কারখানার কাজ দ্রুত ও সন্তোষজনকভাবেই অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৫৫-এর এপ্রিল থেকে ১৯৫৬-এর ফেব্রুয়ারী—এই সময়ের মধ্যে এই কারখানায় ১১৭ খানা ইঞ্জিন তৈরী হয়েছে। কিন্তু একদিকে যেমন ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি ভারতে নতুন নতুন রেললাইন বসান হচ্ছে। তাই, আমাদের দেশে এখনও কিছু ইঞ্জিন আমদানী করতে হয়। আশা করা যাচ্ছে যে শীঘ্রই সে প্রয়োজন আর থাকবে না।

আধুনিক সুপরিকল্পিত শিল্পনগরীর জন্যে অনেক ভেবে চিন্তে স্থান নির্বাচন করা হয়। এমন স্থান নির্বাচন করা হয় যেখানে কারখানার বাড়ীঘর ও কর্মীদের বাসস্থান-ব্যবস্থার জন্যে যথেষ্ট স্থানের অভাব হবে না। সেখানকার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য আর চলাচলের সুবিধের দিকে লক্ষ্য রেখে নগরপত্তন করা হয়। এইরকম নগরীতে স্কুল, হাসপাতাল, খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের জায়গা নির্দিষ্ট করা থাকে। কারখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে; তাই নগরপত্তনের সময় সেই বাড়তি জনসংখ্যার জন্যেও ব্যবস্থা থাকে। পরিচ্ছন্ন পথঘাট, বাজার, জল, আলো প্রভৃতির ব্যবস্থায় সুপরিকল্পিত শিল্পনগরীর জীবন সহজ ও সুস্থ থাকে।

কোন আবাসিক স্থান বা শহরে কালক্রমে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে পূর্বপরিকল্পনার অভাবে সেই শহরের ব্যবস্থায় নানা সমস্যা দেখা দেয়। হাওড়া শহরের বিভিন্ন সমস্যা এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। কলকাতার খুব কাছে, গঙ্গার ধারে অবস্থিত এই শহরের শিল্প-সম্ভাবনা থাকায় কালক্রমে এই আবাসিক শহর শিল্পপ্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু শহর পত্তনের সময় কোন পরিকল্পনা ছিল না বা সে-কালে পরিকল্পনা সম্ভব ছিল না। পরিকল্পনার

অভাবে আজ এখানে তাই নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং মোটের ওপর এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে উঠেছে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে আজ সেখানে তাই নানা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হচ্ছে।

দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি অঞ্চলে কাঠ ও চা-শিল্প বিখ্যাত। এ অঞ্চল প্রধানতঃ চা-শিল্পের কেন্দ্র।

চা-শিল্প

সাধারণতঃ আমরা শিল্প বলতে যা বুঝি চা-শিল্প কিন্তু তা থেকে অনেকাংশে পৃথক। চা-শিল্পে (চায়ের গাছ জন্মান থেকে সুরু করে চায়ের পাতা গরম জলে ভিজিয়ে আমরা যে চা তৈরী করে পান করি চা-গাছের পাতার সেই রূপান্তর পর্যন্ত) কলের চেয়ে হাতই বেশী ব্যবহৃত হয়। আর, চা-র বাগিচা তৈরী আর গাছ জন্মান কৃষিকাজের অন্তর্গত বলা যেতে পারে।

যথেষ্ট বৃষ্টি হয় কিন্তু জল জমে না এমন ঢালু জায়গায় চা জন্মায়। পশ্চিম বাংলার যে অঞ্চলে চা জন্মায় সেই অঞ্চলের এ বৈশিষ্ট্য আছে। জলপাইগুড়ি জেলায় ১৫৮টি ও দার্জিলিং জেলায় ১৩৮টি চা-বাগান আছে। জলপাইগুড়ির চা-বাগানগুলোতে ১৭৬১৯৬ জন ও দার্জিলিং-এর চা-বাগানগুলোতে ৬৯৫৯০ জন মজুর কাজ করে।

এক কালে চা-বাগানের মজুরদের অতি অল্প বেতনে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে হত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দালাল মারফত মজুর সংগ্রহ করা হত। বর্তমানে মজুর-সংগ্রহ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে ও মজুরী বেড়েছে এবং বাসস্থান প্রভৃতিরও অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। সরকার, মালিক আর মজুর এই তিন পক্ষের প্রতিনিধিদের আলাপ-আলোচনা মারফত চা-বাগানের নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এখন চলছে।

অনেকদিন আগে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যারা মজুরী করতে এসেছিল তাদের অনেকেই চা-বাগানগুলোর চার ধারে বসতি স্থাপন করেছে—কেউ কেউ জায়গাজমি কিনে কৃষিকাজ সুরু করেছে।

চা-বাগানের কোন কোন কাজ বিশেষ শ্রমসাধ্য নয় বলে চা-বাগানে

স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকাও কাজ করতে পারে, করেও। বছরের সব সময় চা-বাগানে কাজের চাপ সমান থাকে না। কখনও বা অতি অল্প মজুরে কাজ চলে আবার কখনও অনেক মজুর নিয়োগ করতে হয়। এই জন্যে চা-বাগানে স্থায়ী আর অস্থায়ী দু' রকমের মজুর আছে।

পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ চা-বাগানের মালিকানা কিন্তু বিদেশীদের।

শিল্পে নিযুক্ত মূলধন ও শ্রম

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্পর্কে লক্ষণীয় বিষয় এই যে এখানে এত দারিদ্র্য ও বেকারী থাকা সত্ত্বেও এখানকার শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে অবাঙ্গালীর সংখ্যা বাঙ্গালীর সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী এবং এখানকার শিল্পসমূহের মূলধনের অধিকাংশও বিদেশ থেকে এসেছে। বিদেশী শাসনের আমলে এখানকার শিল্পসমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শাসনের সঙ্গে শোষণ চালাবার জন্যে বিদেশী শিল্পপতিরা এদেশে মূলধন নিয়োগ করে।

শিল্পে বাঙ্গালী শ্রমিকের সংখ্যাল্পতার কারণ

বাঙ্গালী শ্রমিকের সংখ্যাল্পতা সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেক নেতারও ধারণা যে বাঙ্গালী শ্রমবিমুখ বলে কলকারখানায় যায় না এবং বাংলার কৃষি-সম্পদের জন্যেও বাঙ্গালী কলকারখানার কাজ পছন্দ করে না।

কিন্তু কৃষিসম্পদ বাংলার যে আজ আর নেই তা একটু গভীরভাবে ভাবলেই বোঝা যায়। আসল কথা হচ্ছে, বাঙ্গালী তার জাতীয় প্রতিভা অনুসারেই কলের মজুরী পছন্দ করে না। কলের শ্রমিক কোন জিনিসের অংশবিশেষ মাত্র তৈরীর একঘেয়ে কাজ করে। নিজের পরিকল্পনা, সূক্ষ্ম বুদ্ধি বা নিপুণতা তার প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালী কারিগর দীর্ঘকাল থেকে পরিকল্পনা, রুচিবোধ ও হাতের কাজের নিপুণতার জন্যে বিখ্যাত। কিন্তু কলের কাজে এর কোনটারই প্রয়োগের সুযোগ নেই। তাই বাঙ্গালী কারখানার শ্রমিক হতে চায় না, গৃহ-পরিবেশে স্বেচ্ছাধীন কারিগর হতে চায়। এ ছাড়া, কলকারখানায় বাঙ্গালী শ্রমিকের সংখ্যাল্পতার অন্য একটা কারণ তার ক্ষীণ স্বাস্থ্য।

শহরে জনসংখ্যাবৃদ্ধি

পশ্চিম বাংলায় অতি অল্পসংখ্যক আবাসিক শহর ছাড়া, অন্য সমস্ত শহরে জনসংখ্যা বাড়ছে। যে যে জায়গায় লোকসংখ্যা কমেছে সেই সেই জায়গায় জীবিকার্জনের সুযোগ কমে গেছে, কারণ পুরনো যে উৎপাদন-ব্যবস্থা সে সমস্ত জায়গায় ছিল আধুনিক কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে-উৎপাদন-ব্যবস্থা আর নেই এবং সেই সমস্ত স্থানের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গেছে। শহরে জনসংখ্যা বাড়ার কারণ গ্রাম্য সমাজের আর্থিক বুনিয়াদ নষ্ট হয়ে যাওয়া। গ্রামের বিশাল জনসংখ্যা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি-কর্মের জন্যে যত লোক দরকার তার চেয়ে বেশী লোক গ্রামে আছে। তাই তাদের কিছু অংশও জীবিকার অন্বেষণে শহরে ভিড় বাড়াচ্ছে। শহরের জীবনের মোহও কিছু লোককে শহরে টেনে আনে।

গ্রাম ও শহরের সম্বন্ধ

শহরবাসীদের উপজীবিকা চাকরী, মজুরী আর ব্যবসা-বাণিজ্য। গ্রামাঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। গ্রামের চাষীরা খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে, তাদের উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রী করে। শহরে শিল্পজাত জিনিসপত্র তৈরী হয়। গ্রামবাসীরা জামা-কাপড়, থালাবাসন ও অন্যান্য নানারকম শিল্পজাত দ্রব্যের জন্যে শহরের ওপর নির্ভরশীল। গ্রামের উদ্বৃত্ত কর্মক্ষম জনসংখ্যা সাধারণতঃ শিল্পাঞ্চলে নিযুক্ত হয়। এইভাবে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল গ্রাম ও শহর পাশাপাশি বেড়ে ওঠে।

কিন্তু পশ্চিম বাংলায় গ্রাম আর শহর মিলে এক সমৃদ্ধ স্বয়ংপূর্ণ সমাজ গড়ে ওঠে নি। এত ছোট রাজ্যে পাঁচটি শিল্পপ্রধান জেলা থাকা সত্ত্বেও এখানকার কৃষি-ঘাটতি (অর্থ বা কর্ম সংস্থান প্রভৃতি যে কোন দিক থেকেই) পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। শহর আর গ্রাম পরস্পরের অভাব সম্পূরণ করতে পারছে না। যে কোন দিক থেকে দেখতে গেলে, কৃষক শ্রমিক আর মধ্যবিত্তের জীবন-

যাত্রার মান অতি নীচু ; বেকারের সংখ্যা ভয়াবহ রকমে বেশী। শিক্ষিতের হার খুবই কম। শিক্ষিতের হার নীচে দেওয়া গেল :

(১) শিক্ষিতের হার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪·৫
- পুরুষ ৩৪·৭
- স্ত্রীলোক ১২·৭

(২) গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের হার—শতকরা ১৭·৭
- পুরুষ ২৮·১
- স্ত্রীলোক—৬·৭

(৪) শহরাঞ্চলে শিক্ষিতের হার—শতকরা ৪৫·২
- পুরুষ— ৫১·৮
- স্ত্রীলোক—৩৫·৪

কলিকাতা মহানগরী

পশ্চিম বাংলার প্রধান শহর **কলিকাতা**, চলতি কথায় **কলকাতা**। ইংরেজ রাজত্বে এ শহর গড়ে উঠলেও ভারতের অন্যান্য শহরকে এর মধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে। লোকসংখ্যায় ভারতের শহরগুলোর মধ্যে এর স্থান প্রথম, এশিয়ার শহরগুলোর মধ্যে চতুর্থ. এবং পৃথিবীর শহরগুলোর মধ্যে পঞ্চদশ। কলকাতার আয়তন ৩২·৩২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২৫৪৮৬৭৭। প্রতি বর্গমাইলে এখানে ৭৮৮৫৮ জন লোক বাস করে।

পশ্চাৎপট

কলকাতা শহরের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় কয়েকটা গ্রাম মিলে কী করে একটা শহর গড়ে ওঠে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সরস্বতী নদী মজে যাওয়ায় সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁর প্রাচীন বন্দর নষ্ট হয়ে যায় এবং ক্রমে হুগলী এক প্রধান বন্দর হয়ে ওঠে। হুগলীর নাম অনুসারেই পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় নাবিকেরা গঙ্গার নাম রাখে হুগলী। সে সময়ে ভাগীরথীর তীরে

ছত্রলুট বা ছাতানুট (পরে সুতানুটি), কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। এই তিন গ্রামের উত্তরে চিত্রপুর (এখনকার চিৎপুর) ও দক্ষিণে ভবানীপুর ও কালীঘাট গড়ে ওঠে। আদিগঙ্গা তখন পূর্বদিকে সরে এসেছে এবং ছোট হয়ে গিয়েছে। কয়েকটা খাল তখনও গঙ্গাকে পূর্বদিকের জলার সঙ্গে যুক্ত রেখেছিল। এই খালগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তর দিকে চিৎপুরের এবং মধ্যস্থ আর একটি খাল——এখনকার ধর্মতলা স্ট্রীটের উত্তর দিকে—প্রধান ছিল। এই দুটি খালের মাঝখানে আর একটি ছোট খাল (এখন যেখানে সার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রীট) ছিল। প্রথম খালটির উত্তরে চিত্রপুর, প্রথম ও দ্বিতীয় খালের মধ্যে ছাতানুট এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খালের মধ্যে কলিকাতা গ্রাম অবস্থিত ছিল। গোবিন্দপুর ছিল তৃতীয় খালটির দক্ষিণে।

এইরকম সময়ে ইংরেজরা কলকাতায় আসে। হুগলীতে শহর প্রতিষ্ঠার বিশেষ সুবিধে না দেখে ইংরেজ কুঠিয়াল জব চার্নক এই অঞ্চলকে শহর প্রতিষ্ঠার জন্যে পছন্দ করেন। সাতগাঁর বসাক আর শেঠেরা আগেই এ অঞ্চলে সুতো আর সুতোর কাপড়ের হাট বসিয়েছিল। তারা পর্তুগীজ বণিকদের দৃষ্টি এ অঞ্চলের দিকে আকর্ষণ করেছিল। পর্তুগীজরা এদিকে মন দেয় নি। কিন্তু ইংরেজের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হল। ১৬৯৮ খৃস্টাব্দে চার্নক এই তিনখানি গ্রাম কেনার অনুমতি নিলেন হুগলীর গভর্নরের কাছ থেকে এবং স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে ১৩০০৲ টাকা দিয়ে তিনখানা গ্রাম কিনলেন। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণ এর আগেই আরম্ভ হয়েছিল। ১৭০২ খৃস্টাব্দ নাগাদ দুর্গটি সুদৃঢ় করা হয়।

দুর্গের দক্ষিণে ইংরেজরা প্রথমে কুঠী নির্মাণ করে। তার চারদিক ঘিরে ইংরেজ, পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ আর আর্মেনিয়ানরা বসবাস শুরু করে। ভারতীয়েরা ঐ অঞ্চলে থাকতে পেত না। তারা থাকত ঐ অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণে।

যে তিনটি গ্রাম নিয়ে বর্তমান কলকাতা শহরের পত্তন তারই একটি

গ্রামের নাম অনুসারে শহরের বর্তমান নাম **কলিকাতা** (অপভ্রংশ **কলকাতা**) হয়। এই নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। বর্তমানে এই নামের ব্যুৎপত্তি নির্ধারিত হয়েছে। "কলিকাতা একটি খাঁটি বাংলা শব্দ। ইহার অর্থ 'কলি' বা কলিচূণের জন্য 'কাতা' বা শামুক-পোড়া। সূতার নুটি বা গোলার হাট বা আড়ত হইতে যেমন 'সূতানুটি' নাম, তেমান কলির বা চূণের ও কলিচূণের জন্য শামুকের আড়ত, এবং চূণের কারখানা হইতে 'কলিকাতা' নাম।"

কলকাতার ক্রমোন্নতি

ভৌগোলিক অবস্থানই কলকাতার দ্রুত উন্নতির প্রধান কারণ। কলকাতা গাঙ্গেয় উপত্যকার দ্বারস্বরূপ। তাই ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য যতই বাড়তে লাগল কলকাতার শ্রীবৃদ্ধিও ততই হতে লাগল। কালক্রমে কলকাতা পৃথিবীর অন্যতম শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বহু লোক জীবিকার অন্বেষণে কলকাতায় বাস করতে লাগল এবং গড়ে উঠল আধুনিক কলকাতা। ইংরেজ আমলে ১৯১১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। ১৯১২ খৃস্টাব্দে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু কলকাতার গৌরব বা গুরুত্ব তাতে একটুও কমে নি। ব্যবসা-বাণিজ্যই কলকাতার শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ।

শিল্প-বাণিজ্য

কলকাতা বন্দরে কোটি কোটি টাকার মাল আমদানী-রপ্তানী হয়। এই সব মাল লেনদেনের জন্যে এখানে বহু বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক আছে। ভারতের প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় মূলধনের প্রাচুর্য দেখা দেয় এবং শহরবাসী লক্ষ লক্ষ লোকের চাহিদা মেটাবার জন্যে শহর ও শহরতলীতে বিভিন্ন কারিগরী শিল্প গড়ে ওঠে। কলকাতায় যন্ত্রশিল্প ও কুটিরশিল্প দুইই দেখা যায়। যন্ত্রশিল্পের মধ্যে শহরতলীতে চটকল, পাটকল, কাপড়ের কল, চাল

ময়দা ও তেলের কল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং আগ্নেয় অস্ত্র তৈরীর কারখানা, সাবান দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা এবং শহরের মধ্যে ছাপাখানা, মোটর মেরামত ও নানাপ্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রধান। কলকাতায় যত ছাপাখানা আছে ভারতের অন্য কোন শহরে এত ছাপাখানা নেই। কুটিরশিল্পের মধ্যে কামারশালা, জুতো তৈরী ও বিড়ি তৈরীর ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

পরিবহন-ব্যবস্থা

কলকাতার পূর্ব ও পশ্চিম দিকে যথাক্রমে শিয়ালদহ ও হাওড়া রেলস্টেশন। হাওড়া স্টেশন ও কলকাতা শহরের মধ্যে গঙ্গা নদী। গঙ্গার ওপর এক অতি আধুনিক পুল তৈরী করে হাওড়া স্টেশনের সঙ্গে শহরকে যুক্ত করা হয়েছে। যাত্রী-চলাচলের জন্যে কলকাতার রাস্তায় অসংখ্য ট্যাক্সি, ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম ও মোটর বাস রয়েছে; তাছাড়া ঘোড়ার গাড়ী ও মানুষে-টানা রিক্‌শও আছে (আমাদের দেশের প্রধানতম শহরে মানুষে-টানা রিক্‌শ এতদিনে উঠে যাওয়া উচিত ছিল)। মালপত্র বহন করার জন্যে মোটর লরী এবং গরু বা মহিষের গাড়ী আছে। (তবে দুঃখের কথা, আজও কলকাতার রাস্তায় মাল-বোঝাই গাড়ী মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে দেখা যায়।) জলপথ, রেলপথ ও বিমানপথে এ শহর ভারতের বিভিন্ন অংশ ও বহির্জগতের সঙ্গে যুক্ত।

অধিবাসী ও ভাষা

কলকাতার জনসংখ্যার শতকরা ৪৫·৫ জন বাঙ্গালী এবং ৫৪·৫ জন বহিরাগত। ভারতের প্রত্যেক অংশের লোক তো এখানে আছেই। তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সভ্য জাতির লোক এ শহরে আছে। এই শহরের লোকদের মধ্যে ৮০টি ভাষায় কথাবার্তা চলে।

গৃহসমস্যা

আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যধিক হওয়াতে গৃহসমস্যা কলকাতার এক প্রধান সমস্যা। এখানকার এক-চতুর্থাংশ লোক বস্তিতে

বাস করে। এই সমস্ত বস্তির অবস্থা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। কলকাতায় প্রতি বাসকক্ষে গড়পড়তায় ৩·৬ জন লোক বাস করে।

উপজীবিকা

কলকাতার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা তিনটি—ব্যবসায়, চাকরী বা শ্রমিকগিরি ও লোকের বাড়ী চাকর-ঠাকুর প্রভৃতির কাজ।

পৌরশাসন-ব্যবস্থা

কলকাতার পৌরশাসনব্যবস্থা কলকাতার **কর্পোরেশন** বা পৌরসঙ্ঘের হাতে। অন্যান্য শহরে মিউনিসিপ্যালিটি এবং প্রেসিডেন্সী শহরগুলোতে কর্পোরেশন বাসিন্দাদের প্রায় সব রকমের স্থবিধার ব্যবস্থা করে। রাস্তা তৈরী করা, রাস্তার যত্ন নেওয়া, রাস্তায় জল আর আলো দেওয়া, পার্ক খেলার মাঠ প্রভৃতি তৈরী করা ও সে-সবের যত্ন নেওয়া পৌরসঙ্ঘের কর্তব্য। জনস্বাস্থ্য-রক্ষা পৌরসঙ্ঘের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। সেই উদ্দেশ্যে সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, শহরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা প্রভৃতি পৌরসঙ্ঘের অবশ্যকরণীয়। শিক্ষার ব্যবস্থা করা পৌরসঙ্ঘের অপর এক প্রধান কর্তব্য। শ্মশান বা কবরভূমি নির্দিষ্ট করে রাখা, সেগুলো দেখাশুনো করা, জন্মমৃত্যুর হিসেব রাখা, বাড়ীঘর তৈরীর পরিকল্পনা অনুমোদন করা, বাটখারার ওজন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করাও পৌরসঙ্ঘের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

কলকাতার কর্পোরেশন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পৌরসঙ্ঘ। এই সঙ্ঘে মোট সভ্যসংখ্যা ৮১ : তার মধ্যে ৭৬ জন কাউন্সিলার এবং ৫ জন অল্ডারম্যান। কাউন্সিলারদের ৭৫ জনকে অধিবাসীরা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে এবং অপর একজন হলেন কলকাতার ইম্প্রভ্মেণ্ট ট্রাস্ট (Improvement Trust)-এর সভাপতি [কলকাতার রাস্তাঘাট সংস্কারের প্রয়োজনে ১৯১১ খৃস্টাব্দে সরকার এই Improvement Trust গঠন করেন]। কাউন্সিলাররা

দামোদর পরিকল্পনা



তিলৈয়া
বরাকর নং
জি. টি. রোড
চিত্তরঞ্জন
মাইথন
কোনার
বোকারো
দামোদর নং
পাঞ্চেৎ পর্বত
দুর্গাপুর ব্যারেজ
TAR

অল্ডারম্যানদের নির্বাচিত করেন। প্রতি তিন বছর অন্তর কর্পোরেশন-এর নির্বাচন হয়।

বাড়ীর বা বস্তির মালিক যারা, যারা কর্পোরেশনকে রেণ্ট ট্যাক্স আর লাইসেন্স ফী (এ সমস্তই কর্পোরেশন-এর আয়ের পথ) দেয়, যারা অন্ততঃ আট টাকা মাসিক বাড়ীভাড়া দেয়, যারা স্কুল ফাইন্যাল বা অনুরূপ পরীক্ষা পাশ করেছে—মাত্র এই সমস্ত শ্রেণীর প্রাপ্তবয়স্ক (২১ বছরের কম বয়স নয় এমন) ব্যক্তিরা কর্পোরেশন-এর নির্বাচনে ভোট দিতে পারে।

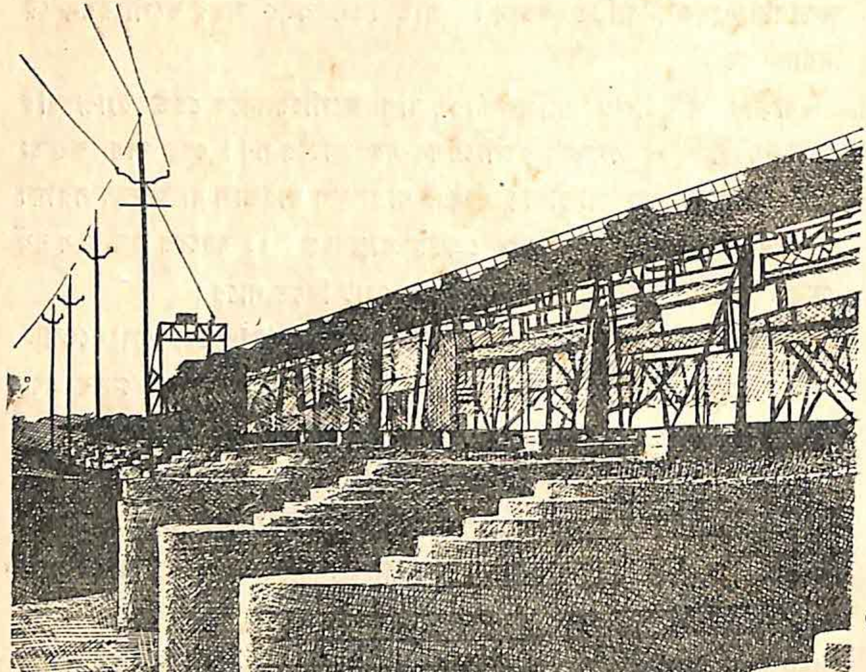
বছরের প্রথম সভায় পৌরসঙ্ঘের সভ্যেরা মেয়র (Mayor) এবং ডেপুটি মেয়র (Deputy Mayor) নির্বাচিত করেন। পৌরসঙ্ঘের সভায় মেয়র এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়র সভাপতিত্ব করেন।

মেয়র আর ডেপুটি মেয়র ছাড়াও কর্পোরেশন-এর কাজের তত্ত্বাবধানের জন্যে কমিশনার (Commissioner) নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছেন। Public Service Commission-এর সুপারিশ অনুসারে রাজ্যসরকার এই পদে লোক নিয়োগ করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কাজের তদারকের জন্য বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি (Standing Commitee) আছে।

দামোদর উপত্যকা উন্নয়ণ পরিকল্পনা

দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে পশ্চিম বাংলায় অশেষ সম্ভাবনাময় এক নতুন অঞ্চল গড়ে উঠছে।

ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমি দামোদর নদের উৎপত্তিস্থল। বিহার ও পশ্চিম বাংলার মধ্য দিয়ে ৩৩৬ মাইল পথ অতিক্রম করে দামোদর মিলেছে হুগলী নদীর সঙ্গে কলকাতা থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে। দামোদরের দুই উপনদী—কোনার আর বরাকর। গ্রীষ্মে দামোদর "আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে", কিন্তু বর্ষায় সে রুদ্রমূর্তি ধরে মাঠ-ঘাট-গ্রাম প্লাবিত করে। ১৯৪৩-এ দামোদরে এক ভীষণ বন্যা দেখা দেয়। তখন দামোদর-কে বশে



আনবার প্রস্তাব হয় এবং দামোদর উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হয়। কিন্তু সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ সুরু হয় স্বাধীনতা লাভের পর। এই পরিকল্পনাকে কার্যে রূপান্তরিত করার ভার দেওয়া হয়েছে **দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন** (Damodar Valley Corporation—সংক্ষেপে D. V. C) নামে এক প্রতিষ্ঠানের উপর।

এই পরিকল্পনাটি **বহু-উদ্দেশ্য-সাধক**। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বনসৃষ্টি, ভূমির ক্ষয়নিবারণ ও সারাবছর নৌ-চলাচল ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে **তিলাইয়া, কোনার, মাইথন** ও **পাঞ্চেৎ** পাহাড়ে (এগুলি বিহার-এর অন্তর্গত) চারটি বড় বড় বাঁধ (dam) নির্মাণ করা হবে। প্রত্যেক বাঁধের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে একটি করে **জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র**। বোকারোতে এক বিশাল **তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র** স্থাপন করা হবে। ৮০০ মাইল দীর্ঘ বিদ্যুৎসঞ্চালন-ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎগ্রহণ ও সঞ্চালনের জন্যে আবশ্যক বহু উপকেন্দ্র (sub-station) স্থাপিত হবে। সেচের জল নিয়ন্ত্রণের জন্যে **দুর্গাপুরে** (বর্ধমান জেলা) একটি আড়-বাঁধ (barrage) নির্মাণ ও খাল খনন করা হবে। প্রধান খালের মধ্যে একটি নৌ-চলাচলের যোগ্য হবে। খাল ও তার শাখা-প্রশাখা প্রভৃতির মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৫৫০ মাইল।

দামোদর উপত্যকা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে প্রকৃতির দান অপরিমিত। দামোদর উপত্যকায় খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য অতুলনীয়। সস্তা বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ফলে এ অঞ্চলে গড়ে উঠবে ধাতু, রসায়ন, কাঁচ এবং আরও নানা ধরণের শিল্প।

দামোদরের নিম্ন অববাহিকা ভারতবর্ষের উর্বরতম অঞ্চলের অন্যতম। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের জলের সুলভতার ফলে এ অঞ্চলে ৫৬ লক্ষ মণ ধান ও ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মণ অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়বে। এ অঞ্চলে বাড়তি পাটের মূল্য হবে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, এবং উৎপন্ন বিদ্যুতের মূল্য হবে ৬ কোটি টাকা।

তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেৎ পাহাড়ের বাঁধ এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে এই সমস্ত বাঁধের জল দুর্গাপুরের আড়-বাঁধের মাধ্যমে বণ্টন করা হবে। দুর্গাপুরের খাল ও শাখা খালের সাহায্যে দামোদরের নিম্ন উপত্যকার ১৩৪৩৭৬২ একর জমিতে সেচের জল জোগান দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

দুর্গাপুরের বাঁধের দৈর্ঘ্য ২২৭১ ফিট্। দামোদরের দু পাশে দুটি মূল খাল ও বহু শাখা খাল থাকবে। বাম তীরের মূল খাল (৮৫ মাইল) মিলবে হুগলী নদীর সঙ্গে। সারা বছরই এ খালে নৌকো চলতে পারবে। বহু মালপত্র এই পথে পরিবাহিত হবে। কলকাতার ৩০ মাইল উজানে খালটি হুগলী নদীর সঙ্গে মেশাতে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের সঙ্গে কলকাতা জলপথে সংযুক্ত হবে।

মুখ্য উদ্দেশ্যগুলির সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পতিত জমি উদ্ধার, ম্যালেরিয়া নিবারণ, মৎস্য চাষ ও ছোটখাট শিল্পের সম্প্রসারণ ইত্যাদি হবে। ছোটখাট শিল্প ও কুটিরশিল্প গড়ে তোলার জন্যে স্থানীয় লোকদের মনে প্রেরণা জোগাতে নানা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। তিলাইয়াতে **তালার কারখানা** আছে। হাতে তৈরী জিনিস **পালিশ করবার কারখানা** খোলা হয়েছে মাইথনে। বর্ধমানে এক **ঠাণ্ডা গুদাম** (cold storage) নির্মাণ করা হয়েছে।

কলকাতা, বর্ধমান, কুলটি, চিত্তরঞ্জন, আসানসোল, খড়গপুর, শক্তিগড়, মেমারি, পানাগড়, দুর্গাপুর, হিজলি, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি শহরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে বা করবে।

পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেলা দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে লাভবান হবে এবং এ রাজ্যে এক নতুন সমৃদ্ধ অঞ্চল গড়ে উঠবে।

সংযোজন

[১] পশ্চিমবংগ

কৃষি

পশ্চিমবংগ কৃষিপ্রধান দেশ। ধান ও পাট পশ্চিমবংগের, বিশেষতঃ পশ্চিমবংগের দক্ষিণাংশের, প্রধান কৃষিজ দ্রব্য।

ধান—ধান জন্মাবার জন্যে প্রচুর তাপ ও জলের প্রয়োজন। তাই যে সব অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সেই সব অঞ্চলে যথেষ্ট ধান জন্মে। অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার জন্যে দক্ষিণবংগে প্রচুর ধান হয়। সারা পশ্চিমবংগের আবাদী জমির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে ধানের চাষ হয়।

পশ্চিমবংগে তিনরকম ধান হয়ঃ আমন, বোরো আর আউশ। আমন ধানের বীজ বর্ষায় বোনা হয়। প্রথম এক জায়গায় চারা জন্মান হয়, তারপর চারা ৫।৬ ইঞ্চি বড় হলে সেগুলোকে তুলে বিস্তীর্ণতর চষা ক্ষেতে লাগান হয়। বর্ষার সংগে সংগে চারাগুলো বাড়তে থাকে। শীতকালে আমন ধান পাকে। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে চাষীরা আমন ধান কেটে ঘরে তোলে।

ধানের মধ্যে আমনই সর্বোৎকৃষ্ট, তাই আমনের চাষ অন্য দু'রকম ধানের চাষের চেয়ে বহুগুণ বেশি। পশ্চিমবংগের আবাদী জমির শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ জমিতে আমন ধানের চাষ হয়।

বোরো নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধান। সারা বর্ষা জলে ডুবে থাকে এবং শীতে শুকোয় এমন জমিতে বোরো ধান বোনা হয়।

আউশ ধান কালবৈশাখীর শেষে বোনা হয় আর ভাদ্র-আশ্বিন মাসে কাটা হয়। আমনের তুলনায় আউশ নিকৃষ্ট ধান।

ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই কম-বেশি ধান জন্মে। তা' ছাড়া চীন, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কোরিয়া, ব্রেজিল, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও ইটালিতেও ধান জন্মে।

পশ্চিমবংগে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধান জন্মে এবং তার বেশির ভাগ জন্মে দক্ষিণাংশে। সরকার ধানের ফলন বাড়াবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করছেন। কারণ, জনসংখ্যার অতি-বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবংগে খাদ্যাভাব এক ভীষণ সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

পাট—ধানের মতই, গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এমন অঞ্চলে পাট জন্মে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পাটের বীজ বোনা হয়। পাটগাছ একটু বড় হলে গাছের গোড়ার আগাছা নিড়িয়ে পরিষ্কার করে দিতে হয়। পাটগাছ ১০।১২ ফুট উঁচু হয়। পাটগাছ কেটে কয়েকদিন জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর গাছের ছাল ছাড়ালে আঁশ পাওয়া যায়। সেই আঁশ শুকিয়ে চাষী বাজারে বিক্রী করে।

চাষী তার উৎপন্ন পাট বিক্রী করে, নগদ টাকা তার হাতে আসে এবং সেই টাকা দিয়ে সে তার নানা প্রয়োজন মেটায়। তাই, খাদ্য-শস্য-উৎপাদন থেকে পাট-উৎপাদনের এক স্বতন্ত্র গুরুত্ব চাষীর কাছে আছে। পাট আমাদের দেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্যগুলির মধ্যে একটি।

পশ্চিমবংগের দক্ষিণাংশের আবাদী জমির শতকরা প্রায় দশ ভাগ জমিতে পাটের চাষ হয়। সারা ভারতের মোট উৎপন্ন পাটের প্রায় অর্ধেক পশ্চিম-বংগে উৎপন্ন হয়।

পাট-চাষের উন্নতির জন্যে ভারত সরকার এক বিশেষ গবেষণাগার স্থাপন করেছেন ও অল্প খরচে ভাল পাট জন্মাবার নানা উপায়ও উদ্ভাবন করা হয়েছে।

পূর্ব-পাকিস্তানে ও উত্তরবংগে সবচেয়ে ভাল পাট জন্মে। বাংলাদেশ দুভাগ হবার আগে সারা বাংলা দেশ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার সব পাট কলকাতায় চালান হয়ে আসত। তাই, কলকাতার কাছাকাছি হুগলী নদীর দুধারে বহু পাটকল গড়ে ওঠে। সেই সংগে ভারতবর্ষের নানা অংশ থেকে

লোক এসে জমে এইসব পাটকলে কাজ করবার জন্যে, আর হুগলী নদীর দুধারে এমন বহু শিল্পনগর গড়ে ওঠে যাদের সংগে বাংলার অন্যান্য অনেক শহর বা নগরের কোন সামাজিক মিল নেই।

বাংলা দেশ যখন দুভাগ হয়ে গেল তখন এক সমস্যা দেখা দেয়ঃ—কাঁচা-মালের অধিকাংশই জন্মে পূর্ব-পাকিস্তানে, কিন্তু প্রায় সবগুলো পাটের কলেই পশ্চিমবংগে। কাঁচামালের অভাবে পশ্চিমবংগের তথা ভারতের পাটশিল্প এক বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হল। তখনই পশ্চিমবংগে পাট-চাষবৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা স্থরু হয়।

সরকারের চেষ্টার ফলে পশ্চিমবংগে এখন আগের চেয়ে বহুগুণ বেশি পাট জন্মাচ্ছে এবং পাটকলগুলির চাহিদার অনেকখানি অংশও পশ্চিমবংগের পাট ক্ষেত থেকে মেটান হচ্ছে। পূর্ব-পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি পাট জন্মে। ভারতে পশ্চিমবংগ ছাড়া, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যাতেও কিছু পাট জন্মান হচ্ছে। তা' হলেও পূর্ব পাকিস্তান এখনও পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাট জন্মায়। মিশর, ইরান, শ্যাম, ইন্দোচীন, জাপান, ফরমোজা, ব্রেজিল, মেক্সিকো, প্যারাগুয়ে প্রভৃতি দেশেও পাট জন্মে।

অধিকাংশ লোকের জীবিকা হলেও কৃষিকাজ কিন্তু পশ্চিমবংগে উন্নত ও আধুনিক নয়। প্রায় একশ' বছর ধরে বাংলার জমিতে ফলন কমে যাচ্ছে, তার ফলে চাষীর দুঃখ-দুর্দশা বাড়ছে।

ফলন কমে যাওয়ার প্রধান কারণ, কালক্রমে ভূমির উর্বরতা কমে গেছে। এখন আশানুরূপ ফলন বাড়াতে হলে উন্নত ধরণের কৃষি-প্রণালী অবলম্বন, সার ব্যবহার, ভাল বীজ বপন, উত্তম সেচব্যবস্থা, বন্যা নিরোধ ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রয়োজন।

আর একটা কারণ এই যে, পুরুষানুক্রমে ভাগ হতে হতে এখন চাষের জমি অতি ক্ষুদ্র হয়ে পড়েছে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষেতে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ সম্ভব নয় এবং সার, বীজ, সেচ ইত্যাদির জন্যে যথেষ্ট খরচ করেও সেই পরিমাণ লাভবান হওয়া যায় না। তাই, আজ চাষী প্রাণপাত পরিশ্রম করেও পেট

ভরে খেতে পায় না; তার দেহ-মনে বল নেই, সাহস নেই। নিজের অবস্থার উন্নতির জন্যে যে উদ্যম আর উৎসাহ দরকার তা তার নেই—চাষ-আবাদ সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দরকার, তা-ও নেই।

প্রতিকার-ব্যবস্থা

এক দিকে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ফলে কৃষির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে জমির ফলন কমেছে। তাই ভারতীয় উন্নয়ন পরি-কল্পনায় কৃষির উন্নতি প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন বলে স্বীকৃত হয়েছে এবং কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্যে সর্বাংগীণ চেষ্টা হচ্ছে। কৃষককে আজ সাধারণ লেখাপড় শেখাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে; উন্নত কৃষি-প্রণালী সম্বন্ধে তাকে উপদেশ-নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে; ভাল বীজ, সার ইত্যাদি স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে; কৃষি ঋণের ব্যবস্থা সুলভ করা হচ্ছে ও কৃষক সমাজে সমবায় প্রথা প্রচলনের চেষ্টা হচ্ছে। ভূমিহীনের ভূমি-সংস্থানের জন্যে, প্রকৃত চাষীর হাতে জমির মালিকানা দেবার জন্যে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করা হয়েছে (১৯৫৩)। চাষের মোট জমি বাড়াবার জন্যে পতিত জমি উদ্ধার করা হচ্ছে। পশ্চিমবংগে পতিত জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ন' লক্ষ একর, তার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে। কৃষির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্যে নতুন নতুন শিল্প প্রচেষ্টা, বিভিন্ন স্থানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, এবং কুটিরশিল্পের উন্নতি সাধনের চেষ্টা শুরু হয়েছে।

উত্তরাংশের আবাদ ও বন

ধান ও পাট যেমন পশ্চিমবংগের দক্ষিণাংশের কৃষি-সম্পদ, উত্তরাংশ তেমনি চা ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

চা—চা আধুনিক সভ্যমানুষের এক অতি-প্রিয় পানীয়। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় অনেক চা-বাগান আছে। পাহাড়ের ঢালু জায়গায়, যেখানে

প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু জল দাঁড়ায় না, সেইখানে চা জন্মে। চা-গাছের বৃদ্ধির জন্যে অপেক্ষাকৃত অল্প রৌদ্রতাপ দরকার।

বীজ থেকে চারা গাছ জন্মে। চারাগাছ ছ'মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত 'নার্শারী'তে রেখে তারপর তুলে অন্ততঃ চার ফুট অন্তর রোপণ করা হয়। চারাগাছ ছ'সাত বছরে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গাছগুলো ঝোপের মত বেড়ে ওঠে এবং মাঝে মাঝে সেগুলো ছাঁটাই করা হয়।

গাছের ডগার দুটি পাতা ও একটি কুঁড়ি তোলা হয় চা তৈরীর জন্যে। পাতাগুলোকে শুকিয়ে, যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, আমরা যে চা-পাতা ভিজিয়ে চা তৈরী করি, উহা সেই অবস্থায় পরিণত করা হয়। তারপর বাক্সভর্তি করে সেই চা চালান দেওয়া হয়। গুঁড়ো থেকে পাতা পর্যন্ত নানারকম চা বাজারে বিক্রী হয়।

বনজ-সম্পদ—উত্তরবংগে, দার্জিলিং জেলার মংপুতে আর একটি আবাদী ফসল হল সিন্‌কোনা। সিন্‌কোনা গাছের ছাল থেকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনাইন প্রস্তুত হয়। উত্তরবংগে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার বনজ সম্পদও উল্লেখযোগ্য। বনজ সম্পদের মধ্যে কাঠ সর্বপ্রধান।

পাহাড়ের তলদেশের অঞ্চলকে বলা হয় তরাই। শিলিগুড়ি আর কার্শিয়াং-এর পূর্বাংশের নাম তরাই। কালিম্পং আর ভূটানের দক্ষিণে, তিস্তা আর সংকোশের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের নাম ডুয়ার্স।

তরাই আর ডুয়ার্সের বনে প্রচুর শাল ও জারুল কাঠ পাওয়া যায়।

পশ্চিমবংগের দক্ষিণাংশে সুন্দরবনেও কাঠ পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের সুন্দরী ও গরান কাঠ বিখ্যাত।

পশ্চিম অংশে ঝাড়গ্রাম, আসানসোল ও বাঁকুড়া অঞ্চলেও কিছু শালকাঠ পাওয়া যায়।

কাঠ এক অত্যাবশ্যক জিনিস। বাড়ী-ঘর, রেলগাড়ী, নৌকো, জাহাজ, আসবাবপত্র ও আমাদের রোজকার জীবনে অতি প্রয়োজনীয় নানা জিনিস তৈরী করতে কাঠ না হলে চলে না। বন থেকে আমরা কাঠ পাই।

তাছাড়াও বনের এক বিশেষ উপকারিতা আছে। বনভূমি বৃষ্টিধারার গতি নিয়ন্ত্রিত করে।

কাঠ ও অন্যান্য সম্পদের জন্যে ভারতের বড় বড় সব বন রাষ্ট্রের সম্পত্তি। জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে অনেক বনের গাছ কেটে চাষ আবাদ করা হয়েছে। সরকার বন-সংরক্ষণের সংগে সংগে বন-সৃষ্টির দিকেও মনোযোগ দিয়েছেন। অধুনা-প্রবর্তিত বন-মহোৎসব দেশে গাছ-পালা বাড়ানরই প্রচেষ্টা।

সমতলভূমিতে খাদ্য ও পরিচ্ছদ

আগেই বলা হয়েছে যে, কোন অঞ্চলের অধিবাসী তার জীবনধারণের জন্যে সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে সহজলভ্য সম্পদ থেকে তার অন্ন ও বস্ত্রের উপাদান ও উপকরণ গ্রহণ করে।

সমতল ভূমিতে আবহাওয়ার পার্থক্য ও উদ্ভিজ্জ সম্পদের ওপর জনসাধারণের খাদ্য নির্ভর করে। পশ্চিমবংগের সমতলভূমিতে প্রচুর ধান জন্মে। তাই, ভাত এ অঞ্চলের প্রধান খাদ্য। যে-অঞ্চলে প্রচুর গম জন্মে রুটি সে-অঞ্চলের প্রধান খাদ্য। সারা পৃথিবীর সমতল ক্ষেত্রের অধিবাসীদেরই প্রধান খাদ্য চাল অথবা গম।

সমতলভূমিতে অন্যান্য খাদ্য হল মাছ, মাংস, দুধ ও নানাপ্রকার ফল। আমাদের দেশে আনুসংগিক খাদ্য হিসেবে ডালও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শীতপ্রধান অঞ্চলে আলুও প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শাক-সব্জী ও নানারকম তরকারী সমতলভূমির অধিবাসীদের খাদ্যতালিকায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

সমতলভূমির অধিবাসী বাঙালীদের মৎস্যপ্রিয়তা বিখ্যাত। তবে পুষ্টি বা বৈচিত্র্য যে-কোন দিক্ থেকে দেখতে গেলে পশ্চিমবংগের জনসাধারণের খাদ্যের মান অতি নীচু।

পোশাক-পরিচ্ছদের পার্থক্যও নির্ভর করে আবহাওয়ার পার্থক্যের ওপর। গরম দেশে পোশাকের ব্যবহার সামান্য এবং সূতী পোশাকই সাধারণতঃ

ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পশ্চিমবংগের সমতল অঞ্চলে বছরের অধিকাংশ সময় গায়ে কোন আচ্ছাদন না হলেও চলে। এ অঞ্চলে সূতী কাপড়ই সকলে ব্যবহার করলেও, তূলো এখানে উৎপন্ন হয় না। তূলো যেরকম মটিতে ভাল জন্মে পশ্চিমবংগে সেরকম মাটি নেই।

প্রাকৃতিক কারণ ও দারিদ্র্যের জন্যে গ্রামবাসীরা অতি অল্প পোশাক পরে। তাদের কোমর থেকে গায়ের ওপর দিক খোলাই থাকে। তবে, শহরে, ধনী বা তথাকথিত ভদ্র বাঙালীর পোশাকে বাহুল্য আছে বলা চলে। এককালে ভদ্র বাঙালীও দ্বিবস্ত্র যথেষ্ট মনে করতেন। আজও ধুতি-চাদরই বাঙালীর নিজস্ব পোশাক বলে পরিচিত।

শীতপ্রধান অঞ্চলে বেশি পোশাক-পরিচ্ছদ প্রয়োজন ও ব্যবহৃত হয়। পশমের জামা-কাপড় শীতপ্রধান অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

পরিবহণ

এক জায়গা থেকে অন্যজায়গায় মানুষের চলাচল ও মালপত্র চালান দেবার ব্যবস্থাকে পরিবহন ব্যবস্থা বলা হয়। আধুনিক সভ্য মানুষের জীবনযাত্রা, সমাজ ইত্যাদি গড়ে তোলার ব্যাপারে পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। যে-দেশ বা গ্রামে চলাচল বা পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হয় নি, সে দেশ বা গ্রাম উন্নত চলাচল ও পরিবহন ব্যবস্থা সম্পন্ন দেশ বা গ্রামের তুলনায় অনুন্নত। শহরের চলাচল ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত বলেই শহর গ্রামের তুলনায় উন্নত।

পরিবহন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট। প্রাকৃতিক কারণে এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিশেষ কোন ফসল অনেক ফলে—চাষীরা সেই ফসল জন্মায়। সে অঞ্চলের প্রয়োজনাতিরিক্ত ফসল যদি অন্যত্র,বিশেষতঃ যে-অঞ্চলে সে ফসল জন্মে না, সেখানে চালান দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে উৎপাদনের অঞ্চলে সে ফসলের দাম থাকে না, চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাট যদি বড় বড় ক্রয়কেন্দ্রে চালান দেওয়া না যায় এবং সেখান থেকে পাট-কলে না যেতে পারে তবে চাষী পাট থেকে টাকাই পায় না। চা যদি যেখানে জন্মে সেখান থেকে চালান

না হতে পারে, তাহলে চা-উৎপাদনে যে শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তা ব্যর্থ হয়। বনের কাঠ বন থেকে লোকালয়ে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে না এলে এই অত্যাবশ্যক বস্তুর অভাবে আমাদের জীবন অচল হয়ে যেত এবং কাঠের ব্যবসায়ীদেরও কোন লাভ হত না।

বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে পরিবহন ব্যবস্থার নানা উন্নতি হয়েছে। প্রথমে মানুষ মাথায় করে মাল বইত, তারপর নানা ভারবাহী পশুর পিঠে মাল টানাত। তারপর মানুষ চাকা (wheel) ও চাকার গাড়ী তৈরী করে পশু দিয়ে গাড়ী টানাত (পশুর ব্যবহার এখনও প্রচলিত)। জলপথে নৌকোয় ও স্টীমারে করে মাল বহন করা হত। পরে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, এমন কি এরোপ্লেন যোগেও চলাচল ও মাল পরিবহন সুরু হল।

আমাদের দেশের চাষীরা (বিশেষতঃ যারা গ্রাম্য হাটে অল্প পরিমাণ মাল বিক্রয়ের জন্যে আনে) ধানের বস্তা, পাটের গাঁট ও অন্যান্য বিক্রয়দ্রব্য মাথায় করে আনে। মাল বেশি হলে গরুর গাড়ীতে বা জলপথে হলে নৌকোয় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া হয়। তবে সারা ভারতবর্ষে নৌকোর চেয়ে গরু বা মোষের গাড়ীর প্রচলন অনেক বেশী। আগেই শুনেছ, অধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে ধান ও পাট জন্মে। তাই, ধান ও পাটের অঞ্চলে অনেক জায়গায় নৌকো চলে। কলকাতা বন্দরে প্রতি বছর প্রায় ৪৫ লক্ষ টন মাল নৌকো করে আমদানী-রপ্তানী করা হয়।

চাষীরা মাথায় বা গরুর গাড়ীতে বা নৌকোয় করে হাটে যে ধান-পাট আনে বড় বড় খরিদ্দারেরা হাট থেকে তা' কিনে নিয়ে আবার গরু বা মোষের গাড়ীতে কিংবা মটর লরীতে বা রেলগাড়ীতে কি স্টীমারে করে কোন বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে বা চটকলে (পাট) চালান দেয়। পাট চটকলে বা চালানী বাজারে পৌছবার আগে কোন মধ্যবর্তী কেন্দ্রে গাঁট বাঁধা হয়। এতে স্টীম প্রেস (Steam Press)-এ বা হাইড্রলিক প্রেস (Hydraulic Press)-এ পাটের গাঁট বাঁধা হয়। গাঁটবাঁধা পাট বহু পরিমাণে চালান করা সুবিধাজনক।

পাট থেকে নানারকম দড়ি, চট, কার্পেট, সতরঞ্চ ইত্যাদি তৈরী হয়।

মাল বহনের জন্যে পাটের চটের থলি ব্যবহৃত হয়। পাট থেকে সূক্ষ্ম ও মোটা সুতো তৈরী হয় এবং সেই সুতো দিয়ে কাপড় বোনা হয়। পাট থেকে কাগজও তৈরী হয়। পাটের বহুবিধ প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই পাটশিল্পের এত গুরুত্ব।

পার্বত্য অঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থা সমতলভূমির পরিবহন ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টকর ও ব্যয়-সাধ্য। পশ্চিমবংগের উত্তরাংশে চা-বাগান অঞ্চলে আজকাল অবশ্য ভাল ভাল মোটরপথ নির্মিত হয়েছে। মোটর গাড়ীতে ও ঐ অঞ্চলে অবস্থিত দার্জিলিং হিমালয়ান রেলপথে চা চালান দেওয়া হয়। অল্প দূরত্বের মধ্যে মাল চলাচলের জন্যে রজ্জুপথ (Ropeway) আছে।

চা কাঠের বাক্সে খুব ভলে করে 'প্যাক্' করে চালান দেওয়া হয়।

কাঠ পাহাড়ের বন থেকে কেটে সমতলে পাঠানো এক কঠিন সমস্যা। তবে, বহুকাল আগে থেকে তার এক পদ্ধতি মানুষ উদ্ভাবন করেছে এবং এ পদ্ধতি আজও পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত।

তোমরা জান নদী উঁচু জায়গা থেকে ক্রমশঃ নীচে সমতলভূমিতে বয়ে আসে। বন থেকে কাঠ কেটে, বড় বড় গাছগুলো নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। স্রোতে ভাসতে ভাসতে কাঠ নেমে আসে। নদীর ধারে নির্দিষ্ট স্থানে ঘাট থাকে। সেখানে কাঠের খণ্ডগুলো টেনে নেওয়া হয়। তারপর নদীতীর থেকে মোটরলরী বা রেলে করে ঐ কাঠের খণ্ডগুলো বিভিন্ন স্থানে পাঠান হয়।

চা বাগানের জীবন

সাধারণতঃ আমরা শিল্প বলতে যা বুঝি চা-শিল্প তা থেকে অনেকাংশে পৃথক। চা-শিল্পে (চায়ের গাছ জন্মান থেকে সুরু করে চায়ের যে-পাতা গরম জলে ভিজিয়ে চা তৈরী করে আমরা পান করি চায়ের পাতার সেই রূপান্তর পর্যন্ত) কলের চেয়ে হাতই বেশি ব্যবহৃত হয়। আর চায়ের বাগিচা তৈরী ও গাছ জন্মান কৃষিকাজের অন্তর্গত বলা যেতে পারে।

জলপাইগুড়ির জেলায় ১৫৮টি আর দার্জিলিং জেলায় ১৩৮টি চা-বাগান আছে। জলপাইগুড়ি চা-বাগানগুলোতে ১৭৬১৯৬ জন ও দার্জিলিং-এর চা-বাগানগুলোতে ৬৯২৯০ জন মজুর কাজ করে। চা-বাগানের বিশেষ পরিবেশে এই বিশাল জনসমষ্টির এক বিশিষ্ট জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছে। এখানকার জীবন গ্রাম্যজীবন থেকে স্বতন্ত্র ও এখানকার সমাজ গ্রাম্যসমাজ থেকে আলাদা ধরণের।

বিদেশী মালিকরা ও ভারতের বিভিন্ন অংশের মজুররা ব্যবসা ও মজুরীর জন্যে এখানে সমবেত হয়েছে। তাই গ্রাম্য সমাজের ঐক্যবন্ধন বা ঐক্যবোধ এখানে নেই।

বাগান, ফ্যাক্টরী, অফিস, এবং মালিক থেকে স্থুরু করে বিভিন্ন ধাপের কর্মীদের বিভিন্ন ধরণের বাসস্থান ও জীবনযাত্রা মিলে প্রত্যেকটি চা-বাগান এক একটি উপনিবেশ।

দার্জিলিং-এর চা-বাগানগুলোতে নেপালী কুলীই অধিক এবং জলপাই-গুড়ির চা-বাগানগুলোতে ছোটনাগপুর ও বিহারের কুলীরই সংখ্যাধিক্য। বাইরে থেকে আসা অনেক কুলী পরিবার এ-সব অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করেছে। তবে জীবনযাত্রায় এরা এখনও স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে পৃথক।

বাগানের কুলীদের কাজের সময় ঋতুভেদে বিভিন্ন হয়। গ্রীষ্মকালে আটটা থেকে ও শীতকালে ন'টা থেকে তাদের দিনের কাজ স্থুরু হয়। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তাদের কাজ চলে। কারখানার কাজ সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলে; প্রয়োজন হলে, বিকেলে পাঁচটার পর আর এক 'Shift'-এও কাজ চলে।

কুলীদের মজুরী, চুক্তি অনুসারে, দিনে বা সপ্তাহে দেওয়া হয়।

চা-বাগানের কাজ খুব শ্রমসাধ্য নয় বলে চা-বাগানে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলেই কাজ করতে পারে ও করে। বছরের সবসময় কাজের

চাপ সমান থাকে না। এজন্যে চা-বাগানে স্থায়ী ও অস্থায়ী দুরকম মজুর আছে।

এককালে চা-বাগানে মজুরদের অতি অল্প বেতনে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে হত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দালাল মারফত মজুর সংগ্রহ করা হত। বর্তমানে মজুর সংগ্রহ ব্যবস্থার, মজুরী ও বাসস্থান প্রভৃতির অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। সরকার, মালিক ও মজুর—এই তিন পক্ষের প্রতিনিধিদের আলাপ-আলোচনা মারফত চা-বাগানের নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এখন চলছে।

কালীপূজো ও দোলযাত্রা চা-বাগানের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। এই দুই উৎসব উপলক্ষে মালিকরাও কুলীদের আমোদপ্রমোদের জন্যে অনেক টাকা খরচ করেন।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা কুলীরা তাদের দেশের বিভিন্ন উৎসব পালন করে। সিংভূম আর মানভূমের কুলী মেয়েরা পৌষপার্বণে নাচগান করে।

বিদেশী মালিক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আমোদ-প্রমোদের জন্যে বিদেশী ধরণের ক্লাবও আছে। মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের খেলাধূলা ও মধ্যবিত্তসুলভ আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা আছে। তাদের বিভিন্ন সভা-সমিতি আছে।

মালিকের অর্থে পরিচালিত বিদ্যালয়াদি এখন চা-বাগানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তবে, ভৌগোলিক অবস্থা প্রভৃতি নানাকারণে চা-বাগানের জীবন আজও দেশের বৃহত্তর সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং একই বাগানে নিযুক্ত বিভিন্ন কর্মীশ্রেণীর মধ্যেও অর্থনৈতিক তারতম্যের ফলে সামাজিক যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়।

পাহাড়ের ঢালুতে আঁকা-বাঁকা, স্তরে স্তরে সাজান, ঘন সবুজ চা-বাগানগুলো দেখতে খুব সুন্দর। চা-বাগানের ধারে ধারে 'ফ্যাক্টরী', কুলীদের বস্তি আর মালিক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের পরিপাটী বাংলোগুলো

দেখা যায়। কোথাও দেখা যায় চা-বাগানের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট নদী। চা-বাগানের পাশে নানা মরসুমী ফুলের বাহারও থাকে। চা-বাগানের কুলীদের ছোট ছোট ঘরগুলো থাকে সারি সারি সাজান।

পাহাড়ে গ্রাম ও শহর

সমতলভূমির গ্রাম ও শহর থেকে পাহাড়ে গ্রাম ও শহর পরিবেশের বিভিন্নতার জন্যে অন্যরকম হয়ে থাকে। পাহাড়ে গ্রাম ও শহরের মধ্যেও আবার ভূমি, আবহাওয়া ও পরিবেশের পার্থক্যের জন্যে পার্থক্য দেখা যায়। পার্বত্য গ্রামগুলোকে নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) **সংঘবদ্ধ গ্রাম**ঃ কোন ঝরণা বা কূপের চারধারে বৃত্তাকারে সংঘবদ্ধ গ্রাম গড়ে ওঠে।

(খ) **অংগুরীবেষ্টিত গ্রাম**ঃ বনের মাঝখানে, চারধারে বনে ঘেরা বৃত্তাকার গ্রাম গড়ে ওঠে। পশুপালকদের গ্রাম সাধারণতঃ এ রকম হয়।

(গ) **রেখার মত লম্বা গ্রাম**ঃ নদীর তীর বা সরু উপত্যকায় রেখার মত লম্বা ভূখণ্ডে এরকম গ্রাম গড়ে ওঠে।

কোন উপত্যকা ওপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে উঠলে সেই উপত্যকায় ক্রমশঃ সরু গ্রাম গড়ে ওঠে।

(ঘ) **আয়তাকার গ্রাম**ঃ চাষের জমির চারধারে আয়তাকার গ্রাম গড়ে ওঠে।

বিভিন্ন পাহাড়ী গ্রামে ঘরের ছাউনি ও দেওয়াল বৃষ্টিপাত ও শীতের তারতম্য অনুসারে পৃথক হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত বা শীত কম সেখানে পাতার ছাউনির ঘর হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত বেশি সেখানে সুদৃঢ় ও শক্ত ছাউনির ঘর হয়। শীতপ্রধান অঞ্চলে বাইরের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে লোকেরা মাটি বা পাথরের দেওয়াল তৈরী করে।

পাহাড় অঞ্চলে সংঘবদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত গ্রাম দুই-ই দেখা যায়।

পাহাড় অঞ্চলে শহরের গড়নেও পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন

শহরে বড় বড় পাকা বাড়ী এবং কোন কোন শহরে শুধু কাঠের বাড়ী দেখা যায়। যেখানে ভূমিকম্পের ভয় আছে সেখানে সাধারণতঃ হাল্কা কাঠের বাড়ী দেখা যায়। যেখানে খুব বরফ পড়ে সেখানে বাড়ীর ছাদ ঢালু হয়, যাতে বরফ বাড়ীর ছাদে জমতে না পারে; কেননা বরফের চাপে ছাদ ধ্বসে যেতে পারে।

সর্বত্রই ভূমি, আবহাওয়া ও পরিবেশ অনুসারে মানুষ গৃহনির্মাণ করে এবং বিশেষ পরিবেশে যে-সমস্ত উপাদান সহজলভ্য তাই ব্যবহার করে।

পশ্চিমবংগের শিল্পাঞ্চল

আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চলঃ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আসানসোল মহকুমার সীতারামপুরের কাছাকাছি প্রথম কয়লা আবিষ্কৃত হলেও, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খনি থেকে কয়লা-তোলা ও কয়লার ব্যবহার সুরু হয়। এ অঞ্চলে প্রায় ছ'শো বর্গমাইল জুড়ে কয়লার খনি আছে। মোট মজুত কয়লার পরিমাণ প্রায় আট শ' কোটি টন বলে অনুমান করা হয়। এ অঞ্চলের কয়লার খনি ভারতের মধ্যে গভীরতম। এখানে ২০০০ ফুটেরও অধিক নীচে কয়লার স্তর আছে। পশ্চিমবংগের মোট ২৮০টি কয়লা খনির মধ্যে এ অঞ্চলেই ২৭৯টি খনি অবস্থিত। (অপরটি দার্জিলিং-এর পাহাড় অঞ্চলে অবস্থিত।)

এ অঞ্চলের কয়লা "bituminous coal"—জ্বালালে ধোঁয়া ও শিখা হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা রেল চালাতে, লোহা ও ইস্পাতের কারখানায় ও অন্যান্য বড় বড় কারখানায় ব্যবহৃত হয়। কয়লা পাতনযন্ত্রে চোয়ালে তা থেকে আলকাতরা ও গ্যাস পাওয়া যায়। পাতনযন্ত্রে যে-কয়লা পড়ে থাকে তাকে 'কোক' (coke) বা পোড়া-কয়লা বলে।

খনির খাদ বা গর্ত বিভিন্ন রকম হয়। 'Quarry' বা পোখরা খাদ অনাবৃত—পুকুরের মত করে এ খাদ কাটা হয়। 'Inclined' বা হাঁটা খাদের দুই দিকে দুই মুখ এবং দুই মুখ থেকে সুড়ংগের মত পথ খনির গভীরে

চলে যায় ও মাঝখানে খাঁচার মত ডুলিতে ওঠা-নামার ব্যবস্থা থাকে। এই খাঁচার মত ওঠা-নামার ডুলির 'গিয়ার'-এর মাথা অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

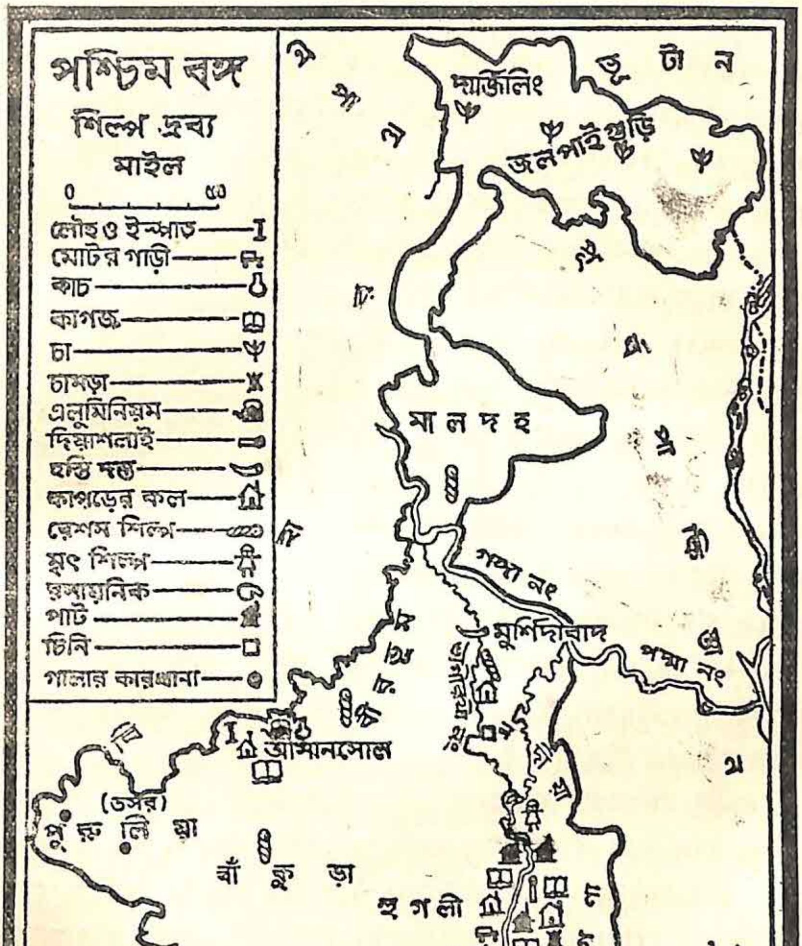
খনির ওপরে ইঞ্জিনঘর (গুমটি ঘর), তেল ঘর (মজুরদের বাতি রাখার ঘর) আর হাজরী আপিস থাকে। খনির কাছাকাছি মজুরদের বাসা, আপিস, ডাক্তারখানা, গুদামঘর প্রভৃতি থাকে। কুলিদের বস্তিকে ধাওড়া বলে। পদমর্যাদা অনুসারে অন্যান্য কর্মচারীদের ছোট-বড় পাকা বাড়ী থাকে।

কয়লার খনির অভ্যন্তরকে স্থানীয় ভাষায় চৌখুপি বলে। খনির মধ্যে গিয়ে কয়লা কাটা শ্রমসাধ্য ও বিপজ্জনক কাজ। আজকাল খনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত হলেও এখনও খনির কাজ মজুরদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। কয়লায় আগুন লেগে খনিতে বহু দুর্ঘটনা হয়। খনিতে আগুন লাগলে সে-আগুন বহু বছর জ্বলতে থাকে।

খাদের ভেতর যারা কয়লা কাটে তাদের স্থানীয় ভাষায় মালকাটা (coal cutter) বলে, কয়লা-কাটার যন্ত্রকে গাঁয়তা (pick) বলে। কয়লা গাঁয়তা দিয়ে কেটে বেলচা (shovel) দিয়ে ঝুড়িতে রাখা হয় এবং পরে টবগাড়ীতে করে ওপরে তোলা হয়। টবগাড়ী যে চালায় (Trolley man) তাকে স্থানীয় ভাষায় টালওয়ান বলে। মেয়ে-কুলীদের কুলীকামিন বলে। আজকাল মেয়েদের খাদে নামতে দেওয়া হয় না—তারা ওপরে কয়লা ঝাড়াই-বাছাই করে।

এ অঞ্চলের কয়লাখনিতে প্রধানতঃ বিহার থেকে কুলী আনা হয়। ওরাওঁ, সাঁওতাল, বাউড়ী, বাগদী, ডোম প্রভৃতি জাতির লোকেরা খনিতে মজুরী খাটে।

খনির সমস্ত শ্রেণীর কর্মী নিয়েই খনি-অঞ্চলের সমাজ গঠিত হলেও সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ নেই, বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে মেলামেশা খানিকটা হয় মাত্র। উচ্চশ্রেণীর কর্মীরা দুর্গাপূজা করেন, তাতে, মজুররা যোগ দেয়। মজুররা কালীপূজো, ছট, ভাদু প্রভৃতি উৎসব করে, বাবুরা তাতে যোগ দেন।



পশ্চিম বঙ্গ
শিল্প দ্রব্য
মাইল
0
৫০
লৌহ ও ইস্পাত
মোটর গাড়ী
কাচ
কাগজ
চা
চামড়া
এলুমিনিয়াম
দিয়াশলাই
হস্তি দন্ত
কাপড়ের কল
রেশম শিল্প
মৃৎ শিল্প
রাসায়নিক
পাট
চিনি
গালার কারখানা
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
ভু টা ন
মা ল দ হ
মুর্শিদাবাদ
আসানসোল
(তসর)
পু রু লি য়া
বাঁ কু ড়া
হু গ লী
কালিকাতা
মেদিনীপুর
তমলুক
উ ড়ি ষ্যা
ব ঙ্গো প সা গ র

বাবুদের 'ক্লাব' 'ইন্‌স্টিটিউট' প্রভৃতি আছে। তাতে তাঁরা খেলা-ধূলো, আমোদ-প্রমোদ করেন। মজুরেরা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বাস করে। যারা একই অঞ্চল থেকে মজুরী করতে এসেছে তারা এক-গোষ্ঠীভুক্ত হয়। তাদের সাধারণ জীবনের আমোদ-প্রমোদ পূজোপার্বণ ইত্যাদি তাদের আঞ্চলিক সংস্কার অনুযায়ীই হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন জাতিগত সংস্কারও দেখা যায়।

মজুরদের মধ্যে নানা অন্ধ সংস্কারও দেখা যায়। মজুররা খনির অভ্যন্তরকে 'মা কালীর পেট' বলে মনে করে। মা কালীর জয়ধ্বনি করে তারা খনির মধ্যে প্রবেশ করে। খনির অভ্যন্তর তাদের কাছে পবিত্র স্থান।

আমাদের দেশের খনি-মজুরেরা ইউরোপীয় খনি-মজুরদের চেয়ে কম দক্ষ। ব্রিটেনে কয়লার খনির একজন মজুর বছরে প্রায় ৩০০ টন কয়লা তোলে আর আমাদের দেশের মজুরেরা তোলে গড়পড়তা ২০০ টন।

খনির মজুরদের অবস্থার উন্নতির জন্যে সম্প্রতি নানা চেষ্টা হচ্ছে। তাদের বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে নানা আইন তৈরী হচ্ছে।

বার্ণপুর-চিত্তরঞ্জন অঞ্চলের লৌহ কারখানা: আধুনিক শিল্পোৎ-পাদনে কয়লা আর লোহা অত্যন্ত দরকারী। কয়লা ছাড়া বড় বড় যন্ত্র চলে না। তাই কয়লাখনির ধারে কাছে লোহা-ইস্পাতের কারখানা স্থাপিত হয়। খনি-অঞ্চলের কাছাকাছি লোহা-পাথর বা হিমাটাইট পাওয়া গেলে সুবিধা আরও বেড়ে যায়। লোহা-ইস্পাতের কেন্দ্রের কাছাকাছি নানা উপশিল্পও গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে যে-অঞ্চলে কয়লা আর লোহা-পাথর সুলভ সে-অঞ্চলে বিরাট শিল্পনগর গড়ে ওঠে।

উপরিউক্ত কারণেই আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে পশ্চিমবংগের প্রধান শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলের সম্ভাবনা অফুরন্ত। কয়লা ও লোহা-পাথরের সহজলভ্যতা ছাড়া এ অঞ্চলের উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, উন্নত বিদ্যুৎ-

সরবরাহের ব্যবস্থা, শ্রমিক সরবরাহের সুবিধা—এ অঞ্চলের শিল্পোন্নতি সহজ করে তুলেছে।

এ অঞ্চল রাণীগঞ্জ থেকে কয়লা পায়। নিকটবর্তী বিহারের কয়লা-খনিগুলো থেকেও কয়লা-সংগ্রহ এখানে সহজ। বর্ধমানের এ অংশে, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায়, বিহারের সিংভূম ও মানভূম জেলায়, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্ঝর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর লোহা-পাথর সহজলভ্য। বড় বড় মোটরপথ এ অঞ্চলকে বিহারের বিভিন্ন অংশ ও কলকাতা বন্দরের সংগে যুক্ত করেছে। কলকাতার সংগে রেলপথেও যোগ আছে। আসানসোল পূর্ব রেলওয়ে ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত। রাণীগঞ্জ, বরাকর ও দিসেরগড়ে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। দামোদর পরিকল্পনায় জলবিদ্যুৎ ও দুর্গাপুরের তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে তাপবিদ্যুৎ সরবরাহ সুরু হলে বিদ্যুৎশক্তি আরও সুলভ হবে। এখানে নিকটবর্তী অঞ্চল ও মানভূম এবং ছোটনাগপুরের আদিবাসী সমাজ থেকে অল্প মজুরীতে শ্রমিক পাওয়া যায়। এখানকার স্বাস্থ্যও ভাল।

পূর্বে বার্ণপুরে ছিল স্টীল কর্পোরেশন অব্ বেংগল (SCB) এবং কুলটী ও হীরাপুরে ছিল ইণ্ডিয়ান্ আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী (IISCO)। এই দুই প্রতিষ্ঠান ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের এক আইন অনুসারে মিলিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান সরকারের সাহায্যে অনেক বড় হয়েছে এবং এখানে উৎপাদন অনেক বেড়েছে। উৎপাদন আরও বাড়াবার জন্যে চুল্লী ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি বাড়ান হচ্ছে।

বার্ণপুরের লোহার কারখানা আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত। এখানে লোহা গালান হয় ও গলিত লোহা থেকে কড়ি, বরগা, রেল-লাইন প্রভৃতি নানা জিনিস তৈরী হয়। এখানে ইস্পাত ও ইস্পাতের নানা জিনিস তৈরী করা হয়। এক একটি ছোট কারখানায় এক এক রকম কাজ হয়। পরস্পর-সংশ্লিষ্ট বহু কারখানা নিয়ে বার্ণপুরের কারখানা সংগঠিত। এখানকার কারখানায় দিবারাত্র কাজ চলতে থাকে। কয়েক হাজার লোক এখানে কাজ

২

করে। কারখানাটা যেন একটা বড় নগর। এক দলের কাজ শেষ হলে অন্য এক দল কাজে যোগ দেয়। কারখানা সর্বদাই নানা যন্ত্রের গর্জনে মুখর।

এ অঞ্চলের সুবিন্যস্ত রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর খনি-অঞ্চল থেকে অনেক ভাল—পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। আধুনিক এই শিল্পাঞ্চলে যথা-প্রয়োজনীয় হাসপাতাল, স্কুল, ক্যান্টিন, ক্লাব ও নানা সভাসমিতি আছে।

তবে এখানকার সামাজিক জীবনেও বেতন ও আয় অনুসারে শ্রেণীভেদ আছে। মজুরদের জীবনেও দেশের যে অঞ্চল থেকে তারা এসেছে সে-অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও রীতিনীতির প্রভাব স্পষ্ট।

কলকাতা ও হাওড়ায় যন্ত্রপাতির কারখানা

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) কাল থেকে বাংলায় শিল্পের প্রসার সুরু হয় এবং বহুপ্রকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হতে থাকে। বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনতে অনেক খরচ। তাই, কলকাতা ও হাওড়ায় কয়েকটি যন্ত্রপাতির কারখানা স্থাপিত হয়। এসব কারখানার মূলধন যোগায় বিদেশীরা। ক্রমে বিদেশীদের অনুকরণে দেশী মূলধনেও অনেক ছোট ছোট কারখানা গড়ে ওঠে। কালক্রমে এরকম কারখানা অনেকগুলো বড় হয়ে উঠেছে।

কলকাতার চারধারে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রের নানা ছোট ছোট যন্ত্রপাতির চাহিদা এবং ছোট ছোট শিল্প ও কুটির শিল্পে (ধানের কল, কলের ঘানি, তাঁত) প্রয়োজনীয় ছোট ছোট যন্ত্রপাতির চাহিদা মেটাতে ও কলকাতা শহরের বহুসংখ্যক মোটর গাড়ীর মেরামতের প্রয়োজনে কলকাতা ও হাওড়ায় বহু যন্ত্রপাতির কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব কারখানায় যন্ত্রপাতি মেরামত, ঢালাই ও তৈরী করা হয়।

এসব কারখানার অনেকগুলোতে মালিকেরা নিজেরাই কাজ করেন। কয়েকজন মাত্র সহকর্মী বা সহকারী থাকে।

শিল্পোন্নয়নে সহায়তায় নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা বিবেচনায় কলকাতা ও হাওড়ার যন্ত্রপাতির ছোট-বড়-মাঝারি কারখানাগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে এবং এগুলোকে উন্নত করে তুলতে সরকারী চেষ্টা হচ্ছে।

বিক্ষিপ্ত ছোট-ছোট কারখানা

পশ্চিম বাংলার নানা অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বহু ছোট ছোট কারখানা আছে। নানা সুবিধার জন্যে কলকাতার ধারে কাছে এ রকম বহু কারখানা বহুদিন থেকে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এ ধরণের কারখানা প্রতিদিনই বাড়ছে।

বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাবার পর পূর্ববংগ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা সরকারী সাহায্য ও প্রেরণায় বা নিজেদের চেষ্টায় ও সম্বল দিয়ে সারা পশ্চিমবংগে ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করেছে। এ জাতীয় কারখানার মধ্যে চিরুণী বা কাচের জিনিস তৈরীর কারখানা, গেঞ্জির কল, প্ল্যাস্টিকের কারখানা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এ সমস্ত কারখানায় বহু লোক জীবিকার্জন করে। এই সব কারখানায় তৈরী মাল কারখানা থেকে কলকাতা ও অন্যান্য জায়গায় চালান যায় অথবা ব্যবসায়ীরা কারখানা থেকেই কিনে পশ্চিমবংগের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ে যায় বা চালান দেয়।

শিল্পে নিযুক্ত মূলধন ও শ্রম :

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্পর্কে লক্ষণীয় বিষয় এই যে এখানে এত দারিদ্র্য ও বেকারী থাকা সত্ত্বেও এখানকার শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে অবাঙালীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি এবং মূলধনের অধিকাংশ বিদেশ থেকে এসেছে। বিদেশী আমলে শাসনের সংগে শোষণ চালাবার জন্যে বিদেশী শিল্পপতিরা এদেশে মূলধন নিয়োগ করে।

শিল্পে বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যাল্পতার কারণ :

অনেকের ধারণা যে বাঙালী শ্রমবিমুখ বলে কলকারখানায় যায় না এবং বাংলার কৃষিসম্পদের জন্যে বাঙালী কলকারখানায় কাজ পছন্দ করে না।

কৃষিসম্পদ বাংলায় যে আজ আর নেই তা একটু গভীর ভাবে ভাবলেই বোঝা যায়। আসল কথা হচ্ছে, বাঙালী তার জাতীয় প্রতিভা অনুসারেই কলের মজুরী পছন্দ করে না। কলের মজুর কোন জিনিসের অংশ-বিশেষ

মাত্র তৈরীর একঘেয়ে কাজ করে। নিজের পরিকল্পনা, সূক্ষ্মবুদ্ধি বা নিপুণতা তার প্রয়োজন হয় না। বাঙালী কারিগর দীর্ঘকাল থেকে পরিকল্পনা, রুচিবোধ ও হাতের কাজের নিপুণতার জন্যে বিখ্যাত। তাই বাঙালী কারখানার মজুর হতে চায় না, গৃহপরিবেশে স্বেচ্ছাধীন কারিগর হতে চায়। তা ছাড়া বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যাল্পতার অন্য কারণ তার ক্ষীণ স্বাস্থ্য।

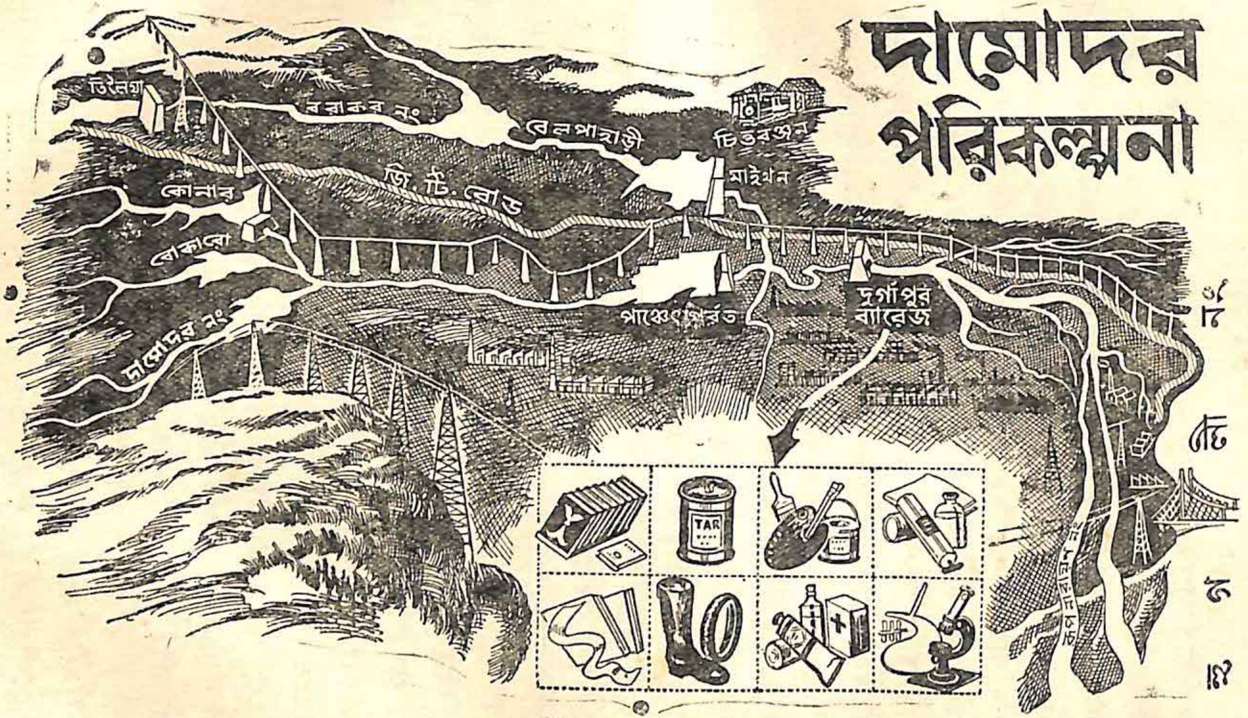
দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা

দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে পশ্চিম বাংলায় অশেষ সম্ভাবনাময় এক নতুন অঞ্চল গড়ে উঠছে।

ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমি দামোদর নদের উৎপত্তিস্থল। বিহার ও পশ্চিম বাংলার মধ্য দিয়ে ৩৩৬ মাইল পথ অতিক্রম করে দামোদর মিলেছে হুগলী নদীর সংগে কলকাতা থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে। দামোদরের দুইটি উপনদী—কোনার আর বরাকর। গ্রীষ্মে দামোদর "আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে", কিন্তু বর্ষায় সে রুদ্রমূর্তি ধরে মাঠ-ঘাট-গ্রাম প্লাবিত করে। ১৯৪৩-এ দামোদরে এক ভীষণ বন্যা দেখা দেয়। তখন দামোদর-কে বশে আনবার প্রস্তাব হয় এবং দামোদর উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হয়। কিন্তু সেই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ সুরু হয় স্বাধীনতা লাভের পর। এই পরিকল্পনাকে কার্যে রূপান্তরিত করার ভার দেওয়া হয়েছে **দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন** (Damodar Valley Corporation—সংক্ষেপে D. V. C.) নামে এক প্রতিষ্ঠানের উপর।

এই পরিকল্পনাটি **বহু-উদ্দেশ্য-সাধক**। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বনসৃষ্টি, ভূমির ক্ষয়নিবারণ ও সারাবছর নৌ-চলাচল ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে **তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেৎ** পাহাড়ে (এগুলি বিহার-এর অন্তর্গত) চারটি বড় বড় বাঁধ (dam) নির্মাণ করা হবে। প্রত্যেক বাঁধের সংগে সংযুক্ত থাকবে একটি করে **জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র**। বোকারোতে

দামোদর পরিকল্পনা



তিলৈয়া
বরাকর নং
বেলপাহাড়ী
চিত্তরঞ্জন
মাইথন
জি. টি. রোড
কোনার
বোকারো
দামোদর নং
পাঞ্চেৎপর্বত
দুর্গাপুর ব্যারেজ

এক বিশাল **তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র** স্থাপন করা হবে। ৮০০ মাইল দীর্ঘ বিদ্যুৎ-সঞ্চালন ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ গ্রহণ ও সঞ্চালনের জন্যে আবশ্যক বহু উপকেন্দ্র (sub-station) স্থাপিত হবে। সেচের জল নিয়ন্ত্রণের জন্যে **দুর্গাপুরে** (বর্ধমান জেলা) একটি আড়-বাঁধ (barrage) নির্মাণ ও খাল খনন করা হবে। প্রধান খালের মধ্যে একটি নৌ-চলাচলের যোগ্য হবে। খাল ও তার শাখা-প্রশাখা প্রভৃতির মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৫৫০ মাইল।

দামোদর উপত্যকা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে প্রকৃতির দান অপরিমিত। দামোদর উপত্যকায় খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য অতুলনীয়। সস্তা বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ফলে এ অঞ্চলে গড়ে উঠবে ধাতুশিল্প, রাসায়নিক দ্রব্যের শিল্প, কাঁচশিল্প এবং আরও নানা ধরণের শিল্প।

দামোদরের নিম্ন অববাহিকা ভারতবর্ষের উর্বরতম অঞ্চলের অন্যতম। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচের জলের সুলভতার ফলে এ অঞ্চলে ৫৬ লক্ষ মণ ধান ও ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মণ অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়বে। এ অঞ্চলে বাড়তি পাটের মূল্য হবে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, এবং উৎপন্ন বিদ্যুতের মূল্য হবে ৬ কোটি টাকা।

তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেৎ পাহাড়ের বাঁধ এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে এই সমস্ত বাঁধের জল দুর্গাপুরের আড়-বাঁধের মাধ্যমে বণ্টন করা হবে। দুর্গাপুরের খাল ও শাখা খালের সাহায্যে দামোদরের নিম্ন উপত্যকার ১০৪৩৭৬২ একর জমিতে সেচের জল জোগান দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

দুর্গাপুরের বাঁধের দৈর্ঘ্য ২২৭১ ফিট্। দামোদরের দু পাশে দুটি মূল খাল ও বহু শাখা খাল থাকবে। বাম তীরের মূল খাল (৮৫ মাইল) মিলবে হুগলী নদীর সংগে। সারা বছরেই এ খালে নৌকো চলতে পারবে। বহু মালপত্র এই পথে পরিবাহিত হবে। কলকাতার ৩০ মাইল উজানে খালটি হুগলী নদীর সংগে মেশাতে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের সংগে কলকাতা জলপথে সংযুক্ত হবে।

মুখ্য উদ্দেশ্যগুলির সিদ্ধির সংগে সংগে পতিত জমি উদ্ধার, ম্যালেরিয়া নিবারণ, মৎস্য চাষ ও ছোটখাট শিল্পের সম্প্রসারণ ইত্যাদি হবে। ছোটখাট শিল্প ও কুটির শিল্প গড়ে তোলার জন্যে স্থানীয় লোকদের মনে প্রেরণা জোগাতে নানা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। তিলাইয়াতে **তালার কারখানা** আছে। হাতে তৈরী জিনিস **পালিশ করবার কারখানা** খোলা হয়েছে মাইথনে। বর্ধমানে এক **ঠাণ্ডা গুদাম** (cold storage) নির্মাণ করা হয়েছে।

কলকাতা, বর্ধমান, কুলটি, চিত্তরঞ্জন, আসানসোল, খড়্গপুর, শক্তিগড়, মেমারি, পানাগড়, দুর্গাপুর, হিজলি, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি শহরে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে বা করবে।

পশ্চিম বংগের বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া জেলা দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে লাভবান হবে এবং এ রাজ্যে এক নতুন সমৃদ্ধ অঞ্চল গড়ে উঠবে।

আধুনিক শিল্পনগরী চিত্তরঞ্জন

আসানসোল-রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কিছুদিন হল এক আধুনিক শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে এই নগরীর নামকরণ করা হয়েছে **চিত্তরঞ্জন**। এখানে সরকারী রেল ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এতদিন আমাদের দেশের বহু টাকা রেলওয়ে-ইঞ্জিন কিনতে বিদেশে চলে যেত। সেই টাকা দেশে রাখতে ও সেই টাকায় অন্যান্য অধিকতর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে দেশে ইঞ্জিন তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চিত্তরঞ্জনে ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে। ১৯৫০-৫১য় সাতখানা ইঞ্জিন তৈরী হয়। এখানকার কারখানার কাজ দ্রুত ও সন্তোষজনকভাবেই অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৫৫-এর এপ্রিল থেকে ১৯৫৬-এর ফেব্রুয়ারী—এই সময়ের মধ্যে এই কারখানায় ১০৭ খানা ইঞ্জিন তৈরী হয়েছে। কিন্তু একদিকে যেমন ইঞ্জিন তৈরী হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি ভারতে নতুন নতুন রেললাইন বসান হচ্ছে। তাই, আমাদের দেশে এখনও কিছু ইঞ্জিন আমদানী করতে হয়। আশা করা যাচ্ছে যে শীঘ্রই সে প্রয়োজন আর থাকবে না।

আধুনিক সুপরিকল্পিত শিল্পনগরীর জন্যে অনেক ভেবে-চিন্তে স্থান নির্বাচন করা হয়। এমন স্থান নির্বাচন করা হয় যেখানে কারখানার বাড়ীঘর ও কর্মীদের বাসস্থান-ব্যবস্থার জন্যে যথেষ্ট স্থানের অভাব হবে না। সেখানকার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য আর চলাচলের সুবিধের দিকে লক্ষ্য রেখে শহরপত্তন করা হয়। এইরকম শহরে স্কুল, হাসপাতাল, খেলাধুলো ও আমোদ-প্রমোদের জায়গা নির্দিষ্ট করা থাকে। কারখানার প্রসারের সংগে সংগে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে; তাই শহরপত্তনের সময় সেই বাড়তি জনসংখ্যার জন্যেও ব্যবস্থা থাকে। পরিচ্ছন্ন পথঘাট, বাজার, জল, আলো প্রভৃতির ব্যবস্থায় সুপরিকল্পিত শিল্পনগরীর জীবন সহজ ও সুস্থ থাকে।

কোন আবাসিক স্থান বা শহরে কালক্রমে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে পূর্বপরিকল্পনার অভাবে সেই শহরের ব্যবস্থায় নানা সমস্যা দেখা দেয়। হাওড়া শহরের বিভিন্ন সমস্যা এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। কলকাতার খুব কাছে, গংগার ধারে অবস্থিত এই শহরের শিল্প-সম্ভাবনা থাকায় কালক্রমে এই আবাসিক শহর শিল্পপ্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু শহর পত্তনের সময় কোন পরিকল্পনা ছিল না বা সে-কালে পরিকল্পনা সম্ভবও ছিল না। পরিকল্পনার অভাবে আজ এখানে তাই নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং মোটের ওপর এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে উঠেছে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে আজ সেখানে তাই নানা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হচ্ছে।

[২] ভারতের গ্রাম ও নগর

গ্রাম : ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশ কৃষিজীবী এবং তাই ভারতে গ্রামের সংখ্যা বেশি। কৃষিজীবীরা তাদের কৃষিক্ষেত্রের ধারে তাদের গ্রাম গড়ে তুলেছে। তবে জলবায়ু ও পরিবেশের পার্থক্যের জন্যে বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক ধরণের গ্রাম গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে অধিবাসীদের রীতিনীতির দিক দিয়েও পার্থক্য দেখা যায়।

যখন কোন নির্দিষ্ট স্থানে কতকগুলি পরিবার বাসগৃহ তৈরী করে সেখানে

স্থায়ীভাবে বাস করে জীবিকানির্বাহের জন্যে কাজকর্ম করে তখন সেখানে এক গ্রাম গড়ে ওঠে।

পৃথিবীর সকল দেশেই গ্রাম আছে এবং সকল জাতের লোকই গ্রামে বাস করে। তবে কবে, কোথায় পরিবারবদ্ধ মানুষ স্বজনসহ একত্র নিরাপদে সুস্থ জীবন যাপনের জন্যে প্রথম গ্রাম পত্তন করেছিল তা জানা যায় না।

গ্রামবাসীদের বাসগৃহের অবস্থান অনুযায়ী দুরকম গ্রাম দেখা যায়ঃ সুসংবদ্ধ গ্রাম (Compact Villages) ও অসংবদ্ধ গ্রাম (Scattered Villages)।

সুসংবদ্ধ গ্রামগুলোতে গৃহস্থদের বাড়ী খুব কাছাকাছি—পাশাপাশি। গ্রামটি রেখার মত লম্বা, আয়তাকার, বৃত্তাকার, অর্ধ-বৃত্তাকার, বা বিশেষ কোন আকারহীনও হতে পারে।

শত্রু বা হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, গ্রামের অধিবাসীদের কৌলিক বৃত্তির ঐক্য প্রভৃতি কারণে হয়ত সুসংবদ্ধ গ্রামগুলো গড়ে উঠেছিল।

অসংবদ্ধ গ্রামগুলোতে গৃহস্থদের বাড়ী-ঘর পাশাপাশি থাকে না। সেগুলো দূরে দূরে ছড়ান থাকে। সুসংবদ্ধ গ্রাম গঠনের প্রয়োজনীয়তাবোধের অভাবেই বোধ হয় গ্রামগুলো অসংবদ্ধ হয়েছে।

গ্রামবাসীদের জাতি বা বৃত্তি অনুসারে গ্রাম একজাতি বা একবৃত্তিজীবী-অধ্যুষিত বা বহু জাতি ও বহু বৃত্তিজীবী-অধ্যুষিত হতে পারে। একজাতি বা একবৃত্তিজীবী-অধ্যুষিত গ্রাম কালক্রমে লুপ্তপ্রায়। আমাদের দেশের বহু গ্রামের নাম থেকে বোঝা যায় যে এককালে সেগুলো একজাতি বা এক-বৃত্তিজীবী-অধ্যুষিত ছিল। তবে এখনও বহু বড় বড় গ্রামে এক নির্দিষ্ট পাড়ায় একবৃত্তিজীবীরা বাস করে।

মাঝখানে ঘরবাড়ী আর চারধারে চাষের জমি—সাধারণতঃ কৃষক বহুল গ্রামের গড়ন এই। তবে এক এক অঞ্চলে গ্রামের গড়ন এক এক রকম।

পশ্চিমবংগের গ্রামগুলো সাধারণতঃ বিশেষ কোন আকারহীন। এগুলো কয়েকঘর গৃহস্থের ঘরবাড়ীর সন্নিবেশমাত্র। কোন কোন অঞ্চলে বাঁধের ধারে বা পথের ধারে রেখার মত লম্বা গ্রামও দেখা যায়।

উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব ও বিহারের গ্রামগুলো সুসংবদ্ধ, তবে বিশেষ কোন আকারহীন।

কেরল রাজ্যে গ্রামের বাড়ীগুলো বিক্ষিপ্ত। এখানে প্রত্যেকটি বাড়ীর চার পাশে বাগান আছে এবং সে-বাগান একটি বাড়ীকে আর একটি বাড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

উড়িষ্যার গ্রাম পশ্চিমবংগের মত। এখানে কোন কোন অঞ্চলে রেখাকার গ্রামও আছে।

পূর্ব-ভারতে অবিন্যস্ত গৃহবিশিষ্ট গ্রাম ও রেখাকার গ্রাম দুই-ই আছে।

নগর (Town) ঃ যে-অঞ্চলে পৌরব্যবস্থার জন্যে স্বতন্ত্র পৌর-প্রতিষ্ঠান (Municipality) আছে সাধারণতঃ তাকে নগর বলে। পৌর-প্রতিষ্ঠান না থাকলেও যেখানে প্রতি বর্গমাইলে অন্ততঃ এক হাজার লোক বাস করে ও মোট জনসংখ্যা অন্ততঃ ৫০০০ সে জায়গাকে নগর বলা হয়। নগরাঞ্চল সাধারণতঃ সরকারী কাজকর্ম বা ব্যবসাবাণিজ্যের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়। জন-সংখ্যার প্রায় অধিকাংশ (প্রায় তিন-চতুর্থাংশ) অকৃষিজীবী হয়।

উপরিউক্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত কোন জায়গার অধিবাসী-সংখ্যা অন্ততঃ এক লক্ষ হলে সে জায়গাকে মহানগরী (City) বলা হয়।

লোকগণনা ও সরকারী কাজকর্মের জন্যে উপরিউক্ত সংজ্ঞা আমাদের দেশে সরকারীভাবে নির্ণীত হয়েছে।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে পশ্চিমবংগে শহর ও মহানগরীর সংখ্যা ১১৪টি।

লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হেতু কোন নগর ক্রমশঃ চারধারে বাড়তে থাকে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের দিকে এগিয়ে যায়। কলকাতা মহানগরীর সাম্প্রতিক বিস্তার লক্ষ্য করলে এ কথা ভাল বোঝা যায়। পশ্চিম দিক্ (হুগলী নদী বাঁধার জন্যে) ছাড়া, আর তিন দিকে কলকাতা দ্রুত বাড়ছে এবং অনেকখানি বেড়েও গেছে।

অবস্থান অনুসারে নগর বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে ঃ

(ক) সমভূমির নগর : ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী কাজকর্ম ও শিক্ষা-কেন্দ্রকে ভিত্তি করে সমভূমিতে সাধারণতঃ সমভূমির নগর গড়ে ওঠে।

(খ) নদীতীরের নগর : ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে নদীতীরে বন্দর-নগর গড়ে ওঠে। পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় বন্দর সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

(গ) পার্বত্য নগর : স্বাস্থ্যকর স্থানে স্বাস্থ্যকর নগর গড়ে ওঠে। কালক্রমে এরকম স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্যও বেড়ে ওঠে।

(ঙ) তীর্থ নগর : কোন তীর্থস্থানে এই শ্রেণীর নগর গড়ে ওঠে ও কালক্রমে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়।

কাজকর্ম অনুসারেও নিম্নলিখিতভাবে নগরের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব : শাসন কেন্দ্র, প্রতিরক্ষা-বিভাগ কেন্দ্র সংস্কৃতি কেন্দ্র, উৎপাদন কেন্দ্র, প্রমোদ কেন্দ্র, যানবাহন কেন্দ্র।

ঘরবাড়ী : স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী আমাদের দেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিবেশে সহজলভ্য উপাদান দিয়ে ঘরবাড়ী তৈরী হয়। ভারতের অধিকাংশ স্থানেই গ্রামাঞ্চলে ঘরগুলোতে মাটির দেয়াল ও চালগুলো ঢালু এবং ছাউনির জন্যে টালি ও খোলা বহুল ব্যবহৃত হয়। যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম সেখানে সমতল (flat) চালাও দেখা যায়। ঘরের চাল ও বেড়ার পার্থক্য বৃষ্টিপাত ও শীতের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। দক্ষিণ ভারতে কোন কোন জায়গায় বাঁশ বা কাঠের বেড়ার ওপর মাটি লেপে দেওয়া হয়। পশ্চিমবংগের গ্রামাঞ্চলের বাড়ীঘর সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। নগরাঞ্চলে, বস্তী ছাড়া, প্রায় সবই পাকা বাড়ী। নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও স্থানাভাবের জন্যে ক্রমশঃ আমাদের দেশে বহুতলবিশিষ্ট উঁচু বাড়ী গড়ে উঠছে।

গ্রামে বেচা-কেনা : গ্রামাঞ্চলের কৃষিজাত বা কুটিরশিল্পজাত নানা দ্রব্য সাধারণতঃ স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রী হয়। গ্রামের উদ্বৃত্ত শাকসব্জীজাতীয় ও কুটিরশিল্পজাত জিনিস নিকটবর্তী নগরাঞ্চলেও চালান যায়। ব্যবসায়ীরা গ্রামের হাটবাজার থেকে সেসব কিনে নিয়ে যায়। গ্রামের চাষীরা ও

ব্যাপারীরা গ্রামের জিনিসপত্র নিজেরাও নগরে নিয়ে যায়। রেলওয়ে ও মোটর চলাচলের প্রসার হওয়াতে গ্রামের বিভিন্ন দ্রব্যের চালান বেড়েছে।

বহিরাগত ব্যবসায়ীরা উৎপাদনকারীর বাড়ী থেকেও কৃষিজাত ও কুটিরশিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্য কিনে নেয়। নানারকম শস্য, তাঁতের কাপড়-গামছা, কুমোরের হাঁড়ি-কলসী এভাবে বেশি বিক্রী হয়।

গ্রামে উৎপন্ন দ্রব্যাদির বেচা-কেনার প্রধান কেন্দ্র হাট। হাটগুলো নির্দিষ্ট স্থানে সপ্তাহে একবার বা দু'বার বসে। ক্রেতা-বিক্রেতারা নানা জায়গা থেকে সেখানে আসে। কালক্রমে হাটে কিছু স্থায়ী দোকান-পাট বসে। স্থায়ী দোকানগুলোতে সাধারণতঃ নানা মনোহারী জিনিস, তৈজস-পত্রাদি ও খাবার বিক্রী হয়।

হাট বসার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। কোন হাট সকালে বসে, কোন হাট বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে, কোন হাট আবার সারাদিন চলে। অস্থায়ী দোকানগুলো কোন হাটে খোলা জায়গায় বসে, কোন হাটে সেগুলোর জন্যে ছোট ছোট ঘর তৈরী থাকে। দোকানীরা হাটের দিন সেগুলো ব্যবহার করে ও তার জন্যে কিছু খাজনা দেয়। এ খাজনা নগদ টাকা-পয়সা বা দ্রব্যরূপে দেওয়া হয়।

হাটে বিভিন্ন জিনিস কেনাবেচার জন্যে বিভিন্ন অংশ নির্দিষ্ট থাকে—যেমন, মেছো হাট (যেখানে মাছ বেচাকেনা হয়), ধানের হাট ইত্যাদি।

অনেক হাটে গবাদি পশু ক্রয়-বিক্রয় হয়। শুধু গরু বেচা-কেনার জন্যে হাট (গোহাটা) হয়। সে রকম হাট সাধারণতঃ সপ্তাহে একদিন বসে। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস বেচা-কেনার হাট সাধারণতঃ সপ্তাহে দু'দিন বসে।

হাটে বেচা-কেনা সারা ভারতবর্ষে সমভূমি ও পার্বত্যভূমিতে সর্বত্র প্রচলিত।

বর্ধিষ্ণু ও জনবহুল অঞ্চলে রোজই প্রয়োজনীয় নানা জিনিস বেচা-কেনা হয়। যেখানে রোজ বেচা-কেনা হয় সে জায়গাকে বাজার বলে। হাট ও

বাজার অনেক অঞ্চলে একই জায়গায় থাকে। হাটবারে বহু জনসমাগম ও বিভিন্ন জিনিসের অনেক বেচা-কেনা হয়।

সারা ভারতবর্ষেই বেচা-কেনার জন্যে ক্রেতা-বিক্রেতার আর এক বিশিষ্ট ধরণের সম্মেলনের ব্যবস্থা আছে। তা হল মেলা।

"ভারতবর্ষে যাহারা গ্রামের মধ্যে বসবাস করিত, তাহাদের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য...ভারতবর্ষের সর্বত্র বংশপরম্পরায় চাকুরিয়া বা শিল্পীদের বাঁধিয়া রাখিবার নানাবিধ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এমন কিছু কিছু জিনিস আছে যাহা নিত্য প্রয়োজন হয় না, অথচ যাহার জন্য বিশিষ্ট কারিগরগণকে গ্রামে বাঁধিয়াও রাখা যায় না। ধরুন, পিতল কাঁসার বাসনের কাজ। তাহা তো নিত্য খরিদ বা মেরামতের দরকার নাই; আর ছোটখাটো গ্রামের পক্ষে একজন করিয়া কাঁসারি পোষাও সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় দুই তিন প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে। পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন জেলায় কাঁসারিগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ভাঙা বাসনপত্র মেরামত করিয়া দেয়, অথবা একেবারে অচল হইলে সেগুলির বদলে বাকি দাম লইয়া গৃহস্থকে নূতন বাসন বিক্রয় করে। কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁসারি এক গ্রামে কিছুদিনের জন্য থাকিয়া যায়; এমন কি পুরানো বাসন গলাইয়া হয়তো পিতলের ধান মাপিবার জন্য কুন্‌কের মত জিনিস ঢালাই করিয়াও দেয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভাল আর একটি খরিদ-বিক্রির ব্যবস্থা ভারতের সবত্র আজও প্রচলিত রহিয়াছে।"

"চাষীর দেশে সকল সময়ে ক্ষেতে ভারি কাজ থাকে না। যে সময়ে ফসল-কাটা শেষ হইয়া যায়, শস্য বিক্রয়ের পরে চাষীর হাতে কিছু পয়সা আসে, সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে মেলা বসে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নানা জায়গায় কোনও ঠাকুর-দেবতার পূজাপার্বণ উপলক্ষে মেলা বসার রীতি প্রচলিত আছে। কোথাও বা দুই নদীর সঙ্গমস্থলে কোনও শুভ দিবসে স্নানের জন্য বহু মানুষের সমাগম হয়। এই সকল মেলার মধ্যে, সকল মেলায় না হইলেও অন্তত অনেক মেলাতে, বিস্তর কেনাবেচার কাজ হয়। বিশেষ বিশেষ মেলায় বিশেষ বিশেষ জিনিস খরিদ-বিক্রয়ের প্রথা

প্রাচান কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তাহার ফলে গৃহস্থ বুঝিয়া সুঝিয়া নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য মেলা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনে। সারা বৎসর কাজের পর সে যে কেবল মেলায় একটু আনন্দ উৎসব করিতেই যায় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারও কিছু সারিয়া আসে।" (হিন্দুসমাজের গড়ন : নির্মলকুমার বসু : পৃঃ ৮৪-৫)

গ্রাম্য সমাজে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা

ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজকে বুঝতে গেলে হিন্দুসমাজে কৌলিকবৃত্তিকে আশ্রয় করে যে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা এবং কালক্রমে সে ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন বোঝা দরকার।

"হিন্দুসমাজের মধ্যে কৌলিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া যে উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে শোষণ ও শ্রেণীগত অসমতা থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন, নূতন স্থানে গ্রামপত্তনের সম্ভাবনা, বিদেশে শিল্পজাত মাল বিক্রয় এবং প্রতিকূল অথবা জাতির দেশাচার বা কুলাচার পালনে স্বাধীনতা থাকার কারণে তাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া টিকিয়া রহিল। মুসলমান আমলে, আমাদের অনুমান হয়, শহরের আশেপাশে প্রাচীন ব্যবস্থার কিছু অদলবদল হইলেও গ্রামে উহা কায়েমী অবস্থায় টিকিয়া গিয়াছিল ; এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শিল্পসামগ্রীর উৎপাদন ও বিদেশে বিক্রয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশ হইতে প্রভূত ধনসম্ভার আকর্ষণ করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিল।"

"খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক শত বৎসর এই সম্পদের লোভে যেমন পাঠান, তুর্ক বা মোগলজাতি ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে, তেমনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজ বণিককুল ভারতে আকৃষ্ট হইয়া নূতন এবং আরও সূক্ষ্ম উপায়ে ধনসংগ্রহের চেষ্টা করিতে থাকে। শেষ দুই শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের ধনোৎপাদন ব্যবস্থায়ও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভাগ্য-বিপর্যয়ের

মধ্যেও তাহার প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিতে থাকে।" (হিন্দুসমাজের গড়ন : নির্মলকুমার বসু : পৃঃ ১১৭)

"বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির মধ্যে শিক্ষিতের হার বেশি। তাহাদের মধ্যে স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠিত লোকের হার কম, মধ্যবিত্তের সংখ্যা অধিক। এক, কায়স্থের মধ্যে কিছু চাষের প্রাদুর্ভাব আছে, নয়তো চাষের দিকে ব্রাহ্মণ বৈদ্য অগ্রসর হয় নাই। শিল্পের দিকেও ইহাদের গতি অতিশয় ক্ষীণ।"

"যে সকল জাতির মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব ক্ষীণ, তাহাদের গতি দুই মুখে অথবা তিন মুখে চলিয়াছে। চামার ও মুচি স্ববৃত্তিতে মাঝারি সংখ্যায় রহিয়াছে, চাষীর সংখ্যাও তাহাদের মধ্যে মন্দ নয়। তাহারা হাতের কাজ করিত, স্ববৃত্তি কমিয়া আসায় অন্যান্য হাতের কাজের দিকে ঝুঁকিবার ফলে, তাহাদের মধ্যে শিল্পের উপর নির্ভরশীল লোকের হার উর্ধ্বমুখী হইয়া আছে। কামারদের মধ্যে শিক্ষিতের হার অপরাপর শিল্পীকূল অপেক্ষা অধিক হওয়ার জন্য এবং তাহাদের দক্ষতার জন্য, স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠান কমিয়া আসিলেও, তাহাদের অন্য শিল্পবৃত্তির দিকে যাওয়া সহজ হইয়াছে।"

"সমাজের সেবক, ধোপা বা নাপিতের মধ্য স্ববৃত্তিতে অধিষ্ঠিত লোকের হার এখনও কম নয়। চাষের দিকেও তাহাদের গতি মধ্যম, কিন্তু শিল্প বা মধ্যবিত্ত বৃত্তিগুলির দিকে তাহাদের গতি ক্ষীণ।"

"বাগদি, বাউরি অথবা নমঃ প্রভৃতি জাতি পূর্বেও যেমন অশিক্ষিত ছিল, আজও তেমনি রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে চাষ ও মজুরীতে অধিষ্ঠিতদের সংখ্যা বেশ উচ্চ। তাহাদের মধ্যে মধ্যবিত্তের বৃত্তি অথবা শিল্পের অভিমুখে গতি অতিশয় ক্ষীণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।"

"মোটের উপর বলা চলে যে, ইংরেজী শাসন এবং ধনতন্ত্র বিস্তারের ফল বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। যাহারা পূর্বেও চাকরি করিত, আজও তাহারা চাকরি করিতেছে। যে সকল শিল্প ধনতন্ত্রের আঘাতে পর্যুদস্ত হইয়াছে সেই সকল জাতির মধ্যে পরিবর্তনের মাত্রা বেশি। বিদেশে চামড়া চালান দেওয়ার ফলে মুচির বৃত্তি অনেকাংশে নষ্ট হইয়াছে, তাহারা

স্ববৃত্তি খানিক অংশে ত্যাগ করিয়া চাষ বা অন্য শিল্পে মজুরি করিতেছে। বিদেশী ও স্বদেশী মিলের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ায় তাঁতীকে চাষের দিকে ঝুঁকিতে হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাঁতের কাপড়ের বাজার আছে বলিয়া তাহারা স্ববৃত্তি সম্পূর্ণ পরিহার করে নাই। কিন্তু কুমোরের হাঁড়িকুড়ি সস্তা হওয়ায় বিলাতি শিল্পের আঘাতে তাহা আজও বিধ্বস্ত হয় নাই; বহু কুমোর স্ববৃত্তির দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।" (হিন্দুসমাজের গড়ন: নির্মলকুমার বসু, পৃঃ ১২৫-৩৩)

গ্রাম-বাংলার কৃষ্টি

বাংলার গ্রামীণ কৃষ্টি রূপ লাভ করেছে বাংলার গ্রামবাসীদের নানা সৃষ্টিতে। বাংলার গ্রামের শিল্পীর সৃষ্টি দেব-দেবীর মূর্তি ও চাল-চিত্র, পটের ছবি, মাটির সরায় বা কাঠের পীঁড়িতে আঁকা চিত্র, আলপনা প্রভৃতিতে বিচিত্র ও মনোরম রূপ লাভ করেছে।

বাংলার কবিগান, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, বাউল, জারী এবং আরও নানারকম লোকসংগীত বাংলার গ্রামবাসীর মনের অশেষ সম্পদের ও সৃজনী-প্রতিভার বিচিত্র প্রকাশ। ঢাক আর ঢোল বাংলার নিজস্ব বাদ্য।

এক সময় গ্রামবাসী বাঙালী অবসর-বিনোদন করত তাস, পাশা, দাবা খেলে আর দশে মিলে সন্ধ্যেবেলায় খোল বাজিয়ে কীর্তন করে। তখন সামাজিক আমোদ-প্রমোদ ও শিক্ষার বাহন ছিল যাত্রা ও কবিগান, গৌর-লীলা ও কৃষ্ণলীলা কীর্তন, কথকঠাকুরের মুখে পুরাণ পাঠ ও কথকতা।

গ্রামে গ্রামে লাঠি খেলা, হাডুডু খেলা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। বছরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন কোন গ্রামে ষাঁড়ের দৌড়, মুরগীর লড়াই প্রভৃতি হত।

আজ বাংলার গ্রাম্য সমাজে এ সমস্ত প্রায় লোপ পেতে বসেছে। গ্রামের সমাজের অবস্থা বদলেছে ও বদলাচ্ছে, কালের প্রভাবে মানুষের রুচি বদলেছে এবং এ পরিবর্তন স্বাভাবিক বলেই মেনে নিতে হয়। আজ গ্রাম্য সমাজে

একটা পরিবর্তনের যুগ চলছে। পুরনো সবই গেছে, তবে মৃত প্রাচীন থেকে নবীন এখনও জন্ম নেয় নি। এখনকার অবস্থা ফসল-তোলা ক্ষেতের মত—পুরনো ফসল উঠে গেছে কিন্তু নতুন বীজের অংকুর উদ্গম এখনো হয় নি। তবে আশা করা যায় যে কালের উপযোগী নতুন গ্রাম ও গ্রামীণ সমাজ অদূর ভবিষ্যতে আবার গড়ে উঠবে।

নগর ও গ্রাম্যসমাজের পার্থক্যঃ—গ্রাম্যসমাজে মানুষ একই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে স্থায়ীভাবে বাস করে। দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে প্রত্যেকের মনে নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রতি একপ্রকার মমতা ও প্রতিবেশীদের সংগে একপ্রকার সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। সান্নিধ্য, ঘনিষ্ঠতা ও বহু দেখাশোনায় প্রত্যেকের সংগে প্রত্যেকের একটা স্থায়ী সামাজিক বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে আত্মকেন্দ্রিকতা সংযত।

গ্রাম্যসমাজে দীর্ঘপ্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে শ্রম-বিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ সুদৃঢ়। ছোট বড় সবাই স্বাভাবিকভাবে তা মেনে নেয়। ব্যক্তি বা শ্রেণীর মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে না। গ্রামের সমাজ পরিবারকেন্দ্রিক।

সংহত গ্রাম্যসমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির শাসনে ব্যক্তিকে সংযত করে। এ সমস্ত কারণে গ্রাম্যসমাজ স্থায়ী ও নগর-সমাজ থেকে সরল ও সংকীর্ণ।

নগর-সমাজের ভিত্তি—আকস্মিক কোন কারণে বিভিন্ন স্থান ও সমাজ থেকে আগত বিভিন্ন ধর্ম, মত ও রীতিনীতি অবলম্বী এক জনসংখ্যা। বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য হেতু দীর্ঘকাল এক জায়গায় থেকেও এদের পরস্পরের সংগে পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা বা সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না। কোন কৌলিক বা সামাজিক রীতিদ্বারা এখানকার ব্যক্তির কর্মপ্রচেষ্টা বা সাধারণ আচরণ নিয়ন্ত্রিত নয়। এ সমাজ সামঞ্জস্যহীন ও সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানকার মানুষ আত্মকেন্দ্রিক।

নগর-জীবনের অবাধ স্বাধীনতা স্বভাবতঃ ভাগ্যান্বেষী, দুঃসাহসিক,

বে-পরোয়া, বৈচিত্র্যলোভী ও সমাজবিরোধী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের আকর্ষণ করে।

শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি

পশ্চিম বাংলার অতি অল্পসংখ্যক আবাসিক শহর ছাড়া, অন্য সমস্ত শহরে জনসংখ্যা বাড়ছে। যে যে জায়গায় লোকসংখ্যা কমেছে, সেই সেই জায়গায় জীবিকার্জনের সুযোগ কমে গেছে ; কারণ পুরনো যে উৎপাদন-ব্যবস্থা সে সমস্ত জায়গায় ছিল, আধুনিক কলকারখানার সংগে প্রতিযোগিতায় সে-উৎপাদন-ব্যবস্থা আর নেই এবং সেই সমস্ত স্থানের ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গেছে। শহরে জনসংখ্যা বাড়ার কারণ গ্রাম্যসমাজের আর্থিক বুনিয়াদ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গ্রামের বিশাল জনসংখ্যা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি-কর্মের জন্যে যত লোক দরকার তার চেয়ে বেশী লোক গ্রামে আছে। তাই তাদের কিছু অংশ জীবিকার অন্বেষণে শহরে ভিড় বাড়াচ্ছে। শহরের জীবনের মোহও কিছু লোককে শহরে টেনে আনে।

গ্রাম ও শহরের সম্বন্ধ

শহরবাসীদের উপজীবিকা চাকরী, মজুরী আর ব্যবসা-বাণিজ্য। গ্রামাঞ্চলের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। গ্রামের চাষীরা খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে, তাদের উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রী করে। শহরে শিল্পজাত জিনিসপত্র তৈরী হয়। গ্রামবাসীরা জামা-কাপড়, থালা-বাসন ও অন্যান্য নানারকম শিল্পজাত দ্রব্যের জন্যে শহরের ওপর নির্ভরশীল। গ্রামের উদ্বৃত্ত কর্মক্ষম জনসংখ্যা সাধারণতঃ শিল্পাঞ্চলে নিযুক্ত হয়। এইভাবে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল গ্রাম ও শহর পাশাপাশি বেড়ে ওঠে।

কিন্তু পশ্চিম বাংলায় গ্রাম আর শহর মিলে এক সমৃদ্ধ স্বয়ংপূর্ণ সমাজ গড়ে ওঠে নি। এত ছোট রাজ্যে পাঁচটি শিল্পপ্রধান জেলা থাকা সত্ত্বেও এখানকার কৃষি-ঘাটতি (অর্থ বা কর্ম সংস্থান প্রভৃতি যে কোন দিক থেকেই) পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। শহর আর গ্রাম পরস্পরের অভাব সম্পূরণ করতে পারছে না।

যে কোন দিক থেকে দেখতে গেলে—কৃষক, শ্রমিক আর মধ্যবিত্তের জীবন-যাত্রার মান অতি নীচু; বেকারের সংখ্যা ভয়াবহ রকমের বেশী। শিক্ষিতের হার খুবই কম। শিক্ষিতের হার নীচে দেওয়া গেল:

(১) শিক্ষিতের হার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪.৫
- পুরুষ ৩৪.৭
- স্ত্রীলোক ১২.৭

(২) গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের হার—শতকরা ১৭.৯
- পুরুষ ২৮.১
- স্ত্রীলোক ৬.৭

(৩) শহরাঞ্চলে শিক্ষিতের হার—শতকরা ৪৫.২
- পুরুষ ৫১.৮
- স্ত্রীলোক ৩৫.৪

কলিকাতা মহানগরী

পশ্চিম বাংলার প্রধান শহর **কলিকাতা**, চলতি কথায় **কলকাতা**। ইংরেজ রাজত্বে এ শহর গড়ে উঠলেও ভারতের অন্যান্য শহরকে এর মধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে। লোকসংখ্যায় ভারতের শহরগুলোর মধ্যে এর স্থান প্রথম, এশিয়ার শহরগুলোর মধ্যে চতুর্থ এবং পৃথিবীর শহরগুলোর মধ্যে পঞ্চদশ। কলকাতার আয়তন ৩২.৩২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২৫৪৮৬৭৭। প্রতি বর্গমাইলে এখানে ৭৮৮৫৮ জন লোক বাস করে।

পশ্চাৎপট

কলকাতা শহরের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় কয়েকটা গ্রাম মিলে কি করে একটা শহর গড়ে ওঠে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সরস্বতী নদী মজে যাওয়ায় সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁর প্রাচীন বন্দর নষ্ট হয়ে যায় এবং ক্রমে হুগলী এক প্রধান বন্দর হয়ে ওঠে। হুগলীর নাম অনুসারেই পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয়

নাবিকরা গঙ্গার নাম রাখে হুগলী। সে সময়ে ভাগীরথীর তীরে ছত্রলুট বা ছাতানুট (পরে সুতানুটি), কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। এই তিন গ্রামের উত্তরে চিত্রপুর (এখনকার চিৎপুর) ও দক্ষিণে ভবানীপুর ও কালীঘাট গড়ে ওঠে। আদিগংগা তখন পূর্বদিকে সরে এসেছে এবং ছোট হয়ে গিয়েছে। কয়েকটা খাল তখনও গংগাকে পূর্বদিকের জলার সংগে যুক্ত রেখেছিল। এই খালগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তর দিকে চিৎপুরের এবং মধ্যস্থ আর একটি খাল—এখানকার ধর্মতলা স্ট্রীটের উত্তর দিকে—প্রধান ছিল। এই দুটি খালের মাঝখানে আর একটি ছোট খাল (এখন যেখানে সার হরিরাম গোয়েংকা স্ট্রীট) ছিল। প্রথম খালটির উত্তরে চিত্রপুর, প্রথম ও দ্বিতীয় খালের মধ্যে ছাতানুট এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খালের মধ্যে কলিকাতা গ্রাম অবস্থিত ছিল। গোবিন্দপুর ছিল তৃতীয় খালটির দক্ষিণে।

এইরকম সময়ে ইংরেজরা কলকাতায় আসে। হুগলীতে শহর প্রতিষ্ঠার বিশেষ সুবিধে না দেখে ইংরেজ কুঠিয়াল জব চার্নক এই অঞ্চলকে শহর প্রতিষ্ঠার জন্যে পছন্দ করেন। সাতগাঁর বসাক আর শেঠরা আগেই এ অঞ্চলে সুতো আর সুতোর কাপড়ের হাট বসিয়েছিল। তারা পর্তুগীজ বণিকদের দৃষ্টি এ অঞ্চলের দিকে আকর্ষণ করেছিল। পর্তুগীজরা এদিকে মন দেয় নি। কিন্তু ইংরেজের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হল। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্নক এই তিনখানি গ্রাম কেনার অনুমতি নিলেন হুগলীর গভর্নরের কাছ থেকে এবং স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে ১৩০০৲ টাকা দিয়ে তিনখানা গ্রাম কিনলেন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণ-এর আগেই আরম্ভ হয়েছিল। ১৭০২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ দুর্গটি সুদৃঢ় করা হয়।

দুর্গের দক্ষিণে ইংরেজরা প্রথমে কুঠি নির্মাণ করে। তার চারিদিক ঘিরে ইংরেজ, পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দার আর আর্মেনিয়ানরা বসবাস সুরু করে। ভারতীয়েরা ঐ অঞ্চলে থাকতে পেত না। তারা থাকত ঐ অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণে।

যে তিনটি গ্রাম নিয়ে বর্তমান কলকাতা শহরের পত্তন তারই একটি গ্রামের নাম অনুসারে শহরের বর্তমান নাম **কলিকাতা** (অপভ্রংশ **কলকাতা**) হয়। এই নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। বর্তমানে এই নামের ব্যুৎপত্তি নির্ধারিত হয়েছে। "কলিকাতা একটি খাঁটি বাংলা শব্দ। ইহার অর্থ 'কলি' বা কলিচুণের জন্য 'কাতা' বা শামুক-পোড়া। সুতার নুটি বা গোলার হাট বা আড়ত হইতে যেমন 'সুতানুটি' নাম, তেমনি কলির বা চূণের ও কলিচূণের জন্য শামুকের আড়ত এবং চূণের কারখানা হইতে 'কলিকাতা' নাম হইয়াছে।"

কলকাতার ক্রমোন্নতি

ভৌগোলিক অবস্থানই কলকাতার দ্রুত উন্নতির প্রধান কারণ। কলকাতা গাংগেয় উপত্যকার দ্বারস্বরূপ। তাই ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য যতই বাড়তে লাগল কলকাতার শ্রীবৃদ্ধিও ততই হতে লাগল। কালক্রমে কলকাতা পৃথিবীর অন্যতম শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বহু লোক জীবিকার অন্বেষণে কলকাতায় বাস করতে লাগল এবং গড়ে উঠল আধুনিক কলকাতা। ইংরেজ আমলে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু কলকাতার গৌরব বা গুরুত্ব তাতে একটুও কমে নি। ব্যবসা-বাণিজ্যই কলকাতার শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ।

শিল্প-বাণিজ্য

কলকাতা বন্দরে কোটি কোটি টাকার মাল আমদানী-রপ্তানী হয়। এই সব মাল লেনদেনের জন্যে এখানে বহু বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক আছে। ভারতের প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সংগে সংগে কলকাতায় মূলধনের প্রাচুর্য দেখা দেয় এবং শহরবাসী লক্ষ লক্ষ লোকের চাহিদা মেটাবার জন্যে শহর ও শহরতলীতে বিভিন্ন কারিগরী

শিল্প গড়ে ওঠে। কলকাতায় যন্ত্রশিল্প ও কুটিরশিল্প দুইই দেখা যায়। যন্ত্রশিল্পের মধ্যে শহরতলীতে চটকল, পাটকল, কাপড়ের কল, চাল ময়দা ও তেলের কল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং আগ্নেয় অস্ত্র তৈরীর কারখানা, সাবান দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা এবং শহরের মধ্যে ছাপাখানা, মোটর মেরামত ও নানাপ্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রধান। কলকাতায় যত ছাপাখানা আছে ভারতের অন্য কোন শহরে এত ছাপাখানা নেই। কুটিরশিল্পের মধ্যে কামারশালা, জুতো তৈরী ও বিড়ি তৈরীর ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

পরিবহন-ব্যবস্থা

কলকাতার পূর্ব ও পশ্চিম দিকে যথাক্রমে রয়েছে শিয়ালদহ ও হাওড়া রেলস্টেশন। হাওড়া স্টেশন ও কলকাতা শহরের মধ্যে গংগা নদী। গংগার ওপর এক অতি আধুনিক পুল তৈরী করে হাওড়া স্টেশনের সংগে শহরকে যুক্ত করা হয়েছে। যাত্রী-চলাচলের জন্যে কলকাতার রাস্তায় অসংখ্য ট্যাক্সি, ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম ও মোটর বাস রয়েছে; তাছাড়া ঘোড়ার গাড়ী ও মানুষে-টানা রিক্‌শও আছে (আমাদের দেশের প্রধানতম শহরে মানুষে-টানা রিক্‌শ এতদিনে উঠে যাওয়া উচিত ছিল)। মালপত্র বহন করার জন্যে মোটর লরী এবং গরু বা মহিষের গাড়ী আছে। (তবে দুঃখের কথা, আজও কলকাতার রাস্তায় মাল-বোঝাই গাড়ী মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে দেখা যায়)। জলপথ, রেলপথ ও বিমানপথে এ শহর ভারতের বিভিন্ন অংশ ও বহির্জগতের সংগে যুক্ত।

অধিবাসী ও ভাষা

কলকাতায় জনসংখ্যার শতকরা ৪৫·৫ জন বাঙালী এবং ৫৪·৫ জন বহিরাগত। ভারতের প্রত্যেক অংশের লোক তো এখানে আছেই, তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সভ্য জাতির লোক এ শহরে আছে। এই শহরের লোকদের মধ্যে ৮০টি ভাষায় কথাবার্তা চলে।

গৃহসমস্যা

আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যধিক হওয়াতে গৃহসমস্যা কলকাতার এক প্রধান সমস্যা। এখানকার এক-চতুর্থাংশ লোক বস্তিতে বাস করে। এই সমস্ত বস্তির অবস্থা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। কলকাতায় প্রতি বাসকক্ষে গড়পড়তায় ৩·৬ জন লোক বাস করে।

উপজীবিকা

কলকাতার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা তিনটি—ব্যবসায়, চাকরী বা শ্রমিকগিরি ও লোকের বাড়ী চাকর-ঠাকুর প্রভৃতির কাজ।

ভারতে স্থলপথ : গ্রামাঞ্চলের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে লোক ও মাল চলাচলের জন্যে ভাল ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের অন্যান্য বহু অংশে ও পশ্চিমবংগের গ্রামাঞ্চলে সন্তোষজনক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না এবং আজও নেই। গ্রাম্য জীবনের অবনতি বা আশানুরূপ উন্নতি না-হওয়ার এটা একটা কারণ।

স্বাধীনতা লাভের পর রাস্তাঘাটের অভাব দূর করতে সরকার সচেষ্ট হয়েছেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত চারভাগে ভাগ করে সংস্কার ও নির্মাণের চেষ্টা চলছে। (১) **জাতীয় সড়ক** (National Highways)—এগুলো ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দর ও রাজধানীকে সংযুক্ত করবে। পশ্চিমবংগে ২৫১ মাইল জাতীয় সড়ক নির্মিত হবে। (২) **প্রাদেশিক সড়ক** (Provincial Highways)—এগুলো জেলার বড় বড় শহরগুলোকে সংযুক্ত করবে। পশ্চিমবংগে ৫৩৫ মাইল প্রাদেশিক সড়ক নির্মাণ করা হয়ে গেছে। (৩) **জেলা সড়ক** (District Roads)—এগুলো জেলার শহর ও গ্রামগুলোকে সংযুক্ত করবে এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক সড়কগুলোর সংগে মিলবে। (৪) **গ্রামের রাস্তা**—এগুলো বিভিন্ন গ্রামকে সংযুক্ত করবে এবং জেলা সড়কগুলোর সংগে মিলবে। পশ্চিমবংগে এরকম রাস্তা ৩৬৩ মাইল নির্মিত হয়ে গেছে।

ভারতে ৮০০০০ মাইল পাকা রাস্তা। তার মধ্যে ১১০০০ মাইল জাতীয় সড়ক। বাকী সড়কগুলো রাজ্য সরকার, কর্পোরেশন, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি বা ইউনিয়ান বোর্ড-এর অধীন।

পশ্চিমবংগের পুরনো প্রধান প্রধান রাস্তার নাম গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড, কলিকাতা-যশোহর রোড ও ব্যারাকপুর ট্রাংক রোড।

পশ্চিমবংগের উত্তরাংশের সংগে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য এক বিশেষ পরিকল্পনা অনুসারে একটা রাস্তা নির্মিত হয়েছে।

ভারতে রেলপথ—বাংলাদেশে প্রায় একশ' বছর আগে কলকাতা থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত প্রথম রেলপথ তৈরী হয়। রাণীগঞ্জের কয়লা পরিবহন ব্যবস্থার জন্যে এ রেলপথের অত্যন্ত প্রয়োজন ও গুরুত্ব ছিল। ভারতের অপর অংশে বোম্বাই থেকে কল্যাণ পর্যন্ত রেলপথও প্রায় একই সময়ে তৈরী হয়।

প্রথমে কয়েকটি বে-সরকারী কোম্পানী সরকারের সংগে বিশেষ চুক্তিতে আমাদের দেশে রেলপথ স্থাপন করে। পরে সম্পূর্ণ সরকারী পরিচালনায় কিছু রেলপথ তৈরী হয়। বর্তমানে ভারতীয় সমস্ত রেলপথ জাতীয় সম্পত্তি ও ভারত সরকারের ব্যবস্থাধীন।

আজকাল আমাদের দেশের বিভিন্ন অংশে মোটর পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং বহু লোক ও মালপত্র মোটরে চলাচল করে। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে যাত্রী বা মালের দূর-যাত্রার একমাত্র বাহন ছিল রেল, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগসূত্রও স্থাপন করেছিল রেলপথ। রেলপথের গুরুত্ব বর্তমানেও বেড়েছে বই কমে নি।

ভারত সরকার রেলের উন্নতির জন্য রেলের ইঞ্জিন, গাড়ী ও মালগাড়ী তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছেন এবং অন্যান্য নানাভাবে চেষ্টা করেছেন।

পরিচালন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সারা ভারতের রেলপথগুলিকে ৭টি মণ্ডলে (Zone) বিভক্ত করা হয়েছে :

(১) পূর্ব রেলপথ (Eastern Railway : সংক্ষেপে E.R.)—পশ্চিমবংগ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে বিস্তৃত।

(২) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ (S.E.R.)—পশ্চিমবংগ, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশে বিস্তৃত। এই দুই রেলপথের প্রধান আপিস কলকাতায়।

(৩) উত্তর-পূর্ব রেলপথ (N.E.R.)—আসাম, পশ্চিমবংগের উত্তর ভাগ, বিহার ও উত্তর প্রদেশে বিস্তৃত।

(৪) উত্তর রেলপথ (N.R.)—পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে বিস্তৃত।

(৫) মধ্য রেলপথ (Central Railway : C.R.)—ভারতের মধ্য অংশে দিল্লী থেকে রাইচুর ও বোম্বাই থেকে বেজওয়াদা পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৬) পশ্চিম রেলপথ (W.R.)—বোম্বাই, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে বিস্তৃত।

(৭) দক্ষিণ রেলপথ (S.R.)—মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে বিস্তৃত।

বড় বড় নদী, গভীর অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চল ভারতে রেলপথের বহুল বিস্তারের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাবার পর উত্তরবংগ ও দক্ষিণবংগের এবং দক্ষিণ-বংগের সংগে আসামের যোগাযোগের অসুবিধা আছে।

পশ্চিমবংগে কিছুটা রেলপথে এখন বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চলছে।

প্রশ্ন

১। 'সমাজ' কথাটার অর্থ কি? মানব-সমাজের ক্রমবিবর্তন কীভাবে হয় সংক্ষেপে লেখ।

[Define Society. Trace, in outlines, the evolution of human society.]

২। সমাজ-বিজ্ঞান কাকে বলে? অন্যান্য বিজ্ঞানের সংগে তার মৌলিক পার্থক্য কোথায়?

[What do you mean by Social Studies? What is its fundamental difference with other sciences?]

৩। সমাজ ও সভ্যতা গঠনে পরিবেশের গুরুত্ব সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

[Write a short essay on the importance of environment on the development of society and culture.]

৪। আরণ্য ফলমূলাহারী ও শিকারীদের সমাজ-ব্যবস্থার একটা উদাহরণ দাও। সেখানকার সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি?

[Give an example of the social system of the wild fruit gatherers and hunters. What are the essential features of their social system?]

৫। আন্দামানের অধিবাসীদের সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

[Give a short account of the economic basis and administration of the society of the Andamanese.]

৬। আন্দামানের অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন, খাদ্য, ধর্ম, সৌন্দর্যানুরাগ, কুসংস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে কি জান ?

[What do you know about the daily life, food, religion, aesthetic appreciation, prejudice, etc., of the Andamanese people ?]

৭। আলমোড়ার আদিবাসীদের সমাজ-জীবনের একটা ছবি আঁক।

[Give a pen-picture of the social life of the original inhabitants of Almorah.]

৮। আলমোড়ার আদিবাসীদের ধর্ম ও উৎসবানুষ্ঠান সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

[Write what you know about the religion and festivals of the original inhabitants of Almorah.]

৯। আলমোড়াবাসীদের শীতাবাস সম্বন্ধে কি জান ?

[What do you know about the winter habitat of the people of Almorah ?]

১০। আলমোড়ার মেলা ও তার গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

[Write a short essay on the fair of Almorah and their importance.]

১১। মালয়ের আদিবাসীদের জীবনযাত্রাপদ্ধতি ও সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

[Write a short note on the ways of living and social customs of the people of Malaya.]

১২। উত্তর-চীনের কৃষিজীবী সমাজের একটা ছবি আঁক। বর্তমানে নবজাগরণের যুগে চীন কীভাবে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

[Draw a picture of the agricultural society of North China. Give a brief description of how China is now fast moving ahead on the road to development.]

১৩। Zuyder-Zeeর ওলন্দাজ অধিবাসীরা কীভাবে নিজেদের কর্মদক্ষতায় প্রকৃতিকে হার মানিয়েছে তার একটি বিবরণ দাও। ওদের সমাজ-ব্যবস্থার একটা মোটামুটি চিত্র আঁক।

[Give an account of how the Dutch people of Zuyder Zee have defeated Nature by his own efforts. Draw an outline of their social system.]

১৪। প্রেইরী-অঞ্চলের সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা কর।

[Write a short essay dealing with the essential feature of the social system in the Prairies.]

১৫। রেড ইণ্ডিয়ানদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। কেন ওদের রেড ইণ্ডিয়ান বলা হয় ?

[Give a short sketch of the mode of living of the Red Indians. Why are they called Red Indians ?]

১৬। পশ্চিমবংগের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

[Write, in brief, what you know about the physical feature of West Bengal.]

১৭। পশ্চিমবংগের উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্প সম্বন্ধে কি জান ?

[Write what you know about the Porducts and Industries of West Bengal.]

১৮। পশ্চিমবংগে কৃষির অনগ্রসরতার কারণ কি ? কীভাবে এই অনগ্রসরতার প্রতিকার করা যায় ?

[What are the causes of the backwardness of agriculture in West Bengal. How can these be removed ?]

১৯। পশ্চিমবংগের গ্রাম্য কেনা-বেচা এবং উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

[Write a short essay on the villages of West Bengal and on buying any selling in villages, production and distribution etc.]

২০। পশ্চিমবংগের গ্রামবাসীদের আহার, বাসস্থান ও পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি বিবরণ দাও।

[Give a brief description of food, habitation and dress of the villages of West Bengal.]

২১। গ্রাম্য-বাংলার কৃষ্টি সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

[Write a short essay on the culture of Rural Bengal.]

২২। পশ্চিম-বাংলার শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থান ও প্রধান প্রধান শিল্পগুলি সম্বন্ধে একটা বিবরণ দাও।

[Give a short description of the sits of the industrial areas of West Bengal and the principal industtries.]

২৩। আধুনিক শিল্পনগরী চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

[Write a short essay on the modern industrial town, Chittaranjan.]

২৪। পশ্চিম বাংলার চা-শিল্প সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে বল।

[Write what you know about Tea industries in W. Bengal.]

২৫। শিল্পে বাঙালী শ্রমিকদের সংখ্যাল্পতার কারণ কি ?

[What are the reasons of the shortage of the number of Bengalies in industries ?]

২৬। কলকাতা মহানগরী সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

[Write a short essay on the city of Calcutta.]

২৭। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা ও পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে এই পরিকল্পনার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা কর।

[Write what you know about the Damodar Valley Project and its importance in the economic life of West Bengal.]

২৮। ভারতের গ্রাম-গঠন সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

[Write a short essay on the building up of villages in India.]

২৯। নগর কাকে বলে ? ভারতের নগরগুলি কীভাবে গড়ে উঠল সে সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

[What is a city ? Write in brief how cities flew up in India.]

৩০। নগর ও গ্রাম্য সমাজের পার্থক্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[Discuss, in brief, the difference between urban and rural societies.]

৩১। ভারতের রেলপথ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Give a brief description of the Indian Railways.]

৩২। আন্দামান, আলমোড়া, Zuyder-Zee, প্রেইরী অঞ্চল এবং পশ্চিমবংগে বিভিন্ন ধরণের সমাজ-ব্যবস্থা কেন গড়ে উঠল বলতে পার ? এইরকম বিভিন্ন ধরণের সমাজ-গঠনে প্রকৃতির প্রভাব কতখানি দায়ী বল।

[Can you say why different social systems grew up in the Andaman, Almorah, Zuydcr Zee, the Prairies and West Bengal ? Estimate the influence of nature on the building up of these different types of society.]

দ্বিতীয় ভাগ

ভারত ও বহির্জগৎ

॥ পরিবেশ ও ইতিহাস ॥

ইতিহাসের প্রধান এবং মৌলিক উপাদান হল মানুষ ও তার পরিবেশ। কেবল রাজা-মহারাজার কাহিনী ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সন-তারিখের পঞ্জিকা হলেই ইতিহাস হয় না। ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য হল বিভিন্ন যুগের রক্ত-মাংসে গড়া জলজ্যান্ত মানুষ। বিভিন্ন যুগের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবন প্রতিফলিত হয়ে থাকে ইতিহাসের মধ্যে—সামান্য একটা অংশমাত্র জুড়ে থাকে রাজা-মহারাজাদের কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী, সন-তারিখের হিসেব-নিকেশ। বিভিন্ন যুগে ভৌগোলিক পরিবেশ বা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি মানুষের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তুলেছে ইতিহাস তারই প্রতিবিম্ব ধরে দর্পণের মতো, পরবর্তী কালের মানুষদের জন্যে। আমাদের দেশের ইতিহাসও এই রকমই একটা দর্পণ।

ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও তার প্রভাব—আমাদের দেশের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম আমাদের চোখে পড়বে ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও ভারতবাসীদের জীবনের ওপর এই বৈচিত্র্যের প্রভাবের কথা।

বিচিত্র দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। ভূগোল পড়তে গিয়ে যত ভৌগোলিক সংজ্ঞার সংগে আমাদের পরিচিতি ঘটেছে, তার প্রায় সব কিছুর সংগেই প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে আমাদের দেশে। পাহাড় (আরাবল্লী, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি), পর্বত (হিমালয়, বিন্ধ্য), গিরিপথ (খাইবার, বোলান, জেলেপলা প্রভৃতি), নদ (সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র), নদী (গংগা, যমুনা), হ্রদ (সম্বর, পুষ্কল), মরুভূমি (রাজস্থানের মরুভূমি), মালভূমি (দাক্ষিণাত্যের মালভূমি), অন্তরীপ (কন্যা কুমারিকা), সাগর (আরব সাগর), মহাসাগর (ভারত মহাসাগর), উপসাগর (বঙ্গোপসাগর), দ্বীপ (আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষা দ্বীপ, আমিন দ্বীপ), প্রণালী (পকপ্রণালী) প্রভৃতি সবই রয়েছে ভারতে। তাই তো ভারতকে বলা হয় ছোটখাটো একটি পৃথিবী।

ভারতের এই ভৌগোলিক রূপ তাকে শুধু বৈচিত্র্যেই মণ্ডিত করেনি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও দান করেছে। উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয় আকাশে অটলোন্নত শির তুলে দাঁড়িয়ে — পশ্চিম হতে পূর্বে প্রসারিত তার বিশাল বাহু। পূর্ব সীমান্তে খাসিয়া-জয়ন্তিয়া-গারো পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের নাতিদীর্ঘ শির তুলে। দক্ষিণ-পূর্বে বংগোপসাগরের সুনীল বিস্তার। দক্ষিণে ভারত মহাসাগর বয়ে চলেছে উত্তাল তরংগভংগে নৃত্য করে। পশ্চিমে উর্মিমুখর আরব সাগর। চারিদিকেই পর্বত বা সাগরের বেষ্টনী। এরোপ্লেন, বাষ্পীয় জাহাজ প্রভৃতি যেকালে ছিল না, সেই সুদূর অতীতে এই বেষ্টনী অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করা ছিল দুঃসাধ্য ; ফলে, চারিদিকের এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে অন্য দেশের পক্ষে ভারতকে প্রভাবিত করা সহজসাধ্য ছিল না। তাই ভারতে সভ্যতার বিকাশ হল নিজস্ব ধারায়—অন্যান্য সভ্য দেশের প্রভাব ভারতের সভ্যতা, কৃষ্টি বা সমাজ-ব্যবস্থাকে বিশেষ প্রভাবিত করে তুলতে পারল না।

ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ। সুদূর অতীতে (আজ থেকে চার হাজার বছরেরও আগে) আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতে প্রবেশকারী সিন্ধুতীরবাসী এই আর্যরাই ক্রমে পরিচিত হলেন 'হিন্দু' বলে ('সিন্ধু' থেকে 'হিন্দু') এবং তাঁদের বিশিষ্ট সভ্যতা, ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থাই হিন্দু সভ্যতা, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা বলে আজও পরিচিত। প্রাগার্য যুগে ভারতে ছিল দ্রাবিড় জাতির প্রাধান্য। আর্যদের ভারত প্রবেশের পর ইতস্ততঃ বহু যুদ্ধের শেষে পরাজিত দ্রাবিড়রা বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে পালিয়ে যান দক্ষিণে—তাঁদের বংশধররা আজও সেই অঞ্চলের অধিবাসী। আর্যদের অধিকার ও বসতির ক্রমবিস্তারের সংগে সংগে আর্য (হিন্দু) সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থাও দৃঢ়মূল হয়ে বসতে লাগল ভারতের মাটিতে। সুদীর্ঘ চার হাজার বছর অতীত হলেও আজও তা শিথিল হয়ে যায়নি। ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী আজও হিন্দু সভ্যতার গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, আজও তারা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে গৌরব বোধ করে। তবে আজ হিন্দু সভ্যতা,

হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় সুদূর অতীতে তা বোঝাত না। বিভিন্ন সময়ে আক্রান্ত বা আক্রমণকারী বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের সভ্যতা, ধর্ম বা সমাজ-ব্যবস্থার অনেক কিছু জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে হিন্দু সভ্যতা, ধর্ম বা সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ লাভ করে তার অংগীভূত হয়ে পড়েছে। শস্যশ্যামল ভারতের শ্যামশ্রী বহু জাতিকেই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করতে প্রলুব্ধ করেছে এবং যুগে যুগে বিভিন্ন দুর্ধর্ষ জাতি প্রলুব্ধ হয়ে উত্তর-পশ্চিমের অসংখ্য গিরিপথের সাহায্যে প্রবেশও করেছে ভারতের অভ্যন্তরে। তারপর ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যে, ভারতের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট হয়ে ভারতকেই গ্রহণ করে নিয়েছে তাদের স্বদেশ বলে। আর্য সভ্যতাকে তারা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছে, আর্য সমাজের বিরাট দেহে তারা লীন হয়ে গিয়েছে—শেষ পর্যন্ত এমনভাবেই তারা ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের আলাদা করে চিনে ওঠা আজ দুষ্কর। [এ অবশ্য প্রাক্-মুসলমান যুগের কথা। মুসলমানরা ভারতে প্রবেশ করেছেন আজ থেকে প্রায় ন'শো বছর আগে। তাঁরা কিন্তু তাঁদের পৃথক্ অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র ঐতিহ্য নিয়ে হিন্দুজাতি ও হিন্দু-সমাজের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বাস করে আসছেন। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের কথাও তাই। তাঁরাও হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন নি।]

যাই হোক, ভারতে প্রবেশ করার পর আর্যদের সংগে সংঘর্ষ বাধে সুসভ্য দ্রাবিড়দের ও ভারতের আদিবাসী বহু অসভ্য জাতির। যুদ্ধে দ্রাবিড় বা আদিবাসীরা অবশ্য শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। তবে তাঁদের সভ্যতা, ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার অনেক বৈশিষ্ট্যই ক্রমে ক্রমে আর্য সভ্যতা, ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার অংগীভূত হয়ে পড়ে। এইভাবেই দ্রাবিড় ও অন্যান্য আদিবাসীদের এবং পরে বিদেশাগত বহু জাতির সভ্যতা, ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার বহু বৈশিষ্ট্য আত্মীকরণের ফলে বিভিন্ন কালে আর্য সভ্যতা, ধর্ম বা সমাজ-ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটতে থাকে। আবার কখনও বা অন্য সভ্যতা, ধর্ম বা সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই হিন্দু সভ্যতা,

ধর্ম বা সমাজ-ব্যবস্থায় প্রয়োজনমতো কঠোরতা বা শিথিলতা অবলম্বন করতে হয়েছে। তারও ফলে এই সভ্যতা, ধর্ম বা সমাজ-ব্যবস্থায় রূপান্তর দেখা দিয়েছে সময়ে সময়ে। প্রয়োজনমতো রূপান্তর সাধনের এই প্রক্রিয়া আজও চলেছে। তবে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রূপান্তর সত্ত্বেও হিন্দু সভ্যতা, ধর্ম বা সমাজ-ব্যবস্থা আজও এক অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়েই বেঁচে রয়েছে, এবং এই বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ যে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে নিহিত রয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে।

প্রকৃতি ভারতকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে যেমন বৈশিষ্ট্য দিয়েছে তেমনি ভারতের অভ্যন্তরেও তার প্রভাব সামান্য নয়। ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতকে তিনটি বিশেষ অঞ্চলে ভাগ করা হয়ে থাকে : (১) হিমালয়ের অধিত্যকা প্রদেশ, (২) সিন্ধু-গঙ্গা-বিধৌত সমতল অঞ্চল, আর (৩) দাক্ষিণাত্য —দাক্ষিণাত্যের যে অংশ কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত, ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তার নাম দিয়েছেন 'সুদূর দক্ষিণ'।

এর মধ্যে হিমালয়ের অধিত্যকা প্রদেশের (অর্থাৎ কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি অঞ্চলের) ইতিহাস বহুলাংশে ভারতের সাধারণ ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন। ভারতের ইতিহাসে তাই তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন স্থান নেই। সিন্ধু-গঙ্গা-বিধৌত সমতল অঞ্চলের গুরুত্বই ভারত-ইতিহাসে সর্বাধিক। ভারতীয় আর্য সভ্যতার বিকাশ এই অঞ্চলেই প্রথম দেখা দেয়—অতীতে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক গুরুত্বও ছিল সমধিক। সেযুগে সময়ে সময়ে রাজনৈতিক ঐক্য বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়েছিল এই অঞ্চলেই।

দক্ষিণ ভারত ('সুদূর দক্ষিণ' সমেত) দ্রাবিড় সভ্যতার লীলাভূমি। আর্যদের সংগে সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে দ্রাবিড়রা বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতে পালিয়ে গিয়ে সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। আর্য প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বহুদিন তাঁরা তাঁদের নিজেদের সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থার ধারা অব্যাহতভাবে অনুসরণ করে চলতে পেরেছিলেন। কালক্রমে অবশ্য তাঁদেরও আর্য সভ্যতা, ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাব ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের অধীন

হয়ে পড়তে হয়। তবে এখনও দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা ভাষা, ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁদের দ্রাবিড় উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে দেননি। আজও তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থায় প্রাগার্য বৈশিষ্ট্য প্রচুর পরিমাণেই বর্তমান রয়েছে। তবে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত কোন দক্ষিণ ভারতীয় রাজাই উত্তর ভারতে স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। তাছাড়া, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ-ভারতের বিবরণও বিশেষ কিছু আজ পর্যন্ত জানা যায় নি। তাই ভারত-ইতিহাসের দিক থেকে এ অঞ্চলও আর্য সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র সিন্ধু-গঙ্গা-বিধৌত সমতলভূমি উত্তরাপথ বা আর্যাবর্তের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ভারতকে উপরিলিখিত তিনটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত করেই প্রকৃতি ক্ষান্ত হয় নি। অসংখ্য নদ-নদী, ছোট-বড় বহু পাহাড়-পর্বত ভারতকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে রেখেছে। সুদূর অতীতে এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করে এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাতায়াত এখনকার মতো সহজসাধ্য ছিল না। সেকালে তাই এই সমস্ত অংশে স্বতন্ত্র রাজ্য, স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই বিচ্ছিন্নতার জন্যে সে-সময় যেমন এক এক অংশে এক এক ধরণের শাসন-ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি গড়ে ওঠে, তেমনি বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাজনৈতিক অনৈক্যও দেখা দেয়। বিদেশাগত শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অংশ একত্রবদ্ধ হয়ে বাধা দিতে অগ্রসর হত না। ফলে, আক্রমণকারী সহজেই জয়লাভে সমর্থ হত। প্রকৃতি-প্রভাবিত এই অনৈক্যই অতীতে বহুবার ভারতের স্বাধীনতালোপের কারণ হয়েছিল।

দেশবাসীর চরিত্রগঠনেও ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের প্রভাব অসামান্য। ভারতে প্রকৃতি বিচিত্ররূপিণী। কোমলে কঠোরে, শ্যামলে ধূসরে কোথাও মধুরা কোথাও বা উগ্রা। কোথাও ভূমিভাগ অতি উর্বর, শস্যপ্রাচুর্যে সমৃদ্ধিমান্—কোথাও বা দিগন্তবিস্তার মরু ভূমির প্রাণরস শোষণ করে আপন জ্বালায় জ্বলছে ধূ-ধূ করে। তবে ভারতের বেশির ভাগ অঞ্চলই শস্যশ্যামল, শুষ্ক মরু অঞ্চল সামান্যই। ভারতের এই শস্যসমৃদ্ধি যেমন যুগে যুগে বিদেশীয়

আক্রমণকারীদের প্রলুব্ধ করে টেনে এনেছে ভারতের বুকে, তেমনি আবার ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের অধিবাসীদেরই পরিশ্রম-বিমুখ ও আলস্যপরায়ণ করে তুলেছে। উর্বর ভূমিতে সামান্য পরিশ্রমেই শস্যোৎপাদন সম্ভব হওয়ায় জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয় নি। তাই তারা কালক্রমে পরিশ্রমবিমুখ হয়ে পড়েছিল। তবে জীবিকা সংগ্রহের জন্যে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন না হওয়ায় ভারতবর্ষের শস্যসমৃদ্ধ অঞ্চলের অধিবাসীরা অবসরও পেত প্রচুর এবং সেই অবসর তারা কাজেও লাগিয়েছিল ভালভাবেই। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চাও তাই সেই সুদূর অতীতেও সম্ভব হয়েছিল ভারতের মাটিতে ; আর শুধু চর্চাই হয়নি, তদানীন্তন পৃথিবীতে এই সমস্ত বিষয়ে শীর্ষস্থানও অধিকার করেছিল আমাদের এই ভারতবর্ষ।

তবে পার্বত্য ও মরুভূমি-সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকতর পরিশ্রম করতে হত জীবিকা সংগ্রহের জন্যে। তাই এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা সমতলভূমির অধিবাসীদের চেয়ে অধিকতর পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হত।

তিনদিকে সমুদ্র-বেষ্টিত ভারতের উপকূলভাগ সুদীর্ঘ, প্রায় ৫০০০ মাইল তার বিস্তার। স্বভাবতঃই এই সমস্ত উপকূলাঞ্চলের অধিবাসীরা সুদক্ষ নাবিক হয়ে উঠেছিল। সেই সুদূর অতীতেও ভারতের নাবিকরা দুস্তর সাগরবক্ষে পাড়ি দিয়ে ভারতের পণ্য তাদের জাহাজে করে নিয়ে যেত দূর দূর দেশের বাজারে। শুধু তাই নয়, ভারত মহাসাগরের বুকে সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপে ভারতের বহু উপনিবেশ, এমন কি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যও গড়ে উঠেছিল।

মূলীভূত ঐক্য—ভারত শুধু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যেই বিচিত্র নয়—বহু জাতি, বহু ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, নানারকমের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি এই বিচিত্রতাকে বিচিত্রতর করে তুলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বৈচিত্র্য এই বিভিন্নতার মাঝেও এক মূলীভূত মহান্ ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথমেই বলতে হয় ভৌগোলিক ঐক্যের কথা। ভারত পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা পৃথগ্‌ভূত। সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। এই ভৌগোলিক ঐক্যের সংগেই ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীর মনোভাবের ও আদর্শের ঐক্য উল্লেখযোগ্য। সুপ্রাচীন কাল থেকেই সমগ্র দেশ 'ভারতবর্ষ' নামে অভিহিত হয়ে আসছে। এই দেশের সমস্ত অধিবাসীই বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নতা সত্ত্বেও 'ভারতবাসী' বলে গৌরব বোধ করে। এই দেশের অধিকাংশ অধিবাসী, অর্থাৎ হিন্দুরা, একই ঐতিহ্যের গৌরবান্বিত উত্তরাধিকারী। বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সমস্ত হিন্দুর কাছেই শ্রদ্ধার ও আদরের জিনিস। চিন্তা, আদর্শ ও মনোভাবের এই সুমহান্ ঐক্য ভারতীয়দের চরিত্রে একটা বিশিষ্টতা দান করেছে, যে বিশিষ্টতা কেবল ভারতীয় চরিত্রেই দেখতে পাওয়া যায়, অন্যত্র নয়।

রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত না হলেও তা প্রতিষ্ঠার কল্পনা সুদূর অতীত থেকেই ছিল। কোন রাজা অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞ করতেন একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র দেশকে এক শাসনের অধীনে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে। 'রাজচক্রবর্তী' শব্দও এই উদ্দেশ্যেরই ইঙ্গিত দেয়।

কবির কথা সামান্য অদল-বদল করে তাই বলতে হয় যে, ভারতে যদিও

"নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান"

তবু "বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্॥"

প্রশ্ন

১। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিভাগগুলির বিবরণ দাও।

[Describe the physical divisions of India.]

২। ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে ভারতীয়দের চরিত্র ও রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে, আলোচনা কর।

[Critically examine the influence of the physical characteristics of India on the character and political life of her people.]

॥ ভারত-ইতিহাসের উপাদান ॥

সুপ্রাচীন কালের ভারত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও পর্যন্ত সীমাবদ্ধই রয়ে গিয়েছে। তার কারণ, সেকালে আধুনিক কালের মতো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ইতিহাস রচিত হত না। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাল নিরূপণ করতেন। অনেকে যে কোন্ সূত্র অনুসারে কাল নিরূপণ করে গেছেন তা আজও সঠিক নির্ণীত হয় নি। ফলে, তাঁদের রেখে-যাওয়া বিবরণ থেকে কোন্ ঘটনা কখন ঘটেছে তা সঠিক জানা যায় না। তাছাড়া, শেষ পর্যন্ত যাঁদের কাল-নিরূপণ-পদ্ধতি ধরাও গিয়েছে তাঁদেরও লেখা থেকে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য বলে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য তাও সঠিক বলা যায় না। কারণ, তাঁদের রচনায় ইতিহাস ও গল্প এমন মিশে গিয়েছে, সত্য ও অতিরঞ্জন এমন গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে যে, সারবস্তু উদ্ধার করে সেকালের পূর্ণাংগ ইতিহাস পুনর্গঠন করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। উপাদানের অভাব অবশ্য নেই, কিন্তু উপাদানগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী নয়, তাই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া, অনেক উপাদান অবশ্য কালগ্রাসে এবং বিভিন্ন সময়ে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে নষ্ট হয়ে গেছে। তবে ঐতিহাসিকদের চেষ্টার অবশ্য ত্রুটি নেই, অতীত ভারতের ইতিহাস রচনার জন্যে নির্ভরযোগ্য উপাদান সংগ্রহে তাঁরা সর্বদাই ব্যস্ত রয়েছেন। বর্তমানে নিম্নলিখিত উপাদানগুলিই ভারতের অতীত ইতিহাস রচনায় তাঁরা কাজে লাগিয়ে থাকেন সবচেয়ে বেশি।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

ক্ষোদিত লিপি—ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রাপ্ত ক্ষোদিত লিপিগুলি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার এক অতি মূল্যবান উপাদান।

ক্ষোদিত লিপি প্রধানতঃ তিন রকমের—শিলালিপি, স্তম্ভলিপি আর তাম্রশাসন। কোন বিশেষ ঘটনার বিবরণ বা রাজকীয় উপদেশই সাধারণতঃ

শিলালিপি বা স্তম্ভলিপিতে উৎকীর্ণ করা হত জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তির জন্যে। এই সমস্ত লিপি থেকে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য জানতে পারা যায়। এশিয়া মাইনরের 'বোঘাজ কোই' শিলালিপি থেকে আর্যদের ভারত প্রবেশ সম্বন্ধে কিছু আলো পাওয়া যায়। 'বেহিস্তন লিপি' থেকে পারস্য সম্রাটের উত্তর-পশ্চিম ভারত বিজয়ের কাহিনী জানা যায়। সম্রাট অশোকের ও গুপ্ত সম্রাটদের লিপি থেকে তাঁদের সময়কায় ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাস কিছু কিছু জানা যায়। কলিংগরাজ খারবেলের হাতীগুম্ফা লিপি এবং সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি থেকে তাঁদের বিজয়-কাহিনীর সংগে সংগে তাঁদের সময়কার অনেক তথ্যও জানা যায়।

তামার পাতের ওপর ক্ষোদাই করা তাম্রশাসন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অনেক পাওয়া গিয়েছে ; এই সমস্ত তাম্রশাসন সেকালে ভূ-সম্পত্তি দান-বিক্রয়ের দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হত।

দাতা দানপত্রটি তামার পাতে ক্ষোদাই করে গ্রহীতাকে দিতেন। গ্রহীতা তাঁর মালিকানার প্রমাণ হিসেবে সেই তাম্রশাসনটি রেখে দিতেন নিজের কাছে। পরে তা থেকে যেত তাঁদের বংশে। প্রাচীন রাজাদের দেওয়া এই ধরণের বহু তাম্রশাসন ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। অনেক তাম্রশাসনে রাজাদের কুলপঞ্জী, রাজার নাম ও রাজ্যকাল, রাজ্যের সীমা, যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণ প্রভৃতি অনেক মূল্যবান তথ্যও উৎকীর্ণ রয়েছে।

মুদ্রা—প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—বিভিন্ন রাজার সময়ে প্রচলিত মুদ্রা। প্রাচীনকালে কোন্ রাজা কোন্ সময়ে রাজত্ব করেছিলেন, তা নির্ণয় করা বড় কঠিন। সেযুগের মুদ্রাগুলি থেকে এ বিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। মুদ্রায় ক্ষোদিত রাজার নাম ও তারিখ সেই রাজার রাজত্বকাল নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে (এমন অনেক মুদ্রা অবশ্য পাওয়া গিয়েছে যাতে রাজার নাম বা তারিখ কিছুই নেই)। কোন কোন মুদ্রা থেকে মুদ্রাংকিত রাজার বিশেষ কোন ধর্ম বা শিল্পের প্রতি অনুরাগেরও পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, কোন কোন কুষাণ

পণ্ডিচেরীতে রাখা ফরাসীদের কাগজপত্র এবং ওলন্দাজদের নথিপত্র, 'সিয়ার্-উল মুতাক্ষরিন্' নামের বই, পেশোয়া দপ্তরের কতকগুলি নথিপত্র, আনন্দরংগ পিল্লাই লিখিত 'রোজনামচা,' সমসাময়িক ইংরেজদের লিখিত বিবরণ এবং চিঠিপত্র এই আমলের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে কম সাহায্য করে না। জেমস মিল-এর ব্রিটিশ-ভারতের ইতিহাস ; উইল্কস-এর মহীশূরের ইতিহাস, ডাফ-এর মারাঠাদের ইতিহাস এবং কানিংহাম-এর শিখদের ইতিহাস থেকেও ইংরেজ আমলের ভারত সম্পর্কে অনেক মূল্যবান্ তথ্য জানা যায়।

প্রশ্ন

প্রাচীন মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিক তথ্যনির্ণয়ে কোন্ কোন্ জিনিস সবচেয়ে সাহায্য করেছে? সেগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(অথবা, ভারত-ইতিহাসের প্রধান উপাদানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও)।

[Describe, in brief, the most important sources of ancient, medieval and modern India.]

॥ প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ॥

প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন ভারতের বিবরণ—প্রত্ন (=প্রাচীন)+তত্ত্ব (জ্ঞান), অর্থাৎ প্রাচীন পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণই হল প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাজ। বিভিন্ন দেশের প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাঁদের দেশের সুপ্রাচীন কালের বিবরণ জানবার জন্যে নানা ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ভূগর্ভ খনন করে, পর্বতগাত্র প্রভৃতিতে অনুসন্ধান চালিয়ে, প্রাচীন নগরী দেবমন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করে প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করে চলেছেন। আমাদের দেশের প্রত্নতাত্ত্বিকরাও নিশ্চেষ্ট নেই। তাঁদেরই চেষ্টায় ভারতের প্রত্নপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগের অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য, প্রাগার্য যুগেও যে ভারতে এক সুমহান্ সভ্যতা বর্তমান ছিল তার বিবরণ প্রভৃতি আমরা জানতে পারি।

প্রত্নতত্ত্বের যাদু—প্রত্নতাত্ত্বিক যেন যাদুকর। তেমনই রহস্যময়, তেমনই বিস্ময়কর তাঁর কৃতিত্ব। ভাঙা বাড়ী, ইট, কাঠ, পাথর, কয়েকখানা হাড়ের টুকরো কিংবা তামা কি লোহার টুকরো থেকে হাজার হাজার বছর আগেকার বাড়ী-ঘর-দোর, মানুষ, সেকালের মানুষের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির বিস্ময়কর ছবি তিনি তুলে ধরেন আমাদের চোখের সামনে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, যে-কোন উপন্যাসের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কাহিনী।

এমনি এক আকস্মিক ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলেই ভারতে সিন্ধু নদের উপত্যকা যে পাঁচ হাজার বছর আগেও এক সুসভ্য জাতির বাসভূমি ছিল তা জানা গেছে। এই সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার অস্তিত্ব আবিষ্কারের প্রধান কৃতিত্ব প্রাপ্য একজন বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিকের। তাঁর নাম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই চেষ্টায় আজ থেকে প্রায় ছত্রিশ বছর আগে সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার অন্তর্গত মোহেঞ্জোদড়ো নামক স্থানে একটি অতি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। শহরটি তাম্রযুগের। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস

বাবু এখানে খননকার্য আরম্ভ করান। পরে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্যার জন্ মার্শাল এই কাজ চালিয়ে যান। এই খননকার্যের ফলে ভারতীয় সভ্যতার সুপ্রাচীনত্ব সন্দেহাতীতরূপেই প্রমাণিত হয়েছে। কেবলমাত্র মোহেঞ্জোদড়োতেই নয়, পশ্চিম-পঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থানে এবং সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের আরও কয়েকটি স্থানেও এই সুপ্রাচীন সভ্যতার নানা চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধুনদের তীরে এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চলে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতাকে 'সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা' বলা হয়। মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা আবিষ্কারের ফলে বোঝা গিয়েছে যে, প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেও ভারতের এই সমস্ত অঞ্চলে এক সুসভ্য জাতির বাস ছিল। কিন্তু এখানে যে-সব শীলমোহর পাওয়া গিয়েছে, তাতে ক্ষোদিত লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয়নি। তাই সিন্ধু সভ্যতার অনেক বিবরণই এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে। তবে সেকালে এই অঞ্চলের সুসভ্য অধিবাসীরা কীভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত সে সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আমরা করতে পারি।

আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ থেকে সেই প্রাচীন যুগের নগর পরিকল্পনা সম্বন্ধে সুন্দর ধারণা পাওয়া যায়। মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা দুইই ছিল সমৃদ্ধিশালী নগর। মোহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত নগরটি বেশ বড় এবং এখানে বহু ছোট বড় বাসগৃহও পাওয়া গিয়েছে। এগুলি পোড়া ইটের তৈরী। বড় বড় দোতলা বাড়ী যে সেকালেও তৈরী হত তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এই সমস্ত বাড়ীতে দোতলায় ওঠার জন্যে সরু সরু সিঁড়িরও ব্যবস্থা ছিল। ঘরে দরজা-জানালা থাকত। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই কূয়া, নর্দমা ও স্নানাগার দেখা যায়। মোহেঞ্জোদড়োয় একটি সুবৃহৎ স্নানাগারও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সুবৃহৎ স্নানাগারটির ঠিক মাঝখানে একটি বৃহৎ উন্মুক্ত চতুষ্কোণাকৃতি আংগিনা আছে। আংগিনাটির চারিদিকে ঘর এবং মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি সন্তরণবাপী। তার দৈর্ঘ্য ৩৯ ফুট, প্রস্থ ২৩ ফুট আর গভীরতা ৮ ফুট। এই সুবৃহৎ স্নানাগারটি দৈর্ঘ্যে ছিল ১৮০ ফুট ও প্রস্থে ১০৮ ফুট।

এর গাঁথুনি এমনই শক্ত ছিল যে, পাঁচ হাজার বছরেও এর কিছুই নষ্ট হয়নি।

রাস্তা-ঘাট—শহরের রাস্তা-ঘাটও বেশ বড় আর সোজা ছিল। রাস্তার ধারে ধারে আবর্জনা ফেলার জন্যে আবর্জনাধার এবং জল-নিকাশের জন্যে নালা-নর্দমার ব্যবস্থাও ছিল খুবই সুন্দর। এই রাস্তা দিয়ে বড় বড় লোকেরা বোধ হয় রথে চড়ে ঘোরাফেরা করতেন—রাস্তার বুকে তাঁদের রথের চাকার দাগ এখনও মিলিয়ে যায়নি অনেক জায়গাতেই। হাজার হাজার বছর আগেও যে আমাদের দেশে এমন সুন্দর স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সম্মত শহর গড়ে উঠেছিল, একথা ভাবতে গেলেও আনন্দে গর্বে আমাদের বুক ভরে ওঠে।

যে সব জিনিস পাওয়া গেছে এখানকার মাটির নিচে থেকে, তা থেকেই এখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের পোশাক, পেশা, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক খবরই আন্দাজ করে নেওয়া যায়।

পোশাক—সেকালে এখানকার লোকেরা সাধারণতঃ সূতী পোশাকই পরতেন, তবে শীতকালে পশমের পোশাকও যে ব্যবহার করতেন না, তা নয়। সোনা, রূপো, তামা, হাতীর দাঁত প্রভৃতি দিয়ে তৈরী যে সমস্ত সুন্দর গহনা পাওয়া গিয়েছে মাটির নিচে থেকে, তা থেকেই বোঝা যায় যে, এখানকার মেয়ে-পুরুষ সবাই গহনা পরতে খুবই ভালবাসতেন।

দৈনন্দিন জীবনধারা—চাষ-আবাদ ছিল এখানকার সাধারণ লোকদের প্রধান উপজীবিকা—গম, যব, তূলো, এই সবেরই চাষ হত বেশি। কামার, কুমোর, তাঁতী, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, স্যাক্‌রা, মণিকার—শ্রমশিল্পীদের ভেতর এদের স্থান ছিল খুবই উঁচুতে। ভারতের অন্য অন্য জায়গার সংগেই শুধু নয়, এশিয়ার নানান্ দেশের সংগেই এখানকার লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। টিন, তামা, দামী দামী পাথর—এসব এঁরা আনাতেন ভারতের বাইরে থেকে।

শিল্প—পাঁচ হাজার বছর আগেও শিল্প-বিদ্যায় এঁরা কতদূর উন্নতি করেছিলেন তা এঁদের কুমোরের চাকা, ইট পোড়াবার উনুন, ধাতু

গলানোর কৌশল ইত্যাদি থেকেই বোঝা যায়। কুমোরের চাকায় তৈরী নানারকম মাটির বাসনও পাওয়া গেছে মাটির নিচে থেকে। তামা, ব্রোঞ্জ, রুপো আর চীনেমাটির বাসনপত্রও পাওয়া গেছে, তবে খুব বেশি নয়। লোহার জিনিস কিন্তু মোটেই পাওয়া যায়নি। মনে হয়, লোহার ব্যবহার অজানা ছিল সিন্ধুতীরের এই সুসভ্য লোকদের। পোড়ামাটির তৈরী কাপড়-বোনার যন্ত্রপাতি; হাড়ের আর হাতীর দাঁতের চিরুনি, ছুঁচ; তামা আর ব্রোঞ্জের তৈরী কুড়ুল, বাটালি, ছুরি, কাস্তে, ক্ষুর; ছোট ছোট তিনকোণা পাথরের টুকরো ইত্যাদি অনেক কিছুই পাওয়া গেছে মাটির নিচে থেকে। মনে হয়, এগুলো ছিল এঁদের নিত্য-ব্যবহারের জিনিসপত্র। তিনকোণা পাথরের টুকরোগুলো বোধ হয় ওজনের বাটখারা হিসেবেই ব্যবহার করা হত।

চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য—সিন্ধুতীরের এই সুসভ্য অধিবাসীরা শিল্পবিদ্যাতেও খুবই অগ্রসর ছিলেন। শীলমোহরের ওপর ক্ষোদাই-করা ষাঁড় আজও যেন জীবন্ত বলেই মনে হয়। চীনেমাটির বাসনের ওপর ফুল, পাতা, পাখী, হরিণ ইত্যাদির সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো দেখলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। অনেকগুলো মানুষের মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। তবে দুঃখ এই যে, এইসব সুন্দর সুন্দর মানুষের মূর্তির বেশির ভাগেরই হাত, পা বা মাথা গেছে ভেঙে।

ধর্ম—এখানকার অধিবাসীদের ধর্ম যে কি ছিল তা সঠিক বোঝা যায় না। দেখতে অনেকটা শিবমূর্তির মতো অনেকগুলো মূর্তি, আর মাতৃকা-দেবীর বহু মূর্তিও অবশ্য পাওয়া গেছে মোহেঞ্জোদড়োতে, কিন্তু তা থেকে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তবে অনুমান হয় যে, সে সময়ে নানারকম জীব-জন্তু, গাছপালাকেও ঠাকুর দেবতার মতো মানা হত। মৃতদেহ এঁরা কখনও পোড়াতেন, কখনও কবর দিতেন।

যুদ্ধাস্ত্র—তামা আর ব্রোঞ্জের তৈরী পরশু, বর্শা, ছোরা, গদা, বাঁটুল—এই সবই ছিল এঁদের সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধাস্ত্র। ঢাল, শিরস্ত্রাণ এসব কিন্তু

পাওয়া যায়নি। মনে হয় এসবের ব্যবহার তখন এদেশে প্রচলিত ছিল না।

প্রশ্ন

১। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার একটি বিবরণ লেখ।

[Give a short description of the old Indus Valley civilization.]

২। সিন্ধু-উপত্যকায় আবিষ্কৃত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলি থেকে সেকালের সিন্ধু-উপত্যকাবাসীদের জীবনযাত্রার কি পরিচয় পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[What light do the relics of the old Indian civilization, discovered in the Indus Valley, throw on the life of the ancient dwellers of the valley ?]

॥ আর্য যুগ ॥

আর্যদের ভারতে আগমন—সিন্ধুনদ-বিধৌত উপত্যকায় প্রাগার্য সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। তার প্রায় এক হাজার বছর পরে মধ্য এশিয়া বা য়ুরোপের কোন দেশ থেকে সুসভ্য আর্যজাতির এক শাখা ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁরাও প্রথমে সিন্ধুনদের শস্যসমৃদ্ধ উপত্যকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। সিন্ধুতীরের অধিবাসী বলেই পরবর্তী কালে তাঁরা হিন্দু (সিন্ধু>হিন্দু) বলে অভিহিত হন।

ভারত-প্রবেশের পর বহুদিন তাঁদের আদিবাসী অসভ্য জাতিদের ও প্রাগার্য যুগের সভ্য অধিবাসী দ্রাবিড়দের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতে হয়। এই দ্রাবিড়রা বোধ হয় সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্য জাতির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাঁদের পরে বা সমসময়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত আর্যদেরই জয় হয় এবং আদিবাসী অসভ্যরা বনে-জংগলে পর্বতগুহায় এবং দ্রাবিড়েরা বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতে পলায়ন করেন। এঁদের মধ্যে অনেকে আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করে আর্যসমাজভুক্ত হয়ে পড়েন। তবে আর্যসমাজের নিম্নতম স্তরেই তাঁদের স্থান হয়।

ক্রমে ক্রমে আর্যরা উত্তর ভারতে বসতি বিস্তার করতে থাকেন। বহুদিন পরে বহু চেষ্টার ফলে দক্ষিণ ভারতেও আর্যরা বসতি স্থাপনে সমর্থ হন। বসতি বিস্তারের সংগে আর্যসভ্যতার অত্যুজ্জ্বল প্রভাবও সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে—ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী আজ সেই সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলে গর্ব বোধ করেন। সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই আর্যরা যে সুমহান্ ঐতিহ্য রেখে গেছেন, সুদীর্ঘ চার হাজার বছর পরেও তা অধিকাংশ ভারতবাসীরই গর্বের বস্তু।

বৈদিক সাহিত্য—আর্যদের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ **বেদ**। বেদ শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। সেই সুদূর অতীতে ভারতীয় আর্যরা যে অতি উন্নত ধরণের চিন্তাধারার পরিচয় রেখে গেছেন বৈদিক সাহিত্যে, আজও তা বিশ্বের বিস্ময়

উদ্রেক করে। সকল শ্রেণীর হিন্দুই আজও বেদকেই তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলে শ্রদ্ধা করেন।

বেদ চারটি—**ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব**। প্রাচীনতম বেদ হল ঋগ্বেদ আর সবচেয়ে পরবর্তী হল অথর্ববেদ।

আর্যরা যে সময় সিন্ধুনদের তীরে এসে বসতি স্থাপন করেন ঋগ্বেদ সম্ভবতঃ সেই সময়কারই রচনা। কেননা গংগা-যমুনা নদীর উল্লেখ থাকলেও, যে সমস্ত নদীর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় তা সিন্ধু নদেরই শাখা-প্রশাখা। যজুর্বেদে আর্যবসতির বিস্তারের সংবাদ পাওয়া যায়। সিন্ধুনদের তীর থেকে আর্যরা তখন মাঝের সমতলভূমিতে কুরুক্ষেত্র (শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী সমতলভূমির পূর্বাঞ্চল) ও পাঞ্চালে (গংগা-যমুনার মধ্যবর্তী সমতলভূমি) ছড়িয়ে পড়েছেন। ঋগ্বেদে যে ধরণের ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার উল্লেখ আছে, যজুর্বেদে তার কিছু রূপান্তর দেখা যায়। ঋগ্বেদের যুগে প্রকৃতির রূপের বিভিন্ন অভিব্যক্তির সরল উপাসনাই ছিল আর্যদের ধর্ম। যজুর্বেদের যুগে উপাসনার এই সারল্যের জায়গায় যাগযজ্ঞের আনুষ্ঠানিক জটিলতারই প্রাধান্য ঘটেছিল। যজুর্বেদের সময় সমাজে তাই পুরোহিতদেরই প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের যুগে আর্য সমাজে বর্ণ-বিভেদের সামান্যতম আভাসমাত্র লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু যজুর্বেদের যুগে বর্ণ-বিভেদের রূপ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। চতুর্বর্ণ ছাড়া অনেক উপবর্ণেরও উল্লেখ পাওয়া যায় যজুর্বেদে। তাছাড়া যজুর্বেদের সময়ে আর্য সভ্যতার সঙ্গে অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণেরও আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে আর্যদের সর্প-পূজার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, যজুর্বেদে পাওয়া যায়। মনে হয় অনার্যদের কাছ থেকেই এই উপাসনাটি যজুর্বেদের যুগে আর্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে ঋগ্বেদই আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্যসৃষ্টি, যজুর্বেদ তার বেশ কিছু পরেকার রচনা। সামবেদের নিজস্ব কোন মূল্য নেই; এর শ্লোকগুলির বেশির ভাগই ঋগ্বেদ থেকে নেওয়া এবং উপাসনার সময় যাতে গাওয়া যায় সেইভাবে স্বর দেওয়া। অথর্ববেদ অনেক পরেকার রচনা—জনগণের মধ্যে

প্রচলিত ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র আর নানারকম ওষধির গুণাগুণের কথাই এতে পাওয়া যায়। সাহিত্য হিসেবে অথর্ববেদ অনেক নিকৃষ্ট ধরণের রচনা, তবে পরবর্তী কালের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বীজ এর মধ্যে নিহিত আছে বলে এর মূল্য একেবারে সামান্য নয়।

প্রত্যেক বেদেরই আবার তিনটি করে ভাগ আছে—**সংহিতা, ব্রাহ্মণ (আরণ্যক-সমেত)** আর **উপনিষদ্**। সংহিতা অংশের বেশির ভাগই পদ্যে লেখা, ব্রাহ্মণ ভাগের রচনা গদ্যে। আরণ্যক ভাগ হল ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট—বানপ্রস্থ অবলম্বন করে যাঁরা সংসার ত্যাগ করে অরণ্যে বাস করতেন, তাঁদের করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ এই অংশে লিপিবদ্ধ রয়েছে। উপনিষদ্‌গুলি বেদের ব্রাহ্মণভাগের শেষাংশ ঃ এইজন্যে সেগুলিকে বেদান্তও বলা হয়। উপনিষদ্‌গুলি সাধারণতঃ গদ্যেই রচিত ; তবে কতকগুলি সম্পূর্ণ এবং কতকগুলি আংশিক পদ্যেও রচিত হয়েছিল।

উপনিষদ্‌গুলি ভারতীয় দর্শনের পরম উন্নতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—পৃথিবীর দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে এদের স্থান খুবই উঁচুতে। উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া শিক্ষা (উচ্চারণ-পদ্ধতি), কল্প (যজ্ঞের বিধি), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দের ব্যুৎপত্তি), ছন্দ এবং জ্যোতিষ নামে ছ'খানি **বেদাঙ্গ** এবং সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা নামে ছ'খানি **দর্শন** আছে।

বৈদিক ধর্ম—বৈদিক সাহিত্য থেকে বৈদিক যুগের আর্যদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে অসংখ্য দেবতার উল্লেখ আছে। তাঁদের মধ্যে দ্যুলোকের দেবতা আদিত্য, অন্তরীক্ষের দেবতা ইন্দ্র বা মরুৎ এবং পৃথিবীর দেবতা অগ্নি ও সোম প্রধান। এ থেকে বোঝা যায় যে, বৈদিকযুগে আর্যরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পূজো করতেন। এক এক সময়ে এক একটি দেবতা সর্বপ্রধান বলে পূজিত হতেন। কিন্তু বহু দেব-দেবীর

উপাসনা করলেও আর্যরা সেই সুদূর অতীতেও উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই সমস্ত দেব-দেবী একই মহাশক্তির বিভিন্ন রূপ।

প্রথমে আর্যদের উপাসনা-পদ্ধতি ছিল খুব সরল। ক্রমে যাগযজ্ঞই প্রধান হয়ে ওঠে। সন্তান-সন্ততি এবং গোধন লাভ ও বৃদ্ধি এবং শত্রুনাশ প্রভৃতি পার্থিব সুখভোগের জন্যেই যাগযজ্ঞ করা হত। ব্রাহ্মণের যুগে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক্রমেই জটিলতর হয়ে উঠল। এই সমস্ত অনুষ্ঠান ভালভাবে পরিচালনা করার জন্যে হোতা, অধ্বর্যু ও উদগাতা এবং তাঁদের সহকারী বহু পুরোহিতের প্রয়োজন হল। ক্রমে দেবতার চেয়ে পুরোহিতরাই উচ্চ আসন লাভ করতে লাগলেন। আন্তরিকতা এবং ভক্তির চেয়ে যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকলাপই প্রাধান্য পেতে লাগল।

বৈদিক সমাজঃ বর্ণাশ্রম বা বর্ণভেদ—প্রাচীন আর্যসমাজে যে বর্ণ বৈষম্য বর্তমান ছিল, ঋগ্বেদ-সংহিতা থেকে তার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ আছে। তবে তখন বর্ণ বৈষম্যের কঠোরতা ছিল না; এক বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের বিবাহ, নিজ বর্ণের বৃত্তি ত্যাগ করে অপর বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ বা অন্য বর্ণের হাতে অন্ন গ্রহণ প্রভৃতিতেও কোন বাধানিষেধ ছিল না। যজুর্বেদের যুগ থেকেই বর্ণ বৈষম্য ধীরে ধীরে স্পষ্টতর হতে থাকে। ক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বৃত্তি বংশগত হয়ে পড়ল। বৈশ্য এবং শূদ্রদের মধ্যে বৃত্তি অনুসারে বহু উপবর্ণের সৃষ্টি হল। অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ কঠোর থেকে কঠোরতর হতে লাগল। তবে শূদ্রদের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হল। ভারতের বিভিন্ন অংশে আর্যদের অধিকার বিস্তৃত হওয়ায় অসংখ্য অনার্যকে দাসরূপে রাখা আর আর্যদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

চতুরাশ্রম—ধর্মশাস্ত্রগুলি থেকে প্রাচীন আর্যদের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য—এই তিন বর্ণ উচ্চবর্ণ বলে সম্মানিত হতেন, এঁদের বলা হত 'দ্বিজ'। **ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ** আর **সন্ন্যাস**—এই চতুরাশ্রমের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হত দ্বিজদের।

উপনয়নের পর হতে গুরুগৃহে থেকে অধ্যয়নের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যাশ্রম। অধ্যয়ন সমাপ্তির পরে বিবাহাদি করে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করার সময় গার্হস্থ্যাশ্রম। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করে 'দ্বিজ'রা চলে যেতেন বনে—সেখানে দিন কাটাতেন ধর্মচিন্তা করে। এই আশ্রমকে বলা হত বানপ্রস্থাশ্রম। শেষ জীবনে তাঁরা সন্ন্যাস অবলম্বন করে পরমাত্মার চিন্তায় নিজেদের ডুবিয়ে রাখতেন। জীবনের এই স্তরকে বলা হত সন্ন্যাসাশ্রম।

সামাজিক আচার-ব্যবহার ঃ নারীর স্থান—বৈদিক যুগে আর্য সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার। কতকগুলি পরিবার নিয়ে ছিল এই সমাজের গঠন। সমাজের রূপ ছিল পিতৃতান্ত্রিক, দ্রাবিড় সমাজের মতো মাতৃতান্ত্রিক নয়; অর্থাৎ সমাজে পুরুষদেরই ছিল প্রাধান্য, তবে নারীরাও পেতেন উচ্চ মর্যাদা। ছেলেদের মতো মেয়েদেরও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ বেদমন্ত্র রচনা করেছিলেন। প্রাপ্তবয়স্কা হলে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত। সাধারণতঃ এক পত্নী গ্রহণ প্রচলিত হলেও বহুবিবাহ বা বিধবাবিবাহেরও প্রচলন ছিল। বাল্যবিবাহ অজ্ঞাত ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদ—বেশভূষার দিকে আর্যদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বৈদিক যুগে পরিচ্ছদের ছিল তিনটি অংশ—নীবি (কটিবন্ধ), পরিধান (বস্ত্র) এবং অধিবাস (চাদর)। তূলো, হরিণের চামড়া আর পশম দিয়ে নানা রঙের পোশাক তৈরী করা হত। স্ত্রী পুরুষ সকলে মাথায় পাগড়ী পরতেন। সোনার গহনা পরার রেওয়াজ যথেষ্ট ছিল।

খাদ্য ও পানীয়—গম আর যব ছিল আর্যদের প্রধান খাদ্য, তবে মাংস খাওয়ার রেওয়াজও ছিল—বিশেষ করে ভোজ ইত্যাদির সময়ে। সোমরস ও সুরা—এই দুই উত্তেজক পানীয়ও আর্যরা পান করতেন।

আমোদ-প্রমোদ—নাচগান, মৃগয়া, রথের দৌড়, পাশা খেলা প্রভৃতি ছিল আর্যদের আমোদ-প্রমোদের প্রধান উপকরণ।

রাষ্ট্রীয় গঠন-ব্যবস্থা—বৈদিক যুগে সামাজিক জীবনের ন্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনেরও প্রধান ভিত্তি ছিল পরিবার। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হত

একটি গ্রাম, কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি 'বিশ' বা 'জন'। গ্রামের নায়ককে বলা হত 'গ্রামণী' এবং 'বিশ্' বা 'জনে'র অধিপতিকে 'বিশ্পতি' বা 'রাজন্' (রাজা)।

রাজন্ ছিলেন তাঁর রাজ্যের সর্বময় কর্তা। বৈদিক যুগে মুখ্যতঃ রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও গণতন্ত্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজপদ সাধারণতঃ বংশগত ছিল, তবে কখনও কখনও প্রজারাও রাজা নির্বাচন করতেন। দেশরক্ষা এবং অপরাধীর বিচারই ছিল রাজার সর্বপ্রধান কর্তব্য। তিনি ছিলেন রাজ্যের প্রধান সেনাপতি আর প্রধান বিচারপতি। রাজ্যের মংগলের জন্যে যাগযজ্ঞ সম্পাদনের ভার থাকত পুরোহিতদের ওপর। সে সময় পুরোহিতদের খুবই প্রতিপত্তি ছিল; তাঁরা কেবল ধর্মানুষ্ঠানই করতেন না, শাসনকার্যেও রাজাকে পরামর্শ দিতেন। সেনানী (সেনানায়ক) ও গ্রামণীও রাজ্য-শাসনে রাজাকে সহায়তা করতেন। রাজ্যের সর্বময় কর্তা এবং প্রভূত ক্ষমতাশালী হলেও কোন রাজাই স্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন না অভিষেকের সময় প্রত্যেক রাজাকেই কর্তব্য পালনের শপথ গ্রহণ করতে হত, এবং জনগণের দুটি প্রতিষ্ঠান 'সভা' ও 'সমিতি'র নির্দেশ এবং শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলতে হত।

রাজনৈতিক অনৈক্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্যদের বিভিন্ন কুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন রাজ্যে বাস করত। এই সমস্ত রাজ্যের রাজাদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। তাঁরা পরস্পরের সংগে সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন। বৈদিক যুগের শেষদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির সম্মেলনে বিশাল বিশাল রাজ্য গঠিত হতে লাগল। শক্তিশালী রাজারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজাদের ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। যে রাজা কৃতকার্য হতেন, তাঁকে বলা হত 'একরাট্'। এইভাবে যাঁরা সার্বভৌম অধিপতি হতে পারতেন তাঁরা রাজসূয়, বাজপেয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন এবং যজ্ঞান্তে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতেন।

অর্থনৈতিক জীবন—বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্যরা গ্রামে বাস করতেন। কৃষিই ছিল তাঁদের প্রধান উপজীবিকা। জমিতে গম, যব, ইত্যাদি তাঁরা উৎপন্ন করতেন। কৃষির উন্নতির জন্যে জমিতে জলসেচ ও সার দেওয়ার ব্যবস্থাও তাঁদের অজ্ঞাত ছিল না। কৃষির মতো পশুপালনও তাঁদের জীবিকা-নির্বাহের অন্যতম উপায় ছিল। বৈদিক সভ্যতার প্রথম দিকে উৎসব অনুষ্ঠানের সময় মাংসের জন্যে গো-বধের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, তবে ঋগ্বেদের সময়েই গোজাতির প্রতি আর্যদের ভক্তিরও ইংগিত পাওয়া যায়। গোরু ছাড়া ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীও তাঁদের নানা কাজে লাগত।

বৈদিক যুগে আর্যরা মুখ্যতঃ কৃষিজীবী হলেও শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর তাঁদের অনুরাগ কম ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য চলত প্রধানতঃ দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার ভিত্তিতে, তবে 'নিষ্ক' নামে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহারও বোধহয় তাঁদের অজ্ঞাত ছিল না। সমুদ্রপথেও ব্যবসা-বাণিজ্য চলত বলে মনে হয়।

যতই দিন যেতে লাগল ততই কৃষিকার্যের ও শিল্পোৎপাদনের যন্ত্রপাতির উন্নতির সংগে সংগে শস্যাদি উৎপাদনের ব্যাপারে যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায় এবং শিল্প-বাণিজ্যেরও প্রভূত উন্নতি হতে থাকে।

আর্য ও অনার্য সভ্যতার পারস্পরিক প্রভাব—আগেই বলা হয়েছে, ভারতে প্রবেশের পর প্রাগার্য সুসভ্য অনার্য দ্রাবিড় জাতি ও আদিবাসী অসভ্য জাতিদের সংগে আর্যদের বহুদিন যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আর্যরাই জয়ী হন। দ্রাবিড়রা দক্ষিণ ভারতে ও আদিবাসীরা বনে-জংগলে ও পর্বতগুহায় আশ্রয় নেন। তবে সমস্ত অনার্যই কিছু আর পালিয়ে যাননি—অনেকেই আর্যদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তাঁদের অধীনভাবে বসবাস করতে থাকেন।

যাই হোক, বহুদিন সংঘাত সংঘর্ষ ও একত্র অবস্থানের ফলে আর্য সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থা যেমন অনার্য সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, তেমনি অনার্যদের সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থাও যে বৈদিক যুগের শেষ দিক থেকেই আর্য

সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে কিছুটা অন্তঃপ্রবেশ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সর্প-পূজার উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না, কিন্তু যজুর্বেদে দেখা যায় দ্রাবিড় সমাজে প্রচলিত এই সর্প-পূজা আর্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। ঋগ্বেদে মূর্তিপূজার উল্লেখ পাওয়া যায় না, পরবর্তী কালে সম্ভবতঃ দ্রাবিড়দের 'দৈত্য'পূজা থেকেই আর্যদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়—দ্রাবিড়দের অনেক 'দৈত্য'ও পরবর্তী বৈদিকযুগে আর্য 'দেবতা'য় রূপান্তরিত হয়ে পূজো পেতে থাকেন। আর্যরা প্রথম দিকে বাস করতেন গ্রামে, পরে আধিপত্য বিস্তারের সংগে তাঁরা শহর গড়ে বড় বড় প্রাসাদ অট্টালিকা তুলে বাস করতে শুরু করেন। প্রাগার্য দ্রাবিড়রা বহুদিন পূর্বেই নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত ছিলেন। সুন্দর সুন্দর শহরে সুন্দর সুন্দর ইটের বাড়ীতে বাস করতেন দ্রাবিড়রা। আর্যরা সম্ভবতঃ দ্রাবিড়দের দেখাদেখিই পরবর্তী কালে নগর পত্তন করে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। বহুদিন পরে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়রা যখন আর্যদের রাজনৈতিক প্রভাবের অধীন হয়ে পড়েন, তখন ধর্মে ও সামাজিক রীতি-নীতিতেও আর্য প্রভাব তাঁদের ওপর বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আর্য ধর্ম, আর্যদের সামাজিক রীতিনীতি তাঁরা তখন গ্রহণ করেন। বর্ণবৈষম্য আগে দ্রাবিড় সমাজে বর্তমান ছিল না, আর্য প্রভাবেব অধীনে আসার পর তাঁদের মধ্যেও বর্ণ-বিভাগ প্রচলিত হয়ে পড়ে। সেমিটিক ভাষা থেকে উৎপন্ন তামিল, তেলুগু প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষায় পরবর্তী কালে যে সংস্কৃতের সংমিশ্রণ দেখা যায় তাও আর্যদের প্রভাবেরই ফল। তবে দ্রাবিড়রা আজও তাঁদের সামাজিক রীতিনীতির প্রাগার্য বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন নি।

রামায়ণ ও মহাভারত: এই দুই মহাকাব্যের গুরুত্ব—আর্যদের দুই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' ঠিক কখন বা কতদিনে লেখা হয়েছে তা এখনও সন্দেহাতীত রূপে নির্ণীত হয়নি। তবে যে সময় এই মহাকাব্য দুখানি লেখা আরম্ভ হয় তখন যে আর্য ধর্ম ও সমাজে যথেষ্ট রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই দুখানি মহাকাব্যের মধ্যে অনেকেই রামায়ণকে প্রাচীনতর মনে করেন, আবার কেউ বা বলেন যে মহাভারতই

প্রাচীনতর। পণ্ডিতদের মতে রামায়ণ সম্ভবতঃ একজনেরই রচনা—পরে অবশ্য বিভিন্ন সময়ে তার মধ্যে বহু শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। তবে মহাভারত রচনায় বিভিন্ন যুগের একাধিক কবির দান আছে—শুধু এক মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসই এর কবি নন—পণ্ডিতদের অভিমত এই। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী তোমাদের সকলেরই জানা আছে, তাই তার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত শুধু মহাকাব্যই নয়, পরবর্তী বৈদিক যুগ ও তারও পরেকার সময়ের ঐতিহাসিক উপাদান এই দুখানি মহাকাব্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। রামচন্দ্র ঐতিহাসিক পুরুষ কিনা সঠিক বলা যায় না, তবে রামায়ণ যে আর্যদের দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য বিস্তারের প্রথম লিখিত বিবরণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তেমনি মহাভারতও যে সেকালের এক পরাক্রান্ত আর্য-কুলের দুই শাখার অন্তর্বিরোধের ঐতিহাসিক চিত্র সে বিষয়েও পণ্ডিতরা একমত। অবশ্য তার মধ্যে এত অতিরঞ্জন, এত অসম্পৃক্ত ঘটনার সমাবেশ, এত নীতি-উপদেশের বাহুল্য মিশে গেছে যে ঐতিহাসিক সত্যটুকু খুঁজে বার করা এখন প্রায় অসম্ভব। তবে আর্য সমাজ ও রাষ্ট্র-গঠনের রূপান্তরের সাক্ষ্য হিসেবে এই বই দুখানির মূল্য ভারত-ইতিহাসের ছাত্রের কাছে অসামান্য। আর্যদের সমাজ-জীবনের ছবি দুখানি মহাকাব্যেই প্রায় একরকম। তবে মহাভারতে দ্রৌপদীর বহু-পতি-গ্রহণ প্রভৃতি অনার্য সমাজে প্রচলিত সামাজিক রীতির আর্য সমাজ-ভুক্তির উল্লেখ আছে। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে বৈদিক যুগের প্রকৃতি উপাসনার জায়গায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই ত্রয়ীর উপাসনা প্রাধান্য লাভ করেছে—বৈদিক-যুগের দেবতারা এই তিন জনের নিচে স্থান পেয়েছেন। পার্বতী, গণেশ প্রভৃতি অনেক নতুন দেবতারও আবির্ভাব হয়েছে।

বর্ণ-বিভাগ তখন সমাজে দৃঢ়মূল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কর্ম ও জন্মান্তর-বাদের ধারণা আর্যদের মধ্যে সুপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। পূর্বতন গ্রামকেন্দ্রিক আর্যসভ্যতা নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। শিল্প-বাণিজ্যে, বিলাসদ্রব্য-প্রস্তুতিতে আর্যশিল্পীরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন, তবে কৃষির গৌরব তখনও হ্রাস পায় নি। পুরুষের বহুপত্নী-গ্রহণ সমাজে নিন্দনীয় ছিল না। নারীর বহুপতি-গ্রহণও যে

অপ্রচলিত ছিল না দ্রৌপদীই তার প্রমাণ। 'স্বয়ম্বর' প্রথাও প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ক্রমেই যে হ্রাস পাচ্ছিল তারও ইংগিত পাওয়া যায় এই মহাকাব্য ছুখানি থেকে। দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয়রাই ক্রমে প্রধান হয়ে উঠছেন, ব্রাহ্মণরা পুরোহিত বা পরামর্শদাতারূপেই যেটুকু সম্মান পাচ্ছেন। শাস্ত্র-চর্চাদিতে পাণ্ডিত্যে তখনও অবশ্য ব্রাহ্মণদেরই ছিল শ্রেষ্ঠত্ব, তবে ক্ষত্রিয়রাও যে পিছিয়ে পড়ে ছিলেন না বিশ্বামিত্র, জনক প্রভৃতি তার প্রমাণ।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে উত্তর ভারতে বহু আর্য রাজ্য গড়ে উঠেছিল। রাজতান্ত্রিক এই সমস্ত রাজ্য ছাড়াও অভিজাততান্ত্রিক ও সাধারণতান্ত্রিক বহু যুক্তরাষ্ট্র তখন দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমস্ত আর্যাবর্তে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না বটে, তবে অন্যান্য রাজাদের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে ছিল না তা নয়। যে সমস্ত রাজারা এ চেষ্টায় সফল হতেন তাঁদের বলা হত সম্রাট্। রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করে তাঁরা তাঁদের এই সর্বাধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়ে নিতেন অন্যান্য রাজাদের দিয়ে। বিজিত রাজারা মিত্র বা করদ রাজারূপে তাঁদের অধীনে রাজত্ব করতেন।

সামাজিক ও রাষ্ট্রিক গঠনের রূপান্তরের সাক্ষ্য হিসেবে ছাড়াও হিন্দুদের জাতীয় ও পারিবারিক আদর্শ গঠন এবং ধর্মীয় জীবন-নিয়ন্ত্রণে এই ছু'খানি মহাকাব্যের গুরুত্ব অসামান্য।

প্রশ্ন

১। 'বেদ' কি? 'উপনিষদ' বলতে কি বোঝ? বৈদিক সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

[What do you know of the Vedas and the Upanishads? Give a brief account of the Vedic literature.]

২। বৈদিক সাহিত্য থেকে আর্যদের ধর্ম সম্বন্ধে কি জানতে পারা যায়?

[What light does Vedic literature throw on the religion of the Vedic Aryans?]

৩। বৈদিক যুগের আর্য সভ্যতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

[Give a brief estimate of civilization of the Aryans in the Vedic Age.]

৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের একটি বিবরণী লেখ।

[Describe in brief the political, social and economic life of the Vedic Aryans.]

৫। টীকা লেখ ঃ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, বেদাঙ্গ, বর্ণাশ্রম, চতুরাশ্রম, মহাকাব্যের যুগ।

[Write notes on : Samhita, Brahman, Aranyak, Vedanga, Varnashram, Chaturashram, The Epic Age.]

৬। আর্য ও অনার্য সভ্যতার পারস্পরিক প্রভাব সম্বন্ধে কি জান লেখ।

[Write what you know of the influence exercised by the Aryan and non-Aryan civilizations on each other.]

৭। মহাকাব্যের যুগে আর্যদের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিতে যে রূপান্তর দেখা দেয় তার বিবরণ লেখ।

[Describe, in brief, the transformation that came upon religion, society and political life of the Aryans in the Epic Age.]

॥ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ॥

ভারতীয় সমাজে ধর্মবিপ্লব : বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎপত্তি—বৈদিক যুগের শেষ দিক থেকেই আর্যদের ধর্মে সরল উপাসনা-পদ্ধতির জায়গায় জটিল ও আড়ম্বরপূর্ণ যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের, আন্তরিকতার জায়গায় আনুষ্ঠানিকতার প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। ফলে, সমাজে ব্রাহ্মণদেরই আধিপত্য বেড়ে যাচ্ছিল। নিজেদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ব্রাহ্মণ-রচিত ধর্মশাস্ত্রে বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে কঠোরতর বিধানও দেখা যেতে লাগল। ক্রমে যাগযজ্ঞাদিতে আড়ম্বরই প্রধান হয়ে উঠল, নিষ্ঠুর পশুবলি হয়ে উঠল ধর্মের অংগ। ব্রাহ্মণদের এই আধিপত্য অন্যান্য দ্বিজদের পক্ষে দিনে দিনেই অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল, বিশেষতঃ রাজশক্তি ক্ষত্রিয়দের কাছে। ফলে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্যে চেষ্টা চলতে লাগল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা চিন্তাশীল, ধর্মের অনুষ্ঠান-সর্বস্বতা তাঁদেরও বিচলিত করে তুলল। উপনিষদে তাই পশুবলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠল। এইভাবে ধীরে ধীরে ধর্মজগতে একটা বিপ্লব ঘনিয়ে আসছিল।

এই বিপ্লব বাস্তব রূপ নিয়ে দেখা দিল আজ থেকে প্রায় ছাব্বিশ শ' বছর আগে—দুজন ক্ষত্রিয়-রাজকুমারের নেতৃত্বে। একজন হলেন উত্তরবিহারের বৈশালী রাজ্যের এক প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান **মহাবীর**। আর একজন হিমালয়ের পাদদেশস্থ কপিলবস্তু নগরীর শাক্য নামক ক্ষত্রিয় উপজাতির নেতা শুদ্ধোদনের পুত্র **সিদ্ধার্থ**। যৌবনে ঐশ্বর্য, সম্পদ, স্নেহ-মমতা সব কিছুর বন্ধন ছিন্ন করে কঠোর তপস্যার পর কিভাবে তাঁরা সত্য জ্ঞান লাভ করেন এবং যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে যান তার কাহিনী ছোট বেলা থেকেই পড়ে এসেছ তোমরা, তাই সে কাহিনী উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের আড়ম্বর, আনুষ্ঠানিকতা, অনাচার, শ্রেণীবৈষম্য এবং নিষ্ঠুর পশুবলির বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য শ্রেণীর বলিষ্ঠ প্রতিবাদরূপেই ভারতে

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তিত হয়, আর তাই এই দুই ধর্মেই সদাচার, সত্যনিষ্ঠা এবং অহিংসার ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যধর্মে যে কঠোর বর্ণবৈষম্য দেখা দিয়েছিল তারই প্রতিবাদে জৈন এবং বৌদ্ধ এই দুই ধর্মেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সমস্ত বর্ণ এবং উপবর্ণের লোককেই সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই এই দুটি ধর্ম ভারতে কয়েক শ' বছর খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

জৈনধর্মের উপদেশ—জৈনরা বেদ মানেন না, ঈশ্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে মানুষ যখন আত্মশক্তিকে সম্পূর্ণ বিকশিত করে তুলতে পারে তখন সে-ই দেবত্বে উন্নীত হয়। তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করেই মানুষ তার আত্মশক্তিকে বিকশিত করে তুলতে পারে—এই জৈনদের বিশ্বাস। তাই তাঁরা কঠোর তপস্যার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তবে হিন্দুদের কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদ তাঁরা স্বীকার করেন। কর্মফলের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভকেই তাঁরা বলেন 'মুক্তি'। যথাযথ বিশ্বাস, যথাযথ জ্ঞান আর যথাযথ আচরণ—কেবলমাত্র এই 'ত্রিরত্নের' সাহায্যেই মোক্ষ লাভ করা যায় বলে জৈনরা বিশ্বাস করেন। তাঁরা বর্ণভেদ প্রথা মানেন না, যে-কোন বর্ণের লোকই জৈনধর্ম গ্রহণ করতে পারেন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা সামাজিক ব্যাপারে সমস্ত জৈনধর্মাবলম্বীই সমান অধিকার ভোগ করেন। পার্থিব বস্তুমাত্রেরই চেতনা আছে বলে তাঁদের বিশ্বাস। তাই তাঁদের মতে অহিংসাই পরম ধর্ম।

জৈনধর্মের প্রসার—জৈনধর্ম প্রথমে পূর্বভারতে প্রচারিত হয়েছিল। উত্তরকালে মৌর্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে শোনা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যেই দাক্ষিণাত্যে জৈনধর্মের প্রসার ঘটে, তবে এই ধর্ম কোন দিনই ভারতের বাইরে প্রসার লাভ করে নি। কয়েক শতাব্দী ধরে এই ধর্ম দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে গণ্য হত। জৈনধর্ম আজও ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়নি। রাজস্থান ও গুজরাটের বহু অধিবাসী এখনও জৈনধর্মাবলম্বী।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে জৈনরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। শ্বেতাম্বর জৈনরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতেন আর দিগম্বররা মহাবীরের মতো সম্পূর্ণ উলংগ হয়ে থাকতেন। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাটলিপুত্র শহরে অনুষ্ঠিত একটি জৈন সভায় মহাবীরের উপদেশগুলি বারোটি 'অংশে' লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

বুদ্ধের ধর্মমত—বুদ্ধদেব বেদের নিত্যতা ও অপৌরুষেয়তা এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করতেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন উদাসীন। বুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য ছিল জীবের দুঃখমোচন করা। তাঁর মতে,—জগৎ দুঃখময়; কিন্তু পশুবলি, যাগযজ্ঞ আর বৈদিক ক্রিয়াকর্ম মানুষকে দুঃখের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে না। বাসনা থেকেই যখন দুঃখের উৎপত্তি, তখন সমস্ত কামনা-বাসনা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করতে পারলে তবেই মানুষের দুঃখমোচন সম্ভব। বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ ও জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে, মানুষকর্মফল অনুসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে প্রাক্তনের ফলভোগ করে।

বাসনার নিবৃত্তির জন্যে বুদ্ধদেব মানুষকে 'অষ্টাংগিক মার্গ' (আটটি পথ) অনুসরণ করবার উপদেশ দিয়েছেন। মানুষকে সম্যক্ দৃষ্টি রাখতে হবে; তাকে সৎ সঙ্কল্প করতে হবে; সদ্বাক্য বলতে হবে; সৎকর্ম করতে হবে; সৎভাবে জীবিকা অর্জন করতে হবে; কাজ করার জন্যে সৎ চেষ্টা করতে হবে; সৎবিষয়ে চিন্তা করতে হবে; আর সম্যক্ সমাধি অভ্যাস করতে হবে। এই অষ্টাংগিক মার্গ বা আটটি পথই মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেবার পথ। এই অষ্টাংগিক মার্গকে **মধ্যপন্থা**ও বলা হয়। বুদ্ধের মতে চরম ভোগবিলাস বা কঠোর তপস্যা—এর কোনটাই প্রকৃত মুক্তির পথ নয়; মধ্য পন্থা অনুসরণ করে তবেই শেষ পর্যন্ত মানুষ নির্বাণ অর্থাৎ পার্থিব দুঃখ-বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে পারে। নির্বাণই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য, নির্বাণই মানুষকে চরম শান্তি এনে দিতে পারে।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সদাচার পালনের ওপর বুদ্ধদেব খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষকে তিনি পঞ্চ শীল বা পাঁচটি নৈতিক আচরণ

পালন করবার নির্দেশ দিয়েছেন। জীবহিংসা, মিথ্যাভাষণ, পরস্ব অপহরণ, মদ্যপান আর দুশ্চরিত্রতা—এই পাঁচটি অসদাচারের নিবৃত্তি অভ্যাস, পঞ্চশীলের মর্মার্থ। বৌদ্ধ ভিক্ষুক ও শ্রমণদের জন্যে বুদ্ধদেব আরও পাঁচটি শীল অর্থাৎ মোট দশ শীলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই অতিরিক্ত পাঁচটি শীল হল—অবেলায় ভোজন, নৃত্যাদি দর্শন, মাল্যগন্ধানুলেপন, মূল্যবান্ শয্যায় শয়ন এবং অর্থদান-গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। বুদ্ধের মতেও 'অহিংসা পরম ধর্ম'। তিনি প্রেম, প্রজ্ঞা ও সমাধির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বৌদ্ধধর্মে মতভেদ—বুদ্ধ তাঁর ধর্মমত সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। পণ্ডিত ছাড়া সাধারণ লোকে তখন সংস্কৃত ভাষা ভাল বুঝত না। বুদ্ধদেব তাই সাধারণের বোধগম্য ভাষায়, অর্থাৎ পালি ভাষায়, তাঁর ধর্ম প্রচার করতেন। শিষ্যদের তিনি কথ্যভাষায় মুখে মুখে ধর্মোপদেশ দিতেন। তাঁর উপদেশগুলি তাঁর জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়নি। তাঁর মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যরা রাজগৃহ শহরে এক সভায় সমবেত হয়ে তাঁর মৌখিক উপদেশগুলি গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করেন। 'ত্রিপিটক' নামে প্রসিদ্ধ এই সঙ্কলনটি পালিভাষায় লেখা এবং বিনয়পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধম্মপিটক—এই তিন ভাগে ভাগ করা। বিনয়পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের কর্তব্য এবং বৌদ্ধ সংঘারামগুলির নিয়মাবলী আর সুত্তপিটকে বুদ্ধের বাণী ও কার্যাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের মূল দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে অভিধম্মপিটকে।

কালক্রমে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বুদ্ধের বাণী নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। এই মতভেদ মীমাংসার জন্যে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণলাভের প্রায় এক শতাব্দী পরে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধসংগীতি আহ্বান করা হয়। এই সভায় প্রচলিত কতকগুলি মতবাদের দোষ দেখান হয় এবং বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রগুলি সংশোধন করা হয়। সম্রাট অশোক পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় বৌদ্ধসংগীতি আহ্বান করেন। এখানে আবার কয়েকটি মতবাদের নিন্দা করা হয় এবং বৌদ্ধশাস্ত্র নতুন করে সংকলন করা হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহারাজ

কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় কাশ্মীর বা জলন্ধরে চতুর্থ বা শেষ বৌদ্ধসংগীতির অধিবেশন বসে। এই সভায় বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য টীকা তৈরী করা হয়। এই চারটি সংগীতিরই যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে; কেননা এগুলো থেকে বিভিন্ন সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ও রূপান্তরের ইতিহাস জানতে পারা যায়।

বৌদ্ধধর্মের বিস্তার—বুদ্ধের জীবদ্দশায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের মাত্র পূর্বাংশেই প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দেহত্যাগের পাঁচশ' বছরের মধ্যেই এই ধর্ম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অশোক, কণিষ্ক, হর্ষবর্ধন প্রমুখ প্রবল-পরাক্রান্ত সম্রাট্‌দের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যেই বৌদ্ধধর্মের এমন ব্যাপক বিস্তার সম্ভব হয়েছিল। এশিয়া মহাদেশের এক বৃহৎ অংশের বহু অধিবাসী আজ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তবে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিভূমি ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম আজ লুপ্তপ্রায়।

প্রশ্ন

১। ভারতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের কারণ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

[Write what you know about the reasons of the growth of Buddhism and Jainism in India.]

২। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উপদেশগুলি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

[Narrate, in brief, the teachings of Buddha and Mahavira Jain.]

ইরাণ ও গ্রীস এবং ভারত : পারস্পরিক প্রভাব

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা—খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস ভালভাবে জানা যায় না। তবে জানা যায় যে, খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থানের কিছু আগে ভারতে ষোলটি মহাজনপদ বা প্রধান রাষ্ট্র ছিল। এই রাষ্ট্রগুলো কাবুল নদীর উপত্যকা থেকে গোদাবরী নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কতকগুলোতে প্রচলিত ছিল গণতন্ত্র এবং বাকী-গুলোতে রাজতন্ত্র। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বৈশালীর লিচ্ছবি রাজ্য (রাজধানী বৈশালী, বর্তমান মজঃফরপুর জেলায়) এবং হিমালয়ের পাদদেশে কপিলবস্তুর শাক্যরাজ্য বিশেষ শক্তিশালী ছিল।

অবন্তী, বৎস, কাশী, কোশল, মগধ—রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অবন্তী, বৎস, কোশল, কাশী এবং মগধ—এই পাঁচটি রাজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবন্তীরাজ্য অবস্থিত ছিল বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত মালবে। এর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। বর্তমান এলাহাবাদের কাছে যমুনার তীরে ছিল বৎসরাজ্য। কাশীরাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান বারাণসী। এককালে রাজ্যটি পরাক্রান্ত ছিল, কিন্তু পরে কোশলের অধীন হয়। কোশলরাজ্য ছিল বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা অঞ্চলে। বিহারের দক্ষিণ অংশে (বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলায়) ছিল বিখ্যাত মগধরাজ্য। মগধের রাজধানী প্রথমে ছিল গিরিব্রজ, পরে রাজগৃহ (বর্তমান রাজগির), সর্বশেষে পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনার কাছাকাছি)।

দরায়ুসের আক্রমণ—হর্যঙ্কবংশীয় বিখ্যাত রাজা বিম্বিসার যখন মগধে এক বিশাল শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন, সেই সময়ে ভারতের প্রতিবেশী দেশ ইরাণে (পারস্য) এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন ইরাণের সম্রাট কুরুস্ (Cyrus)। কুরুস্ তাঁর সাম্রাজ্য পূর্বদিকে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আফগানিস্তানের প্রসিদ্ধ নগর

কপিশা ধ্বংস করে কাবুল নদী ও সিন্ধু নদের অন্তর্বর্তী অঞ্চল তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তাঁর পর বিখ্যাত ইরাণ-সম্রাট্ প্রথম দরায়ুস (Darius) গান্ধার দেশ (বর্তমান রাওয়ালপিণ্ডি ও কাশ্মীর) এবং রাজস্থানের মরু অঞ্চল পর্যন্ত সিন্ধু উপত্যকা জয় করে তাঁর অধীন প্রদেশে পরিণত করেন। তাঁর পার্সিপোলিস প্রাসাদে এবং নকশি-রুস্তমে তাঁর সমাধির ওপর যে ক্ষোদিত লিপি পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে এই সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল ছিল তাঁর বিংশতিতম প্রদেশ। তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশের মধ্যে এই প্রদেশটিই ছিল ধনে-জনে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এখান থেকে তিনি যে অজস্র স্বর্ণরেণু রাজকর হিসেবে পেতেন আজকালকার হিসেবে তার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকার মতো। তাঁর ছেলে জারাক্সেস-ও ভারতীয় প্রদেশগুলোর ওপর তাঁর অধিকার কিছুটা বলবৎ রাখতে পেরেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে ক্রমেই তাঁদের আধিপত্য কমতে থাকে। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে এই সমস্ত ভারতীয় প্রদেশ থেকে তাঁদের আধিপত্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে, দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজান্দারের আক্রমণের সময়, সিন্ধু নদকে ভারত ও ইরাণীয় সাম্রাজ্যের মাঝখানকার সীমারেখা বলে ধরা হলেও ঐ সময় কিন্তু ঐ নদীর ধার বরাবর ইরাণীয় আধিপত্যের কোন চিহ্নই ছিল না। সে সময় ওখানে অনেকগুলো ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল।

ভারতীয় সভ্যতায় ইরাণীয় প্রভাব—সিন্ধু উপত্যকা বহুদিন ইরাণ সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে ঐ অঞ্চল ইরাণীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইরাণীয় সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতাকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে নি। ইরাণীয় সভ্যতার অতি সামান্য প্রভাবের উল্লেখযোগ্য অবশেষ দেখতে পাওয়া যায় খরোষ্ঠী অক্ষরে ক্ষোদিত লিপিগুলির মধ্যে। এই খরোষ্ঠী বর্ণমালা উদ্ভূত হয়েছিল ইরাণের আরামী অক্ষর থেকে এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রচলিত ছিল।

ইরাণীয় সভ্যতার প্রভাবের অন্যান্য চিহ্ন মৌর্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের 'কেশধৌতি' অনুষ্ঠানের মধ্যে, তাঁর প্রাসাদের গঠন-কারুকার্যে, অশোকের অনুশাসনের ভূমিকায়, তাঁর স্তম্ভে ও ঘণ্টাকৃতি শীর্ষে দেখতে পাওয়া যায়।

ধর্মে ইরাণের জরথুষ্ট্র-ধর্মাবলম্বী বা ম্যাগীদের মধ্যে প্রচলিত পবিত্র অগ্নির উপাসনা ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি প্রচলিত ছিল বলে জানতে পারা যায়। এ ছাড়া ইরাণীয় সভ্যতার আর বিশেষ কোন প্রভাব ভারতীয় সভ্যতার ওপর পড়েছিল বলে মনে হয় না।

আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ—হর্যঙ্ক বংশের পর মগধের সিংহাসনে বসেন শিশুনাগ বংশের রাজারা। তাঁদের পরে মগধের আধিপত্য যায় নন্দবংশের শূদ্র রাজাদের হাতে। এঁরাও প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ ছিলেন। এই বংশের শেষ রাজা ধননন্দের রাজত্বকালে ভারতকে আবার এক বৈদেশিক জাতির আক্রমণ সহ্য করতে হয়। দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজান্দার দিগ্বিজয়ের সংকল্প নিয়ে সুদূর গ্রীস থেকে বেরিয়ে মিশর, ব্যাবিলন, টায়ার, সিডন প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত দেশ জয় করে, ইরাণ সাম্রাজ্য ধ্বংস করে এসে পৌছলেন ভারতের দ্বারপ্রান্তে।

পথে পড়ল আফগানিস্তান আর উত্তর-পশ্চিম ভারতের ছোট ছোট পার্বত্য রাজ্য। সসৈন্যে হিন্দুকুশ পার হয়ে এই সমস্ত পার্বত্য রাজ্যে হানা দিলেন আলেকজান্দার। এদের সংগে যুদ্ধে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল তাঁকে—একথা যে-সব গ্রীক ইতিহাস-লেখক এসেছিলেন আলেকজান্দারের সংগে তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন।

এদের হারিয়ে সিন্ধুনদ অতিক্রম করে আলেকজান্দার এসে পৌছলেন পঞ্চনদে—আজকাল যাকে আমরা বলি পঞ্জাব। পঞ্চনদ তখন অম্ভি, অভিসার, পুরু প্রমুখ রাজাদের রাজতন্ত্রী রাজ্য আর ক্ষুদ্রক, মালব প্রভৃতি উপজাতিদের গণতন্ত্রী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অম্ভি, অভিসার, পুরু প্রমুখ রাজাদের মধ্যে আদৌ সদ্ভাব ছিল না, উপজাতীয়দের মধ্যেও না। যুদ্ধ বিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটি প্রায় সর্বদাই লেগে থাকত। বুদ্ধিমান

আলেকজান্দার ভারতীয়দের এই আত্মকলহের পূর্ণ সুযোগ নিতে ত্রুটি করেন নি।

তক্ষশিলা—পঞ্চনদে পৌঁছবার পর আলেকজান্দার প্রচুর সাহায্য পেয়েছিলেন তক্ষশিলা রাজ্যের রাজা অম্ভির কাছে। এই তক্ষশিলা ছিল বর্তমান পশ্চিম পঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি জেলায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের এক শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্যটির খ্যাতি ছিল সারা পৃথিবীতে। শুধু তাই নয়, শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবেও এর প্রসিদ্ধি ছিল দেশজোড়া। নানা দেশ থেকে দলে দলে ছাত্র আসত এখানে, বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করবার জন্যে।

আলেকজান্দার ও পুরু—প্রতিবেশী রাজা পুরু ও অভিসারের সংগে বহুদিন থেকে বিরোধ চলছিল অম্ভির। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের সাহায্যে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাইলেন তিনি। তাই বিনা বাধায় আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে তিনি সন্তুষ্ট করলেন এই দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীরকে।

অভিসারের রাজ্যের যে-সব অঞ্চলের সঙ্গে অম্ভির বিরোধ ছিল তারা আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করল—কিন্তু পুরু মাথা নোয়াতে রাজী হলেন না। ঝিলাম ও চিনাব নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন তিনি। দিগ্বিজয়ী গ্রীক শত্রুর হাত থেকে দেশের মান বাঁচাবার জন্যে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে তিনি দাঁড়ালেন সোজা হয়ে। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। আলেকজান্দারের সুদক্ষ নেতৃত্বে ও খানিকটা দৈবের প্রতিকূলতায় তাঁকেও হার মানতে হল।

পুরুকে পরাজিত করে তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করবার পর আলেকজান্দার অগ্রসর হলেন বিপাশা নদীর দিকে। পথে তিনি কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যও জয় করেন। গাংগেয় উপত্যকা পর্যন্ত তাঁর অগ্রসর হবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাঁর রণক্লান্ত সৈন্যরা আর বেশিদূর যেতে চাইল না। তাছাড়া প্রবল পরাক্রান্ত মগধের বিশাল সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হবার সাহসও

বোধ হয় তারা হারিয়ে ফেলেছিল। তাই ভারতের অভ্যন্তরে অধিক দূর প্রবেশ করা সম্ভব হল না আলেকজান্দারের পক্ষে। তাঁর দিগ্বিজয় অভিযান অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি ফিরে চললেন স্বদেশের দিকে। তাঁর ভারত-অভিযানের শেষ সীমানা নির্দেশ করবার জন্য বিপাশা নদীর উত্তর ধারে তিনি বারটি উঁচু বেদী তৈরী করেন।

স্বদেশের দিকে ফেরার পথে ইরাবতী ও চিনাব নদীর নিম্ন উপত্যকায় স্বাধীন ও রণপ্রিয় উপজাতিদের সঙ্গে গ্রীকদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অসংখ্য ভারতীয় নরনারী এবং শিশুর প্রাণহানি ঘটে। ক্ষমতাশালী মালব জাতির একটি দুর্গ আক্রমণ করার সময় আলেকজান্দার নিজে গুরুতররূপে আহত হন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য গ্রীকরাই জয়লাভ করে। তারপর পথে বহু কষ্ট সহ্য করে আলেকজান্দার ব্যাবিলনে এসে উপস্থিত হন। এখানেই হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয় (৩২৩ খ্রীঃ পূঃ)।

আলেকজান্দারের সাফল্যের কারণ—গ্রীকদের সংগে যুদ্ধে রাজা পুরু ও অন্যান্য ভারতীয় যোদ্ধারা যে অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, আলেকজান্দারের সমভিব্যাহারী গ্রীক লেখক ও ঐতিহাসিকদের রচনায় তার আভাস পাওয়া যায়। তাই ভারতবাসীর সামরিক দুর্বলতাই যে আলেকজান্দারের জয়লাভের কারণ একথা বলা যায় না। সে সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য না থাকার জন্যেই তারা সম্মিলিতভাবে আলেকজান্দারের গতি রোধ করার চেষ্টা করে নি। তাছাড়া সেনাপতি হিসেবে আলেকজান্দার যে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে-সমস্ত ভারতীয় রাজা বা সেনাপতি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁরা সেরকম অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। এই সমস্ত কারণেই আলেকজান্দার সাফল্যলাভ করতে পেরেছিলেন।

আলেকজান্দারের আক্রমণের ফলাফল—ভারত ত্যাগের পূর্বে আলেকজান্দার তাঁর অন্যতম সেনাপতি ফিলিপ্পসকে বিজিত ভারতীয়

প্রদেশগুলোর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে যান ; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্রোহী সৈনিকদের হাতে ফিলিপ্পস-এর মৃত্যু ঘটে। শীঘ্রই একটা বিশৃংখলা দেখা দেয়। তখন আলেকজান্দারের অন্য একজন সেনাপতি, অ্যান্টিপেটার, পুরু আর অম্ভিকে সিন্ধু উপত্যকা আর পঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু আলেকজান্দারের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ থেকে গ্রীক আধিপত্য লুপ্ত হয়।

আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের **প্রত্যক্ষ ফল** খুবই কম। দেশের শাসনব্যবস্থা কি ভারতবাসীদের জীবনধারার ওপর গ্রীক শাসনব্যবস্থা বা জীবনধারার বিশেষ কোন প্রভাব এই আক্রমণের ফলে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে নি। এমন কি, আমাদের কোন পুরাণ বা অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে এ আক্রমণের কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। এ থেকেই মনে হয় প্রাচীন ভারতীয়রা আলেকজান্দারের এ আক্রমণকে একেবারেই গুরুত্ব দেন নি। আলেকজান্দারের রণনীতিও পরবর্তী কোন ভারতীয় রাজা গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। প্রাচীন ভারতীয় রণনীতি অনুসরণ করে চতুরংগ বাহিনী নিয়েই পরবর্তী রাজারাও যুদ্ধ করেছেন। এই সব বিবেচনা করে সহজেই বলা যায় যে আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ, গ্রীক ঐতিহাসিকদের উচ্ছ্বসিত জয়জয়কার সত্ত্বেও, ভারতের ওপর উল্লেখযোগ্য কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

তবে উত্তর-পশ্চিম ভারতে কতকগুলো গ্রীক উপনিবেশ স্থাপন আলেকজান্দারের আক্রমণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ ফল বলা যেতে পারে ; কতকগুলো গ্রীক উপনিবেশ অনেকদিন পর্যন্ত বর্তমান ছিল—খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মহামতি অশোকের আমলেও যে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক ঔপনিবেশিকরা বাস করতেন তার প্রমাণ অশোকের একটি অনুশাসন থেকে পাওয়া যায়।

কিন্তু আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল বিশেষ কিছু না হলেও কয়েকটি **পরোক্ষ ফল** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আক্রমণের ফলে

ভারত থেকে ইউরোপ যাবার চারটি পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়—তিনটি স্থলপথ (একটি কাবুলের ভিতর দিয়ে, একটি বেলুচিস্তানের মুল্লার গিরিপথ দিয়ে, আর একটি গেড্রোসিয়া হয়ে), আর একটি জলপথ, মাকরান উপকূল ঘুরে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের মধ্যে এই চারটি পথ দিয়ে ঘটল সংযোগ সাধন। এই চারটি পথ দিয়েই পরবর্তী কালে ভারতের বাণিজ্যদ্রব্য গিয়ে পৌছতে লাগল ইউরোপের বাজারে। গ্রীসের পর যে-দেশ সভ্যতা-সংস্কৃতি-সম্পদে ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল সেই রোমের বাজারেও এই পথ দিয়েই যেত ভারতের মসলিন, রেশম আর নানা বিলাসদ্রব্য। বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ রোমক স্বর্ণমুদ্রা এই পথ দিয়েই ভারতে নিয়ে আসত ভারতের বণিক আর নাবিকরা।

শুধু তাই নয়, এই সমস্ত পথ দিয়েই ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় চিন্তাধারা এশিয়া ও ইউরোপের সভ্যতা, দর্শন, চিন্তাধারা প্রভৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। এরই ফলে খ্রীষ্টধর্মের ওপর বৌদ্ধ চিন্তাধারার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। রোমক সাম্রাজ্যে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তাও গিয়ে পৌছেছিল আলেকজান্দারের আক্রমণের ফলে উন্মুক্ত এই সমস্ত পথ দিয়েই।

আলেকজান্দারের আক্রমণের আর একটি উল্লেখযোগ্য পরোক্ষ ফল হল আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর পশ্চিম এশিয়ায় কয়েকটি গ্রীক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। ভারতের সীমান্তের কাছাকাছি এই সমস্ত গ্রীক রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে পরবর্তী কালে গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতার ওপর পারস্পরিক প্রভাব প্রতিফলিত হতে লাগল।

পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে শক্তিহীন করে আলেকজান্দার ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যস্থাপনে এবং মৌর্যসাম্রাজ্য-বিস্তারেও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছিলেন। এতদিন পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত মগধ সম্রাটের আয়ত্তের বাইরে ছিল। আলেকজান্দার উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুর্ধর্ষ জাতিদের ক্ষমতা খর্ব করতে না পারলে পরে মগধের মৌর্য

সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে ঐ প্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করা কঠিন হত বলেই মনে হয়।

মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাহ্লীকদেশীয় (Bactrian) গ্রীকরা যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, তাও পরোক্ষভাবে আলেকজান্দারের আক্রমণের ফল। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর পশ্চিম এশিয়ায় যে সমস্ত গ্রীকরাজ্য গড়ে ওঠে বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকদের রাজ্যও তাদের অন্যতম। মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পর সেখান থেকেই তারা ভারতে প্রবেশ করে উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্য স্থাপন করে। এদের এই রাজ্য স্থাপনের ফলে ভারতীয় ও গ্রীক সভ্যতা পরস্পরের ওপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। ভারতে বাহ্লীক রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে বৌদ্ধদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। পরে গ্রীকদের মধ্যে প্রচলিত মূর্তিপূজার প্রভাবেই বৌদ্ধদের মধ্যেও মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটে। বাহ্লীক গ্রীক রাজ্য গান্ধারে যে গ্রীক-ভারতীয় গান্ধার শিল্পরীতি গড়ে ওঠে তাও ভারতীয় ও গ্রীক সভ্যতার পারস্পরিক প্রভাবের ফল সান্নিধ্যের ফলে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মীয় চিন্তাধারা যেমন গ্রীকদের দার্শনিক ও ধর্মীয়চিন্তাধারার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল তেমনি আবার ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে, ভারতীয় মুদ্রাতেও গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু আলেকজান্দারই ভারতের মাটিতে প্রথম পদার্পণকারী গ্রীক তাই পরবর্তী কালে ভারতের ওপর যে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তার জন্যে তাঁকে পরোক্ষভাবে দায়ী করা যায়।

প্রশ্ন

১। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[Describe briefly the political condition of India in the 6th century B.C.]

২। ভারতীয় সভ্যতার ওপর ইরাণীয় সভ্যতা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল কি? এ সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

[Write what you know about the influence of the civilization of ancient Iran on that of ancient India.]

৩। আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ ও তার ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[What do you know about Alexander's invasion of India and its effects ?]

॥ মৌর্য সাম্রাজ্য ॥

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য—আলেকজান্দারের ভারত-ত্যাগের কিছুদিন পরে চন্দ্রগুপ্ত নামে মৌর্যবংশীয় এক বীর নন্দবংশের শেষ সম্রাট্ ধন নন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৩২১ খ্রীঃ পূঃ)। জানা যায়, তাঁর এই সাফল্যের মূলে ছিল চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষশিলার এক কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুশাগ্র বুদ্ধি আর তাঁর নিজের সাহস, সংগঠন-নৈপুণ্য আর সুদক্ষ সৈনাপত্য। সিংহাসনে আরোহণ করার পর চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে তাঁর প্রধান মন্ত্রীর পদে বরণ করেন। সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর মগধের সিংহাসনে আরূঢ় থেকে চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যান। কাশ্মীর বাদে প্রায় সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়; এমন কি, পারস্যের সীমা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, দক্ষিণ ভারতেও মহীশূরের চিতলদ্রুগ জেলা পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের আগে আর কোন ভারতীয় নরপতিই এত বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেন নি।

এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে তাঁকে দু'বার গ্রীকদের সংগেও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়—একবার উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীকদের সংগে, আর একবার রাজত্বের শেষ দিকে পশ্চিম এশিয়ার গ্রীকরাজ সেলিউকস নিকাটর (গ্রীকবীর আলেকজান্দারের অন্যতম সেনাপতি)-এর সংগে। প্রথম বার গ্রীকদের পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব অধিকার করেন। সেলিউকস-এর সংগে যুদ্ধে কি হয়েছিল সঠিক জানা যায় না। তবে সেলিউকস যে চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করতে পারেন নি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, সন্ধির শর্ত অনুসারে তিনি আফগানিস্তানের কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট এবং বেলুচিস্তানের মাকরান প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে ছেড়ে দেন। শুধু তাই নয়, বৈবাহিক বন্ধনের দ্বারা তিনি চন্দ্রগুপ্তের সংগে তাঁর মৈত্রী সুদৃঢ় করে

তুলেছিলেন। তাঁর বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে মেগাস্থিনিস নামে একজন গ্রীক দূতকেও তিনি পাঠিয়েছিলেন চন্দ্রগুপ্তের সভায়।

মৌর্য আমলের বহু সংবাদ এই মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায়।

বিন্দুসার—চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার অমিত্রঘাত মগধের রাজা হন। তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এটা ঠিক যে, বিন্দুসার তাঁর পিতার রাজ্য অক্ষুণ্ণ রেখে গিয়েছিলেন।

মহামতি অশোক—বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক (অশোকবর্ধন) আনুমানিক ২৭৩ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই অশোকই হলেন মৌর্য বংশের, শুধু মৌর্য বংশের কেন সারা পৃথিবীর মধ্যেই, শ্রেষ্ঠ সম্রাট্। সিংহাসনে আরোহণ করার চার বছর পরে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। এই চার বছরের কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় নি।

কলিংগ যুদ্ধ—যাই হোক, সিংহাসনে আরোহণ করার পর প্রথম দিকে তিনিও তাঁর পূর্বপুরুষদের মতোই সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে মন দিয়েছিলেন। আর তারই ফলে একবার কলিংগ (বর্তমান উড়িষ্যা) রাজ্যের সংগে তাঁর ভয়ানক যুদ্ধ বাধে। রক্তস্রোতে লাল হয়ে ওঠে কলিংগের মাটি। শেষ পর্যন্ত মগধের দুর্ধর্ষ বাহিনীর সংগে যুদ্ধে হার মানতে হয় কলিংগের বীর যোদ্ধাদের—প্রাণ দিয়েও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে নি তারা।

যুগান্তক পরিবর্তন—কিন্তু তা না পারুক, তাদের এই রক্তদান বৃথা যায় নি একেবারে। শত্রু-মিত্রের এই অজস্র রক্তপাত গভীরভাবেই প্রভাবিত করেছিল সম্রাট্ অশোকের মনকে। গভীর দুঃখে শোকে অনুতাপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন অশোক, প্রতিজ্ঞা করলেন আর কোনদিনই এমন ধারা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না তিনি। সেই থেকে যুদ্ধজয়ের নীতি ছেড়ে ধর্মবিজয়ের নীতি অবলম্বন করলেন এই প্রিয়দর্শী সম্রাট্। তাঁর এই ভাবান্তরের কথা

স্থন্দর করেই প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর ত্রয়োদশ পর্বতলিপিতে। তাতে লেখা রয়েছে—আমার পুত্র-পৌত্রর৷ যেন নতুন নতুন দেশজয়কে লোভনীয় জিনিস বলে মনে না করে; ধর্মবিজয়কেই যেন প্রকৃত বিজয় বলে তারা বুঝতে পারে।

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ—কলিংগ যুদ্ধের পর অশোকের ধর্মজীবনেও একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। এর আগে পর্যন্ত তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই উপাসক ছিলেন—দেবাদিদেব মহাদেবই ছিলেন তাঁর উপাস্য দেবতা। কিন্তু কলিংগ যুদ্ধের পর থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের দিকে তাঁর ঝোঁক দেখা যেতে লাগল। পরে তিনি উপগুপ্ত নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণও করেছিলেন বলে জানা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করবার পর বুদ্ধদেবের অহিংসা ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী দেশ-বিদেশে প্রচার করবার জন্যে আমরণ চেষ্টাও করেছিলেন তিনি।

ধর্মযাত্রা—বৌদ্ধশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ তিনি বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন, আর এই সমস্ত শাস্ত্রের নানা সদুপদেশ থেকে প্রজারা যাতে তাদের জীবন সৎ ও স্থন্দর করে গড়ে তুলতে পারে তার জন্যে তাঁর চেষ্টার শেষ ছিল না। পূর্বপুরুষদের মতো প্রমোদ-ভ্রমণ **বিহার-যাত্রায়** না বেরিয়ে দশ বছর অন্তর অন্তর **ধর্মযাত্রায়** বেরিয়ে আপামর জনসাধারণের কাছে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের নানা সদুপদেশ শেখাতেন তিনি। তাঁর রাজত্বকালের মধ্যে দু'বার তিনি এই রকম ধর্মযাত্রায় বেরিয়েছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার—কিন্তু তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সব জায়গায় গিয়ে এই সদ্ধর্ম প্রচার করা তাঁর একার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই ধর্ম প্রচারের জন্যে তিনি **রাজুক, ধর্মমহামাত্র** ইত্যাদি উপাধিধারী অনেক বিশেষ বিশেষ কর্মচারীও নিয়োগ করেন—পাহাড়-পর্বত-স্তম্ভের গায়ে স্থনীতি ও সদ্ধর্মের কথা লেখানো, দেশ-বিদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্যে বন্দোবস্ত করা, দেশের জনসাধারণের নৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করা, এই সবই ছিল এঁদের কাজ।

এ ছাড়া দূর দূর দেশে প্রচারকও পাঠান হত এই ধর্মের নানা সদুপদেশ প্রচার করবার জন্যে। প্রতিবেশী গ্রীক, তামিল আর সিংহলী রাজ্যগুলোতে এই ধরণের অনেক প্রচারক গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারও করে এসেছেন বলে জানা যায়। সিংহলে ধর্মপ্রচারের জন্যে অশোকের এক ছেলে (বা ভাই) মহেন্দ্র আর মেয়ে (বা বোন) সংঘমিত্রাকে পাঠান হয়েছিল—একথাও অনেকে বলেন। নিম্ন বর্মা, সুমাত্রা, মিশর, সিরিয়া, এমন কি ইউরোপের কোন কোন দেশেও নাকি ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন অশোক।

হিতৈষণা—অশোক শুধু বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেই ক্ষান্ত হন নি, নিজেও জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের সমস্ত সদুপদেশ পালন করতেন। যাতে রাজকীয় রন্ধনশালার জন্যেও জীব হিংসা করা না হয় সে নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের বিশ্বকল্যাণের বাণী তিনি জীবনের মূলমন্ত্র করে নিয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের লোকেদের যাতে সর্বতোভাবে কল্যাণ হয় তার জন্যে আন্তরিক চেষ্টা করে গিয়েছেন তিনি। এ কাজ সুসম্পন্ন করার জন্যে অনেক বিশেষ বিশেষ রাজকর্মচারীও তিনি নিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের কাজ ছিল—দেশবাসীর যাতে কল্যাণ হয়, যাতে দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃংখলা-সুশাসন বজায় থাকে—তার ব্যবস্থা করা। অনাথ-আতুরের জন্যে বহু আশ্রম আর হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অশোক। এ ছাড়া লোকদের পথ চলার সুবিধার জন্যে তিনি বড় বড় রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ লাগিয়েছিলেন, পায়ে-চলা পথের ধারে ধারে পুকুর আর কূয়ো খুঁড়িয়ে রেখেছিলেন—যাতে বৃষ্টিতে রোদে কারো কোন অসুবিধে না হয়। শুধু মানুষের জন্যেই দরদ ছিল না তাঁর মনে, পশু-পাখী জন্তু-জানোয়ার সকলের জন্যেই তাঁর মনে ভালবাসা ছিল সমান। তাদের জন্যেও পথের দু'ধারে ছিল জলের ব্যবস্থা, তাদের জন্যেও ছিল পিঁজরাপোল। তাঁর দ্বিতীয় পর্বতলিপি থেকে জানা যায় যে শুধু নিজের রাজ্যের সব জায়গাতেই নয়, সিংহল আর তামিলের মিত্র রাজ্যগুলোতে, এমন কি গ্রীক-রাজ অ্যান্টিওকস-এর রাজধানী সিরিয়াতে এবং আরও অন্য অন্য বিদেশী

রাজ্যেও মানুষ আর জন্তু-জানোয়ারদের জন্যে হাসপাতাল আর আতুরাশ্রম তৈরী করেছিলেন এই পরম জীবহিতৈষী সম্রাট্।

প্রজাবৎসল অশোক—অশোক সমস্ত মানুষকেই ভালবাসতেন নিজের ছেলের মত। এক পাহাড়ের গায়ে তাঁর একটা লেখা দেখা যায়—সব প্রজাই আমার সন্তান; আমি যেমন চাই আমার ছেলেরা ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হয়, তেমনি এও চাই যে আমার প্রজাদেরও যেন ইহলোকে ও পরলোকে ভাল হয়।

অশোকের উপদেশ—অশোক প্রজাদের উদ্দেশ করে যে-সমস্ত উপদেশ পাহাড়ের বুকে কি স্তম্ভের গায়ে লিখে রেখে গিয়েছেন, তার সার মর্ম হল—মা বাবা আর অন্য অন্য গুরুজনদের ভক্তি করবে; সত্য কথা বলবে; মানুষ-জীব-জন্তু সকলকেই ভালবাসবে, সকলকেই দয়া দেখাবে; বন্ধু-বান্ধব ভৃত্য সকলের সংগে যেমন ব্যবহার করা উচিত তেমনি ব্যবহার করবে; অন্যের ধর্মকে ছোট করে দেখবে না; দেহে মনে পবিত্র হবে—ইত্যাদি।

অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব—অশোকের মতো সম্রাট্ পৃথিবীর যে-কোন দেশের পক্ষেই গর্বের জিনিস। স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, শুভেচ্ছা দিয়ে তিনি মানুষের মনোরাজ্যই জয় করতে চেয়েছিলেন—তরবারির সাহায্য নিয়ে জল-স্থলের বাঁধনে বাঁধা দেশ বা রাজ্য জয়ের লোভ ছিল না তাঁর মনে। এক বিশাল শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও এই যে সংযম তিনি দেখিয়েছিলেন তার তুলনা পাওয়া যায় না পৃথিবীর ইতিহাসে তাই তিনি শুধু মানুষেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন 'দেবানাং প্রিয়ঃ' অর্থাৎ দেবতাদেরও প্রিয়।

জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী—ধর্মপ্রচারে ও জীবের কল্যাণ-সাধনেই তিনি তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন। প্রজাদের তিনি দেখতেন তাঁর আপন সন্তানের মতো। তাই তারা যাতে সৎভাবে জীবন-যাপন করতে পারে, জীবনে যাতে তাদের প্রকৃত মংগলের প্রতিষ্ঠা হয় সেজন্যে সদুপদেশ প্রচার করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, পর্বতগাত্রে এবং স্তম্ভের ওপর ক্ষোদিতও

করে গিয়েছিলেন সাধারণের বোধগম্য ভাষায়। উদ্দেশ্য ছিল, পথ চলতে চলতেও এই সমস্ত সদুপদেশ চোখে পড়লে এর থেকে সারমর্ম আহরণ করে তারা তাদের জীবন সুগঠিত করে তুলতে পারবে। সন্তানের মতো স্নেহ করতেন বলেই পথ চলতে যাতে কেউ কষ্ট না পায় সেদিকেও লক্ষ্য ছিল তাঁর। এরই জন্যে তিনি পথের ধারে ধারে বৃক্ষ রোপণ, কূপ খনন ও বিশ্রামাগার নির্মাণ করিয়েছিলেন। মানুষ ও পশুর সুচিকিৎসার জন্য বহু আরোগ্যশালাও এই জন্যেই তিনি স্থাপিত করে গিয়েছিলেন। কৃষির জন্য জলসেচের উত্তম ব্যবস্থা করে যাওয়ার পেছনেও ঐ একই উদ্দেশ্য ছিল—প্রজাদের কল্যাণ সাধন।

ধর্মীয় উদারতা—ধর্মমতেও অশোক ছিলেন অতি উদার। নিজে বৌদ্ধ হলেও সকল ধর্মের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি ছিল। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত দীনদরিদ্রকে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

পৃথিবীর মহত্তম লোকপালক—এইভাবে মানুষ আর পশুপক্ষীর যথার্থ কল্যাণসাধনে সমস্ত রাজশক্তি নিয়োগ করতে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনও সম্রাট্‌কে দেখা যায় নি। তাঁর মহত্ত্ব পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমস্ত নরপতির কীর্তি-মহিমাকে ম্লান করে দিয়েছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের লোকের মনে আজও অশোকের স্মৃতি অম্লান দ্যুতিতে বিরাজ করছে।

অশোকের ক্ষোদিত লিপি—অশোকের সময়কার ইতিহাস রচনার সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য উপাদান ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আবিষ্কৃত তাঁর ক্ষোদিত লিপিগুলি। সাধারণের বোধগম্য প্রাকৃত ভাষাতে অশোক তাঁর এই লিপিগুলি ক্ষোদিত করে গিয়েছিলেন—লিপিগুলির মধ্যে বাইশটি পর্বতগাত্রে এবং চোদ্দটি স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদাই করা আছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে লিপিগুলি পাওয়া গিয়েছে তার হরপ খরোষ্ঠী (প্রাচীন ইরাণের আরামী বর্ণমালা থেকে উদ্ভূত; লেখার প্রণালী ডান দিক থেকে বাঁ দিকে—আমাদের মতো বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নয়); অন্যান্য লিপিগুলির হরপ ব্রাহ্মী, যা থেকে

দেবনাগরী এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অন্যান্য আধুনিক হরপ উদ্ভূত হয়েছে।

অশোকের এই সমস্ত লিপি থেকে যেমন কলিংগ জয় ও কলিংগ যুদ্ধের অজস্র রক্তপাতে তাঁর ভাবান্তর, বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর অনুরক্তি, জীবহিংসা নিষেধ, প্রজাবাৎসল্য, জীবকল্যাণ সাধন প্রভৃতির কথা জানা যায়, তেমনি তাঁর রাজ্যের বিস্তার, ভারতে এবং ভারতের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ, তাঁর রাজ্যশাসনপদ্ধতি, তাঁর অধীন প্রদেশপাল ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের শাসনকার্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রভৃতির কথাও জানতে পারা যায়; দেশের লোকদের নৈতিক জীবন সম্বন্ধেও যথেষ্ট আলোক পাওয়া যায় তাঁর এই সমস্ত পর্বত ও স্তম্ভলিপি থেকে। এ ছাড়া সুনীতি ও সদাচরণের অমূল্য উপদেশাবলীর ধারক হিসেবেও এই লিপিগুলির মূল্য অসামান্য।

মৌর্য যুগে সমাজ ও সভ্যতা: সমাজ—মেগাস্থিনিসের বিবরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, অশোকের ক্ষোদিত লিপি প্রভৃতি থেকে মৌর্য যুগের সামাজিক অবস্থার কথা অনেকখানি জানা যায়।

এখনকার মতো তখনও ভারতবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। তাই বেশির ভাগ লোকই বাস করত গ্রামে। মৌর্য সম্রাট্‌রা জলসেচ ব্যবস্থার ওপর খুবই নজর দিতেন, ফলে কৃষির অবস্থা ভালই ছিল। সব রকম খাদ্য-শস্য, ফলমূল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। তাই জীবনধারণের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য দেশবাসী যথেষ্ট পরিমাণেই পেত। দুর্ভিক্ষ কদাচিৎই দেখা দিত। দেশে খনিজ দ্রব্য এবং বহুমূল্য রত্নাদিও যথেষ্ট পাওয়া যেত। শিল্প-বাণিজ্যেও মৌর্য সাম্রাজ্য খুবই উন্নতিশীল ছিল। ভারতের বণিকরা শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বিদেশের বাজারেও যথেষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতেন। শিল্প-বাণিজ্যের ওপর রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ছিল বেশ ভাল রকমই। অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে সোনা, হীরে, মণি, মুক্তো ইত্যাদির ব্যবসাতে দাক্ষিণাত্যের বণিকরা লাল হয়ে উঠতেন। উত্তর ভারতের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য ছিল কম্বল, চামড়া আর ঘোড়া। কাপড়-চোপড় আসত বারাণসী, মাদুরা,

কঙ্কণ, এমন কি সুদূর চীন থেকেও। স্থল ও জলপথে চলত বিদেশের সংগে বাণিজ্য। বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক আইন-কানুনও ছিল—ভারতে আসবার বা ভারত থেকে যাবার জন্যে এখনকার মতো তখনও 'পাশপোর্ট' দরকার হত। শিল্প-বাণিজ্যে তখন অনেক যৌথ সংগঠনও যে বর্তমান ছিল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত সংগঠনকে বলা হত শ্রেণী। এই সমস্ত শ্রেণী আধুনিক ব্যাংকেরও কাজ করত।

দেশের লোকেরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই বাস করত। সুন্দর সুন্দর জরির পোশাক, ফুল-তোলা সূক্ষ্ম মসলিনের কাপড়, দামী পাথর-বসানো সোনার গয়না, ইত্যাদি পরতে লোকেরা খুবই ভালবাসত। তবে তারা আচার-ব্যবহারে ছিল খুবই সরল, ব্যয়ের দিক থেকেও তারা ছিল মিতব্যয়ী। যাগযজ্ঞ ছাড়া অন্য সময় তারা বড় একটা মদ্য পান করত না। চুরি ডাকাতি কদাচিৎ ঘটত—লোকেরা রাত্রে দরজা-জানালা খুলে রেখে নিশ্চিন্ত মনেই নিদ্রা যেতে পারত। মামলা-মোকদ্দমা হত না বললেই হয়। লোকেরা পরস্পরকে বিশ্বাস করত, মিথ্যা কথা বলা তাদের অভ্যাস ছিল না।

প্রাকৃত ভাষায় ক্ষোদিত অশোকের লিপিগুলি দেখে অনুমান করা যায় যে দেশের লোকেদের অধিকাংশই লেখাপড়া জানত। পাহাড়ের গায়ে বা স্তম্ভের ওপর ক্ষোদাই করার জন্যে খরচ নিশ্চয়ই প্রচুর পড়ত। জনসাধারণ যাতে এই সমস্ত লিপি পড়ে তাদের জীবন সুগঠিত করে তুলতে পারে তারই জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এত লিপি ক্ষোদিত করিয়ে গিয়েছিলেন অশোক। তারা যদি পড়তেই না পারত তাহলে তাঁর মত প্রজাহিতৈষী সম্রাট্ রাজকোষের এত অর্থ—যা তাঁর মতে ছিল প্রজাদেরই জন্য ন্যস্ত সম্পত্তি—কখনোই অযথা অপব্যয়িত হতে দিতেন না।

সভ্যতা—মৌর্য যুগে ভারত যে শিল্পে ও সভ্যতায় জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিল্পের দিক দিয়ে, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত কাঠের যে-সমস্ত বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে গিয়েছিলেন, সমসাময়িক গ্রীকদের মতে তা ইরাণের বহুখ্যাত রাজপ্রাসাদের চেয়েও ঢের বেশি সুন্দর

ছিল। অশোকের পাথরে তৈরী প্রাসাদ এমনই বিশাল, এতই অপূর্বসুন্দর ছিল যে পাঁচশো বছর পরেও তা দেখে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বলেছিলেন যে এ মানুষের কীর্তি হতে পারে না, নিশ্চয়ই কোন অতিমানবের কীর্তি। অশোক-স্তম্ভের নিখুঁত কারুকার্য ও মসৃণতা আজও পৃথিবীর বিস্ময়। কাঠের ও পাথরের কাজে ভারতের শিল্পীরা তখন যে কতদূর উন্নতি করেছিল তা এ থেকেই অনুমান করা যায়। সম্পূর্ণ একটা পাথরের তৈরী এক একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ যে রেল-ট্রাক-ক্রেণ না থাকা সত্ত্বেও দূর দূরান্তরে নিয়ে যাওয়া হত তা থেকেই বোঝা যায়, সেই সুদূর অতীতে ভারতবাসীরা ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় বহুদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। তখন যে-সমস্ত সুন্দর সুন্দর বাসন-পত্র, গয়না-গাঁটি, বা জরি-বসানো সূক্ষ্ম কাপড় লোকেরা ব্যবহার করত তা এদেশের শিল্পীদের দক্ষতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জনসাধারণের মধ্যে যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল সে সম্বন্ধে আমাদের অনুমানের কথা আগেই বলেছি।

মৌর্য সম্রাট্‌রা সকলেই প্রজাপালক ও সুশাসক ছিলেন। রাজ্যশাসনের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেও তাঁরা সমস্ত কাজেই প্রজাদের মংগলচিন্তা দ্বারাই প্রণোদিত হতেন। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক দুজনেই প্রজাদের কাছে ছিলেন অবারিতদ্বার। যে-কোন প্রজাই যে-কোন সময়ে তাঁদের কাছে হাজির হয়ে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা জানাতে পারত। এঁরা দুজনেই প্রজাদের সন্তানবৎ স্নেহ করতেন। প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে তখন যে কত উন্নত ধারণা বর্তমান ছিল, অর্থশাস্ত্রের এই নীতি হতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্র রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে বলছেন—রাজা নিজে যাতে খুশি হতে পারেন তাকেই তাঁর ভাল মনে করা উচিত নয়, প্রজারা যাতে খুশি হতে পারে তাকেই তাঁর প্রকৃত কল্যাণ বলে মনে করা উচিত। সুশাসন করা রাজার পক্ষে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য, কেননা সুশাসনই প্রজার কাছে রাজার ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায়। এ শুধু ফাঁকা বুলি নয়—চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক দুজনেই এই নীতি তাঁদের জীবনে মেনে নিয়েছিলেন এবং এই নীতি

অনুসারেই প্রজার প্রতি তাঁদের কর্তব্য তাঁরা পালন করে গেছেন। যথেচ্ছাচার করার মতো সমস্ত ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার না করে, অপূর্ব আত্মসংযমে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করে প্রজাহিতৈষণার এই মহান্ আদর্শ অনুসরণ করে যাওয়ার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বড় বেশি পাওয়া যায় না। সমাজ কত সভ্য ও শিক্ষিত হলে যে রাজার এই মহান্ কর্তব্য নির্ধারণ করে দেয় এবং রাজাও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তা পালন করেন তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ, মৌর্য যুগে ভারতীয় সমাজ শিক্ষায়-সভ্যতায়, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে, সমৃদ্ধিতে আদর্শস্থানীয় ছিল বলা যেতে পারে।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ—গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ 'ইণ্ডিকা' নামে একখানি বইয়ে চন্দ্রগুপ্তের সময়কার এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। এই বইখানি এখন পাওয়া যায় না, তবে তাঁর পরবর্তী বহু গ্রীক লেখকের লেখায় তাঁর 'ইণ্ডিকা' থেকে যে সমস্ত উদ্ধৃতি পাওয়া যায় তা থেকেই আমরা তাঁর মতামত অনেকটা জানতে পারি।

মেগাস্থিনিস মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে বহুদিন বাস করে গিয়েছিলেন। তাঁর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর। দৈর্ঘ্যে তা ছিল ৯½ মাইল আর প্রস্থে ১¾ মাইল। চারিদিকে প্রশস্ত পরিখা আর সু-উচ্চ প্রাচীর দিয়ে শহরটি সুরক্ষিত করা ছিল। প্রাচীরে ৫৭০টি উঁচু স্তম্ভ এবং ৬৪টি তোরণ ছিল। চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ ছিল কাঠের তৈরী। প্রাসাদের ভেতর ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগান, বড় বড় পুকুর। ময়ূর আর নানা জাতের সুন্দর সুন্দর পাখী খেলা করত সেই সমস্ত বাগানে, পুকুরে খেলা করত বড় বড় সুন্দর সুন্দর মাছ। বিশালতা ও সৌন্দর্যের জন্যে ইরাণের রাজপ্রাসাদের সে সময় ছিল জগৎজোড়া খ্যাতি। কিন্তু ইরাণ-প্রত্যাগত গ্রীকদের মতে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের সংগে ইরাণের সেই অতি বিখ্যাত প্রাসাদেরও কোন তুলনাই হত না। পাটনার সন্নিকটে কুমরাহার গ্রামের কাছে সম্প্রতি এই বিশাল প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

মেগাস্থিনিসের বিবরণী থেকে সেকালের ভারতীয়দের **সামাজিক অবস্থা** সম্বন্ধেও আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। মেগাস্থিনিস্ বৃত্তি অনুসারে ভারতবাসীদের দার্শনিক (ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণ), কৃষক, পশুপালক ও শিকারী, শিল্পী ও বণিক্, সৈনিক, পরিদর্শক ও গুপ্তচর এবং অমাত্য—এই সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে গেছেন। মেগাস্থিনিস্ ভারতীয়দের মিতব্যয়িতা ও সততার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। দেশে চুরি-ডাকাতি প্রায়ই হত না; মামলা-মোকদ্দমাও বিরল ছিল! যজ্ঞের সময় ছাড়া ভারতবাসীরা মদ্যপান করতেন না।

মেগাস্থিনিসের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, মৌর্য সম্রাটের অধীনে দু' শ্রেণীর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। এক শ্রেণীর ওপর ন্যস্ত থাকত গ্রামাঞ্চলের আর এক শ্রেণীর ওপর রাজধানীর শাসনকার্য পরিচালনা করার ভার। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে কেউ নদ-নদী তদারক করতেন, কেউ জমি জরিপ করতেন, কেউ বা জলনিকাশের ব্যবস্থা পরিদর্শন করতেন। কারও ওপর থাকত শিকারীদের তদারক করার ভার, কেউ করতেন রাজস্ব আদায়, কেউ কেউ কাঠুরিয়া, সূত্রধর, কর্মকার ও খনির শ্রমিকদের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করতেন। আবার কেউ বা রাস্তা-নির্মাণ তদারক করতেন—রাস্তার মাঝে মাঝে 'মাইল-স্টোন'-এর মতো দূরত্ব-নির্দেশক স্তম্ভ স্থাপন করার ভারও থাকত তাঁদেরই ওপর।

রাজধানীর শাসনকাজ পরিচালনার জন্য ছ'টি সমিতি ছিল। প্রত্যেক সমিতিতে সদস্য থাকতেন পাঁচজন করে। এক-একটি সমিতির ওপর থাকত এক-একটি কাজের ভার। যেমন, এক সমিতির সদস্যরা পরিদর্শন করতেন কারুশিল্পের কাজকর্ম; দ্বিতীয় এক সমিতির ওপর ছিল বৈদেশিকদের দেখাশোনা করার ভার; তৃতীয় একটি সমিতি কর নির্ধারণের জন্যে নাগরিকদের জন্মমৃত্যুর হিসেব রাখতেন; চতুর্থ সমিতি খুচরো কেনা-বেচা, ওজন ও মাপ নিয়ন্ত্রণ করতেন; পঞ্চম সমিতির ওপর ছিল শিল্পজাত জিনিস-পত্র বিক্রি করার ভার; আর ষষ্ঠ সমিতির ওপর ছিল বিক্রীত জিনিসের

মুল্যের এক-দশমাংশ শুল্ক হিসেবে আদায় করার ভার। নির্দিষ্ট কাজ ছাড়াও এই ছ'টি সমিতি সম্মিলিতভাবে সরকারী ইমারত দেখাশোনা, জিনিসপত্রের দাম ঠিক করা, বাজার, বন্দর, মন্দির প্রভৃতির তদারকও করতেন।

মেগাস্থিনিস্ বলেছেন যে, চন্দ্রগুপ্তের এক বিশাল স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল এবং সৈন্যবিভাগ পরিচালনার ভার ছিল তিরিশজন সদস্য নিয়ে তৈরী এক সমিতির ওপর। এই সমিতিও ছ' ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগে সদস্য থাকতেন পাঁচজন করে। এক এক ভাগের ওপর এক-একটি নির্দিষ্ট কাজের ভার ন্যস্ত থাকত। এই ছ'টি বিভাগ নৌবহর, রসদ, যানবাহন, পদাতিক, অশ্বারোহী, রথী আর হস্তিবাহিনীর তদারক করত।

প্রশ্ন

১। মেগাস্থিনিস্-এর বিবরণী কি জন্যে মূল্যবান? তাঁর বিবরণী থেকে মৌর্য যুগ সম্বন্ধে কি জানা যায় সংক্ষেপে লেখ।

[Estimate the value of Megasthenes' acconut. What light does it throw on the history of that period ?]

২। অশোকের জীবনী ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যা' জান লেখ।

[Give an estimate of the life and greatness of Asoka.]

৩। প্রজাবর্গের পার্থিব. নৈতিক ও ধর্মীয় মংগলসাধনের জন্য অশোক কি কি করেছিলেন ?

[What did Asoke do for the material, moral and religious advancement of his subjects ?]

৪। মৌর্য যুগে ভারতবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে যা জান লেখ। শিক্ষায়, সভ্যতায় ভারত কি তখন অনগ্রসর ছিল ?

[Write what you know about the social and economic life of the Indians in the Maurya age. Do you think that India was then backword in culture and civilization ?]

॥ অশোকের পর পাঁচশ বছর ঃ রূপান্তরের যুগ ॥

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন—অশোকের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ভেংগে পড়তে আরম্ভ করে। তাঁর বংশধররা ছিলেন দুর্বল; এই বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করবার মতো যোগ্যতা তাঁদের ছিল না। ফলে দূরবর্তী প্রদেশগুলোর ওপর কেন্দ্রের প্রভাব ক্রমশঃ শিথিল হয়ে পড়তে লাগল। ক্রমে রাজ-পরিবারের কয়েকজন লোক কয়েকটি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলেন। তারপর থেকেই বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়তে লাগল। অশোকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই পাটলিপুত্রের সিংহাসন মৌর্যদের হাতছাড়া হয়ে যায়। শেষে মৌর্য সম্রাট্ বৃহদ্রথকে হত্যা করে তাঁর ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুংগ পাটলিপুত্র সিংহাসন অধিকার করে শুংগরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যান।

মৌর্যোত্তর মগধ—পুষ্যমিত্র শুংগের পর দশজন শুংগ-রাজা প্রায় একশ' বারো বছর রাজত্ব করে যান পাটলিপুত্রে। শুংগদের পরে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসেন শেষ শুংগ-রাজের মন্ত্রী বাসুদেব কাণ্ব। কাণ্বরা মোট পঁয়তাল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন পাটলিপুত্রে।

এই শুংগ আর কাণ্ব রাজারা যে সময় পাটলিপুত্রে রাজত্ব করছিলেন, সেই সময় ব্যাকৃট্রিয়ান (বাহ্লীক), সাইথিয়ান (শক), পার্থিয়ান (পহ্লব, পারদ বা পার্থিব) প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশী আক্রমণকারী শক্তি বার বার এসে হানা দিচ্ছিল পশ্চিম আর উত্তর-পশ্চিম ভারতে।

ব্যাকৃট্রিয়ান—এঁদের মধ্যে প্রথম এসেছিলেন ব্যাকৃট্রিয়ান গ্রীকরা। আফগানিস্থান আর পঞ্জাব অধিকার করে এঁরা প্রায় আড়াইশ' বছর সেখানে রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন **মিনান্দার (মিলিন্দ)**। অযোধ্যা জয় করে এই ব্যাকৃট্রিয়ান রাজা অগ্রসর হয়েছিলেন পাটলিপুত্র পর্যন্ত; কিন্তু পুষ্যমিত্রকে পরাজিত করতে পারেন নি।

মিনান্দার শেষ জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন—**মিলিন্দ-পঞ্‌হো** (মিলিন্দের প্রশ্ন) নামে একখানা বইয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং বৌদ্ধ-ধর্মশাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যে-সমস্ত প্রশ্ন জেগেছিল মিলিন্দের মনে তা বিধৃত রয়েছে এই বইখানির মধ্যে।

সাইথিয়ান—ব্যাক্‌ট্রিয়ানদের পর আসেন সাইথিয়ান বা শক নামে এক বিদেশী জাতি। এঁদের আদি বাস ছিল মধ্য এশিয়ায়। সেখান থেকে য়ুয়ে-চি বা কুষাণদের কাছে তাড়া খেয়ে এঁরা দক্ষিণদিকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন, পরে দক্ষিণ আফগানিস্তানে শকস্তান (বর্তমান সিস্তান) অধিকার করে বসবাস করতে থাকেন। তারপর ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে ভারতে প্রবেশ করে উত্তরে তক্ষশিলা আর মথুরায়, আর দক্ষিণে মালব আর সৌরাষ্ট্রে (বর্তমান কাথিয়াবাড়) এক-একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে এঁদের প্রতিষ্ঠিত সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সৌরাষ্ট্রের শকরাজ্যই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এখানকার রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর **রুদ্রদামন**।

পার্থিয়ান—শকদের পর যে বিদেশী জাতি এসে ভারতের দরজায় হানা দেন তাঁদের নাম হল পার্থিয়ান। ভারতে প্রবেশ করার আগে এঁরা বাস করতেন কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণদিকে পার্থিয়া অঞ্চলে। সেখান থেকে ক্রমে কান্দাহার জয় করে এঁরা ভারতের মধ্যে প্রবেশ করেন। কাবুল আর সিন্ধু নদের উপত্যকায় এঁরা অনেকগুলো রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতে যে সমস্ত পার্থিয়ান রাজা রাজত্ব করে যান, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন **গণ্ডোফার্নিস**। তাঁর রাজত্বকালে ভারতে পার্থিয়ান শক্তি উন্নতির তুংগশৃংগে উঠেছিল। যীশু খ্রীষ্টের অন্যতম শিষ্য সেণ্ট টমাসও নাকি এঁরই রাজত্বকালে ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন।

কুষাণ—সব শেষে আসেন কুষাণরা। মধ্য-এশিয়া থেকে যাঁরা শকদের গৃহহারা করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই য়ুয়ে-চি জাতিরই এক অংশ ছিলেন

এই কুষাণরা। উত্তর আর উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু জায়গাই নিজেদের অধীনে এনে এঁরা এক বিস্তৃত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই কুষাণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন মহারাজাধিরাজ **কণিষ্ক**। গান্ধার থেকে পবিত্র হিন্দু-তীর্থ বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁর রাজ্য। এই বিশাল রাজ্যের রাজধানী ছিল পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার)। তক্ষশিলা আর মথুরা ছিল তাঁর রাজ্যের আর দু'টো প্রধান শহর। এর মধ্যে মথুরায় কণিষ্কের তুর্কি-পোশাক-পরা প্রকাণ্ড একটা মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। বহু যুদ্ধের বিজয়ী বীর কণিষ্কের সংগে নাকি সুদূর চীন দেশের রাজারও যুদ্ধ হয়েছিল। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়াঙ-চুয়াঙ নাকি সন্ধির জামিন হিসেবে এক চৈনিক রাজকুমারকে থাকতে দেখেছিলেন মহারাজাধিরাজ কণিষ্কের সভায়।

বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী কণিষ্ক—অশোকের মতো কণিষ্কও বৌদ্ধ ধর্মে অনুরাগী ছিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি পরীক্ষা আর এই সমস্ত শাস্ত্রের টীকা-টিপ্পনী তৈরী করবার জন্যে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক মহাসভা আহ্বান করেছিলেন। বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের ওপর পেশোয়ারে তিনি এক প্রকাণ্ড স্তূপ বা চৈত্যও নির্মাণ করিয়েছিলেন। পেশোয়ারের এই প্রকাণ্ড স্তূপটির গঠন-বৈচিত্র্য নাকি এতই সুন্দর ছিল যে সেকালে দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোকই এই স্তূপটি দেখতে আসত।

মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম—বুদ্ধ বা অশোকের সময় বৌদ্ধ ধর্মের যে সহজ ও সরল রূপ ছিল, মহারাজাধিরাজ কণিষ্কের সময় তাতে রূপান্তর ঘটেছিল। এই রূপান্তরিত বৌদ্ধ ধর্মের নাম দেওয়া হয়েছিল **মহাযান** বৌদ্ধ ধর্ম। এর আগে বৌদ্ধ ধর্মের যে রূপ ছিল তার নাম দেওয়া হয় **হীনযান** বৌদ্ধ ধর্ম। মহাযান বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধকে শুধু দেবতা নয়, একেবারে দেবাদিদেব বলে মানা হতে লাগল। জীবের দুঃখ দূর করবার জন্যেই বার বার নরদেহে তিনি জন্ম নিয়েছেন এই ধূলির ধরণীতে; সত্য ধর্ম প্রচার করে গিয়েছেন মানুষকে সত্যের পথ, নির্বাণের পথ দেখাবার জন্যে,—বললেন মহাযানী বৌদ্ধরা। এই সময়ই গ্রীক দেবতাদের মূর্তির অনুকরণে বুদ্ধদেবেরও বিভিন্ন ভংগির মূর্তি তৈরী হতে

লাগল আমাদের দেশে। বুদ্ধের অনুরাগী বিদেশী রাজারা, বিশেষ করে গ্রীকরাই, বুদ্ধদেবের এই মূর্তিপূজোর প্রচলন করে যান। তাঁদের আগে পর্যন্ত মূর্তি গড়ে বুদ্ধদেবের পূজো করতেন না ভারতীয় বৌদ্ধরা। এই জনপ্রিয় মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমে চীন, জাপান আর অন্যান্য নানা দেশেও ছড়িয়ে পড়ল।

সাহিত্য ও শিল্পানুরাগ—মহারাজ কণিষ্ক শুধু সুশাসক, নির্ভীক যোদ্ধা বা বৌদ্ধধর্মানুরাগীই ছিলেন না, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কবি-সাংগীতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক অশ্বঘোষ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত চরক, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন ও বসুমিত্র প্রমুখ বহু ভারতীয় মনীষী তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন।

পেশোয়ারে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের ওপর তৈরী ৪০০ ফুট উঁচু বিশাল স্তূপ ও কাশ্মীরে কণিষ্কপুর শহর তাঁর স্থাপত্যানুরাগের পরিচয় দেয়। মথুরাকেও তিনি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বহু বিচিত্র ও নয়নমনোহর নিদর্শন দিয়ে সাজিয়েছিলেন। এইখানেই তাঁর বহু মূর্তি (তুর্কি-বেশধারী মূর্তি সমেত) পাওয়া গিয়েছে। গান্ধার শিল্পরীতির বহু নিদর্শনও কণিষ্ক ও হুবিষ্কের সময় নির্মিত হয়েছিল। কণিষ্ক এবং অন্যান্য কুষাণ রাজাদের মুদ্রাতে রোমক মুদ্রাঙ্কন-পদ্ধতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

শৈব বাসুদেব—কণিষ্কের পর আরও অনেক কুষাণ রাজা রাজত্ব করে যান ভারতবর্ষে। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন **প্রথম বাসুদেব**। এঁর যত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, তার বেশির ভাগের ওপর উৎকীর্ণ রয়েছে বৃষভবাহন শিবের মূর্তি।

কণিষ্কের রাজত্বকালের গুরুত্ব—নানা কারণেই কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজত্বকালকে ভারত-ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলা যেতে পারে। কুষাণরাজ্যের সুদূর বিস্তার আবার ভারতীয়দের মনে বিস্তীর্ণ ভূভাগকে এক শাসনের অধীনে এনে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের কামনা জাগিয়ে দেয়। পরবর্তী যুগে সমগ্র উত্তর-ভারতব্যাপী গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় এরই পরিণতি

লক্ষ্য করা যায়। কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্যে ও শিল্পে যে প্রাণবন্যা দেখা দেয়—অশ্বঘোষ, নাগার্জুন প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতদের রচনা যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—তারই মহতী পরিণতি প্রত্যক্ষ করা যায় পরবর্তী যুগে মহাকবি কালিদাসের রচনায়, অজন্তা-ইলোরার অপূর্ব ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে। কুষাণ রাজত্বে সাহিত্য ও শিল্পের মতো ভারতের ধর্মীয় জীবনেও যথেষ্ট চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির ভারতে অবস্থানের জন্যে তাঁদের ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাস ভারতীয় ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাসকে প্রভাবিত করে তুলছিল—বিদেশীদের ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাস আত্মীকরণের জন্যে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মেও যথেষ্ট উদারতা দেখা দিতে লাগল। বুদ্ধদেব যে ধর্ম প্রচার করে গিয়েছিলেন, অশোক যে ধর্ম দেশ-বিদেশে প্রচার করেছিলেন, স্বাভাবিক ভাবেই তাতে রূপান্তর দেখা দিল। বুদ্ধদেব নিজে দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতেন না, বৌদ্ধরাও আগে তাঁকে গুরু রূপেই শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ক্রমে বৈদেশিক ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবে তিনি দেবতা রূপেই পূজো পেতে লাগলেন। মূর্তি নির্মাণ করে তাঁর পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত হল। কণিষ্কের সময় বৌদ্ধধর্মের এই রূপান্তর পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল 'মহাযান' মতের প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে। নাগার্জুন ছিলেন এই মতের প্রধান সমর্থক। হিন্দুধর্মেও যথেষ্ট উদারতা দেখা যায়, যার ফলে শৈব ও ভাগবত মতের প্রচলন হয় এবং বহু বৈদেশিক রাজা ও প্রধান ব্যক্তিকেও এই দুই ধর্মমত গ্রহণ করতে দেখা যায়। মধ্য ও পূর্ব এশিয়াতে কণিষ্কের বিজয় অভিযান এই সমস্ত অঞ্চলে ভারতীয় শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটায়। এই সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করলে মহারাজ কণিষ্কের রাজত্বকালকে ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ বলে অভিহিত করতে হয়।

মৌর্যোত্তর যুগে ভারত—মৌর্য্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর থেকে গুপ্ত যুগ আরম্ভ হবার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রায় পাঁচশ' বছর সময় ভারতের ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকেই এই সময়টাকে রূপান্তরের যুগ বলা যায়।

ধর্ম—এই সময় বৌদ্ধ ধর্মের চরম উন্নতির সময়। বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি এই সময় এত বেশি হয়েছিল যে এই যুগকে বৌদ্ধ ধর্মের যুগও বলা যেতে পারে। গ্রীক, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক রাজারাও এই ধর্মকে অন্তরের সংগে শ্রদ্ধা করতেন। এই যুগেই বৌদ্ধধর্ম ভারতের সীমানা পার হয়ে চীন ও ভারতীয় দ্বীপমালায় গিয়ে পৌছয়। শুধু তাই নয়। কুষাণরাজ কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতা ও সক্রিয় চেষ্টায় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই ধর্ম মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় প্রসার লাভ করে। এই যুগের সর্বোত্তম সাহিত্য ও শিল্পকীর্তিও বৌদ্ধধর্মের সংগে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বৌদ্ধ ধর্মের এই উন্নতি ও জনপ্রিয়তার কারণ তার উদারতা। বিদেশী আক্রমণকারীরা এই উদারতার জন্যেই বৌদ্ধ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। গ্রীকরাজ মিনান্দার শুধু বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণই করেন নি, 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' (মিলিন্দের প্রশ্ন) নামে পালি ভাষায় বৌদ্ধধর্মবিষয়ক বইও লিখেছিলেন। কুষাণরাজ কণিষ্কের বৌদ্ধধর্মানুরাগের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। তাঁরই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মে 'মহাযান' সম্প্রদায় প্রবল হয়ে ওঠে। মহাযান-সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধরা বুদ্ধদেবের মূর্তি নির্মাণ করিয়ে পূজো করতেন। এর আগে বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজোর প্রচলন ছিল না। গ্রীকদের প্রভাবেই গ্রীক দেবতা অ্যাপোলো প্রভৃতির অনুকরণে বুদ্ধদেবের মূর্তিপূজোর প্রচলন ঘটে।

বৌদ্ধ ধর্মের সমুন্নতি ঘটলেও এই যুগে হিন্দু ধর্মও একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে নি। শুংগরাজ পুষ্যমিত্র নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাই তাঁর রাজত্বকালে তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেছিলেন। পরে অবশ্য শাতবাহন (অন্ধ্র) বংশীয় এবং তারও পরে গ্রীক ও কুষাণ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাময়িকভাবে বৌদ্ধ ধর্মের খুবই উন্নতি দেখা দেয়। তবে হিন্দু ধর্মের মধ্যেও এই সময় নতুন আন্দোলন দেখা দেয়। ভাগবত ধর্ম (যা পরে বৈষ্ণব ধর্মরূপে দেখা দিয়েছিল) ও শৈব ধর্ম গোঁড়া হিন্দু ধর্মের সংকীর্ণতা দূর করে তার মধ্যে খানিকটা উদারতা এনে দেয়। ফলে এই দুই ধর্মও খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তক্ষশিলার গ্রীকরাজ অ্যানটিয়ালকাইদাস-এর দূত ও গ্রীক রাজনীতিজ্ঞ হেলিওদোরস ভাগবত ধর্মের অনুরাগী হয়ে পড়েন এবং বেসনগরে বাসুদেবের

প্রতি শ্রদ্ধাচিহ্ন হিসেবে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় কুষাণরাজ বিম কদ্‌ফিস শৈবধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কুষাণবংশের শেষ শক্তিশালী রাজা প্রথম বাসুদেবও শৈব ছিলেন।

সাহিত্য—হীনযান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ করার জন্যে উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। ফলে বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনের বহু অমূল্য গ্রন্থ এই সময় রচিত হয়। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' সাহিত্যিক মূল্যায়নে মহাকবি কালিদাসের অমর রচনাবলীর সংগে তুলনীয়। মহাযান মতের শ্রেষ্ঠ প্রচারক নাগার্জুনের দার্শনিক নিবন্ধাবলী বৌদ্ধ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মিলিন্দের প্রশ্ন বা 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' এ-যুগের আর একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। এছাড়া পতঞ্জলির ব্যাকরণ গ্রন্থ 'মহাভাষ্য', চরক ও সুশ্রুতের আয়ুর্বেদ গ্রন্থাবলী, মনুর সংহিতা প্রভৃতি এ-যুগের হিন্দু পণ্ডিতদের অমর কীর্তি। গাথাসপ্তশতীর কবি হাল এই যুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গর্গের জ্যোতিষ-গ্রন্থ এবং ভাসের নাটকাবলীও এই যুগের রচনা বলেই অনুমান করা হয়। অর্থাৎ সাহিত্য ও জ্যোতির্বিদ্যার দিক দিয়ে এই যুগকে কালিদাস-বরাহমিহির-আর্যভট্ট প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য কবি-দার্শনিক-জ্যোতির্বেত্তাদের আবির্ভাবের প্রস্তুতির যুগ বলা যেতে পারে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য—মথুরা, সারনাথ, অমরাবতী ও গান্ধার—স্থাপত্য-শিল্পের এই চার রকম রীতির উদ্ভবকাল হল এই যুগ। কার্লের গুহা বা চৈত্য কক্ষ, সাঁচী স্তূপের চারটি তোরণদ্বার, মধ্য ভারতে পাথরের রেলিং এবং দক্ষিণ ভারতে গুন্টুর জেলার অমরাবতীতে এই যুগের শিল্পরীতির চমৎকার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। গান্ধার শিল্পরীতির বিকাশ ঘটেছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক ও রোমক এবং হিন্দু শিল্পরীতির মিশ্রণে। প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্যের গৌরবোজ্জ্বল অনেক নিদর্শনই এই শিল্পরীতির অনুসরণে তৈরী। ভারতীয় শিল্পকলায় গান্ধার শিল্পরীতির প্রভাব অবশ্য তেমন বেশি নয়, তবে ভারতের বাইরে এর সমাদর হয়েছিল যথেষ্টই। গান্ধার শিল্পকে চৈনিক

তুর্কিস্থান, মংগোলিয়া, চীন, কোরিয়া ও জাপানের বৌদ্ধ শিল্পরীতির জনক বললে অত্যুক্তি করা হয় না। প্রাচীন ভারতের শিল্পনৈপুণ্যের যা শ্রেষ্ঠ পরিচয়, পৃথিবীর শিল্পরসিকদের কাছে আজও যার আবেদন অপরিসীম, এই যুগকে অজন্তা-ইলোরার সেই শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তির সূচনার যুগ বলে স্বচ্ছন্দে চিহ্নিত করা যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্য—এই যুগে চীন ও রোমক সাম্রাজ্যের সংগে স্থল ও জলপথে ভারতের বাণিজ্য চলত বেশ ভালমতোই। রোমক লেখক প্লিনি তো গভীর দুঃখের সংগেই অভিযোগ করেছেন যে মশলাপাতি, সুগন্ধি দ্রব্য, মসলিন আর দামী দামী পাথর দিয়ে ভারত রোমক সাম্রাজ্যকে শুষে নিচ্ছে প্রতি বছর। প্লিনির এই অভিযোগ যে অমূলক নয়, দক্ষিণ ভারতে বহু রোমক সম্রাটের অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কারই তার প্রমাণ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রচনা 'পেরিপ্লাস অফ্ দি এরিথ্রীয়ান্ সী' (এক মিশরীয় গ্রীক-এর লেখা) থেকেও জানা যায় যে ভারতের পশ্চিম উপকূল অসংখ্য বন্দর ও পোতাশ্রয়ে পরিপূর্ণ ছিল। মিশর থেকে নিয়মিত জাহাজ এসে লাগত এই সমস্ত বন্দরে। ব্রোচ (ভৃগুকচ্ছ) থেকে ভারতীয় জাহাজ পণ্য নিয়ে যেত পারস্য উপসাগরের নানা বন্দরে।

উপনিবেশ বিস্তার—এই যুগে ভারতের বাইরে হিন্দুদের উপনিবেশ বিস্তার এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত হয়। চম্পা বা দক্ষিণ আনাম, কম্বুদ্বীপ বা কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ বা জাভা, সুমাত্রা, বলিদ্বীপ, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপে ভারতীয় অভিযানকারীরা উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে ভারতের শিল্প, সাহিত্য, ধর্মেরও প্রতিষ্ঠা করেন এবং এইভাবেই বৃহত্তর ভারতের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এই সমস্ত দেশ ছাড়া মধ্য এশিয়ার বহু অঞ্চলেও এই সময় ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকদের অদমনীয় উৎসাহ, ভারতের কুষাণ রাজাদের ঐ সমস্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রভৃতি কারণেই মধ্য আর পূর্ব-এশিয়ার বহু দেশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ভারতের প্রভাবাধীন হয়ে

পড়ে। মধ্য এশিয়ার খোটান অঞ্চলে সার অরেল স্টীন যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন তার ফলে জানা যায় যে, দু' হাজার বছর আগে এ-অঞ্চলের লোকেরা ভারতীয় হরপ, ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় মুদ্রা ব্যবহার করত। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সমস্ত বাড়ীঘরের চিহ্ন পাওয়া গেছে তা-ও ভারতের বৌদ্ধ ভাস্কর্য, বৌদ্ধ স্থাপত্যেরই পরিচয় বহন করছে।

গ্রীক-রোমক-ইরাণীয় সভ্যতার প্রভাব—ভারতীয় সভ্যতায় এই যুগেই গ্রীক ও রোমক সভ্যতার কিছুটা প্রভাব পড়ে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে ছোটখাট অনেকগুলো গ্রীকরাজ্য এই সময় গড়ে উঠেছিল। ওদিকে রোমক সাম্রাজ্যও বিস্তৃত হতে হতে কুষাণদের রাজ্য-সীমানার খুব কাছে এসে পড়েছিল। ফলে গ্রীক ও রোমকদের সংগে ভারতীয়দের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জিনিসপত্র আমদানী-রপ্তানীর সংগে সংগে ভাবেরও আদান-প্রদান ঘটতে থাকে। গান্ধার শিল্পে, ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানে, বুদ্ধদেবের মূর্তিপূজায়, কুষাণ রাজাদের মুদ্রায় গ্রীক ও রোমক প্রভাবের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, মৌর্যোত্তর প্রাক্‌গুপ্ত ভারতের ইতিহাস রোম-গ্রীক-পারস্যের সভ্যতার সংগে ভারতীয় সভ্যতার লেন-দেনের ইতিহাস, এবং ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগ গুপ্ত যুগের প্রস্তুতির ইতিহাস।

প্রশ্ন

১। মহারাজ কণিষ্কের সম্বন্ধে যা জান লেখ। বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের জন্য তিনি কি করেছিলেন?

[Write what you know about Maharaja Kanishka. What steps did he take for the spread of Buddhism ?]

২। মৌর্যোত্তর যুগে ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

[Write what you know about post-Maurya religion, literature, art, commerce and industry.]

॥ গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও কৃতী সম্রাট্গণ ॥

গুপ্ত যুগ—কুষাণসাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় একশ' বছর ভারতে কোন শক্তিশালী সাম্রাজ্য বা বড় রাজ্য গড়ে ওঠে নি, তবে এই সময় দেশে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তারই সুযোগ নিয়ে ছোটখাট স্বাধীন রাজ্য অনেকগুলো গড়ে উঠেছিল। এই অন্ধকারময় যুগের অবসান হল পাটলিপুত্রের সিংহাসনে গুপ্ত রাজাদের আরোহণের সংগে।

মহারাজাধিরাজ **প্রথম চন্দ্রগুপ্তই** হলেন এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। তাঁর সময়ে গুপ্ত রাজ্য মগধ থেকে এলাহাবাদ ও অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁর পর গুপ্তসাম্রাজ্য আরও প্রায় দু'শ' বছর টিকে ছিল। এর মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, প্রথম কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত প্রমুখ রাজাদের রাজত্বকালই গুপ্তসাম্রাজ্যের চরম উন্নতির কাল।

এই সমস্ত প্রতাপশালী সম্রাটদের মধ্যে আবার **সমুদ্রগুপ্তই** ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। উত্তর-ভারতের বহু রাজাকে পরাজিত করে তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অগ্রসর হন এবং মধ্য প্রদেশের ও দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলের বহু রাজা তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। তবে বোধ হয় পাটলিপুত্র থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্য শাসন করা সহজ নয় ভেবেই তিনি নর্মদা ও মহানদীর দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের বিজিত রাজ্যগুলো স্থায়িভাবে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন নি। যাই হোক, হিমালয় থেকে নর্মদা এবং ব্রহ্মপুত্র থেকে চম্বল পর্যন্ত তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

এছাড়া সমতট, দবাক, কামরূপ, নেপাল ও কর্তৃপুর রাজ্য এবং মালব, অর্জুনায়ন, আভীর, যৌধেয়, মদ্রক প্রভৃতি গণরাজ্যও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল। কুষাণ ও শক রাজারা এবং সিংহলের রাজা মেঘবর্ণও তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্যে কিছু ভূমি উপহার দিয়েছিলেন। এইভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ ছাড়াও সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত গুণও ছিল প্রচুর। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। এলাহাবাদে এক স্তম্ভগাত্রে তাঁর সভাকবি হরিষেণের যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ রয়েছে তাতে হরিষেণ পরাজিত শত্রুর প্রতি তাঁর মহানুভবতা, তাঁর মার্জিত বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান, কবিত্বশক্তি, সংগীতবিদ্যার পারদর্শিতা প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করেছেন। তাঁর সংগীতানুরাগের কথা কোন কোন মুদ্রায় উৎকীর্ণ তাঁর বীণাবাদন-রত মূর্তি দেখেও অনুমান করা যায়। সমুদ্রগুপ্ত বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃত-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সভায় বহু কবি ও বিদ্বান্ ব্যক্তির সমাগম হত। ব্রহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর কম শ্রদ্ধা ছিল না।

সমুদ্রগুপ্ত প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর সগৌরবে রাজত্ব করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য**। আদিত্য অর্থাৎ সূর্যের মতোই ছিল তাঁর বিক্রম। সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য তিনি অক্ষুণ্ণ তো রেখেই ছিলেন, তাছাড়া মালব আর সৌরাষ্ট্রের দুর্ধর্ষ শক শত্রুদের পরাজিত করে ঐ দুই রাজ্যও তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনে এনেছিলেন। শকদের হারিয়ে 'শকারি' উপাধিতেও তিনি ভূষিত হয়েছিলেন।

বেতাল-পঞ্চবিংশতি আর অন্য অনেক কাহিনী-কিংবদন্তীতে যে বিক্রমাদিত্য রাজার উল্লেখ আছে, অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই সেই গল্প-কাহিনীর বিক্রমাদিত্য রাজা। গল্প-কাহিনীর বিক্রমাদিত্যের উপাধি ছিল 'শকারি', দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেরও ঐ উপাধি ছিল। সেই বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল মালবের উজ্জয়িনীতে—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেরও এক রাজধানী এই উজ্জয়িনীতে ছিল বলে জানা যায়। অবশ্য গল্প-কথার বিক্রমাদিত্যের যেমন 'নবরত্ন-সভা' ছিল, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সেই রকম কোন নবরত্ন-সভা ছিল কি না জানা যায় না। তবে, ইনিও বহু বিদ্বজ্জনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন-সভা'র

উজ্জ্বলতম রত্ন মহাকবি কালিদাস যে এঁরই সময়কার লোক ছিলেন—একথাও জানা গিয়েছে।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র **প্রথম কুমারগুপ্ত** এবং তাঁর পর তাঁর পুত্র **স্কন্দ গুপ্ত** গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসেন। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্যমিত্র নামে এক শক্তিশালী জাতি এবং পরে দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর হূণরা বড় উৎপাত আরম্ভ করে। স্কন্দগুপ্ত এই দুই আক্রমণকারী জাতিকেই পরাজিত করেন—পুষ্যমিত্রদের পরাজিত করেন যুবরাজ অবস্থায়, এবং হূণদের সাম্রাজ্য লাভের পর।

হূণ আক্রমণ ও গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস—এই **হূণরা** ছিল মধ্য এশিয়ার এক দুর্ধর্ষ যাযাবর সম্প্রদায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে এরা য়ুরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যে-দেশেই এদের পদপাত হয়েছে, সেখানেই এরা অত্যাচার, উৎপীড়ন আর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে নিষ্করুণ ভাবে। ভারতবর্ষে এদের আবির্ভাব হয় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে—গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষ দিকে। কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেই সম্রাট স্কন্দগুপ্ত তাদের পরাজিত করেন এবং হূণদের আক্রমণ সাময়িক ভাবে প্রতিরুদ্ধ হয়। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর আবার নব উদ্যমে তাদের আক্রমণ সুরু হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে তারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করে নেয়। হূণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য এইভাবে ক্রমে শক্তিহীন ও পরে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এই সময় হূণ সর্দার **তোরমান** উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ভারতে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।

কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের সময় গুপ্তসাম্রাজ্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণই ছিল, তবে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর থেকেই ভাংগন দেখা দেয় এবং অচিরকালের মধ্যেই গুপ্তসাম্রাজ্যের গৌরব-রবি চিরদিনের মতো অস্তমিত হয়।

ফা-হিয়েনের বিবরণ—গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরবময় দিনগুলোর কথার খানিক আভাস পাওয়া যায় সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণের প্রশস্তি, মহাকবি

কালিদাসের রচনাবলী প্রভৃতি থেকে। তবে এ-সবের চেয়েও বিস্তারিত খবর পাওয়া যায় চীনা পরিব্রাজক **ফা-হিয়েন**-এর বিবরণী থেকে।

সুদূর চীন থেকে এই পণ্ডিত ভারতে এসেছিলেন গুপ্ত সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের সময়। উদ্দেশ্য ছিল প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'বিনয়পিটক'-এর বিশুদ্ধ পাঠ সংকলন করা। ভারতে তিনি সবশুদ্ধ পনর বছর ছিলেন। তার মধ্যে গুপ্ত রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে তিন বছর থেকে তিনি সংস্কৃত ভাষা ভাল ভাবে শিক্ষা করেন এবং বহু বৌদ্ধ গ্রন্থও নকল করে নেন। চীনে ফিরে এইসব গ্রন্থ তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

পাটলিপুত্র ছাড়াও ভারতের অন্যান্য বহু জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, দেশ দেখা এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করা এই দুই উদ্দেশ্য নিয়েই। এই সমস্ত বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ভারত সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা হয় তা তিনি লিপিবদ্ধ করে যান। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের গৌরবোজ্জল দিনগুলির বিবরণ তাঁর এই লেখা থেকেই সব চেয়ে বেশি পাওয়া যায়।

তাঁর এই বিবরণ থেকে আমরা ভারতের সে-সময়কার আর্থিক ও বাণিজ্যিক অবস্থা, সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মনৈতিক জীবন প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেক কথা জানতে পারি।

তাঁর মতে মগধের অধিবাসীরা যেমন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন তেমনি দানশীল এবং প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। ধনীরা নানাবিধ জনহিতকর কাজে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন না। দেশে লেখাপড়ারও যথেষ্ট চর্চা ছিল। পাটলিপুত্রে তিনি দুটি প্রকাণ্ড বৌদ্ধমঠ দেখেছিলেন। এই দুটি মঠে ভারতের নানা জায়গা থেকে বহু ছাত্র বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসত।

দেশের শিল্পকলার অসাধারণ উৎকর্ষ তাঁকে কম বিস্মিত করে নি। মহামতি অশোকের রাজত্ব লাভের প্রায় পৌনে সাত শ' বছর পরে ফা-হিয়েন ভারতে আসেন। কিন্তু এতদিন পরেও পাটলিপুত্রে অশোকের বিশাল

প্রস্তর-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর মতে এই অপূর্ব প্রাসাদ কেবল অতিমানবের পক্ষেই নির্মাণ করা সম্ভব ছিল।

ফা-হিয়েন গুপ্ত রাজাদের শাসন-ব্যবস্থারও খুব প্রশংসা করে গেছেন। তাঁর মতে, গুপ্তসম্রাট্‌রা ন্যায়পরায়ণ এবং দয়ালু ছিলেন। তাঁদের সময়ে দণ্ডবিধি খুব কঠোর ছিল না; অপরাধীর কখনও প্রাণদণ্ড হত না। হাত-পা কাটা প্রভৃতি দৈহিক শাস্তির বিধান থাকলেও সচরাচর এরকম শাস্তি দেওয়া হত না। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অপরাধীর কম-বেশী অর্থদণ্ড হত। তবে কেউ বার বার রাজদ্রোহ করলে তার ডান হাত কেটে দেওয়া হত। প্রজাদের সুখ-সুবিধার দিকে রাজারা যথেষ্ট নজর দিতেন। তাঁদের সুশাসনে প্রাজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত। তাদের খুব বেশি রাজকর দিতে হত না। যারা সরকারী জমি চাষ করত তাদের উৎপন্ন শস্যের কিছু অংশ খাজনা হিসেবে দিতে হত। দেশের সর্বত্র শাসন-ব্যবস্থা যাতে ভালভাবে চলে গুপ্ত সম্রাট্‌রা সেজন্য অনেক রাজকর্মচারী নিয়োগ করতেন। এই সমস্ত রাজকর্মচারী নিয়মিত হারে নির্দিষ্ট বেতন পেতেন।

রাজধানী পাটলিপুত্রে এবং অন্যান্য বড় বড় শহরে বহু ধনী বণিক ও শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। বহু অর্থের মালিক হলেও সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করতে তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। বিভিন্ন শহরে যে সমস্ত আরোগ্যশালা ছিল, তার ব্যয় তাঁরাই চালাতেন। এই সমস্ত আরোগ্যশালায় বিনা পারিশ্রমিকে দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা করা হত। রোগীদের বিনামূল্যেই ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হত। শুধু মানুষের জন্যই নয়, পশুদের জন্যও চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা ছিল এবং তা দেখে ফা-হিয়েন বিস্মিত হয়েছিলেন।

দেশের লোকেরা তখন সহজেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারতেন। 'ছাড়পত্রে'র কড়াকড়ি তখন ছিল না। শুধু তাই নয়। যাত্রীদের সুবিধার জন্য পথের ধারে ধারে কিছু দূর অন্তর অন্তর যাত্রীনিবাসও ছিল। সেখানে বিনা খরচে আহার ও বাসের ব্যবস্থাও ছিল।

ভারতের লোকেরা চিরদিনই পরমতসহিষ্ণু। এখানে তাই বিভিন্ন ধর্মমতের লোকেরা পাশাপাশি নির্বিরোধেই বাস করতে পারত। গুপ্ত যুগেও ফা-হিয়েন এই সহিষ্ণুতার ভূরি ভূরি প্রমাণ পেয়েছিলেন। গুপ্ত সম্রাট্‌রা নিজেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মালম্বী; সেজন্য কিন্তু বৌদ্ধদের কোন অসুবিধা ভোগ করতে হত না। ফা-হিয়েন-এর মতে, পঞ্জাব, বংগদেশ ও মথুরায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেশি ছিল, কিন্তু মধ্যপ্রদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্যই ছিল বেশি। তবুও এক ধর্মের লোকদের প্রতি অন্য ধর্মের লোকদের কোন বিদ্বেষ ছিল না। পাটলিপুত্র ও মথুরায় বহু বৌদ্ধমঠ ছিল। গুপ্ত বা অন্যান্য হিন্দু রাজারা ও দেশের বিত্তশালী হিন্দুরা কিন্তু এই বৌদ্ধ মঠগুলিকে অর্থসাহায্য করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

ভারতবাসীরা তখন সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্মের আচার অনুসারেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। চণ্ডাল ছাড়া কেউ মদ্য, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি খেতেন না। চণ্ডালরা অস্পৃশ্য বলে গণ্য হত এবং তারা নগরের বাইরে বাস করত।

ফা-হিয়েন ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট প্রসার দেখোছলেন। ভারতের বণিকরা তখন জাহাজে করে সমুদ্রপথে ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশেও, ভারতে উৎপন্ন জিনিসপত্র বাণিজ্যের জন্য নিয়ে যেতেন। ভারতে সে-সময় অনেক সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। বাংলা দেশের তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক) এই সমস্ত বন্দরের অন্যতম ছিল। সমুদ্র তখন তাম্রলিপ্তির গা ঘেঁষে বহে যেত। এখন তা বহু দূরে সরে গেছে। তাম্রলিপ্তি থেকে ভারতীয় বণিকরা দূর দূর দেশে বাণিজ্য-যাত্রায় যেতেন। এইখান থেকেই হিন্দু বণিকদের এক জাহাজে চেপে ফা-হিয়েন স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন।

গুপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠত্ব—গুপ্তযুগ ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। গুপ্তরাজারা ভারতে যেমন বিশাল, যেমন গৌরবময় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন পরে আর কোন হিন্দু রাজা সেরকম বিশাল বা

তেমন গৌরবময় সাম্রাজ্য স্থাপন করে যেতে পারেন নি। তাঁরা প্রায় দুই শতাব্দী ধরে এই সুবৃহৎ সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক ঐক্য, শান্তি, শৃংখলা রক্ষা করে অপূর্ব কীর্তি রেখে গিয়েছেন। বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল বলেই যে গুপ্তসাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নয়। গুপ্ত সম্রাট্‌দের উৎকৃষ্ট শাসন-পদ্ধতিও গুপ্ত সাম্রাজ্যের খ্যাতির অন্যতম কারণ। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, গুপ্তসম্রাট্‌দের সুশাসনে ভারতবাসীরা সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধন এবং সুশাসনের ফলে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুবই উন্নতি হয়েছিল। দেশে ধনসম্পদ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুশাসন ও সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির জন্যেই গুপ্তযুগের ভারতবর্ষ ধর্মে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে এবং বাণিজ্যে চরম উন্নতি করতে সমর্থ হয়েছিল।

শাসন-প্রণালী—গুপ্তযুগে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রই ছিল শাসনতন্ত্রের ভিত্তি। তবে গুপ্তরাজারা স্বৈরাচারী ছিলেন না কিন্তু তাঁদের পরামর্শ দেবার জন্যে মন্ত্রীপরিষদ থাকত। এছাড়া, মহাদণ্ডনায়ক ও মহবলাধিকৃত (বিচারপতি ও সেনাপতি), সন্ধিবিগ্রহিক (সন্ধি ও যুদ্ধ ইত্যাদির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী), কুমারামাত্য ও অমাত্য প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করতেন। রাজা ছিলেন সকলের ওপরে—তাঁকে দেবতার মতো মনে করা হত।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য গুপ্তরাজারা তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্যকে ভুক্তি, বিষয় ও মণ্ডলে ভাগ করেছিলেন। গ্রামে স্বায়ত্তশাসন অক্ষুণ্ণ ছিল। রাজারা বা রাজকর্মচারীরা গ্রামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না।

ধর্ম—অশোক ও কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলেও ভারতে ব্রাহ্মণ্য ও জৈনধর্মের শক্তি কখনও লোপ পায় নি। বিষ্ণুভক্ত হিন্দু গুপ্তরাজাদের সময়ে রাজশক্তির আনুকূল্য লাভ করে **ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব বিশেষ বৃদ্ধি** পেয়েছিল। এই সময়েই প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত হয় এবং বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিকেয়, সূর্য, লক্ষ্মী, পার্বতী ও অন্যান্য অনেক দেবদেবীর পূজার প্রচলন হয়।

তবে ফা-হিয়েন-এর বিবরণ থেকেই জানা যায় যে, গুপ্তরাজারা প্রধানতঃ হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও বৌদ্ধদের ওপর কোনরকম নির্যাতন করেন নি, বরং বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানগুলিকেও অর্থসাহায্য করেছিলেন। অন্য ধর্মীদেরও উচ্চ রাজপদে বসাতে তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। গুপ্ত রাজাদের আমলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সংগে হিন্দুধর্মের কোন বৈরভাব ছিল না।

সাহিত্য—প্রাচীন ভারতীয়-সাহিত্যের ইতিহাসে গুপ্তযুগ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। গুপ্তরাজাদের আনুকূল্যে এই সময়ে **সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ উন্নতি** দেখা দেয়। গুপ্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত কেবল বিদ্যোৎসাহীই ছিলেন না, নিজেও একজন নিপুণ কবি ছিলেন। তাঁর সভাকবি হরিষেণ—যিনি নিজেও একজন গুণী কবি ছিলেন—তাঁকে 'কবিরাজ' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। অনেকের মতে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের উজ্জলতম রত্ন মহাকবি কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা অলংকৃত করে ছিলেন। 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব,' 'মেঘদূত,' 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা,' মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রভৃতি কাব্য-নাটক রচনা করে তিনি অমর হয়ে আছেন। মহাকবি কালিদাস ছাড়াও গুপ্তযুগে আরও অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হয়েছিল। এঁদের মধ্যে 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের রচয়িতা বিশাখদত্ত, 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের প্রণেতা শূদ্রক, 'অমরকোষ' নামক বিখ্যাত অভিধানের লেখক অমরসিংহ, বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধু ও দিঙ্ নাগাচার্যের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করার মত।

প্রাচীন সাহিত্যের সংস্কার—হিন্দুদের দুইটি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, সংস্কৃত রামায়ণ আর মহাভারত এই যুগেই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করে। এছাড়া প্রাচীন পুরাণগুলিও এই সময়েই নতুন যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন অনুসারে নতুন করে সরল সংস্কৃত ভাষায় লেখা হল। কেবল রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণই নয়, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ স্মৃতিশাস্ত্রগুলিকেও এই যুগে সামাজিক পরিবর্তনের সংগে তাল রেখে নতুন করে ঢেলে সাজা হয়।

বিজ্ঞান—এই সময় ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতির যথেষ্ট চর্চা হত এবং এই সমস্ত বিজ্ঞানেও ভারত গৌরবময় আসন অধিকার করে ছিল।

জ্যোতির্বিদ্যারও এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, বরাহমিহির এবং ব্রহ্মগুপ্ত এই যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির গ্রীসদেশীয় জ্যোতির্বিদ্যার সংগেও পরিচিত ছিলেন।

শিল্পকলা—গুপ্তযুগের **স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর চিত্রকলার** যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা থেকে এই যুগের শিল্পীদের অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের বেশিরভাগ বাড়ীঘর-মন্দির মুসলমান আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় সে সময়ের স্থাপত্যশিল্পের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অবশ্য সম্ভব নয়। তবে আজও উত্তর প্রদেশের দেওগড়ের পাথরে তৈরী এবং ভিতরগাঁও-এর ইঁটে তৈরী মন্দির দেখলে গুপ্তযুগের স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের খুব বেশী প্রমাণ না থাকলেও, **চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পে** এ যুগ যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আজও টিকে আছে। গুপ্তযুগের অনেক বৌদ্ধমূর্তি সারনাথের সংরক্ষণশালায় রাখা আছে। এই মূর্তিগুলির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য দর্শকমনকে মুগ্ধ করে তোলে। দক্ষিণ ভারতে **অজন্তার গুহা-প্রাচীরের চিত্রাবলী** এই যুগের অপূর্ব শিল্পকীর্তি। যুগ যুগ ধরে এই মনোরম চিত্রাবলী সমগ্র পৃথিবীর শিল্পরসিকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে আসছে।

গুপ্তযুগে ধাতুশিল্পেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ (চন্দ্ররাজের নামাঙ্কিত) খুব সম্ভব দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময় তৈরী হয়েছিল। তারপর কত শতাব্দী চলে গেছে, কিন্তু এই দীর্ঘ দিন রোদ ও বৃষ্টির অত্যাচার সহ্য করলেও এতে এতটুকু মরচে ধরে নি। তাম্রমূর্তি ঢালাইয়ের কাজেও এ-যুগের শিল্পীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। গুপ্ত

সম্রাট্‌দের স্বর্ণমুদ্রাগুলির সৌন্দর্যও আকর্ষণীয়। এগুলি সে-যুগে ধাতুশিল্পের উন্নতির অভ্রান্ত নিদর্শন।

বিদেশের সংগে সংযোগ—গুপ্তযুগে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বহু বৈদেশিক রাজ্যের সংগে তখন ভারতের যোগাযোগ ছিল। ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে কয়েক দল প্রচারক চীনদেশে পাঠান হয়েছিল। চীন থেকেও কয়েকজন বৌদ্ধতীর্থযাত্রী ভারতে এসেছিলেন। ফলে চীনের সংগেও ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

এই সময়ে মালয় উপদ্বীপ এবং তার সন্নিহিত দ্বীপগুলির সংগেও ভারতের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয় বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে এই সমস্ত জায়গায় যাতায়াত করতেন। **তাম্রলিপ্তি** (তমলুক) তখন ছিল একটি প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। সেখান থেকে জাহাজে চড়ে ভারতীয় বণিকরা দূর দূর দেশে যাতায়াত করতেন। বাণিজ্য উপলক্ষে যাতায়াতের ফলে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল; ফলে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া এবং অন্যান্য দ্বীপে বিস্তৃত হয়েছিল।

এছাড়া চীন, পূর্ব-এশিয়া, পশ্চিম-এশিয়া ও মধ্য-এশিয়ার সংগেও ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ভারতবর্ষ ক্রমে সমগ্র এশিয়ার প্রধান বানিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

অজন্তা গুহা-প্রাচীরের চিত্র থেকে জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতে ভারত ও পারস্যের মধ্যে দূত বিনিময় চলত। রোমক সাম্রাজ্যের সংগেও গুপ্তরাজদের যোগাযোগ ছিল। সেইজন্য গুপ্তযুগের মুদ্রাগুলিতে রোমের প্রভাব দেখা যায়।

এইভাবে দেখা যায় যে, গুপ্তযুগে দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার এবং ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তাই ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগ এক গৌররময় যুগ বা **'সুবর্ণযুগ'** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

প্রশ্ন

১। গুপ্তযুগের সভ্যতা সম্বন্ধে যা জান লেখ। (১৯৪৫, '৪৯)

[Write what you know about Indian civilization in the Gupta Age.]

২। গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে কেন ? (১৯৪২, '৪৫)

[Why is Gupta Age called the Golden age of Indian history ?]

৩। ফা-হিয়েনের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যা জান লেখ। (১৯৩৯, '৪০)

[Write what you know about the account left by Fa-hien.]

॥ হর্ষবর্ধন ও হিউয়েন সাঙ ॥

থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশঃ হর্ষবর্ধন—গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে অনেকগুলি ছোট বড় রাজ্য স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠে। তার মধ্যে কনৌজের মৌখরি রাজ্য এবং থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজ্যই প্রধান। থানেশ্বরের এই পুষ্যভূতি বংশেই উত্তর ভারতের শেষ পরাক্রান্ত হিন্দু সম্রাট হর্ষবর্ধনের জন্ম হয়। তিনি পুষ্যভূতি বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা মহারাজাধিরাজ প্রভাকরবর্ধনের ছোট ছেলে। পিতার মৃত্যু এবং তার কিছুদিন পরেই বাংলার রাজা শশাংকের হাতে বড় ভাই রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুতে মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন। সেই সময় কনৌজের সিংহাসনও শূন্য ছিল। কনৌজরাজ গ্রহবর্মণ (রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের ভগিনীপতি) আগেই মালবরাজ দেবগুপ্ত ও বাংলার রাজা শশাংকের সংগে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। রাণী রাজ্যশ্রীও (রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের বোন) শত্রুর হাতে বন্দিনী হন। ভগিনীপতির মৃত্যু ও বোনের উদ্ধারের জন্যই রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্ত ও শশাংকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। দেবগুপ্তকে তিনি পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু শশাংকের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। এইভাবে থানেশ্বর ও কনৌজ দুই রাজ্যেরই রাজপদ শূন্য হয়ে পড়ল। থানেশ্বরের শূন্য সিংহাসনে বসার পর দুই রাজ্যের মন্ত্রীদের অনুরোধে হর্ষবর্ধন দুই রাজ্যেরই শাসনভার নিজের হাতে নেন।

হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সেই বছর থেকেই 'হর্ষাব্দ' গণনা করা হয়। থানেশ্বর ও কনৌজ দুই রাজ্যের অধীশ্বররূপে স্বীকৃত হওয়ার পর হর্ষবর্ধন কনৌজকেই তাঁর রাজধানী করলেন। রাজা হয়ে হর্ষ কয়েক বছর পরে **শীলাদিত্য** এই রাজোপাধি গ্রহণ করেন। কনৌজ এবং থানেশ্বর একই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মধ্যদেশে (Upper Ganges Valley) এক বিশাল শক্তিশালী রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

সিংহাসনে আরোহণ করেই হর্ষ প্রথমে দুই রাজ্যের শৃংখলা স্থাপন করেন। তারপর ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করে ভ্রাতৃহন্তা শশাংকের সংগে যুদ্ধে অগ্রসর হন। এই অভিযানে অগ্রসর হবার আগে তিনি কামরূপ (আসাম) রাজ্যের রাজা ভাস্করবর্মণের সংগে মৈত্রী স্থাপন করেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম দু' দিক থেকে শশাংককে আক্রমণ করেন। কিন্তু মহাবীর শশাংককে তাঁরা পরাস্ত করতে পারেন নি। শশাংকের মৃত্যুর পর হর্ষ মগধ এবং আরও পরে বাংলাদেশ জয় করেন। যাই হোক, ইতিমধ্যে হর্ষ নিজের রাজ্যে তাঁর ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন এবং নিজেকে 'পূর্ণ অধীশ্বর' বলে ঘোষণা করেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন—তাঁর সেনাবাহিনীতে ৬০,০০০ গজারোহী এবং ১০০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। এই সুবিশাল পরাক্রান্ত বাহিনী নিয়ে তিনি এবার রাজ্য বিস্তারে মন দেন।

হর্ষের রাজ্য বিস্তার—শশাংকের মৃত্যুর পর হর্ষ মগধ জয় করে 'মগধ-রাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত কোংগোদ রাজ্য অধিকার করেন। পশ্চিম ভারতে কাথিয়াবাড় অঞ্চলে বলভীর রাজা ধ্রুবসেন তাঁর সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। ক্রমে আর্যাবর্তে তিনি একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তার করতে তিনি সমর্থ হন নি। দক্ষিণে তাঁর রাজ্যসীমা নর্মদা নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। নর্মদা পার হয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের চেষ্টা করলে তিনি বাতাপীর বিখ্যাত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

হর্ষের ধর্মমত—হর্ষ প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন। পরে অবশ্য নিজের ধর্ম ত্যাগ না করলেও তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর শাসনাধীন দেশগুলিতে তিনি আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ করে দেন এবং অকারণ জীবহত্যা নিবারণ করেন। তবে বৌদ্ধ ধর্মের মতো অন্যান্য ধর্মের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

শাসন-পদ্ধতি—হর্ষবর্ধন দয়ালু শাসক ছিলেন। তিনি নিজেই তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের শাসনকার্য তত্ত্বাবধান করতেন। তবে রাজকার্য পরিচালনায় তাঁকে সাহায্য করবার জন্য সম্ভবতঃ তাঁর একটি মন্ত্রীপরিষদ ছিল। সুশাসনের জন্য তাঁর সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে ('ভুক্তি') এবং প্রত্যেক প্রদেশ আবার কয়েকটি জেলায় ('বিষয়') ভাগ করা ছিল। তাঁর রাজত্বে কর-ভার খুবই লঘু ছিল ; কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের ⅙ অংশ রাজস্ব দিতে হত। তখন দণ্ড-বিধি কঠোর ছিল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও গুপ্তযুগের চেয়ে দেশে চোর ডাকাতের উপদ্রব বেশি ছিল।

সাহিত্যানুরাগ—হর্ষবর্ধন কেবল সুদক্ষ সেনাপতি বা ন্যায়নিষ্ঠ শাসকই ছিলেন না, দানশীলতা, ধর্মানুরাগ, সাহিত্যানুরাগ এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্যও তিনি ভারতের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর রাজসভায় 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' রচয়িতা বাণভট্ট, ময়ুরভট্ট, দিবাকর, হিউয়েন-সাঙ, প্রভৃতি মনীষীদের সমাবেশ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, 'রত্নাবলী' নামে বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক রচনা করে হর্ষ তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব—৬৪৬ বা ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম ছিলেন তিনি। কিশোর বয়সে এক সংকটময় মুহূর্তে দুটি বিচ্ছিন্ন রাজ্যের শাসনভার তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। যেভাবে সেই সংকট কাটিয়ে উঠে তিনি ঐ দুই রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনেন এবং তারপর সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে এক সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করে যান তা রাজ্য-সংগঠক হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের উজ্জ্বলতম সাক্ষ্য। শাসক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট গৌরবের অধিকারী। তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং নিজেই শাসনাধীন সমস্ত দেশ পরিদর্শন করে ধার্মিককে পুরস্কৃত আর দুষ্টকে শাস্তি দিতেন।

হিউয়েন-সাঙের বিবরণ—গুপ্তযুগে ফা-হিয়েনের মতো হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালেও চীন থেকে একজন খ্যাতনামা চীনা পণ্ডিত ও পরিব্রাজক

ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর নাম **হিউয়েন-সাঙ**। ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতে ছিলেন। ফা-হিয়েনের মতো তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে গভীরতর জ্ঞান অর্জন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। হর্ষের সংগে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে এদেশ সম্বন্ধে তিনি যে মনোজ্ঞ বিবরণ লিখে গেছেন তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এই বিবরণ থেকেই হর্ষবর্ধনের সময়কার ভারতের **সমাজ, সংস্কৃতি** প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারি।

সমাজ—গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের মতো হিউয়েন-সাঙও ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্রের প্রশংসা করেছেন—ভারতবাসীরা সৎ, সত্যবাদী ও ধার্মিক ছিলেন। প্রজারা সুখে-শান্তিতে সরলভাবেই জীবনযাপন করতেন। বিদ্যাচর্চা আর শিল্পকলার দিকে জনসাধারণের মনোযোগ ছিল।

কনৌজের উৎসব—হর্ষবর্ধনের সময়ে কনৌজ উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরে পরিণত হয়েছিল। হিউয়েন-সাঙের বিবরণে কনৌজের এক মহতী সভার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন হিউয়েন-সাঙকে সংগে নিয়ে কনৌজে এই সভায় উপস্থিত হন। মহাযান তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবার এবং এই চৈনিক পণ্ডিতের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেবার জন্যেই এই সভা আহ্বান করা হয়েছিল। ২০ জন রাজা এবং হাজার হাজার বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন ধর্মবিদ্ ও পুরোহিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভার ঘটা ও আড়ম্বর হিউয়েন-সাঙকে মুগ্ধ করেছিল। একটি সু-উচ্চ মন্দিরে বুদ্ধের একটি স্বর্ণ-নির্মিত মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। সভার কাজ আরম্ভ হবার আগে সম্রাট্ এক বুদ্ধমূর্তি সংগে নিয়ে একটি বিরাট শোভাযাত্রা বার করেন এবং অবশেষে সভাগৃহে উপস্থিত হন। তারপর এক ভূরিভোজের আয়োজন হয়। ভোজের পর সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। এ সভায় হিউয়েন-সাঙ মহাযান মত ব্যাখ্যা করেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে বৌদ্ধধর্মের দিকে সম্রাটের প্রবল অনুরাগ লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণরা ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেন।

প্রয়াগে পঞ্চবার্ষিক দানব্রতোৎসব—প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর গংগা-যমুনার সংগমস্থল প্রয়াগে সম্রাট্ একটি দান-মহোৎসব অনুষ্ঠান করতেন। এই জায়গাটি 'দানক্ষেত্র' বা 'সন্তোষক্ষেত্র' নামে পরিচিত। কনৌজের উৎসব শেষ হলে হিউয়েন-সাঙ এবং ২০টি দেশের রাজাদের সংগে হর্ষবর্ধন প্রয়াগে উপস্থিত হন। সম্রাটের কাছ থেকে দান গ্রহণ করবার জন্য সন্তোষক্ষেত্রে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। এই উৎসবে সম্রাট্ পর পর তিন দিন বুদ্ধ, আদিত্যদেব (সূর্য), এবং ঈশ্বরদেবের (শিব) উপাসনা করতেন এবং প্রত্যেক দিন জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে বহু মূল্যবান জিনিস বিতরণ করতেন। উৎসব ৭৫ দিন ধরে চলত। পাঁচ বছরের সঞ্চিত সমস্ত জিনিস বিতরণ করে নিঃশেষ হলে সম্রাট্ এক পুরনো পোশাক পরে বুদ্ধের চরণে আত্মনিবেদন করতেন। এরকম দানশীলতা ও বদান্যতার দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে বিরল।

হর্ষের বিদ্যোৎসাহিতা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়—হর্ষবর্ধন একজন সুপণ্ডিত, সাহিত্যিক ও পরম বিদ্যোৎসাহী সম্রাট্ ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ্ লিখেছেন যে, হর্ষ খাস্‌মহল থেকে যে রাজস্ব পেতেন, তার এক-চতুর্থাংশ পণ্ডিত আর সাহিত্যিকদের পুরস্কারস্বরূপ দান করা হত। এখনকার পাটনা জেলার অন্তর্গত বড়গাঁও নামে জায়গায় **নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়** অবস্থিত ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হর্ষের দান ছিল প্রচুর। হিউয়েন-সাঙ এখানে কয়েক বছর অধ্যয়ন করেন। সে সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতের মধ্যে বিদ্যাচর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এখানে দশ হাজার আবাসিক ছাত্র শিক্ষালাভ করতেন। এত ছাত্র ও শিক্ষকের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিনামূল্যে সরবরাহ করা হত। এখানে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, শিল্প ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। নালন্দার অধ্যাপকরা প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। হিউয়েন-সাঙের সময় নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন **শীলভদ্র** নামে এক বাংগালী মহাপণ্ডিত। হিউয়েন-সাঙ নালন্দায় থেকে আচার্য শীলভদ্রের কাছে কয়েক বছর শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছিলেন। এখানে

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সকল সময়ে শাস্ত্রালোচনা করা হত এবং প্রবীণ ও নবীন ছাত্ররা পরস্পরের সংগে শাস্ত্রালোচনা করে জ্ঞানার্জন করতেন।

প্রশ্ন

১। রাজা হিসেবে হর্ষবর্ধনের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

[Give an account of the achievements of Harshavardhana as a king.]

২। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে হর্ষের চরিত্র ও শ্রেষ্ঠত্বের কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

[What light do the accounts of Hieun-tsang throw on the character and greatness of Harshavardhana ?]

॥ হিন্দুযুগে বাংলা দেশ ॥

প্রাচীন বাংলার পরিচয়—খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর আগে পর্যন্ত অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় সতর শ' বছর আগে পর্যন্ত আমাদের এই সোনার বাংলার কোন কালানুক্রমিক ইতিহাস জানা যায় না। তবে প্রাচীনকালে যে শক্তিশালী 'গংগারিডই' বা 'গংগাহৃদি' জাতি দুর্ধর্ষ গ্রীকদের মনেও আতংক জাগিয়েছিলেন, তাঁরা এই বাংলা দেশেই রাজত্ব করতেন বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। কিছু পরবর্তী কালের রচনা 'পেরিপ্লাস অফ দি এরিথি্রয়ান সী' থেকে বা প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমী-র রচনা থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতেও বাংলা দেশে স্বাধীন **গংগাহৃদি** রাজ্য সগৌরবে বর্তমান ছিল। তাঁদের রাজধানী ছিল গংগার মোহনার কাছাকাছি এ সুন্দর বন্দর-নগরে—নাম তার **গংগ**।

বাংলার বিশ্ববিখ্যাত মসলিন সেই সুদূর অতীতে এই গংগ বন্দর থেকেই দেশ-বিদেশে রপ্তানি হত। এই সামান্য খবরটুকু ছাড়া প্রাক্-তৃতীয় শতাব্দী কালের বাংলার আর বিশেষ কোন খবর জানা যায় না।

গুপ্তযুগের সময় থেকে বাংলা দেশের ইতিহাস খানিক খানিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে দেখা যায় যে, সে সময় বাংলা বলে কোন আলাদা একটি দেশ ছিল না। এখানকার বিভিন্ন অঞ্চল তখন বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তাও আবার এই সব জনপদ বা দেশের সীমানা যে সবসময় একই ছিল তাও নয়, বহুবার তা' বদলে গিয়েছে। যাই হোক প্রাচীন বাংলার যে সমস্ত দেশ বা জনপদ তখন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল নিচে তার সামান্য বিবরণ দেওয়া হল।

(১) **বংগ**—এই প্রাচীন জনপদটি ছিল এখনকার দক্ষিণ আর পূর্ববংগ নিয়ে তৈরী। পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে গংগা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র আর দক্ষিণে বিশাল সমুদ্র এর চারিদিক দিয়ে বয়ে যেত। এখানকার অধিবাসীদের বলা হত 'বংগজাতি'। **সমতট** আর **হরিকেল** কখনও সমগ্র বংগ, কখনও বা

তার অংশবিশেষের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হত। **বংগাল** নামেও একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাও এই বংগেরই এক অংশ ছিল। সম্ভবতঃ এই **'বংগাল'** থেকেই বাংগালা বা **'বাংলা'** নামের উৎপত্তি হয়েছে। **চন্দ্রদ্বীপ** নামে আর একটি জনপদের কথা জানা যায় ; এটি এখনকার পূর্ব বাংলার বাখরগঞ্জ জেলার বাকলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(২) **পুণ্ড্র** বা **পুণ্ড্রবর্ধন** ও **বরেন্দ্র**—উত্তরবংগের বগুড়া, দিনাজপুর, রাজসাহী ও রংপুর অঞ্চলে **পুণ্ড্র** নামে এক জাতি বাস করত বলে এই অঞ্চলের নাম হয়েছিল **পুণ্ড্রদেশ** বা **পুণ্ড্রবর্ধন**। পুণ্ড্রদেশ বলতে এক সময় গংগানদীর পূর্বতীরস্থিত বর্তমান বাংলা দেশের প্রায় সমগ্র ভূ-খণ্ডকেই বোঝাত। পুণ্ড্রদেশের রাজধানীর নামও ছিল **পুণ্ড্রবর্ধন**। বগুড়ার সাত মাইল দূরের **মহাস্থানগড়**কেই পণ্ডিতেরা প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরের ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করেন। মৌর্যযুগের একটি শিলালিপিতেও এই জায়গাটিকে **পুণ্ড্রনগরী** বলা হয়েছে।

উত্তরবংগের আর একটি নাম ছিল **বরেন্দ্র** বা **বরেন্দ্রী**। মোটামুটি বলতে গেলে পুণ্ড্রবর্ধনের একটা বেশ বড় অংশই উত্তরকালে (দশম শতাব্দী থেকে) এই নামে পরিচিত হয়।

(৩) **রাঢ়** বা **রাঢ়া**—ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বাংলার যে অংশ তাই তখন **রাঢ়** বা **রাঢ়া** নামে পরিচিত ছিল। অজয় নদ এই জনপদকে **উত্তর রাঢ়** আর **দক্ষিণ রাঢ়** এই দুই ভাগে ভাগ করে রেখেছিল। রাঢ়ের আর এক নাম ছিল **সুহ্ম**।

মেদিনীপুর জেলার **তাম্রলিপ্তি** (বর্তমান **তমলুক**) বন্দর ও **দণ্ডভুক্তি** (সম্ভবতঃ বর্তমান **দাঁতন**) নামে সমৃদ্ধ জনপদ রাঢ়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৪) **গৌড়**—ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে গৌড় নামটি সুপরিচিত। কিন্তু প্রথমে এর ভৌগোলিক সীমা কি ছিল, তা সঠিক জানা যায় না। তবে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন যে, প্রথম অবস্থায় এই জনপদটি গড়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদ জেলার একটি অঞ্চল নিয়ে। পরে সমগ্র মুর্শিদাবাদ, বীরভূম,

মালদহ এবং সম্ভবতঃ **বর্ধমানও** গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাঙালী জাতির গৌরব **মহারাজ শশাংকের** রাজত্বের সময় গৌড়ের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সেই সময় থেকেই গৌড় নামটি বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে। ক্রমে গৌড় বলতে প্রায় সমস্ত বাংলা দেশকেই বোঝাত।

শশাংকের পূর্বেকার বাংলার ইতিহাস—আগেই বলা হয়েছে গুপ্তযুগের আগে পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার নির্ভরযোগ্য কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। গুপ্ত আমলে বাংলা দেশ মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল স্বতন্ত্র র‍্যাজ্য হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং এইভাবে বাংলায় কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। বাংলার বিভিন্ন জেলায় পাওয়া কয়েকটি তাম্রশাসন থেকে এই সময়কার তিনজন বাঙালী রাজার নাম জানতে পারা যায়—**গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য** আর **সমাচারদেব**। এঁরা 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তবে এই তিনজন রাজার পারস্পরিক সম্পর্ক যে কি ছিল তা জানা যায় না। এঁরা তিনজনই প্রায় সমসাময়িক। ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এঁরা রাজত্ব করতেন। সম্ভবতঃ গোপচন্দ্রই এঁদের মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সমগ্র দক্ষিণ বংগ, পশ্চিম বংগের কিছু অংশ এবং পূর্ব বংগেও এঁদের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল বলে মনে করবার সংগত কারণ আছে। এই সমস্ত রাজাদের আমলে স্বাধীন বংগরাজ্য যে যথেষ্ট প্রভাবশালী ও সমৃদ্ধ ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত অঞ্চলে প্রাচীন কালের যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে মনে হয় যে, সমাচারদেবের পরেও কয়েকজন রাজা ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করেন; এঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল পৃথুবীর, আর একজনের নাম শ্রীসুধন্যাদিত্য।

কোন্ সময়ে এবং কিভাবে যে এই স্বাধীন বংগরাজ্যের পতন ঘটে তা সঠিক জানা যায় না। তবে বাতাপীর চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মন্ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ

শতাব্দীর শেষাশেষি বংগদেশ জয় করেছিলেন—স্বাধীন বংগরাজ্যের পতনের এটি একটি কারণ হতে পারে।

গৌড়াধিপ শশাংক—আগেই বলা হয়েছে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিমবংগে গৌড় নামে এক স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়ের রাজারা পশ্চিমে রাজ্যবিস্তার করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কনৌজের প্রবল পরাক্রান্ত মৌখরিরাজ্যের বিরোধিতায় কৃতকার্য হতে পারেন নি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে মহারাজ শশাংক গৌড়ের সিংহাসনে বসেন (আনুমানিক ৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তাঁরই রাজত্বের সময়ে গৌড় অসাধারণ সম্মান আর প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

শশাংকের রাজধানী ছিল **কর্ণসুবর্ণ**। মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙামাটির কিছু দূরে **কানসোনা** নামের জায়গাটিকেই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বলে মনে করা হয়।

শশাংকের রাজ্যজয়—শশাংক উত্তরে পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বংগ) আর দক্ষিণে দন্তভুক্তি (মেদিনীপুর জেলায়) এবং উৎকল ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কোংগদ রাজ্য জয় করেন। পশ্চিমে মগধরাজ্যও তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছিল।

থানেশ্বর ও কনৌজের সঙ্গে শত্রুতা—শশাংকের রাজ্যলাভের অনেক আগে থেকেই গুপ্ত রাজাদের সংগে মৌখরিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। গুপ্ত আর মৌখরিদের এই বিবাদের সুযোগ নিয়ে শশাংক পশ্চিম দিকে তাঁর রাজ্য-বিস্তারে মন দিলেন। তিনি মালবের রাজা দেবগুপ্তের সংগে মিলে মৌখরি রাজ্য আক্রমণ করলেন। এই যুদ্ধে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মন্ নিহত এবং তাঁর স্ত্রী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হলেন। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য থানেশ্বর-রাজ প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন। রাজ্যবর্ধন মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন। কিন্তু ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শশাংক কর্তৃক নিহত হন।

রাজ্যবর্ধনের ছোট ভাই হর্ষবর্ধন কামরূপের (প্রাচীন আসামের) রাজা ভাস্করবর্মার সংগে মিত্রতা স্থাপন করে ভ্রাতৃহন্তা শশাংককে শাস্তি দেবার জন্যে অগ্রসর হলেন। হর্ষের সংগে শশাংকের সংঘর্ষ ও তার ফলাফল সম্পর্কে কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এটা প্রায় সুনিশ্চিত যে হর্ষবর্ধন শশাংকের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেন নি। সম্ভবতঃ ৬১৯ থেকে ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময়ে শশাংকের মৃত্যু হয়েছিল। তবে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত শশাংকের ক্ষমতা যে অক্ষুণ্ণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শশাংকের মৃত্যুর পর ভাস্করবর্মা সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেছিলেন এবং শশাংকের সাম্রাজ্য হর্ষবর্ধনের অধিকারভুক্ত হয়েছিল।

ধর্মের দিক থেকে শশাংক শৈব ছিলেন। হিউয়েন-সাঙ তাঁর বিবরণীতে শশাংককে বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী বলে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু তিনিই আবার স্বীকার করেছেন যে, শশাংকের রাজ্যের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রসার ছিল।

শশাংকের কৃতিত্ব—বাংলার ইতিহাসে শশাংকের স্থান খুবই উঁচুতে। বাঙালী রাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে যান। প্রবল শক্তিশালী মৌখরিরাজ এবং থানেশ্বররাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এটা নিঃসন্দেহেই তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়।

বাংলার পাল বংশ ঃ মাৎস্যন্যায়—শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ আর বিদ্রোহের ফলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে ওঠে। ওদিকে প্রতিবেশী রাজাদের বার বার আক্রমণে বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সমগ্র দেশে তখন আর কোন রাজারই একাধিপত্য থাকল না। বাহুবলই তখন একমাত্র বল হল এবং দেশে ঘোর অরাজকতা দেখা দিল। দুর্বলেরা প্রবলের অত্যাচারে জর্জরিত হতে লাগল। পুকুরে যেমন বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে খেয়ে ফেলে, অরাজকতার সময় দেশে তেমনি প্রবল দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে।

প্রাচীন অর্থশাস্ত্রে এইরকম অরাজকতাকে বলা হত 'মাৎস্যন্যায়'। বাংলাদেশে প্রায় একশ' বছর ধরে এইরকম মাৎস্যন্যায় চলেছিল। শেষে এই অরাজকতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে দেশের নেতারা স্থির করলেন যে, তাঁরা একজনকে রাজা হিসেবে বরণ করে নেবেন এবং সকলেই তাঁর প্রভুত্ব মেনে নেবেন। দেশের জনসাধারণও এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। শেষে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি গোপাল নামে এক মহাগুণবান্ ব্যক্তিকে বাংলাদেশের রাজপদে নির্বাচিত করা হল। গোপালের পৈতৃক নিবাস ছিল বরেন্দ্রী (উত্তরবঙ্গ)। তাই তাঁর প্রবর্তিত রাজবংশ বাংলার নিজস্ব রাজবংশ, এ-কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

গোপাল (৭৬৫-৬৯ খ্রীঃ অঃ)—গোপাল ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। নালন্দায় তিনি একটি বৌদ্ধমঠ তৈরী করে দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে ধর্মচর্চার জন্যে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। তিনি সুশাসক ছিলেন। তাঁর সুশাসনে বহুদিন পরে বাংলাদেশে শান্তি ও শৃংখলা ফিরে এসেছিল।

ধর্মপাল—গোপালের পর তাঁর ছেলে ধর্মপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। প্রতিহারবংশীয় রাজা বৎসরাজ ছিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। ধর্মপাল যখন বাংলা দেশ থেকে পশ্চিমদিকে রাজ্যবিস্তারের জন্যে অভিযান করেন তখন বৎসরাজও সাম্রাজ্য-বিস্তারের জন্যে পূর্বদিকে অগ্রসর হন। ফলে দু'জনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়; এই সংঘর্ষে ধর্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু এই সময় দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বৎসরাজ রাজপুতানার মরুভূমিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন এবং উত্তর ভারতে সামাজ্য স্থাপনের আশা তাঁকে ত্যাগ করিতে হয়।

ধ্রুব বৎসরাজকে পরাজিত করেই ক্ষান্ত হলেন না; ধর্মপালের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করেলেন। গংগা-যমুনার মাঝামাঝি এক জায়গায় ধর্মপালের সংগে তাঁর যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে ধ্রুব জয়লাভ করলেন বটে, কিন্তু তিনি কিছুদিনের মধ্যেই দাক্ষিণাত্যে ফিরে যাওয়ায় উত্তর ভারতে ধর্মপালের আর কোনও

প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। এই সুযোগে ধর্মপাল ধীরে ধীরে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত জয় করে **আর্যাবর্তের সম্রাট্** বলে স্বীকৃত হলেন।

রাজ্যবিস্তার—বাংলা ও বিহার ছিল ধর্মপালের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। পঞ্জাব, পূর্ব রাজপুতানা, মালব, বেরার এবং সম্ভবতঃ নেপাল প্রভৃতি বহু রাষ্ট্রের রাজারা ধর্মপালের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিজের নিজের রাজ্য নিজেরাই শাসন করতেন। ধর্মপাল কনৌজরাজ ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করেন এবং তাঁর জায়গায় নিজের আশ্রিত চক্রায়ুধকে ঐ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রমে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে গোকর্ণ পর্যন্ত সমগ্র দেশ ধর্মপালের অধিকারভুক্ত হয়েছিল।

ধর্মপালের কৃতিত্ব—ধর্মপাল বাংলার শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর বীরত্বে ও রাজনীতি-কুশলতায় বাংলা দেশ বিপুল শক্তিশালী হয়ে আর্যাবর্তে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। ধর্মপাল শুধু বীর আর রাজনীতি-কুশলই ছিলেন না, মনের দিক দিয়েও তিনি খুব উদার ছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ ছিল না। গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মগধের বিক্রমশীলা মহাবিহার ধর্মপালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। নালন্দার মতো এই মহাবিদ্যালয়টিও সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরেও খ্যাতিলাভ করেছিল। রাজসাহী জেলার সোমপুরে তিনি আর একটি মহাবিহার নির্মাণ করেছিলেন। কয়েক বছর আগে পাহাড়পুরে তার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

দেবপাল—ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন (আঃ ৮১৫ খ্রীঃ অঃ)। তিনিও পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি পিতৃসাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ তো রেখেইছিলেন, নিজেও অনেক রাজ্য অধিকার করে সাম্রাজ্যের প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়িয়েছিলেন। হিমালয় থেকে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত এবং পূর্ব হতে পশ্চিম সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর ভারত থেকেই তিনি রাজকর আদায় করতেন।

পালবংশের চিরশত্রু প্রতিহারদের দর্পও তিনি চূর্ণ করেছিলেন। প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র প্রথম ভোজ (মিহির) একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনিও দেবপালের কাছে পরাজিত হন। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষও তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

দেবপালের কৃতিত্ব—দেবপাল প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সময়েই পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে গৌরবের উচ্চতম শিখরে পৌছেছিল। প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত তাঁকে অধীশ্বর বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর খ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেব তাঁর সভায় দূত পাঠিয়েছিলেন। বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি মঠ তৈরী করিয়েছিলেন এবং এই মঠের ব্যয়-নির্বাহের জন্যে তাঁর প্রার্থনা অনুসারে দেবপাল তাঁকে পাঁচখানি গ্রাম দান করেছিলেন। ধর্মপালের মতো দেবপালের সময়েও বাংলার শক্তি ও সমৃদ্ধি বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পালবংশের পতন—দেবপালের মৃত্যুর পর পালসাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। তবে এর পরও পালরাজারা প্রায় তিনশ' বছর পর্যন্ত বাংলায় ও মগধে রাজত্ব করেছিলেন।

প্রথম বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল—দেবপালের পর তাঁর ভাইপো **প্রথম বিগ্রহপাল** রাজা হন। প্রথম বিগ্রহপাল শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। দিনরাত ধর্মচর্চা নিয়েই থাকতেন। কিছুদিন রাজত্ব করার পর তিনি তাঁর ছেলে **নারায়ণপালের** হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। নারায়ণপালও তাঁর বাবার মতোই শান্তিপ্রিয় ছিলেন। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় তিনি বাংলাদেশে রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁর দুর্বল শান্তিকামী শাসন বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে নি। তাঁর দুর্বলতার সুযোগে প্রতিদ্বন্দ্বী গুর্জরপ্রতিহাররা প্রবল হয়ে উঠলেন। তাঁদের আক্রমণে পাল সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হল। প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজ আর্যাবর্তে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি বুন্দেলখণ্ড ও উত্তর-প্রদেশে

বিস্তৃত রাজ্য জয় করে মগধের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হন। নিরীহ নারায়ণপাল তাঁর গতিরোধ করতে পারলেন না। ভোজ নারায়ণপালকে পরাস্ত করেন। ওদিকে আসাম ও উড়িষ্যার শাসনকর্তারাও পালবংশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ নারায়ণপালকে পরাজিত করেছিলেন বলে মনে হয়।

রাজ্যপাল ও দ্বিতীয় গোপাল—প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজের ছেলে প্রথম মহেন্দ্রপাল পালবংশের জন্মভূমি উত্তরবংগে প্রতিহার বংশের প্রাধান্য স্থাপিত করেন; মগধও তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। নারায়ণপাল অবশ্য শেষজীবনে উত্তরবংগ আর বিহার পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে রাজ্যপাল ও নাতি দ্বিতীয় গোপাল মগধ ও উত্তরবংগের অধিকার রক্ষা করেছিলেন।

পরবর্তী পালরাজগণ: দ্বিতীয় বিগ্রহপাল—এদিকে কিছু দিনের মধ্যেই পালবংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী গুর্জরপ্রতিহার বংশের পতন ঘটে। তাঁদের পতনের পর চান্দেল এবং কলচুরি এই দুই বংশ খুব ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। পালদের তখন এই দুই নতুন শত্রুর সম্মুখীন হতে হল। দ্বিতীয় গোপাল এবং তাঁর ছেলে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের আমলে চান্দেল আর কলচুরিরা বংগদেশ আক্রমণ করেন। ফলে পালরাজারা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়লেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হল। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব ও দক্ষিণ বংগে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হল।

প্রথম মহিপাল—দ্বিতীয় বিগ্রহপালের ছেলে প্রথম মহীপাল পালবংশের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করবার বিশেষ চেষ্টা করেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষের দিকে কাম্বোজ নামে এক জাতি উত্তরবংগে প্রভুত্ব স্থাপন করে। প্রথম মহীপাল এই কাম্বোজের কবল থেকে উত্তরবংগ উদ্ধার করে সেখানে তাঁর অধিকার সুদৃঢ় করেন। একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে চোলসম্রাট প্রথম রাজেন্দ্র বাংলা আক্রমণ করেন। মহীপাল এই আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। উত্তর ও দক্ষিণ বিহার মহীপালের শাসনাধীন ছিল।

মহীপালের কৃতিত্বে পালপ্রভুত্ব বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। তাহলেও বাংলা দেশের সর্বত্র কিন্তু পাল-কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় নি। এই সময় থেকেই বাংলায় অনেক স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে পূর্ব ও দক্ষিণ বংগে **চন্দ্র রাজ্য** এবং পশ্চিম বংগে (রাঢ় অঞ্চলে) **শূররাজ্য** প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়। চন্দ্ররাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। শূরবংশীয় রাজা আদিশূর সম্পর্কে একটি কাহিনী চলিত আছে। শোনা যায়, তিনি যজ্ঞকর্মাদি করাবার জন্যে কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও তাঁদের সংগে পাঁচজন কায়স্থ বাংলা দেশে আনিয়েছিলেন এবং পরে এঁদের বংশ থেকেই নাকি এখনকার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের উৎপত্তি হয়।

নয়পাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল—প্রথম মহীপালের ছেলে নয়পাল এবং নাতি তৃতীয় বিগ্রহপালের সময়ে মধ্যভারতের চেদিদেশের কলচুরিবংশের বিখ্যাত রাজা লক্ষ্মীকর্ণ পাল-সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। নয়পালের সময়েই প্রসিদ্ধ বাঙালী পণ্ডিত **অতীশ** বা **দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান** বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় মহীপাল: দিব্য—দ্বিতীয় মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল নামে তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন ছেলে ছিলেন। এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় মহীপাল ছিলেন হীনবল রাজা। তাঁর সময়ে পালবংশ আবার ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। এই সময়ই **উত্তরবংগে প্রজাবিক্ষোভ** দেখা দিয়েছিল। **দিব্য** বা **দিব্বোক** নামে কৈবর্তজাতীয় এক নেতার নেতৃত্বে উত্তরবংগের প্রজারা দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় মহীপাল পরাজিত ও নিহত হলেন, উত্তরবংগ দিব্বোকের শাসনাধীন হল।

ভীম: রামপাল—দিব্বোকের কিছু পরে তাঁর ভাইপো **ভীম** বরেন্দ্রীর রাজা হলেন, কিন্তু তিনি বেশীদিন রাজত্ব করতে পারেন নি। দ্বিতীয় মহীপালের ছোট ভাই **রামপাল** তাঁকে পরাজিত করে পালবংশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন।

বিখ্যাত 'রামচরিত'-কাব্যের রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী এবং 'চক্রদত্ত' নামক প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদগ্রন্থের প্রণেতা চক্রপাণি দত্ত এই সময়ে বাংলা দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

রামপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন এবং পালবংশের গৌরববৃদ্ধিও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ছেলে কুমারপাল সেনবংশীয় বিজয়সেনের হাতে পরাজিত হয়ে মগধে আশ্রয় নেন। বাংলাদেশে পালপ্রভুত্ব বিলুপ্ত হল। এর পর বাংলায় সেনবংশ রাজত্ব করতে থাকেন। মগধে পালরাজারা কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন। শেষে মুসলমান সেনাপতি ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ-বিন্‌-বক্‌তিয়ারের আক্রমণে তাঁদের এই শেষ অধিকারটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়।

পালরাজাদের সময়ে বাংলা দেশ—পালরাজাদের সাড়ে তিনশো বছর-ব্যাপী রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। একশো বছরের অরাজকতার পর তাঁদের সুশাসনে বাংলা দেশে বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা, শান্তি, শৃঙ্খলা ও ঐক্য বর্তমান ছিল। সমগ্র আর্যাবর্তে পালরাজারা স্বাধীন বাংগালী জাতির প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পালযুগে বাংলাদেশে সামাজিক জাতিবিভাগ বা শ্রেণীবিভাগ ছিল। তখন বৃত্তি অনুযায়ী লোকে উচ্চশ্রেণীর বা নিম্নশ্রেণীর বলে বিবেচিত হত। ব্রাহ্মণরা সমাজে সবার চেয়ে বেশি মর্যাদা পেতেন। কৈবর্ত জাতি তখন উত্তরবংগে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তবে জাতিবিভাগ থাকলেও এক জাতির সংগে অন্য জাতির বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিল না। দেশে তখন কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের খুবই উন্নতি হয়েছিল এবং এ-সবের সাহায্যে বাংলা দেশে প্রচুর ধনাগমও হত। তবে এখনকার মত তখনও অর্থবণ্টনে অসাম্য ছিল। ঐশ্বর্য ও বিলাসিতার পাশাপাশি তখনও দারিদ্র্যের জীর্ণ চেহারা এখনকার মতোই দেখা যেত। ধনীরা বড় বড় অট্টালিকায় বাস করতেন, রত্নখচিত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতেন, বাড়ীতে মূল্যবান জিনিসপত্রও ব্যবহার করতেন। দেশে বিলাসী ব্যক্তির অভাব ছিল না। নানারকম রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য খাওয়া তখনও ভোজনবিলাসী

বাংগালীদের অভ্যাস ছিল। এখনকার মতো সেদিনও দরিদ্ররা কিন্তু জীর্ণ কুটিরে, কোনমতে দুটি শাকান্ন পেটে দিয়ে, জীর্ণ কাঁথায় শুয়ে ধনীর প্রাসাদের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত আর ভাগ্যকে দোষ দিত। তবে ধনী দরিদ্র সমস্ত বাংগালীর কাছেই উৎসব ছিল প্রিয়। দুর্গাপূজা ছিল হিন্দুদের প্রধান পর্ব। মহারাজ রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রচনা থেকে জানা যায় যে উমা অর্থাৎ দুর্গার অর্চনা উপলক্ষে বরেন্দ্রভূমিতে খুব উৎসব হত। হোলি উৎসবও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল, এর নাম ছিল 'হোল্‌কা'। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এতে যোগ দিত। বাংলার অধিবাসীদের অধিকাংশই তখন গ্রামে বাস করত।

পালরাজারা ভারতের বাইরে দূর দূর দেশের রাজাদের সংগেও প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের উৎসাহে বিদেশেও ভারতের ধর্ম ও সভ্যতার যথেষ্ট প্রসার হয়। পণ্ডিত ধর্মপাল, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ) প্রভৃতি জগৎবিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্যরা এই সময়েই তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সুবর্ণদ্বীপ ও মালয়ে ভারতের সভ্যতা ও বৌদ্ধধর্মের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পালরাজারা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পালযুগে উদন্তপুর (ওদন্তপুর) ও বিক্রমশীলায় (দুটি জায়গাই বিহারে) দুটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। দেশবিদেশ থেকে বহু ছাত্র এসে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে যেতেন। আয়ুর্বেদজ্ঞ চক্রপাণি দত্ত, কবি সন্ধ্যাকর নন্দী এবং দার্শনিক শ্রীধরভট্টের মত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং রাজানুকূল্য লাভ করেছিলেন।

পালযুগে ধীমান ও বীতপাল নামে দুজন শিল্পী চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে এক নতুন রীতির প্রতিষ্ঠা করে খ্যাতিলাভ করেন। পালযুগে বাংলাদেশে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল। পালরাজারা অনেক সুন্দর সুন্দর বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে খননকার্যের ফলে সোমপুর-বিহার নামে একটি বিরাট মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এত বড় বিহার তখন ভারতে আর ছিল না। এই

ধ্বংসাবশেষ থেকে সেকালের বাংলার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের প্রভূত উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের নানা জায়গায় সে-যুগে তৈরী বহু দেবদেবীর মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মূর্তিগুলিও সেযুগের শিল্পোন্নতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দিনাজপুরের বিশাল মহীপালদীঘি আজও পালরাজাদের কীর্তি ঘোষণা করে। কৈবর্তরাজ ভীমের কীর্তিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাস্থানগড়ের কাছে ভীমের যে ডমর (দুর্গপ্রাচীর) তৈরী হয়েছিল আজও তার ধ্বংসাবশেষ দেশী ও বিদেশী দর্শকের মনে বিস্ময় জাগায়। ভীমের আর এক কীর্তি 'ভীমের জাঙাল' (বাঁধ)। কৈবর্ত রাজাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তি 'কৈবর্তস্তম্ভ' সে-যুগের বাংলার এক দর্শনীয় কীর্তি। দিনাজপুরে বাঙাল নামে জায়গাটিতে একটি 'গরুড়স্তম্ভ' আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি মহারাজ দেবপালের সময়কার এক স্মরণীয় কীর্তি।

পালরাজারা ধর্মবিষয়ে খুবই উদার ছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। নারায়ণ ও মহাদেবের উপাসকদের তাঁরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। পালরাজারা রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁদের ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের সংগে পরামর্শ করতেন। পরবর্তী পালরাজাদের সময়ে কৈবর্ত-নায়কদের অভ্যুত্থান থেকে বোঝা যায় যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা জাতিধর্ম-নির্বিশেষেই উচ্চপদ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন।

বাংলার সেনরাজবংশ—আগেই বলা হয়েছে সেনবংশের বিজয়সেন পালরাজ কুমারপালকে পরাজিত করে বাংলাদেশে সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বিজয়সেনের পূর্বপুরুষরা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটদেশ থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। সেনরাজারা জাতিতে ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন, অর্থাৎ তাঁরা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি গ্রহণ করেন।

বিজয়সেন—সিংহাসনে আরোহণ করে বিজয়সেন গৌড়রাজকে এবং উত্তর-বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার রাজাদের পরাজিত করেন। ক্রমে সমগ্র পূর্ব আর পশ্চিম বাংলায় বিজয়সেনের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে বিজয়সেন প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে এক অখণ্ড রাজ্য স্থাপন

করেন। তিনি পশ্চিম বাংলায় বিজয়পুর নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করে সেইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। পূর্ব বাংলায় বিক্রমপুরে সম্ভবতঃ তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর সময়ে প্রজারা আবার সুখ শান্তি ফিরে পেয়েছিল। একজন সামান্য সামন্তরাজের পদ থেকে নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলে বিজয়সেন বংগদেশের সার্বভৌম রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি ষাট বছরেরও বেশী রাজত্ব করে যান। তাঁর দানশীলতাও ছিল অসাধারণ।

বল্লালসেন—বিজয়সেনের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে বল্লালসেন সিংহাসনে বসেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও পণ্ডিত ছিলেন এবং যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মকাজ নিয়েই সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর দুখানি বই 'দান-সাগর' আর 'অদ্ভুতসাগর' থেকে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর জানা যায়। শোনা যায় বাংলা দেশে তিনিই কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। তবে ধর্মকার্য, শাস্ত্রচর্চা প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তিনি যুদ্ধে বিমুখ ছিলেন না। সম্ভবতঃ সমগ্র পশ্চিম ও পূর্ব বাংলা এবং উত্তর বিহারের কিছু অংশ তাঁর শাসনাধীন ছিল। বৃদ্ধবয়সে পুত্র লক্ষ্মণসেনের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

লক্ষ্মণসেন—বল্লালসেনের ছেলে লক্ষ্মণসেনই সেনবংশের শেষ বিখ্যাত রাজা। যৌবনে ঠাকুরদাদা ও বাবার সংগে বহু যুদ্ধে গিয়ে তিনি অশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। বিজেতা ও বিদ্যোৎসাহী হিসেবে তাঁর যথেষ্টই খ্যাতি ছিল। যখন প্রায় আশী বছর তাঁর বয়স তখন পশ্চিম থেকে মুসলমানরা পূর্বদিক আক্রমণ করবার জন্য অগ্রসর হয়ে আসে। বৃদ্ধ সেনরাজ মুসলমান-আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেন নি। তিনি সে সময়ে যুদ্ধ করবার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই মুসলমান সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ-বিন্-বক্তিয়ার খলজী যখন হঠাৎ আক্রমণ করে বসলেন তখন যুদ্ধ না করে আত্মরক্ষা করবার জন্য তিনি পূর্ববংগে পালিয়ে যান। তবে ইখ্‌তিয়ারের নদীয়া আক্রমণের পরও কমপক্ষে তিন চার বছর ধরে লক্ষ্মণসেন পূর্ববংগে রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়।

লক্ষ্মণসেন শুধু যুদ্ধ-নিপুণই ছিলেন না, তিনি শাস্ত্র ও ধর্ম চর্চাতেও গভীর ভাবে অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সুকবি ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হলায়ুধ বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। যে সমস্ত পণ্ডিত ও কবি তাঁর রাজসভা অলংকৃত করে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন, শরণ ও জয়দেব এই পাঁচজন হলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আবার 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জয়দেব আর 'পবনদূত'-প্রণেতা কবি ধোয়ী ছিলেন সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। পবনদূতে সেনদের রাজধানীর একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পরও তাঁর বংশধরেরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পূর্ববংগে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

সেনযুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা—সেনরাজারা বাঙালী ছিলেন না; তাঁরা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটদেশ থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। সেনযুগে ব্রাহ্মণরাই প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। এই সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে প্রজাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হত। বাঙালী জাতিকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়েছিল। এক স্তরের সংগে অন্য স্তরের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা চলত না। কেবল উচ্চস্তরের লোকেরাই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করতেন। কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা অবজ্ঞাত হতেন। এই সময়ে লোকেরা বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা সে সময়ে পুণ্য কাজ বলে বিবেচনা করা হত।

ধর্ম—সেনরাজারা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। এই আমলে বৌদ্ধরা বিশেষ কোন রকম রাজানুকূল্য লাভ করেন নি। সেনরাজাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় হিন্দুধর্ম নানাদেশে প্রসারলাভ করে এবং তার গৌরব বৃদ্ধি পায়।

সাহিত্য—সেনযুগে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। সেনরাজারা প্রায় সকলেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। বল্লালসেন 'দানসাগর', 'ব্রতসাগর', 'আচারসাগর', 'প্রতিষ্ঠাসাগর',

আর 'অদ্ভুতসাগর' নামে পাঁচখানি বই লিখেছিলেন। এই বইগুলির মধ্যে প্রথম আর শেষের বই দুখানির পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেনরাজাদের সভায় কবি ও পণ্ডিতদের বিশেষ সমাদর ছিল। লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী পণ্ডিত হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব', 'শৈবসর্বস্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সর্বানন্দের 'টীকা-সর্বস্ব' নামে অমরকোষের টীকা সমগ্র ভারতে আদৃত হয়েছে। কবি ধোয়ীর 'পবনদূত' কালিদাসের 'মেঘদূতের' অনুকরণে রচিত হয়েছিল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর মত সুললিত কাব্য খুব কমই দেখা যায়। এই সব পণ্ডিত ও কবি ধর্মশাস্ত্র ও উচ্চশ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ রচনা করে সেনযুগকে অমর করে রেখেছেন। এই যুগকে **বাংলাদেশে সংস্কৃত-সাহিত্যের সুবর্ণযুগ** বলা যেতে পারে।

প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি—বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় **জাতিভেদ** প্রথা বর্তমান ছিল বলে জানা যায়। তবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের আমলে এ বিষয়ে তেমন কোন কঠোরতা ছিল না। যোগ্যতা থাকলে শূদ্ররাও উচ্চ পদ পেতে পারতেন।

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ, সন্ধ্যাকর নন্দী, ধোয়ী প্রমুখ লেখকদের রচনা, সেকালের মূর্তি ছবি প্রভৃতি থেকে প্রাচীন বাংলার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। বাঙালীরা বেশির ভাগই গ্রামে বাস করতেন। তাঁরা অনাড়ম্বর সহজ ও সরল জীবন যাপন করতেন। শহরে ধনীরা ও বড় বড় ব্যবসায়ীরা বাস করতেন। তাঁদের জীবনযাত্রা মোটামুটি ছিল বিলাসবহুল। তাঁরা আড়ম্বরপ্রিয় ও বিলাসী ছিলেন। অনেকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনও যাপন করতেন।

সমাজে মেয়েদের যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা ছিল। ভাত, ডাল, মাছ-মাংস, শাক-সব্জী, পিঠে-পায়স, ঘি-দুধ-দই, মাখন, সন্দেশ প্রভৃতি তখনও ছিল বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। পুরুষরা ধুতি-চাদর আর মেয়েরা শাড়ী পরতেন। খড়ম আর চামড়ার জুতো দুয়েরই ব্যবহার বাঙালীদের জানা ছিল। কর্পূর, চন্দন, অগুরু, দুধের সর, হলুদ প্রভৃতি ছিল প্রসাধনের উপকরণ। মেয়ে

পুরুষ সকলেই গয়না পরতেন। মেয়েদের মধ্যে তখনও পর্দার প্রচলন হয় নি।

নাচ-গান-বাজনার যথেষ্টই চর্চা ছিল। সামাজিক বা ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে নাচ-গান-বাজনার ব্যবস্থা করা হত। তাস, পাশা প্রভৃতি খেলাতেও বাঙালীরা খুব আনন্দ পেতেন।

এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে পাল্‌কি, গরুর গাড়ী, ঘোড়া, নৌকো প্রভৃতিই ছিল প্রধান বাহন।

এখনকার মত সে যুগেও বাংলা ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। ধানই ছিল প্রধান ফসল। তখন প্রচুর আখের চাষ হত। আখের রস থেকে চিনি আর গুড় তৈরী হয়ে বিদেশে চালান যেত। তখন এদেশে খুব বেশি গুড় তৈরী হত বলেই নাকি এদেশের নাম হয়েছিল গৌড়। এখানে তুলো ও সর্ষেরও যথেষ্ট চাষ হত। কৃষি ছাড়া বাংলায় নানারকম শিল্পদ্রব্যও তৈরী হত। বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, কাষ্ঠশিল্প ইত্যাদি শিল্প থেকে বহু লোকের জীবিকানির্বাহ হত। সেই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী থেকে দেশে প্রচুর অর্থাগম হত। স্বর্ণকার, মণিকার, কর্মকার প্রভৃতি ধাতুশিল্পীদের এবং গন্ধবণিক প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট পসার ছিল। শিল্পের উন্নতির সংগে সংগে বাংলায় বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়েছিল। বাণিজ্যের উন্নতির ফলে বাংলায় নতুন নতুন হাট, গঞ্জ ও নগর গড়ে উঠেছিল। স্থলপথে যাতায়াতের স্থবিধের জন্যে বড় বড় রাজপথ তৈরী হয়েছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে আমরা রমাবতীর (রামপালের রাজধানী) রাজপথের সুন্দর বর্ণনা পাই। জলপথে বাণিজ্যের ব্যাপারেও বাংলাদেশ খুব অগ্রসর ছিল। সেযুগে কড়ির বিনিময়ে জিনিসপত্র কেনার প্রথা প্রচলিত ছিল।

ধর্ম ব্যাপারে উদারতা বাঙালীর চিরকালের বিশেষত্ব। এদেশে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রসার হয় গুপ্তযুগে। শিব, বিষ্ণু, সূর্য, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজো বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু তাঁরা অন্য-ধর্ম-বিদ্বেষী ছিলেন না। রাঢ়ের অধিবাসীদের প্রতিকূলতায়

জৈনধর্ম রাঢ় অঞ্চলে তেমন প্রসারলাভ না করলেও বরেন্দ্রী অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছিল। সেনরাজাদের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম খুব শক্তি সঞ্চয় করে। ফলে বৌদ্ধ ও জৈন দুই ধর্মই হীনবল হয়ে পড়ে, শেষে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আলোচ্য যুগে বাংলাদেশে বহু কবি ও পণ্ডিত আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেকালে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হত সংস্কৃত ভাষায়। রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' নামে একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তার প্রত্যেকটি শ্লোক একদিকে রামায়ণের রামচন্দ্র, অন্যদিকে পালরাজ রামপালের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অভিনন্দ নামে বহু-শ্লোক-রচয়িতা এক কবি একজন পালরাজার সভাসদ্ ছিলেন। এ ছাড়া, 'টীকা-সর্বস্ব' নামে অমরকোষের টীকা-রচয়িতা সর্বানন্দ, 'ন্যায়-কন্দলী' রচয়িতা দার্শনিক শ্রীধরভট্ট, 'হারলতা' ও 'পিতৃদয়িত' নামে দুখানি বইয়ের লেখক এবং বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধভট্ট, সেন-আমলের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হলায়ুধ প্রভৃতি বাঙালী মনীষীরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লুই ও কাহ্নপাদের 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' পাল যুগের রচনা; এই বৌদ্ধগান ও দোঁহাই বাংলা সাহিত্যের প্রথম কীর্তি।

বাংলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাসে সেনযুগও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ'-এর ভাষা সংস্কৃত হলেও শুনতে কিন্তু অনেকটা বাংলা ভাষার মতো। তাই অনেকে জয়দেবকে আদি বাঙালী কবি বলেন। এছাড়া এখনকার **বাংলা লিপির উদ্ভবও** সেনযুগেই হয়েছিল বলে মনে হয়। অবশ্য পালসম্রাট্ প্রথম মহীপালের একটি লিপির ১০টি বর্ণ দেখতে অনেকটা বাংলা অক্ষরের মতো। বিজয়সেনের একটি লিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালার মধ্যে ২২টি প্রায় বাংলা অক্ষরের রূপ পেয়েছে দেখা যায়।

সেযুগে বাংলার সংগে বাইরের বিভিন্ন দেশের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বস্তুতঃ বাংলাকে তখনকার নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্ম, সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের শিক্ষয়িত্রী বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙালী ধর্মপ্রচারক, বণিক ও ঔপনিবেশিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে বাংলার

তথা ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি এই সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এখানকার অধিবাসীদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি তিব্বতে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তেমন প্রসারলাভ করে নি। পরবর্তী কালে শান্তরক্ষিত এবং পদ্মনাভ নামে নালন্দা মহাবিহারের দু'জন বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু অশেষ কষ্ট সহ্য করে তিব্বতে যান এবং সেখানে সাফল্যের সংগে ধর্ম-প্রচার করেন। একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমশীলা মহাবিহারের বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী বৌদ্ধপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে যান। তের বৎসর তিব্বতবাসীদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে তিনি সেখানেই দেহরক্ষা করেন। পাল আমলে যবদ্বীপ, মালয়, সুমাত্রা, ব্রহ্ম ইত্যাদি সমুদ্রপারের দেশগুলিতেও বাঙালীরা ধর্ম ও বাণিজ্য ব্যাপারে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। এর আগে আচার্য বোধিধর্ম নামে এক বাঙালী পণ্ডিত চীনদেশে গিয়েছিলেন। তাম্রলিপ্তি (মেদিনীপুর) ও সপ্তগ্রাম (হুগলী) বন্দর থেকে বাঙালীরা জাহাজে করে এই সমস্ত দূর দূর দেশে যাতায়াত করত।

বাংলার প্রাচীনকালের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন অল্পই পাওয়া গিয়েছে। তবে যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকেই সেযুগের শিল্পীদের অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বরাকরের মন্দির, বাঁকুড়া জেলার বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বরের মন্দির এবং বর্ধমান জেলার দেউলিয়ার মন্দির প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য-উৎকর্ষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাহাড়পুরে একটি বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার ওপরের ভাগ ভেঙে গিয়েছে ; বাকী অংশের উচ্চতা ৭০ ফুট। ৩৫৬ ফুট লম্বা ও ৩১৪ ফুট চওড়া এই মন্দিরটি ইট-কাদার গাঁথুনিতে তৈরী। এটি অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। পাহাড়পুরে পাল আমলের আরও অনেক শিল্পকীর্তি পাওয়া গিয়েছে। উত্তরবংগে সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ, কৈবর্ত-স্তম্ভ আর গরুড়স্তম্ভ সে-যুগের অন্যতম বিস্ময়কর শিল্পকীর্তি। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মন্দিরাদির গায়ে ভাস্কর্য-চিত্র এবং দেবদেবী-মূর্তি থেকে আমরা সে-যুগের বাঙালী

ভাস্করদের দক্ষতার প্রমাণ পাই। বজ্রযোগিনীতে (বিক্রমপুর) পালযুগের একটি অপরূপ-সুন্দর মৎস্যাবতার বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। পালযুগে ধীমান ও বীতপাল এবং সেনযুগে শূলপাণি বাঙালী স্থপতি ও ভাস্করদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এঁরা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে যে নতুন নতুন রীতির প্রবর্তন করে যান সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতিতেও তার অনুকরণ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন

১। প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ লেখ।

[Write a short account of the society and culture of ancient Bengal.]

২। পাল ও সেনযুগে বহির্জগতের সংগে বাংলাদেশের যোগাযোগের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Give a short account of the contact of Bengal with the world outside during the Pala and Sena rule.]

॥ বিভিন্ন দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য ও তাদের সভ্যতা ॥

এতক্ষণ প্রধানতঃ উত্তর ভারতের কথাই আমরা আলোচনা করে এসেছি। এবার দক্ষিণ ভারতের কথা একটু মোটামুটি আলোচনা করা যাক। উত্তর ভারতে যখন মৌর্য সাম্রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত তখনও দক্ষিণ ভারতে চের বা কেরল, সত্যপুত্র, চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য যে বেশ গৌরবের সংগে বর্তমান ছিল—অশোকের শিলালিপি থেকে তা জানতে পারা যায়।

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত রাজ্যগুলির মধ্যে দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রের **সাতবাহন রাজ্য,** বাতাপীর (বিজাপুর জেলার বাদামী) **চালুক্য রাজ্য,** নাসিক অঞ্চলের **রাষ্ট্রকূট রাজ্য,** কল্যাণীর পরবর্তী-**চালুক্য রাজ্য** আর সুদূর দক্ষিণের **পল্লব, চোল, চের,** আর **পাণ্ড্য রাজ্যই** সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

সাতবাহন রাজ্য—গোদাবরী আর কৃষ্ণা নদীর মাঝামাঝি অঞ্চলে ছিল অন্ধ্র প্রদেশ। প্রাচীন ক্ষোদিত লিপিতে অন্ধ্রদের বলা হয়েছে সাতবাহন।

অনুমান, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মহারাষ্ট্রে এই বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম **শিমুক** (আনুমানিক ২৩০ খ্রীঃ-পূঃ)। তাঁর ছেলে প্রথম শাতকর্ণির সময়ে এই বংশের ক্ষমতা ও গৌরব বৃদ্ধি পায়। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শকদের আক্রমণে সাতবাহন রাজ্যের প্রভুত্ব অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়।

এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন **গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি** (আ ৮০ ১০৪ খ্রীঃ)। তিনি শক, যবন (গ্রীক্), পহ্লব (পার্থিয়ান্) প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। উত্তরে মালব থেকে দক্ষিণে কর্ণাট পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সাতবাহন রাজ্যের পতন হয়। এটি তখন কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সাতবাহন রাজারা

ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবে ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধ দুই ধর্মই তাঁদের আনুকূল্য লাভ করেছিল।

বাতাপীর চালুক্যবংশ—ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহারাষ্ট্রে চালুক্যদের অভ্যুদয় হয়। কয়েক শতাব্দী ধরে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে চালুক্যরা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিলেন। **বাতাপী** বা **বাদামী** শহর (বিজাপুর জেলায়) ছিল তাঁদের রাজধানী।

চালুক্যবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন **প্রথম পুলকেশী**। তিনি কয়েকটি রাজ্য জয় করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তবে তাঁর নাতি **দ্বিতীয় পুলকেশীই** (৬০৯-৬৪০ খ্রীঃ) এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি কেবল মহারাষ্ট্রদেশেই তাঁর ক্ষমতা সুদৃঢ় করেন নি, নর্মদা নদীর তীর থেকে কাবেরী নদীর দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। তিনি কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্য অভিযান প্রতিহত করেন, কাঞ্চীর পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণের রাজ্যের কতকাংশ দখল করেন। চোল, পাণ্ড্য আর কেরল রাজ্যের রাজারাও তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় পুলকেশী প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন। পারস্যরাজ দ্বিতীয় খুস্রুর সংগেও তাঁর পত্র আর দূত বিনিময় হত।

চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ তাঁর রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দ্বিতীয় পুলকেশী খুবই ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। তাঁর প্রজারা রাজভক্ত, যুদ্ধপ্রিয়, সাহসী ও শক্তিমান ছিল; তাঁর রাজ্য ঐশ্বর্যে পূর্ণ ছিল। দেশটির নাম তখনও ছিল মহারাষ্ট্র।

চালুক্যরাজাদের কৃতিত্ব—চালুক্যরাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন; তবে অন্য ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁরা সহিষ্ণু ছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ঘটলেও তা লুপ্ত হয় নি। চালুক্যরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দাক্ষিণাত্যে দিগম্বর জৈন-সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কয়েকজন চালুক্য রাজা ভাগবত-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

এই সময়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু

ও শিবের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যে বাতাপী ও পট্টদকলে বড় বড় মন্দির তৈরী করা হয়েছিল এই সময়ে গুহামন্দির নির্মাণের প্রথাও প্রচলিত হয়েছিল। বাতাপীর বখ্যাত গুহামন্দির আজও সেকালের ভাস্কর্যশিল্পের উন্নতির পরিচয় দিচ্ছে সম্ভবতঃ অজন্তা গুহাপ্রাচীরের কতকগুলি বিখ্যাত ছবিও চালুক্যরাজাদের সময়ে আঁকা হয়েছিল। চালুক্যরাজারা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত **রবিকীর্তি** দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজসভা অলংকৃত করে ছিলেন।

রাষ্ট্রকূট বংশ—অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন্‌কে পরাজিত করে **দন্তিদুর্গ** নাসিক অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট রাজ্য স্থাপন করেন। রাষ্ট্রকূটরা রাজপুত ছিলেন। দন্তিদুর্গের পর **প্রথম কৃষ্ণ** রাজা হন। তিনি মহীশূরের গংগ রাজ্য আক্রমণ করেন এবং বেংগীর চালুক্যরাজকে পরাজিত করেন। শিল্পের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইলোরার বিখ্যাত **কৈলাস মন্দির** তাঁর এক অমর কীর্তি।

প্রথম কৃষ্ণের ছেলে **ধ্রুবের** সময় থেকেই রাষ্ট্রকূটদের গৌরবময় যুগ আরম্ভ হয়। ধ্রুব প্রতিহাররাজ বৎসরাজকে পরাজিত এবং গৌড়রাজকে বিতাড়িত করেন। ধ্রুবের ছেলে **তৃতীয় গোবিন্দ** এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর সময়ে রাষ্ট্রকূটরা খুব ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। তিনি গংগরাজ্যের বিদ্রোহ দমন এবং কাঞ্চীর পল্লবরাজকে পরাজিত করেন। গুর্জর-প্রতিহাররাজ বৎসরাজের ছেলে দ্বিতীয় নাগভট তাঁর কাছে ভীষণভাবে পরাজিত হন। বাংলার রাজা ধর্মপাল ও তাঁর আশ্রিত কনৌজরাজ চক্রায়ুধও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন।

তৃতীয় গোবিন্দের ছেলে **প্রথম অমোঘবর্ষ** মান্যখেট বা মালখেড় (হায়দরাবাদ অঞ্চলে) নামক জায়গায় তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। হর্ষবর্ধনের মতো তিনিও গ্রন্থরচয়িতা ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। একজন আরব লেখকের মতে, অমোঘবর্ষ ছিলেন পৃথিবীর চারজন শ্রেষ্ঠ সম্রাটের মধ্যে একজন।

রাষ্ট্রকূটবংশের শেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন **তৃতীয় কৃষ্ণ**। তিনি দক্ষিণে কাঞ্চী ও তাঞ্জোর অধিকার করেন। কিন্তু তাঁর সামন্ত চালুক্যবীর **দ্বিতীয় তৈল** রাষ্ট্রকূটবংশের শেষ রাজা চতুর্থ অমোঘবর্ষকে পরাজিত করে দাক্ষিণাত্যে আবার চালুক্য বংশের প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

নব নব রাজবংশের অভ্যুত্থান—মুসলমান বিজয়ের আগে উত্তর ভারতের মতো বিন্ধ্যপ্রদেশের দক্ষিণেও কয়েকটি নতুন রাজবংশের উদ্ভব ঘটেছিল। এদের মধ্যে কল্যাণীর চালুক্য বংশই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

কল্যাণীর চালুক্যবংশ—আগেই বলা হয়েছে দ্বিতীয় তৈল শেষ রাষ্ট্রকূটরাজ চতুর্থ অমোঘবর্ষকে পরাজিত করে আবার চালুক্য-প্রভূত্ব স্থাপিত করেন (৯৭৩ খ্রীঃ)। বাতাপীর পরিবর্তে তাঁর রাজধানী হল কল্যাণী। এই রাজবংশকে বলা হয় কল্যাণীর চালুক্য বংশ। এই বংশের প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন **ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য** (বা **বিক্রমাঙ্কদেব**)। তিনি শক্তিশালী চোলবংশের দর্প চূর্ণ করেন এবং চোল-রাজধানী কাঞ্চী তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। বিক্রমাদিত্যের কীর্তি-কাহিনী তাঁর সভাকবি বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্কচরিত' কাব্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 'মিতাক্ষরা'-প্রণেতা বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রকার **বিজ্ঞানেশ্বর** তাঁর সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিক্রমাদিত্যের পরে ক্রমেই চালুক্য-বংশের অবনতি ঘটতে থাকে।

সুদূর দক্ষিণের রাজ্যসমূহ

দাক্ষিণাত্যের এই সমস্ত রাজ্যের মতো সুদূর দক্ষিণের পল্লব, চোল ও পাণ্ড্য রাজ্যের কীর্তি-কাহিনীই দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত করে রেখেছে।

পল্লববংশ—খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে পল্লবরা একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কাঞ্চী নগরী (বর্তমান কাঞ্জীভরম্ বা কাঞ্চীপুরম্) ছিল তাঁদের

রাজধানী। ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দক্ষিণ ভারতে প্রভুত্ব নিয়ে চালুক্য আর পল্লবদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ হত। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে পল্লবরাজ **সিংহবিষ্ণুর** সময়ে কাবেরী নদী পর্যন্ত পল্লবরাজ্য বিস্তৃত হয়। তিনি তাঁর প্রতিবেশী পাণ্ড্য, চোল ও চের রাজ্য এবং সিংহল দ্বীপ জয় করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

তাঁর নাতি **প্রথম নরসিংহবর্মণ মহামল্ল** ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকেও বহু যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্যদের রাজধানী বাতাপীনগর অধিকার করেন। এই সময় থেকেই পল্লবরা দক্ষিণ ভারতে প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। নরসিংহবর্মণের সময়ে পল্লবদের প্রধান বন্দর মামল্লপুরম্ (মহাবলিপুরম) অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছিল। তাঁর সময়েই হিউয়েন সাঙ্ কাঞ্চী পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এখানে সে সময় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত এবং এখানকার অধিবাসীরা সৎ, সাহসী ও সত্যবাদী ছিল।

প্রথম নরসিংহবর্মণের পর থেকেই পল্লব বংশের অবনতি আরম্ভ হয়। নবম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজ **প্রথম আদিত্য** পল্লবরাজ অপরাজিতকে পরাজিত করে পল্লবশক্তি ধ্বংস করেন এবং চোলরাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করেন।

পল্লববংশের কৃতিত্ব—কাঞ্চীর পল্লবরা দক্ষিণ ভারতের রাজনীতি ও সভ্যতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন।

শিল্পকলা—পল্লবরাজারা শিল্পানুরাগী ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস পল্লবদের শাসনকালেই আরম্ভ হয় বললে অত্যুক্তি হয় না। পাহাড় কেটে মন্দির তৈরী করার প্রথা এই সময়েই প্রবর্তিত হয়েছিল। পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর ছেলে **প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ** পাহাড় কেটে অনেকগুলি মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন, পদুকোট্টাই রাজ্যে গুহামন্দিরে সম্প্রতি যে পল্লবচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁরই সময়ে তা আঁকা হয়েছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে। প্রথম নরসিংহবর্মণের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের চরম

উন্নতি হয়। মামল্লপুরমের (মহাবলিপুরম্) সাতটি বিখ্যাত **'রথ'** (রথাকৃতি মন্দির) তাঁর অমর কীর্তি। প্রত্যেকটি রথই এক একটি গোটা পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছিল। দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ কাঞ্চীর বিখ্যাত কৈলাস মন্দির নির্মাণ করেন। পল্লবরাজাদের আরও অনেক অপূর্ব শিল্পকীর্তি আজও দেখতে পাওয়া যায়।

সাহিত্য—পল্লবরাজারা সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশ শিলালিপিই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। প্রাচীনকাল থেকেই কাঞ্চী ছিল হিন্দুসভ্যতার ও সংস্কৃত-শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র। শোনা যায়, 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যের রচয়িতা **মহাকবি ভারবি** পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর সভাকবি ছিলেন। 'কাব্যাদর্শ'-প্রণেতা **দণ্ডী** দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ নিজে একজন খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'মত্তবিলাসপ্রহসন' নামে একখানি মনোহর প্রহসন রচনা করে যশস্বী হয়ে আছেন।

চোলবংশ—খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পল্লবরা হীনবল হয়ে পড়লে সুদূর দক্ষিণে চোলবংশীয় রাজারা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। মহাবীর **রাজরাজ** যখন চোল সিংহাসনে আরোহণ করেন (৯৮৫ খ্রীঃ) তখন থেকেই চোল বংশের প্রকৃত গৌরবের যুগ আরম্ভ হয়। রাজরাজ দক্ষিণ ভারতে পাণ্ড্য, চের, কেরল প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন এবং কল্যাণীর চালুক্যদের রাজ্য আক্রমণ করে ছারখার করে দেন। মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। ক্রমে বিন্ধ্যের দক্ষিণে তাঁর সমকক্ষ আর কেউই রইলেন না। তিনি এক শক্তিশালী নৌবাহিনীও তৈরী করেছিলেন। এই নৌবাহিনীর সাহায্যে তিনি সিংহল দ্বীপের উত্তরাংশ এবং মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন। চীনদেশেও তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন। তিনি শুধু অসাধারণ বীরই ছিলেন না, শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী তাঞ্জোরের **বৃহদীশ্বর (শিব) মন্দির** এক অসামান্য শিল্পকীর্তি।

তাঁর ছেলে **প্রথম রাজেন্দ্র** চোলবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্। ভারতের

রণকুশল দিগ্বিজয়ী সম্রাট্‌দের অন্যতম ছিলেন তিনি। তিনি কল্যাণীর চালুক্য ও মহীশূরের হোয়সল (বা প্রতীচ্য গংগ) বংশের প্রভুত্ব ধ্বংস এবং কেরল রাজ্য ও সমগ্র সিংহল দ্বীপ নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের সার্বভৌম সম্রাট্‌ হয়ে তিনি উত্তর ভারতে রাজ্যবিস্তার-অভিযানে বের হন। তাঁর বিজয়-বাহিনী কলিংগ, দক্ষিণ কোশল ও পশ্চিম বংগের কিছু অংশ অধিকার করে। তিনি পূর্ব বংগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে পালরাজ মহীপালদেব ও রাঢ়ের (দক্ষিণ-পশ্চিম বংগের) শূররাজ রণশূর পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর তিনি 'গংগইকোণ্ড' (গংগ বা গংগাবিজয়ী) উপাধি ধারণ করে তিরুচিনোপল্লী (ত্রিচিনোপল্লী) জেলায় 'গংগইকোণ্ড-চোলপুরম্' নামে নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তিনি এক বিরাট্‌ নৌশক্তির অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর নৌবাহিনী সমুদ্র পার হয়ে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রার কতক অংশ জয় করেছিল। এইভাবে তিনি চোলসাম্রাজ্যকে এক বিশাল শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করে যান।

তাঁর দৌহিত্র রাজেন্দ্র চোল কুলোত্তুংগের পরেই চোলবংশ ক্রমে হীনবল হয়ে পড়তে থাকে।

চোলরাজাদের ধর্মমত—চোলরাজারা শিবের উপাসক ছিলেন; কিন্তু তাঁরা পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই সময়ে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি ঘটেছিল। তবে রাজকীয় দান ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া হলেও কতকগুলি বৌদ্ধমঠ চোলরাজাদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল।

চোলরাজাদের কৃতিত্ব—চোলরাজাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব দেখতে পাওয়া যায় তাঁদের রাজ্যশাসন-ব্যবস্থায়। সমগ্র রাজ্যকে প্রদেশ (কাউম), জেলা (নাড়ু) এবং গ্রামে (কুররম) ভাগ করে প্রত্যেকটি ভাগ যাতে সুষ্ঠু ভাবে শাসিত হয় সেদিকে চোলরাজাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই সুশাসনের জন্যে পঞ্চায়েৎ সভা ছিল। এ ছাড়া বিচার থেকে আরম্ভ করে

রাস্তাঘাট, বাগান ইত্যাদির দেখাশোনা প্রভৃতি সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় যাতে সুপরিচালিত হয় চোলরাজারা সেদিকে যথেষ্ট নজর দিতেন।

শুধু শাসন-ব্যবস্থাতেই নয়, শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্যের উন্নতির দিকেও চোলরাজারা কম সজাগ ছিলেন না। শিল্পে অবশ্য তাঁরা পল্লবদের রীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর শিবের মন্দির এবং গংগইকোণ্ড-চোলপুরমের বহু মন্দিরই চোল স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বৃহদীশ্বর মন্দিরটি খুবই সুন্দর—মন্দিরের চূড়াটি থাক-থাক করে তৈরী। সবার ওপরে রয়েছে প্রকাণ্ড একটি পাথর—গোল করে কেটে সেটি বসানো হয়েছে। গংগইকোণ্ড-চোলপুরমের কতকগুলি মন্দিরের ক্ষোদাই মূর্তিগুলি দেখতে খুবই সুন্দর। মন্দিরের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বিমান (উচ্চ চূড়া)।

কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য চোলরাজারা ব্যাপক জলসেচের ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতায়াতের সুবিধার জন্য ভাল ভাল রাস্তাও তৈরী করেছিলেন।

পাণ্ড্য বংশ—খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চোলবংশের শক্তিহ্রাসের পর দক্ষিণে পাণ্ড্য বংশীয় রাজারা প্রবল হয়ে ওঠেন। চের বা কেরল রাজ্যও ক্ষমতা অর্জন করে। পাণ্ড্যরাজ্য আগে ছিল কাঞ্চীর পল্লবসম্রাটের একটি সামন্ত রাজ্য, আর কেরলরা ছিলেন চোলদের সামন্ত। কিন্তু চোলবংশের পতনের পর সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্যদের সমকক্ষ শক্তি আর ছিল না। পাণ্ড্যরাজারা শিল্পানুরাগীও ছিলেন। তাঁরা অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরী করেছিলেন। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুরের আক্রমণে চোল ও পাণ্ড্য এই দুটি রাজ্যই ধ্বংস হয়।

দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। পরে হর্ষবর্ধন অবশ্য উত্তর ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু তিনিও সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, উত্তর ভারতে অনেক

ছোট ছোট রাজ্যেরও উদ্ভব হয়। এই সমস্ত রাজ্যের রাজাদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ আর যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে কেউই স্থায়ী শক্তির অধিকারী হতে পারেন নি। শুধু উত্তর ভারতেরই নয়, দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসও প্রায় সমানভাবেই আবর্তিত হচ্ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এই রাষ্ট্রীয় অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ভারত-আক্রমণকারী মুসলমানরা এদেশে স্থায়ী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। যাই হোক, ভারতবর্ষে এই রাজনৈতিক বিশৃংখলা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব বিস্তার করলেও হিন্দুসভ্যতার প্রাণশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। ধর্মচর্চায়, সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে, বাণিজ্যে এবং আরও অনেক বিষয়েই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিশাল হিন্দুসমাজ এই বিশৃংখলতার যুগেও যথেষ্ট উন্নতি করেছিল।

দক্ষিণ ভারতের ধর্মসংস্কারকগণ —খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতে কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ধর্ম-সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। এঁদের প্রভাবে হিন্দুসমাজে এক বিরাট ধর্ম-আলোড়ন দেখা দেয়। এই সমস্ত সংস্কারকের মধ্যে কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্য, রামানুজ, মাধবাচার্য ও বসবের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুমারিল ভট্ট খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে আবির্ভূত হন। তিনি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী এবং মীমাংসাদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। বৌদ্ধদের ওপর তিনি অপ্রসন্ন ছিলেন।

আচার্য শংকর আবির্ভূত হন ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। ত্রিবাংকুরের অন্তর্গত আলোয়াই নদীর তীরে কালাদি গ্রামে এক দরিদ্র নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শংকর শৈশবে পিতৃহীন হন এবং পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র ৩২ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু এই অল্পপরিসর জীবনেই তিনি দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছিলেন। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর এক প্রান্ত পর্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ করে তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শংকরাচার্য হলেন

বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। তাঁর লেখা বেদান্তভাষ্য ও অন্য অন্য বইয়ে তিনি যে ধর্মমত প্রচার করে গেছেন, তাকে বলা হয় 'অদ্বৈতবাদ'। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়; তিনিই একমাত্র সত্য এবং দৃশ্যমান জগৎ শুধুই মায়া বা দৃষ্টিবিভ্রম (অর্থাৎ অসার)—এই হল শংকরের অদ্বৈতবাদের সারমর্ম। বৌদ্ধ ও অন্যান্য সমস্ত বিরুদ্ধ মতামতকে প্রখর যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে শংকর তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করে যান। তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার করার উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি মঠও স্থাপন করেছিলেন। তার ভেতর মহীশূরের শৃংগেরী মঠ, পুরীর গোবর্ধন মঠ, দ্বারকার সারদা মঠ ও বদরিকাশ্রমের যোশী মঠ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

আলবার—খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে তামিলদেশে শৈব ও বৈষ্ণব 'ভক্ত' সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এঁরা নিজের নিজের আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে স্তোত্র রচনা করে মন্দিরে মন্দিরে গেয়ে বেড়াতেন। এই বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে বারজন বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন; 'আল্‌বার' নামে তাঁরা পরিচিত। তাঁদের পরে যে-সমস্ত বৈষ্ণব আচার্যের অভ্যুদয় হয়, তাঁদের মধ্যে নাথমুনি, যামুনাচার্য ও রামানুজাচার্য প্রধান।

রামানুজ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে মাদ্রাজের কাছে এক তামিল ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'শ্রীবৈষ্ণব' নামক এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনিও শংকরাচার্যের মতো বেদান্তের ভাষ্য (টীকা) রচনা করেছিলেন; কিন্তু তাঁর ধর্মমত শংকরের ধর্মমতের বিরোধী ছিল। রামানুজের মতে জীবমাত্রই ব্রহ্মের অংশ; ব্রহ্ম ও জগৎ দুই-ই সত্য। জ্ঞানের পরিবর্তে ভক্তিকেই তিনি মুক্তিলাভের উপায় বলে নির্দেশ করেছিলেন।

রামানুজের কিছু পরে **মাধবাচার্য** নামে আর একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব-ধর্মপ্রচারক আবির্ভূত হন। তাঁর শিষ্যদের বলা হয় মাধবাচারী, তিনি দ্বৈতবাদী (অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীব দুই-ই পৃথক সত্য, এই মতবাদী) ও ভক্তিপন্থী ছিলেন।

শৈব ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে জ্ঞান-সম্বন্দর, অপ্পর, সুন্দরমূর্তি ও মাণিক্ক

বসহ্ব খ্যাতি লাভ করেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বসব। তিনি বিজাপুরের এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বসবের শিষ্যরা 'বীরশৈব' বা 'লিংগায়েৎ' সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এঁরা শিবকেই একমাত্র উপাস্য দেবতা বলে মনে করেন ও শিবলিংগ পূজো করেন, পুনর্জন্ম মানেন না, বাল্যবিবাহের এঁরা বিরোধী এবং বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী। মৃতদেহ এঁরা সমাধিস্থ করেন।

মন্দির—এই সময় দাক্ষিণাত্যের নানা অঞ্চলে অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির তৈরী হয়েছিল। বৌদ্ধরা পাহাড় কেটে গুহাচৈত্য বা বিহার তৈরী করতেন। অজন্তা ও ইলোরা তার শ্রেষ্ঠ ও বিস্ময়কর উদাহরণ। জৈনরাও ঐভাবে মন্দির নির্মাণ করতেন। মহীশূরে শ্রবণ-বেলগোলার জৈন গুহামন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ও জৈনদের আদর্শে রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণ পাহাড় কেটে ইলোরার সুপ্রসিদ্ধ কৈলাস মন্দির তৈরী করেন। পাহাড় কেটে তৈরী করা এত বড় মন্দির পৃথিবীতে আর নেই। এর দেওয়ালের গায়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির সংগে বৌদ্ধ আর জৈন ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত নানা ঘটনার বহু ছবি আঁকা রয়েছে। চালুক্যরা বাতাপীর যে গুহামন্দির তৈরী করেছিলেন তাও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার মতো। মন্দির তৈরীর ব্যাপারে পল্লব ও চোল সম্রাট্‌দের কৃতিত্ব ছিল অসীম। পাহাড় কেটে মন্দির তৈরী করার কৌশল পল্লবরাই প্রবর্তন করেন। পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহবর্মণের মামল্লপুরম্ বা মহাবলিপুরমের 'সপ্তরথ' নামে বিখ্যাত সাতটি পাহাড়-কাটা মন্দির এবং দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণের কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির পল্লববংশের অমর কীর্তি। চোল বংশের স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল রাজরাজ চোলের তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের গংগইকোণ্ড-চোলপুরমের মন্দিরও আকারে আর গঠন-সৌষ্ঠবে খুব সুন্দর। পল্লব, চোল ও পাণ্ড্যদের মন্দিরগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল 'গোপুরম্' বা বৃহদাকার তোরণ। মূল মন্দিরের মতো 'গোপুরম্'গুলিও বিচিত্র কারুকার্যে খচিত। সুদূর দক্ষিণের এই মন্দিরগুলি দ্রাবিড়-স্থাপত্যের অপরূপ নিদর্শন।

সাহিত্য—এ যুগে সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেও দক্ষিণ ভারত যথেষ্ট উৎকর্ষলাভ করেছিল। মহাকবি ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়', পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণের 'মত্তবিলাসপ্রহসন' ও বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্ক-চরিত' এ-যুগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-কীর্তি। এর ওপর রয়েছে কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্য, রামানুজাচার্য প্রভৃতি ধর্মনেতাদের এবং 'কাব্যাদর্শ'-প্রণেতা দণ্ডী, 'মিতাক্ষরা'-প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষীদের জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী। বিখ্যাত শৈব ভক্ত মাণিক্ক বসহর 'তিরুবাসহম্' রচনা করে তামিল ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন।

নৌ-শক্তি—দাক্ষিণাত্যের রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নৌ-শক্তির অধিকারী ছিলেন রাজরাজ চোল ও প্রথম রাজেন্দ্র চোল। তাঁদের নৌবাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। এর সাহায্যে তাঁদের সাম্রাজ্য সাগরপারের নানা দ্বীপে বিস্তৃত হয়েছিল। বাণিজ্যের প্রসারও তাঁদের নৌশক্তি-বৃদ্ধির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পল্লব ও পাণ্ড্য রাজারাও নৌবাহিনীর সাহায্যে সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন—সেযুগে সাধারণতঃ রাজাই ছিলেন রাজ্যে সর্বেসর্বা, প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা; কিন্তু দক্ষিণ ভারতে কোন কোন রাজ্যের শাসন-প্রণালীর মধ্যে গণতন্ত্রের স্বীকৃতিও দেখা যায়। এই গণতান্ত্রিক নীতি রূপায়িত হত গ্রামকে কেন্দ্র করে। এ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল চোলরাজাদের শাসন-প্রণালী। চোল-শাসনের ভিত্তিই ছিল গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন বা পঞ্চায়েৎ প্রথা। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে তৈরী হত একটি 'কুর্রম্' (গ্রামসংঘ বা ইউনিয়ন)। প্রত্যেক 'কুর্রম্'-এর ওপর নিজের এলাকায় সবরকম ব্যবস্থা করার দায়িত্ব থাকত। এই দায়িত্ব পরিচালনার জন্য 'কুর্রম্'-এ 'মহাসভা'-নামধারী একটি সমিতি থাকত। মহাসভার কাজ দেখবার জন্যে 'অধিকারিন্' নামে রাজকর্মচারীরা নিযুক্ত থাকতেন। গ্রামবাসীরা মহাসভার সভ্যদের এক বৎসরের জন্যে নির্বাচিত করতেন। প্রত্যেক 'কুর্রম্'-এর নিজস্ব সরকারী অর্থভাণ্ডার (treasury) থাকত।

নিজের এলাকার জমি বিলি-ব্যবস্থার, এমন কি বিক্রী করবারও ক্ষমতা ছিল এই মহাসভার। গ্রামবাসীদের বিবাদ-বিসংবাদের বিচারের কাজ এবং অন্য অন্য গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজ দেখাশোনার জন্যে মহাসভার অধীনে কয়েকটি করে সমিতি থাকত। তেমনি আবার কয়েকটি সমিতি থাকত গ্রামের পুকুর, বাগান, পথঘাট ইত্যাদির যত্ন নেওয়া, এসব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রভৃতি কাজ দেখাশোনা করার জন্যে। সাধারণতঃ গ্রামের প্রধান মন্দিরে সমিতির অধিবেশন বসত।

প্রশ্ন

১। প্রাচীন যুগে দক্ষিণ ভারতে যে-সমস্ত ধর্মসংস্কারক আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম কর। তাঁদের ধর্মমত সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও।

[Name three of the religious reformers of South India of olden days and explain briefly their religious teachings.]

২। দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Give a brief description of the civilization and culture of South India.]

৮। টীকা লেখ :—(ক) প্রাচীন যুগে দক্ষিণ ভারতে (বা চোলরাজ্যে) গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন, (খ) দক্ষিণ ভারতের মন্দির।

[Write notes on :

(a) Village autonomy in South India, (b) Temples of South India.]

॥ ভারতীয় উপনিবেশ প্রসারের চেষ্টা ॥

প্রাচীন যুগে হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা ও বৈদেশিক সম্পর্ক—অতি প্রাচীনকাল হতেই ভারতবাসীরা সমুদ্রযাত্রা করে এবং বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সংগে বাণিজ্য সম্পর্ক—'পেরিপ্লাস অফ্ দি এরিথ্রিয়ান্ সী' নামে বইখানি থেকে জানা যায় যে প্রাচীন ভারতের সংগে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। বিখ্যাত রোমান লেখক প্লিনিও (খ্রীঃ ১ম শতকে) একথার উল্লেখ করেছেন। ভারতে তৈরী জাহাজে করে ভারতীয় নাবিকরা মুক্তা, মূল্যবান রত্নপ্রস্তর, মশলা, মসলিন, প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য নিয়ে আরব, পারস্য, আফ্রিকা, প্রভৃতি দূর দূর দেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। ভারতীয় পণ্য আবার সেই সব দেশ থেকে রোম, গ্রীস প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশের বাজারে চালান হয়ে যেত। পাশ্চাত্ত্য জগতে এই সমস্ত জিনিসের বিশেষ চাহিদা ছিল। ভারতীয়রা বাণিজ্যসূত্রে আরবসাগরের কয়েকটি দ্বীপে বসবাসও করেছিলেন।

ধর্মীয় সম্পর্ক—কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যেই নয়, ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়েও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হয়েছিল। অশোক পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত পশ্চিম-এশিয়ার কতকগুলো দেশে বৌদ্ধ ও হিন্দু এই দুই ধর্মই বেশি প্রচলিত ছিল।

সাংস্কৃতিক সংযোগ—এই সময় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাও ভারতের ওপর, সামান্য হলেও, প্রভাব বিস্তার করেছিল। গ্রীক ও রোমক জ্যোতির্বিদ্যায় ভারতবাসীর জ্ঞানার্জনের কথা, ভারতীয় শিল্প ও মুদ্রায় গ্রীক প্রভাব—এসব অস্বীকার করবার উপায় নেই। পাশ্চাত্ত্য দেশ যেমন ভারতীয় দর্শন

থেকে জ্ঞানলাভ করেছিল, আরবরাও সেই রকম ভারতীয় সভ্যতা বহুলাংশে গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় ঔষধ, এবং গণিতে দশমিক চিহ্নের অপূর্ব আবিষ্কার প্রভৃতি আরবদের মারফৎ সমগ্র পৃথিবীতে প্রচলিত হয়ে পড়েছিল।

মধ্য এশিয়ার সংগে সংযোগ—ধর্মপ্রচারকদের প্রচারকার্যের ফলে আর কুষাণ সম্রাট্‌দের রাজনৈতিক প্রভাবের জোরে মধ্য এশিয়ার অনেক দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। এই সময় বহু ভারতবাসী মধ্য এশিয়ার বর্তমান খোটানের চারিদিকে বসবাস করতে আরম্ভ করেন, ফলে সেখানেও ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারলাভ করেছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকেও খোটানে ভারতীয় ভাষা ও লিপির প্রচলন ছিল এবং সেখানে তখনও কুবেরের পূজো হত।

চীনের সংগে সংযোগ—মধ্য এশিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে এখনও লক্ষ লক্ষ নরনারী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। বহু চৈনিক সন্ন্যাসী ভারতে এসে বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ এবং বুদ্ধের মূর্তি স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। চীনা ভাষায় এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করবার জন্যে তাঁরা সংস্কৃত ও পালি ভাষা ভাল করে শিখেছিলেন। এইজন্যে বহু ভারতীয় পণ্ডিতকে চীনদেশে নিয়ে গিয়ে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। এইভাবে চীনদেশের সংগে ভারতের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধও স্থাপিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় ৭৫০ অব্দে চীনদেশের ক্যাণ্টনে যে কয়েকটি হিন্দু মন্দির ছিল এবং অনেক ভারতীয় বণিকের বাসও ছিল, একথা জানতে পারা যায়।

কোরিয়া, জাপান ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও ভারতের সংগে এই সমস্ত দেশের সংযোগ—বৌদ্ধধর্ম চীন থেকে কোরিয়ায় এবং কোরিয়া থেকে জাপানে প্রচারিত হয়েছিল। গত পনর শ' বছর ধরে বৌদ্ধধর্ম এই দুই দেশের সভ্যতা গঠনে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রচারিত হয়। এখানে ভারতীয় বর্ণমালারও প্রচলন হয়। তিব্বতীয় সন্ন্যাসীরা নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিহারে এসে বৌদ্ধ

শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করে যেতেন। অতীশ দীপংকর এবং আরও অনেক ভারতীয় বৌদ্ধসন্ন্যাসী তিব্বতে গিয়েছিলেন।

সিংহল—প্রাচীনকালে হিন্দুরা সিংহলেও উপনিবেশ স্থাপন করেন। প্রবাদ আছে যে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লাট প্রদেশের যুবরাজ বিজয়সিংহ নির্বাসিত হয়ে সমুদ্রযাত্রা করেন এবং বর্তমান সিংহল দ্বীপে এক রাজ্য স্থাপন করেন। তারপর ঐতিহাসিক যুগে চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি তামিলদেশীয় রাজারা বারবার সিংহল আক্রমণ করে সেখানে রাজ্যবিস্তার করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—দুঃসাহসিক সামুদ্রিক অভিযানের যে-স্বপ্নে প্রাচীন ভারতবাসীরা বিভোর ছিল, তার অবাধ ও পূর্ণরূপায়ণের ক্ষেত্র হয়ে উঠল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। ইন্দোচীন ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ ছিল বংগোপসাগরের অপর পারে অবস্থিত। সমস্ত পৃথিবীতে নানাপ্রকার মশলার ব্যবসা তাদের প্রায় একচেটিয়া ছিল। এই সমস্ত জায়গা খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ ছিল। এইজন্যে দেশ দুটি ভারতীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ ও শ্রীবিজয়ে (সুমাত্রায়) ভারতীয় বণিকদের প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে সুদূর প্রাচ্যের সংগে ভারতবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয় বণিকরা এই সমস্ত দেশে যাতায়াত করত। তার ফলে এই সমস্ত জায়গায় ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা বিস্তারলাভ করেছিল।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হতে দেখা যায়, ভারতীয় নামধারী রাজা এই সমস্ত দেশ শাসন করতেন। এই সমস্ত দেশের ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, ভাষা এবং বর্ণমালা সবই ভারতীয় ছিল। তাই এই রাজ্যগুলোকে আমরা ভারতীয় ঔপনিবেশিক রাজ্য বলতে পারি।

প্রাচ্যে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন ও সভ্যতা বিস্তার—দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে মালয় উপদ্বীপ, কাম্বোডিয়া (কম্বুজ), আন্নাম এবং সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপে এইরকম রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। এই সমস্ত রাজ্যে হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা প্রচলিত হয়। প্রায় এক হাজার

বছর ধরে এই সমস্ত অঞ্চলের প্রধান সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতীয় সভ্যতারই অংগ ছিল।

চম্পা—হিন্দু ঔপনিবেশিকরা ইন্দোচীনে চম্পা ও কম্বুজ নামে দুটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। বর্তমান আন্নামের সমগ্র অংশই চম্পা-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জয় পরমেশ্বর বর্মদেব, ঈশ্বরমূর্তি, রুদ্রবর্মন, মহারাজাধিরাজ শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মন, জয় সিংহবর্মন প্রভৃতি বহু বীরপুরুষ এখানে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা কম্বুজবাসীদের এবং মংগোল-নায়ক কুবলাই খাঁর মতো প্রবল পরাক্রান্ত অভিযানকারীর আক্রমণ হতে তাঁদের রাজ্য রক্ষা করে তাঁদের শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। চীনদেশের সংগে তাঁদের কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিল। তেরশ' বছরেরও বেশি সগৌরবে বর্তমান থেকে শেষে আন্নামীদের বার বার আক্রমণের ফলে চম্পারাজ্যের ক্ষমতা নষ্ট হয়। গৌরবের দিনে এখানে অনেকগুলো সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। সমস্ত দেশটি সুন্দর সুন্দর হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরে সাজান ছিল।

কম্বুজ—কম্বুজে হিন্দুরাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় নি। তবে খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে এই রাজ্য বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল তা জানা যায়। এই রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে তুয়েন-সেইন (Tuen Sein) নামে একটি সীমান্ত রাজ্য ছিল। একজন চীনা লেখক লিখে গেছেন যে, এক হাজারেরও বেশি ভারতীয় ব্রাহ্মণ এখানে বাস করতেন। এখানকার অধিবাসীরা সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদের মত অনুসারে চলত এবং তাঁদের সংগে নিজেদের আত্মীয়দের বিয়ে দিত। কম্বুজের রাজারা ভারতবর্ষ ও চীনদেশে দূত পাঠিয়েছিলেন। চম্পার চেয়েও কম্বুজরাজ্য বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। সমগ্র কাম্বোডিয়ার সংগে কোচিন-চীন, লাওস্, ব্রহ্মদেশ, এবং মালয় উপদ্বীপের কিছু অংশ কম্বুজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অংকোর ভট, অংকোর থোম, এবং আরও বহু অপূর্ব মন্দির কম্বুজ-রাজাদের ঐশ্বর্য ও ধর্মপ্রাণতার পরিচয় দেয়।

অংকোর ভট—অংকোর ভট বিশ্ববাসীর কাছে এক বিস্ময়ের জিনিস। এটি একটি বিষ্ণুমন্দির। এর চারিদিক পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

সুবিখ্যাত এই অংকোর ভট মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ আজও এক সমৃদ্ধিশালী নগরের স্মৃতি বহন করছে। এই মন্দিরটি সুদূর প্রাচ্যে হিন্দু-সভ্যতা-বিস্তারের এক অপরূপ নিদর্শন।

অংকোর থোম—চতুষ্কোণাকৃতি অংকোর থোমের (নগরধামের) প্রত্যেক দিক দুই মাইলের ওপর চওড়া। এটি ৩৩০ ফুট একটি পরিখা দিয়ে ঘেরা এবং অংকোর ভটের মতো এরও চারিদিকে পাথরের তৈরী উঁচু পাঁচিল আছে। নগরের মাঝখানে একটি বিরাট মন্দির আছে। এটি দেখতে পিরামিডের মতো। নগরের তোরণগুলি দেখতে খুবই সুন্দর। সে-যুগে এটি পৃথিবীর সমৃদ্ধিশালী নগরগুলির অন্যতম ছিল। হিন্দুরাজাদের আনুকূল্যে চম্পা ও কম্বুজ রাজ্যে ভারতীয় ভাষা, ধর্ম ও সভ্যতা প্রসারলাভ করেছিল।

শৈলেন্দ্র বংশ—মালয় উপদ্বীপ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দুটি প্রকাণ্ড হিন্দু সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটে। অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্রবংশ সুমাত্রার শ্রীনগরে রাজধানী স্থাপন করে এক পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মালয় উপদ্বীপ, এবং সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্নিও সমেত সমগ্র ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ছিল শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। শৈলেন্দ্র সম্রাট্‌দের ক্ষমতাশালী নৌবাহিনী ছিল। ভারতবর্ষ ও চীনের রাজারাও শৈলেন্দ্ররাজকে বিশেষ সম্মান করতেন। শৈলেন্দ্ররাজারা মহাযান বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা সম্ভবতঃ বাংলা দেশ থেকেই ধর্ম সম্বন্ধে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। বাংলা দেশের কুমারঘোষ নামে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন এক শৈলেন্দ্ররাজের ধর্মাচার্য। শ্রীবিজয় ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

শৈলেন্দ্রদের সময়ে স্থাপত্য-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তাঁদের সময়ে যবদ্বীপের বরবদুর-এ একটি অপরূপ সুন্দর বৌদ্ধমন্দির তৈরী হয়েছিল। আজও পর্যন্ত তা' শৈলেন্দ্রবংশের গৌরব ও তাঁদের শিল্পানুরাগের সাক্ষ্য বহন করছে।

শৈলেন্দ্ররাজারা একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন। এই সময় চোলসম্রাট্ প্রথম রাজেন্দ্র এক বিরাট নৌবাহিনী নিয়ে শৈলেন্দ্ররাজ্য

আক্রমণ করেন এবং শৈলেন্দ্ররাজ্যের এক বৃহৎ অংশ অধিকার করেন। তার পরেও শৈলেন্দ্রদের সংগে চোলদের বিবাদ চলতে থাকে। প্রায় এক শতাব্দী পরে শৈলেন্দ্ররাজ্যে চোলদের প্রাধান্য নষ্ট হয় বটে, কিন্তু শৈলেন্দ্র রাজ্যেরও পতন আরম্ভ হল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিংহল দ্বীপের বিরুদ্ধে এক অভিযানের ফলে এই রাজ্যের পতন ঘটে।

শৈলেন্দ্ররাজাদের পতনের পর **যবদ্বীপের হিন্দুরাজ্য** ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। যবদ্বীপে রামায়ণ ও মহাভারত যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। এখানকার অধিবাসীরা এখনও এই দুটি মহাকাব্য থেকে তাঁদের নাটকের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে থাকেন।

প্রায় পনের শ' বছর ধরে ভারতীয় হিন্দুরা ইন্দোচীন এবং সুমাত্রা হতে নিউ গিনি পর্যন্ত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নানা দ্বীপে রাজত্ব করে গেছেন। সে-সময় ভারতীয় ধর্ম, ভারতীয় কৃষ্টি, ভারতীয় বিধি-ব্যবস্থা এবং ভারতীয় শাসনপদ্ধতি এই বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন-প্রণালীকে প্রভাবিত করেছিল। ভারতের ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের উচ্চ নৈতিক ভাবধারা এবং উন্নত মানবধর্মী নীতি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে এক বৃহত্তর ভারত গড়ে উঠেছিল। ভারতের মূল ভূখণ্ডে গৌরবময় হিন্দু যুগের অবসানের প্রায় সংগে সংগেই উপনিবেশগুলিতেও হিন্দুধর্মের ও হিন্দু রাজাদের প্রাধান্য নষ্ট হতে লাগল।

প্রশ্ন

১। প্রাচীন যুগে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কিভাবে ভারতের বাইরে প্রসারলাভ করেছিল, সংক্ষেপে বিবৃত কর।

[Briefly describe how the culture and civilization of ancient India extended beyond her borders.]

২। প্রাচীন হিন্দুদের ঔপনিবেশিক কীর্তিকলাপ বর্ণনা কর।

[Give a description of the colonial activities of the ancient Indians.]

৩। টীকা লেখ :—শৈলেন্দ্র বংশ, কম্বুজ, চম্পা, অংকোর ভট্।

[Write notes on :
The Sailendras, Kambuja, Champa, Angkor Vat.]

॥ রাজপুত জাতি ঃ মুসলমানদের ভারতে আগমন ॥

রাজপুত জাতি ঃ রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত নেই। কিংবদন্তী অনুসারে রাজপুতেরা রামায়ণ ও মহাভারতের সূর্য ও চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়। হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে তাদের কঠোর সংগ্রাম থেকে কেউ কেউ মনে করেন রাজপুতেরা মূলতঃ ভারতীয় এবং তাদের দেহের গঠন থেকে অনেকে মনে করেন যে তারা আর্য।

কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে বহিরাগত হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতির সংগে ভারতের আদিবাসীদের সংমিশ্রণে রাজপুত জাতির উদ্ভব হয়েছিল। কালক্রমে তারা ভারতীয় হিন্দুদের সংগে মিশে গিয়েছিল। রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রতিহার, গুহিলোট, চৌহান, চৌলুক্য, পরমার, চান্দেল্ল ও চেদী বংশ বিখ্যাত।

রাজপুত রাজারা কনৌজে, দিল্লী-আজমীর অঞ্চলে, গুজরাটে, মালবে এবং যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে রাজত্ব করতেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস প্রধানতঃ রাজপুতদের বীরত্বের ইতিহাস।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গুজরাটের চৌলুক্যেরা আরবদের দক্ষিণাভিমুখী অভিযান রোধ করে। দশম শতাব্দীর মুসলমান আক্রমণ থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষার জন্যেও রাজপুতরা কঠোর সংগ্রাম করেছিল।

দেশের জন্যে বিদেশীদের সংগে যুদ্ধ করলেও রাজপুতদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে কলহ-বিরোধের অন্ত ছিল না। এই আত্মঘাতী কলহ-বিরোধ দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে চরমে ওঠে এবং রাজপুতরা ক্রমে হীনবল হয়ে বিদেশীদের কাছে বারবার পরাভূত হয়।

রাজপুতদের অনৈক্য ও তজ্জনিত দুর্বলতার জন্যে গজনীর সুলতান মামুদ সহজেই ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ দখল করেন এবং এই একই কারণে পরবর্তী কালে রাজপুতরা দিল্লীর সুলতানদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। দিল্লীর সুলতানির পতনের পর মোগল আক্রমণ রোধ করতে এবং মোগল রাজত্বকালে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে রাজপুতেরা, বিশেষ করে মেবারের রাজপুতেরা প্রাণপণ সংগ্রাম করেছিল। বাবরের মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠায় বাধা দিতে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের যুদ্ধ (খানুয়ার যুদ্ধ: ১৫২৭ খ্রীঃ) ও মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে রাণা প্রতাপ সিংহের যুদ্ধ (হলদিঘাটের যুদ্ধ, ১৫৭৬ খ্রীঃ) রাজপুত বীরত্বের অবিস্মরণীয় সাক্ষ্য। কিন্তু অসংহত রাজপুত শক্তি শেষ পর্যন্ত মুসলমান অভিযানের দুর্ধর্ষ গতি রোধ করতে পারে নি।

রাজপুত শৌর্যের বিবরণ নানা গাথা-কাহিনীতে আজও সারা ভারতে ছড়িয়ে রয়েছে। রাজপুত চিত্রকলা, মন্দির-প্রাসাদ-দুর্গ নির্মাণের কৌশল চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মর্যাদারক্ষার জন্যে রাজপুত রমণীর দুঃসাহসিক জৌহরব্রত পালন আজও ভারতের রমণীকুলকে প্রেরণা জোগায়।

মুসলমানদের ভারতে আগমন: হজরত মহম্মদ সপ্তম শতাব্দীতে আরবদেশে ইসলাম-ধর্ম প্রচার করেন। ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের মুসলমান বলা হয়।

বিচ্ছিন্ন আরবজাতি ইসলামের প্রভাবে এক সংহত শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। এই নবজাত মুসলমান জাতি ধর্মপ্রচার আর রাজ্যজয়ের দ্বারা অল্পকালের মধ্যে এশিয়া আফ্রিকা আর ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বিন্ কাসিম (মহম্মদের ছেলে কাশিম) নামে এক আরব সেনাপতি সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। তিনি ভারতে স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন করেন নি এবং এই প্রথম মুসলমান অভিযানের ঐতিহাসিক গুরুত্বও উল্লেখযোগ্য নয়। তবে আরব পণ্ডিতরা ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, গণিত,

জ্যোতিষ ও চিকিৎসাবিদ্যা থেকে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন এবং তাঁদের চেষ্টাতেই ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রচারিত হয়েছিল।

ভারতে মুসলমান বিজয় স্থরু হয় দশম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে। তুর্কী জাতীয় মুসলমানেরা গজনী ও কাবুল প্রদেশ থেকে এসে উত্তর ভারতের সমতল ভূমিতে ইসলামের বিজয় পতাকা-প্রোথিত করেছিল।

গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদ (৯৯৮-১০৩০) বারবার উত্তর ভারত আক্রমণ করে হিন্দু রাজাদের বিপন্ন করেন। তিনি সতর বার ভারত আক্রমণ করলেও পঞ্জাবের কয়েকটি জেলা, উন্দের হিন্দুরাজ্য ও মূলতানের মুসলমান রাজ্য ছাড়া আর কোন জনপদ স্থায়ী ভাবে অধিকার করতে পারেন নি। হয়ত মামুদ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চান নি—তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য বোধ হয় ছিল ভারতের বিপুল ধনসম্পদ হস্তগত করা। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, পরবর্তী মুসলমান আক্রমণকারীদের তিনিই ছিলেন পথপ্রদর্শক।

মামুদ ভারতের তীর্থস্থানগুলোকে ধনরত্নের ভাণ্ডার মনে করতেন। তিনি ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বর এবং ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে মথুরা লুণ্ঠন করেন। তাঁর সোমনাথ আক্রমণই (১০২৪ খ্রীঃ) ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শোনা যায়, সোমনাথ লুণ্ঠন করে তিনি প্রায় দু' কোটি স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিলেন।

মামুদ ভারতের বিজিত অংশগুলোকে নিজের শাসনাধীন করতে না পারলেও তাঁর আক্রমণের ফলে ভারতের ধনসম্পদের ক্ষয় হয়েছিল এবং আক্রান্ত রাজ্যগুলো সামরিক শক্তিতে হীনবল হয়েছিল। পঞ্জাবের কিছু অংশ তিনি মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন বলেই পরবর্তী কালে ভারতে মুসলমানদের রাজ্যবিস্তার সম্ভব হয়েছিল।

মুসলমান বিজয়ের প্রকৃতিঃ মুসলমানদের ভারত আক্রমণ ও বিজয় তৎকালীন ভারতবাসীদের মনে ঘৃণা ও ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। মহম্মদ বিন্ কাসিমের সিন্ধু আক্রমণে বহু প্রাণহানি হয়। তবে যত লোক প্রাণ হারায় তার চেয়ে বেশি লোক দাসত্ব ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয় (যদিও পরবর্তী কালে তিনি তাঁর ত্রুটি হয়ত বুঝেছিলেন)।

সুলতান মামুদের আক্রমণেরও মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুমন্দির ধ্বংস করে ধনরত্ন লুণ্ঠন করা।

বিন্ কাসিম ও মামুদের নীতি পরবর্তী মুসলমান আক্রমণকারীরাও গ্রহণ করেছিলেন।

অল বিরুণীর বিবরণ : সুলতান মামুদ (আমাদের দেশের মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মত) তাঁর সভায় অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর সভারত্নদের অন্যতম ছিলেন অল বিরুণী।

সুলতান মামুদের সংগে তিনি ভারতে আসেন এবং কিছুকাল পঞ্জাবে থেকে সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুদর্শন অধ্যয়ন করেন। সেই ধর্মান্ধতার যুগে তিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে একখানা নিরপেক্ষ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থের নাম 'তহকক্-ই-হিন্দ্'। এই গ্রন্থে একাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতির নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন

১। রাজপুত জাতির উৎপত্তি ও ভারতে মুসলমান অভিযানে বাধাদানে তাঁদের ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[Discuss, in brief, the origin of the Rajputs and their role in withstanding Muslim aggression.]

২। মুসলমানদের ভারতে আগমনের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

[Describe briefly the story of the coming of the Mahomedans into India.]

৩। অল বিরুণী কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে বল।

[Who was Al-biruni ? Write what you know about him.]

॥ মুসলমান শাসনের প্রথম যুগে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি ॥

সুলতানি প্রতিষ্ঠা : পারস্যের পূর্বদিকে ঘুর নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এ রাজ্য প্রথমে ছিল গজনীর অধীন। কালক্রমে ঘুর-রাজ্যের রাজারা শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং ঘুর-নায়ক মহম্মদ ঘুরী অবশেষে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

মহম্মদ ঘুরী কিন্তু সুলতান মামুদের মতো কেবল ধনলোভেই ভারত আক্রমণ করেন নি। স্থায়ী মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি ভারত অভিযান সুরু করেন। উত্তর ভারতে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আজমীর ও দিল্লীর রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে পৃথ্বারাজ মহম্মদ ঘুরীকে পরাজিত করেন কিন্তু পরবর্তী যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত শক্তিশালী রাজা ভারতে আর ছিল না।

মহম্মদ ঘুরীর দুই সেনাপতি কুতবুদ্দিন ও ইক্তিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খলজী ভারতের বিভিন্ন হিন্দুরাজ্য জয় করতে লাগলেন। মহম্মদ খলজী বিহার ও বাংলা দেশ জয় করেন। এইভাবে অল্পকালের মধ্যেই সিন্ধুদেশ থেকে গংগাতীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলমান প্রভুত্ব প্রকৃত পক্ষে কিন্তু বড় বড় নগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশের অধিকাংশ স্থানেই হিন্দু সামন্তদের শাসন প্রচলিত ছিল। তাঁরা দিল্লীর প্রাধান্য স্বীকার করতেন, কিন্তু কার্যতঃ স্বাধীনভাবেই নিজের নিজের রাজ্য শাসন করতেন।

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে এক আততায়ীর হাতে মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ভারতে মুসলমান

প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। মহম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস ও সেনাপতি কুতবুদ্দিন দিল্লীর প্রথম স্বাধীন সুলতানরূপে রাজ্যশাসন করতে থাকেন (১২০৬)।

কুতবুদ্দিনের শাসনকাল থেকে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে বাবরের মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত মুসলমান শাসন "দিল্লীর সুলতানি" নামে পরিচিত।

সুলতানি আমলে নিম্নলিখিত রাজবংশগুলি দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল: দাসবংশ (১২০৬-১২৯০), খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০), তুঘলুক বংশ (১৩২০-১৪১৩), সৈয়দ বংশ (১৪১৪ ১৪৫১) ও লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)।

সুলতানি আমলের শাসন-ব্যবস্থা: সুলতানেরা স্বেচ্ছাতন্ত্রী রাজা ছিলেন। তাঁরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন। কোরাণের বিধানের প্রতি সম্মান দেখালেও, রাজ্যশাসন ব্যাপারে সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁরা কোরাণের অনুশাসন মেনে চলতেন না। কোন কোন সুলতান (যেমন, মহম্মদ তুঘলুক) মুসলমান ধর্মগুরু খলিফার প্রাধান্য স্বীকার করলেও, অনেক সুলতানই আনুষ্ঠানিকভাবে খলিফার প্রাধান্য স্বীকার করেন নি।

সুলতান সৈন্য ও বিচার বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন। তাঁর দ্বারাই দেশের আইন-কানুন নিয়ন্ত্রিত হ'ত এবং তিনিই রাজকর্মচারীদের নিযুক্ত করতেন। কোন মন্ত্রী বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাকেও সুলতান যে কোন সময় পদচ্যুত করতে পারতেন। সৈন্যবলই সুলতানদের প্রভুত্বের প্রকৃত অবলম্বন ছিল। তাই দুর্গ ও সেনানিবাসগুলোর কাছাকাছি অঞ্চলগুলোতেই তাঁদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য অঞ্চলে হিন্দু সামন্তেরা সুলতানের অধীনতা স্বীকার করে, তাঁদের কর দিয়ে বিনা বাধায় রাজত্ব করতেন। মুসলমান রাজ্যে সাধারণতঃ হিন্দুদের জিজিয়া নামে কর দিতে হত। তবে কোন হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করলে সে শাসকসম্প্রদায়ের সমস্ত অধিকারই পেত।

সুলতানি আমলে রাজার পরিবর্তনে কিন্তু গ্রাম্যজীবনে কোন পরিবর্তনই লক্ষিত হত না। সাধারণ লোক ও কৃষকদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটত না।

সুলতান-পদ বংশানুক্রমিক হলেও উত্তরাধিকারীর অযোগ্যতার জন্যে আমীর-ওমরাহরা কোন কোন ক্ষেত্রে সুলতান নির্বাচন করেছেন।

সুলতানি আমলে ভারতবর্ষের প্রদেশ সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে ২০ থেকে ২৫ ছিল। শাসন দু'ভাগে বিভক্ত ছিল—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক। কেন্দ্রীয় শাসন সুলতান নিজে পরিচালনা করতেন। তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারীরা তাঁকে পরামর্শ দিতেন। প্রাদেশিক শাসনের ভার ন্যস্ত ছিল নায়েব সুলতানদের ওপর। কেন্দ্রীয় শাসনের গুণগত কোন পার্থক্য ছিল না।

কেন্দ্রীয় শাসন কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন উজীর বা প্রধান মন্ত্রী। বিচারবিভাগের প্রধান ছিলেন প্রধান কাজী। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন কোতওয়াল।

কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন কোন কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে, প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সুযোগ পেলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ কৃষিই সুলতানি আমলে জনসাধারণের প্রধান উপজীবিকা ছিল। কোন কোন সুলতান কৃষির উন্নয়নের চেষ্টাও করেছিলেন। ফিরোজ শাহ তুঘলুক জলসেচের জন্যে কতকগুলো সেচখাল কাটিয়েছিলেন।

গ্রামগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। প্রতি গ্রামই অন্ন বস্ত্র আশ্রয়ের ব্যাপারে স্বাবলম্বী ছিল।

কোন কোন গ্রামে এবং বিশেষ করে শহরগুলোতে নানাপ্রকার শিল্পের উন্নতি হয়েছিল। সে যুগের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে সূতী ও রেশমী নানারকম কাপড়, চিনি, কাগজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ধাতুশিল্প ও প্রস্তর-শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্প সর্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করে। বিদেশী পর্যটকেরা বাংলা বয়নশিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বাংলাদেশ আর গুজরাটের বন্দর থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সূতী কাপড় বিদেশে রপ্তানী হত।

বণিকশ্রেণী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বাণিজ্য করতেন।

ইউরোপ, আফগানিস্তান, পারস্য, তিব্বত, চীন, ভূটান, ব্রহ্মদেশ, মালয়-দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের সংগে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।

সুলতান ও অভিজাত সমাজের চাহিদা মেটাবার জন্য দিল্লীতে একটা সরকারী কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। সে কারখানায় চার হাজার তাঁতী কাজ করত।

সুলতানদের ভোগ-বিলাসের জন্যে বিদেশ থেকেও নানা দ্রব্য ভারতবর্ষে আমদানী হত।

ধনী অভিজাত শ্রেণীর জীবনযাত্রা ও সাধারণ লোকের জীবনযাত্রায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল।

আফ্রিকাবাসী পর্যটক ইবন বতুতা বলেন যে তিনি বাংলা দেশে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যত সস্তা দেখেছিলেন তেমন আর কোথাও দেখেন নি। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর একখানা পর্তুগীজ চিঠিতে দেখা যায় যে সাধারণ গৃহস্থের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। তাই স্বতঃই অনুমান হয় যে সাধারণ লোকের হাতে টাকা ছিল না এবং টাকার এ অভাবের কারণ হয়ত সম্পন্ন শ্রেণীর হাতে প্রচুর টাকা মজুত হওয়া।

সে আমলে দেশে ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল।

হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শের ফল: মুসলমানদের পূর্বে গ্রীক, শক ও হূণেরা ভারতবর্ষে এসেছিল। কালক্রমে এই সমস্ত বিদেশী জাতি ভারতবাসীদের সংগে এক হয়ে মিলে যায়। তখন আর ভাবে ভাষায়, ধর্মে, কর্মে আচরণে তাদের কোন পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু মুসলমানেরা যে ধর্ম, কর্ম ও সামাজিক আচার নিয়ে এল তা ভারতীয় হিন্দুদের ধর্ম ও আচার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাছাড়া মুসলমানেরা তাদের ধর্ম ও সামাজিক আচারে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল, তাই তারা পূর্বাগত বিদেশীদের মত ভারতীয় সমাজে এক হয়ে মিলে গেল না। তবে দুই সম্প্রদায় দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে অজ্ঞাতে একে অন্যের প্রভাবাধীন হল এবং তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হল।

মুসলমানরা বহু অমুসলমানকে ইসলাম-ধর্মে দীক্ষিত করেছিল। অনেক মুসলমান রাজা ও সেনাপতি হিন্দুনারীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। এই সমস্ত ধর্মান্তরিত অমুসলমানরা ও মুসলমানদের হিন্দু স্ত্রীরা তাদের পূর্বসংস্কার ত্যাগ করতে পারে নি। তাই, বাধ্য হয়েই দুই সমাজের মধ্যে আচার-আচরণগত বৈষম্য কিছুটা লাঘব করতে হয়েছিল।

আবার হিন্দুধর্মের সংগে ইসলামের সংঘর্ষের ফলে একদিকে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা কঠোরতর হল এবং অন্যদিকে ধর্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অধিকতর সাম্য ও উদারতা পরিস্ফুট হতে লাগল।

রক্ষণশীলতা বৃদ্ধির ফলে তৎকালীন হিন্দুশাস্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থের কঠোর অনুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ হল। এই শ্রেণীর গ্রন্থকারদের মধ্যে রঘুনন্দনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্মৃতির অনুশাসনের গণ্ডি দিয়ে হিন্দু সমাজে মুসলমান আচারের প্রবেশ রোধ করতে চেয়েছিলেন। অপর পক্ষে উদার মতাবলম্বী বহু প্রচারক এই সময়েই হিন্দু সমাজের নানা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেন।

উদারমতাবলম্বী প্রচারকদের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মসমন্বয়। আচার-অনুষ্ঠানের বৈষম্য ও জাতিবর্ণের বৈষম্য তাঁরা অস্বীকার করতেন; তাঁদের মতে ভক্তি ও বিশ্বাসই হল মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়।

এই সমস্ত উদারমতাবলম্বী প্রচারকদের মধ্যে **রামানন্দ, বল্লভাচার্য, শ্রীচৈতন্য, একনাথ, কবীর ও নানক** ছিলেন প্রধান।

রামানন্দ রামের উপাসক; তিনি হিন্দীভাষায় তাঁর মত প্রচার করেন। উত্তর-ভারতে তীর্থপর্যটন উপলক্ষে তিনি জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে দীক্ষা দেন। তাঁর বারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে একজন ছিলেন নাপিত, একজন মুচি ও একজন জোলা।

বল্লভাচার্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। মাদ্রাজ অঞ্চলে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর উপদেশের সার কথা: ভোগবাসনা ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ।

চৈতন্যের প্রেম-ধর্ম প্রচারের ফলে হিন্দু ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যে এক নব জাগরণ এসেছিল। তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে বিষ্ণুর অবতার মনে করতেন। তিনি প্রেম ও বৈরাগ্যের মহিমা প্রচার করেন। তাঁর মতে ভক্তিমান চণ্ডালও ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক বড়। তিনি ভারতের বহু অংশে পর্যটন করেন এবং তাঁর প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ ধর্মগুরু একনাথ মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবি ও মনীষী ছিলেন। তিনি প্রচলিত অনেক সমাজবিধি অগ্রাহ্য করেন এবং তথাকথিত অস্পৃশ্যজাতির মধ্যে ধর্মপ্রচার করেন।

কবীর এক মুসলমান-জোলার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের নৈষ্ঠিক অনুষ্ঠান বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে সকল ধর্মই এক: রামে ও রহিমে কোন প্রভেদ নেই।

শিখসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নানক হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মের সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেক মুসলমানও ছিলেন।

সুফীসম্প্রদায়ের মুসলমান সাধুদের ধর্মমতে হিন্দুদের বেদান্তের প্রভাব দেখা যায়।

প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি: ধর্মসংস্কারকদের চেষ্টায় ও প্রভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য উন্নতি লাভ করে। তাঁরা অনেকেই জনসাধারণকে বোঝাবার জন্যে সহজবোধ্য ভাষায় বই লেখেন। রামানন্দ ও কবীর হিন্দী সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধি করেন। একনাথের রচনায় মারাঠী ভাষা সমৃদ্ধ হয়। গুরু নানক ও তাঁর শিষ্যবর্গের রচনায় পঞ্জাবী ভাষা উন্নতি লাভ করে। গুরুমুখী লিপির উদ্ভবও তাঁদের কালে এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় হয়। চৈতন্যদেবের কালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এক নব যুগের সূচনা হয়। তাঁর পূর্বে চণ্ডীদাস বাংলায় তাঁর অমর গীতিকাব্য রচনা করেন। মিথিলার অধিবাসী হলেও সমকালীন বিদ্যাপতি বাংলার প্রাচীন কবি বলেই পরিচিত। কৃত্তিবাস রচিত বাংলা রামায়ণ সুলতানি আমলের অমর রচনা।

বাঙালী কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মা-পুরাণ এ আমলের বিখ্যাত কাব্য। এই সময়ই মহাভারতও বাংলায় অনূদিত হয়।

ফার্সী ও উর্দু সাহিত্য : দিল্লীর সুলতানেরা ফার্সী ভাষায় গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিতেন। সে যুগে ফার্সী ভাষায় কাব্য রচনা করে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেন তাঁদের মধ্যে আমীর খুসরু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

মুসলমান লেখকগণ কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনা করেন। সুলতানি আমলের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন জিয়াউদ্দিন বরণী। তাঁর লিখিত তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী (ফিরুজ শাহ্ তুঘলুকের কালের ইতিহাস) বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

সেকালে মুসলমান পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষা অনুশীলন করতেন এবং রাজদরবারে প্রতিপত্তি লাভের জন্যে অনেক হিন্দুও ফার্সী শিখতেন। আর, অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকদের জন্যে হিন্দী, আরবী ও ফার্সীর সংমিশ্রণে এক মিশ্র ভাষার উদ্ভব হয়। সে ভাষার নাম উর্দু বা বাজারের ভাষা।

স্থাপত্য : সুলতানি আমলের স্থাপত্য হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শের ফল। মসজিদ নির্মাণেও হিন্দু শিল্পী ও স্থপতি নিযুক্ত হত এবং হিন্দু ও জৈন মন্দিরের উপাদানও ব্যবহৃত হত। কোন কোন স্থলে সামান্য অদল-বদল করে মন্দিরকেই মসজিদ করা হত। তাই, সাধারণতঃ সুলতানি আমলের স্থাপত্য সম্পূর্ণ মুসলমানি নয়।

সেকালে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধরণের নির্মাণ-রীতির উদ্ভব হয়। দিল্লী অঞ্চলে মুসলমানি আদর্শই রক্ষিত হয়। দক্ষিণাপথে ও জৌনপুরে স্থানীয় পদ্ধতিই প্রধান ছিল। পশ্চিম ভারতে গুজরাটী স্থাপত্যরীতি গৃহীত হয়, বাংলাদেশে মুসলমান স্থাপত্যে বাংলার নিজস্ব কুটীর নির্মাণের রীতি অনুসৃত হয়। এবং বাংলাদেশের মসজিদে বাংলার তক্ষণশিল্পের প্রভাব দেখা যায়।

মোটের ওপর, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সংস্পর্শ সুলতানি আমলে ধর্মচিন্তায়, সমাজে, সাহিত্যে, শিল্পে সুফলবাহী হয়েছিল।

বিভিন্ন প্রাদেশিক অঞ্চলের অবস্থা ঃ মহম্মদ বিন তুঘলুকের রাজত্বকালের অব্যবস্থায় সুলতানি সাম্রাজ্যের যে পতন আরম্ভ হয় সমরকন্দের দুর্ধর্ষ তুর্কী অধিপতি তৈমুরের আক্রমণে (১৩৯৮ খ্রীঃ) তা' সম্পূর্ণ হল। তখন সাম্রাজ্যের ভগ্নাংশগুলো নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বহু স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। তুঘলুকদের পর লোদী বংশের সুলতান বহলুল ও সিকান্দর লোদী চেষ্টা করেছিলেন দিল্লীর সুলতানির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে। কিন্তু বাংলাদেশের বা দক্ষিণ ভারতের শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যগুলোকে বশীভূত করার সাধ্য তাঁদের ছিল না।

সুলতানি আমলে উত্তর ভারতে জৌনপুর, কাশ্মীর, মালব, গুজরাট ও বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে খান্দেশ, বহমনী রাজ্য ও বিজয়নগর রাজ্য এবং পরবর্তী কালে বহমনী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে বেরার, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগর ও বিদর এই পাঁচটি রাজ্যের উদ্ভব হয়।

ঘিয়াসউদ্দিন তুঘলুকের ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলুক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রীঃ) **জৌনপুর** নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তুঘলুক সুলতানদের পতনের সময় ১৩৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর এক ওমরাহ জৌনপুরে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। জৌনপুরের রাজারা শিক্ষা ও শিল্পানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কাশ্মীর রাজ্যের সুলতানদের মধ্যে জৈন-উল আবেদিন (১৪১৭-১৪৬৭ খ্রীঃ) সব চেয়ে প্রসিদ্ধ। সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা ও জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রজার হিতসাধন তাঁর শাসনের মূলনীতি ছিল। তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিল্প ও সংগীতেও তাঁর অনুরাগ ছিল। আরবী ও ফার্সী ভাষায় রচিত অনেক গ্রন্থ তিনি সংস্কৃতে এবং সংস্কৃত মহাভারত ও রাজতরংগিণী (কাশ্মীরের ইতিহাস) ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করান।

দিল্লীর সুলতানদের ক্ষমতা যখন নিঃশেষপ্রায় তখন **মালবের** এক প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্বাধীনভাবে রাজত্ব সুরু করেন। মুঘল আমলে ১৫৩১

খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ্ মালব জয় করেন এবং সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মালবে দিল্লীর অধিকার স্থাপিত হয়।

১৩৯১ থেকে ১৩৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে **গুজরাট** দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীন হয়। এই রাজ্যের রাজাদের মধ্যে মামুদ বেগারাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। মামুদের পৌত্র বাহাদুর শাহ মালব জয় করেন ও যুদ্ধে মেবারের রাণাকে পরাজিত করেন। বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের সংগে যুদ্ধে পরাস্ত হন। আকবর ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মালব স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন।

প্রাদেশিক মুসলমান নরপতিদের মধ্যে **বহমনী রাজারাই** সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন। হাসান গংগু নামে মহম্মদ বিন্ তুঘলুকের এক আফগান কর্মচারীই বহমনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বহমনী রাজ্যের রাজধানী ছিল গুলবর্গা। ফিরুজ শাহ বহমন গুলবর্গায় বহু প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ গাওয়ানের দক্ষতায় বহমনী রাজ্য শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল বিষয়ে উন্নত হয়ে উঠেছিল।

রুশ পর্যটক নিকিতিনের ভারতভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে বহমনী রাজ্যে আয়তনের অনুপাতে লোকসংখ্যা বেশী ছিল। ধনসম্পদ থাকলেও ধনসম্পদের অসম বণ্টনের ফলে সাধারণ মানুষ দুঃখে ছিল কিন্তু অভিজাতশ্রেণীর বিলাসব্যসনের অবধি ছিল না।

প্রতিবেশী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের সংগে বহমনী রাজ্যের বিরোধ লেগেই ছিল।

বহমন বংশের পতনের পর বহমনী রাজ্য ভেঙে পূর্বোক্ত পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যে—বেরার, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগর ও বিদর—বিভক্ত হয়।

মহম্মদ তুঘলুকের রাজত্বকালে হরিহর রায় ও বুক্কা রায় **বিজয়নগর রাজ্য** প্রতিষ্ঠা করেন (১৩৩৬ খ্রীঃ)। বিজয়নগরে পরপর কয়েকটি হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করে। তাদের নাম—সংগম বংশ (দেবরায় ছিলেন এ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা), সালুভ বংশ, তুলুভ বংশ ও অরবিডু বংশ।

তুলুভ বংশের কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৫-৩০) বিজয়নগর রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণ-ভারত পর্যটন করেন।

দিল্লীর সুলতানেরা উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে দক্ষিণ-ভারত আক্রমণ সুরু করলে, হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বিজয়নগর প্রায় তিন শ' বছর ধরে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করেছিল ও বহমনী রাজ্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করেছিল।

কালক্রমে বিজয়নগরের রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যগুলো মিলিতভাবে বিজয়নগর আক্রমণ করে (তালিকোটার যুদ্ধ ঃ ১৫৬৩) ও রাজ্যের ধনরত্ন লুঠ করে।

বিজয়নগরের রাজারা সুদক্ষ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সীমাহীন ক্ষমতা থাকলেও রাজারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন নি। প্রজাদের মংগলই তাঁদের লক্ষ্য ছিল এবং জনমতকে তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন। রাজা কৃষ্ণ রায় তাঁর "অমুক্ত-মাল্যদ" গ্রন্থে যে ভাবে রাজ কর্তব্য বর্ণনা করেছেন তা থেকে মনে হয় যে ঐ গ্রন্থে বর্ণিত আদর্শ বিজয়নগরের রাজারা কার্যতঃ পালন করতেন।

বিজয়নগরের সমাজে ব্রাহ্মণরা সর্বাধিক সম্মানিত ছিলেন। স্ত্রীজাতি সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে পুরুষদের সমান অংশ গ্রহণ করতেন। অসিচালনা ও মল্লযুদ্ধেও বিজয়নগরের নারীরা দক্ষ ছিলেন এবং রাজারা স্ত্রী-মল্লযোদ্ধা পোষণও করতেন।

ব্রাহ্মণেরা নিরামিষাশী হলেও বিজয়নগরের জনসাধারণ প্রায় সর্বভুক ছিল।

বিজয়নগরের হিন্দু (বৈষ্ণব) রাজারা ধর্মনির্বিশেষে প্রজাপালন করতেন। এ রাজ্যে বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, ইহুদী ও আফ্রিকাবাসী মুসলমানেরা নির্বিবাদে বাস করত।

বিজয়নগরের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ও দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল এবং সংগীত, নৃত্য, নাটক, তর্কশাস্ত্র, দর্শন

প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। জ্ঞানী-গুণীদের সাহায্য ও উৎসাহদানের জন্যে বিজয়নগরের রাজারা মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করতেন। বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য ও তাঁর ভাই মাধব বিদ্যারণ্য বিজয়নগরের পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আটজন বিখ্যাত কবি ("অষ্টদিগ্‌গজ") কৃষ্ণদেব রায়ের সভায় ছিলেন।

বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে বিজয়নগরের স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণদেব রায়ের "হাজার মন্দির" হিন্দুস্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কণ্টি, ইরাণী পর্যটক আবদুর রজ্জাক এবং পর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ ও নুনিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে বিজয়নগরের জনসাধারণের ও রাজাদের অসাধারণ সমৃদ্ধির কথা জানা যায়।

কৃষি বিজয়নগরবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। বিজয়নগরে উন্নত সেচব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

বস্ত্রশিল্প, ধাতুশিল্প ও মৃৎশিল্প যথেষ্ট উন্নত ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পীদের পৃথক পৃথক সংঘ (Guild) ছিল। এ রাজ্যে ছোটবড় তিনশ' বন্দর ছিল। কালিকট ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। ব্রহ্মদেশ, চীন, পারস্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, আবিসিনিয়া, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের সংগে বিজয়নগরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এ রাজ্য থেকে লোহা, সোরা, চাল, চিনি মসলা ও কাপড় রপ্তানী হত এবং এ রাজ্যে হীরা, চুনী, প্রবাল, তামা, পারদ, রেশম, কর্পূর, কস্তুরী, চন্দন, মখমল, হাতী, ঘোড়া, বলদ প্রভৃতি আমদানী হত।

বাংলাদেশে সেন বংশের পতনের পর মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের মুসলমান শাসকেরা দিল্লীর সুলতানের অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীন হবার প্রয়াস বহুবার করেছেন। দিল্লী থেকে দূরত্ব সর্বদাই বিদ্রোহীদের সহায়ক হয়েছে। ইল্‌তুৎমিস ও বলবনের মত শক্তিশালী সুলতানদেরও বাংলার বিদ্রোহ দমনে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে। বাংলার শাসকেরা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অধীনতা স্বীকার করলেও দিল্লীর সুলতানি

ফৌজ চলে গেলেই আবার তাঁরা স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতে সুরু করেছেন।

অবশেষে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন (১৩৪৩)। তিনি ও তাঁর বংশধরেরা প্রথমে সত্তর বছরের বেশী (১৩৪৩-১৪১৪) বাংলা শাসন করেন। তাঁর ও তাঁর পুত্র সিকন্দরের শাসনকালে সুলতান ফিরুজ বাংলাদেশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে বিফল-মনোরথ হন। সিকন্দরের পুত্র গিয়াসুদ্দিন আজম্ (১৩৯৩-১৪১০) বোধ হয় ইলিয়াস শাহী বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। অমর ফার্সী কবি হাফিজের অনুরাগী বলে তিনি বিখ্যাত।

১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে ভাতুড়িয়া ও দিনাজপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা গণেশ প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। কারো কারো মতে ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গণেশ স্বাধীন রাজারূপে বাংলা দেশ শাসন করেছিলেন। তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও জালালুদ্দিন নামে পরিচিত হন।

রাজা গণেশের বংশধরেরা কিন্তু দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারেন নি। তাঁদের পতনের পর আবার ইলিয়াস শাহী বংশের হাতেই রাজক্ষমতা ফিরে আসে।

রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দিনের নামাংকিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। কিন্তু রাজা গণেশের নামাংকিত কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নি। কিছুকাল আগে ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দের দনুজমর্দন নামে এক রাজার মুদ্রা বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে পাওয়া গেছে। কেউ কেউ মনে করেন যে রাজা গণেশ ও দনুজমর্দন অভিন্ন ব্যক্তি।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন হাবসী খোজা তৎকালীন সুলতানকে হত্যা করে সিংহাসনে বসে এবং সেই থেকে হাবসীদের অত্যাচারে বাংলাদেশে বিশৃংখলা দেখা দেয়। তখন (১৪৯৬) আমাত্যরা আলাউদ্দিন হুসেন নামে এক যোগ্য ব্যক্তিকে বাংলার সিংহাসনে বসান। হুসেন শাহ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও সুবিবেচক ছিলেন। তিনি রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং উড়িষ্যার প্রান্ত

পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। তিনি এবং তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্য বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে নূতন বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন ও প্রচার করেন। হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ গোস্বামী একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর ভাই সনাতন গোস্বামীও সুপণ্ডিত ছিলেন। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু (এঁকে হুসেন শাহ "গুণরাজ খাঁ" উপাধি দেন) শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন। বিজয়গুপ্ত পদ্মাপুরাণ বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন। নসরৎ শাহের আদেশে মহাভারতের বাংলা পদ্যানুবাদ হয়।

এই বংশের শেষ রাজা গিয়াসুদ্দিন মামুদ শের খাঁ কর্তৃক বিতাড়িত হন। অবশেষে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাংলাদেশ অধিকার করেন।

সুলতানি আমলে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান পরম সম্প্রীতিতে বাস করত। বহু হিন্দু উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিল। ধর্মক্ষেত্রে সত্যপীরের পূজো (কথিত আছে, হুসেন শাহ এই পূজো প্রচলিত করে যান) হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক।

বাংলার শিল্পোন্নতির কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বাংলার শিল্পজাত দ্রব্য ও বাঙালীর অতিথিপরায়ণতা, উদার নম্র আচরণ, ধন-সম্পদ বিদেশীদের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

বাঙালী পুরুষেরা দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ ছিল। স্ত্রীলোকেরা রেশমের শাড়ী ও মূল্যবান অলংকার ব্যবহার করত। সেকালে বাংলাদেশে চামড়ার জুতোর ব্যবহার ছিল। সংগীতে ও নৃত্যে বাঙালী যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। সে যুগের বাংলাদের সংগে দেশবিদেশের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম তৎকালীন চীন সম্রাটকে বাংলার বিশিষ্ট শিল্পদ্রব্যাদি উপহার পাঠিয়েছিলেন। তিনি কবি হাফেজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

চীনদেশের সংগে মৈত্রী পরবর্তী সুলতানেরাও রক্ষা করে চলেছিলেন।

পাণ্ডুয়ার বিভিন্ন মসজিদ ও সমাধি-সৌধ সে যুগের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে।

প্রশ্ন

১। সুলতানি আমলের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[Discuss in brief the system of administration under the Delhi Sultanate.]

২। সুলতানি আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কি জান সংক্ষেপে লেখ।

[Write, in brief, what you know about the economic life of India under the Delhi Sultanate,]

৩। হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার সংঘর্ষের ফল কি হয়েছিল? যে সমস্ত ধর্মপ্রচারক সে সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের কথা সংক্ষেপে বল।

[What was the effect of the contact between Hindu and Muslim culture? Narrate, in brief, the life stories of the religious reformers of those times.]

৪। সুলতানি আমলে শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধে যা জান বল।

[Write what you know about the development of art and literature under the Sultanate of Delhi.]

৫। সুলতানি আমলের ভাঙনের যুগে বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে তার মধ্যে বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্য এবং বাংলা দেশের কথা সংক্ষেপে বল।

[Write, in brief, an account of the Vijaynagar and Bahmani kingdoms in the Deccan and of Bengal.]

৬। এঁরা কে ছিলেন বলঃ কবীর, শ্রীচৈতন্য, রামানন্দ, জৈন-উল-আবেদিন, নিকিতিন, পায়েজ, আব্দুর রজ্জাক।

[Write notes on :—Kabir, Sri Chaitanya, Ramananda, Jain-ul-Abedin, Nikitin, Paes, Abdur Razzaque]

———

॥ মুঘল যুগ

মুঘল সাম্রাজ্যঃ ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।

বাবরের পাণিপথে জয়লাভ ভারতে মুঘল রাজত্ব স্থাপনের প্রথম সোপান। আফগান সর্দারেরা ও মধ্য ভারতের রাজপুত জাতি তখনও অপরাজিত। খানুয়ার যুদ্ধে (১৫২৭) রাজপুত শক্তি বিনষ্ট হল। তখন বাবর আফগান গোষ্ঠীদের দমনে মনোযোগী হলেন।

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাবর পথপ্রদর্শকমাত্র। তিনি ভারতবর্ষে কোন সুগঠিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন নি—তাঁর সে-সময় ছিল না। তাঁর রাজ্য তাঁর মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যেই লোপ পেয়েছিল। আকবরের আবির্ভাব না হলে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে একজন আক্রমণকারী-মাত্র রূপেই উল্লিখিত হতেন।

মুঘলেরা ভারতে ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ণ ক্ষমতায় রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে শের শাহ ও তাঁর বংশধরেরা মাত্র পনের বছরের জন্যে একটা ছেদচিহ্ন রচনা করেছিলেন। এই পনের বছরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিন্তু যথেষ্ট। শের শাহ্ তাঁর শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন, ধর্মনির্বিশেষে সকল প্রজার হিতচেষ্টা ও রাজস্বব্যবস্থা দ্বারা আকবরের মহা-ভারত সৃষ্টির আদর্শ স্থাপন করে যান।

১৭০৭ থেকে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ মুঘলবংশের পতনের কাল এবং ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের কংকালমাত্র অবশিষ্ট ছিল।

বাবর থেকে আওরংজেব পর্যন্ত ছ' জন মুঘল সম্রাট যোগ্যতা ও গৌরবের সংগে রাজত্ব করে যান। এঁদের বলা হয় Great Moguls।

বাবর	...	১৫২৬ — ১৫৩০
হুমায়ুন	...	১৫৩০-১৫৩৯ — ১৫৫৫-১৫৫৬
আকবর	...	১৫৫৬ — ১৬০৫
জাহাংগীর	...	১৬০৫ — ১৬২৭
শাহজাহান	...	১৬২৭ — ১৬৫৮
আওরংজেব	...	১৬৫৮ — ১৭০৭

মুঘলেরা ভারতকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের সম্পদ মুঘলযুগে বিদেশে প্রেরিত হত না। মুঘল সম্রাটেরা বিশ্বজনীন ইসলামের স্বপ্ন দেখতেন না। তাঁরা তুর্কী সুলতান ও পারস্যের সুলতানকে হিন্দুস্থানের শত্রু মনে করতেন।

আওরংজেব ছাড়া বাবর-পরবর্তী প্রায় সকল মুঘল সম্রাটই ভারতকে হিন্দু-মুসলমানের দেশ বলেই ভেবেছেন। তাই তাঁদের আমলে ভারত মুসলমান রাষ্ট্র হলেও রাষ্ট্রব্যবস্থায় হিন্দুর প্রতিষ্ঠা ছিল।

মুঘল রাজত্বকালে সর্বভারতীয় ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। আসাম থেকে কাবুল পর্যন্ত ও রামেশ্বর থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত মুঘল সাম্রাজ্যে এক রাষ্ট্র, এক শাসন, এক বিধান, এক রাষ্ট্রভাষা, এক সংস্কৃতি ও এক মুদ্রা সে ঐক্য সূচনা করত।

সে যুগে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ও উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আরবেরা মিশর ও পারস্য জয় করেছিল। সে জয়ের ফলে মিশর আর পারস্যের মত দুই অতি-পুরাতন দেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুঘলেরা এদেশে এসে অমুসলমান সভ্যতার সংগে সমন্বয় সাধন করেছিল। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, ভাষা, আচার-আচরণ কিছুই লুপ্ত হয় নি। সাম্রাজ্যের বিশালতা, স্থলবাহিনীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর, নৌ-বলের অভাব, আওরংজেবের ধর্মান্ধ ও কুটিল রাজনীতি এবং তাঁর দাক্ষিণাত্যে সুদীর্ঘ স্থিতি, পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের অক্ষমতা ও আত্মকলহের ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীন প্রাদেশিক রাজ্যস্থাপন,

মারাঠা রাজপুত শিখ ও জাঠ প্রভৃতি জাতির জাগরণ, বিদেশী আক্রমণ (নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ দুররানী), ইংরেজদের আগমন ইত্যাদি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।

মুসলমান যুগে—কোন রাজবংশ মুঘলদের মত এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারেন নি।

আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব ঃ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে অমরকোট (সিন্ধুদেশের অন্তর্গত) রাজ্যে, হিন্দুর আশ্রয়ে, পারস্যদেশীয় মাতার গর্ভে মুঘল পিতার ঔরসে আকবরের জন্ম হয়।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা হয়। সে যুগে পৃথিবীর সব দেশে শক্তিশালী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-সাহিত্য-ধর্ম-বিজ্ঞান নতুন পথে পরিচালিত হয়।

এর কিছুকাল আগে ভারতে মুঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও, আকবরের রাজত্বকালেই ভারতবর্ষে সেই নব যুগের সূচনা হয়। সুলতানি আমলের বিশৃংখলা ও রক্তস্রোত শেষ হয়ে গেল। একটি শক্তিশালী রাজবংশ প্রায় দুই শতাব্দী দেশের শাসন পরিচালনা করল এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনাধীন সমন্বয়-প্রচেষ্টার প্রভাবে ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হল ও শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও স্থাপত্যে নূতন ধারা প্রবর্তিত হল।

আকবরের দেহ আর মনের গঠনে বিচিত্র প্রভাব ক্রিয়াশীল হয়েছিল। তিনি পিতৃরক্তে তুর্কী, মাতৃরক্তে পারসিক এবং জন্মে ভারতীয়। জীবনের প্রথম দিকের দুঃখ-দুর্দশা ও অনিশ্চয়তার অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে সুফলপ্রসূ হয়েছিল। পারস্যের কমনীয় প্রকৃতি এবং ফার্সী কবিতা তাঁর শিশু মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ফার্সী ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি আকবরের দরবারে আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয়েছিল। তাঁর দরবারে ফার্সী কবি, চিত্রকর ও সেনানায়কেরা সমাদৃত হয়েছিলেন। আকবরের মাধ্যমে পারস্য ও ভারতবর্ষের মধ্যে এক সমন্বয়ী সাংস্কৃতিক মিলন হয়েছিল।

ক্ষমা ও মৈত্রী আকবরের ব্যক্তিগত আচরণ ও রাজনীতির অংগ। তাঁর আত্মীয় ও বন্ধু প্রীতি সুবিদিত। উচ্ছৃংখলতা ও বিদ্রোহ সত্বেও ধাত্রীপুত্রের ও পুত্র সেলিমের প্রতি তাঁর ক্ষমা প্রদর্শন তাঁর ক্ষমা ও সহনশীলতার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর সভাকবি ফৈজীর রোগশয্যার পার্শ্বে তিনি দিনের পর দিন কাটান। বন্ধু বীরবলের মৃত্যুতে তিনি শিশুর মত অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। এই সমস্ত ঘটনা তাঁর সুগভীর বন্ধুপ্রীতির নিদর্শন।

আকবরের আগে কোন মুসলমান সম্রাট্ বিজিত হিন্দুদের সংগে বিজিত ও বিজেতার সম্পর্কের তিক্ততা দূর করার জন্মে নীতিগতভাবে কোন প্রয়াস করেন নি। তিনি পরাজিত শত্রুর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করতেন, তার মৈত্রী কামনা করতেন। কোন ক্ষেত্রে উদার নীতি অবলম্বন, কোন ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন এবং কোন ক্ষেত্রে উচ্চ পদে নিয়োগ করে তিনি পরাজিত শত্রুকে বিশ্বস্ত মিত্রে পরিণত করতেন।

আকবর হিন্দুদের ওপর থেকে বিভেদ ও অপমান-জনক জিজিয়া কর, তীর্থকর প্রভৃতি তুলে দেন ও তাদের মন্দির নির্মাণের অধিকার দান করেন। এই উদারনীতি অবলম্বনের ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত কণ্ঠে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বলে তাঁকে অভিনন্দিত করেছে।

আকবর জানতেন, হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজেই যথেষ্ট ত্রুটি আছে। তিনি দুই সমাজকেই উদার সংস্কারদ্বারা গ্লানিমুক্ত করে শান্তি ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে এক সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং নিজের ধৈর্য ও শক্তিবলে তিনি এক নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্য গঠনও করেছিলেন। তাঁর এই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন ঘটাবার চেষ্টার জন্মে মুসলমান মোল্লারা তাঁকে বিধর্মী বলে ঘোষণা করেছিল এবং বাংলাদেশে ও বিহারে বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আকবর তাঁর নীতি থেকে বিচলিত হন নি।

আকবরের চিন্তায় সমস্ত ধর্মমতের সমন্বয় হয়েছিল। তাঁর প্রবর্তিত মতবাদ দীন-ই-ইলাহী নামে পরিচিত। এ মতবাদ, অনুসরণকারীর সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে, কার্যকর হয় নি। এ ধর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল সৎবৃত্তির

উন্মেষ। এই মত প্রচারের সংগে যুক্ত ছিল আকবরের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন, সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণ ও সংস্কারের আকাজ্ক্ষা।

বিধর্মীর সংগে নীতিগতভাবে সহাবস্থান ও মৈত্রী আকবরের কালের সাম্রাজ্যবাদের এক নতুন রূপ। তাঁর প্রধানা মহিষী রাজপুতকন্যা যোধবাঈর ধর্মীয় আচারে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি। যোধবাঈর মহলে ব্রাহ্মণ পাচক, তুলসীমঞ্চ, গংগাজল ও হোমকুণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

আকবর রাজকার্যে নিরলস ছিলেন। রাজ্যের সমস্ত খবর তিনি রাখতেন ও সমস্ত হিসাব তিনি নিজে পরীক্ষা করতেন। নগর পরিকল্পনা, প্রাসাদ নির্মাণ, খাল খনন, উদ্যান রচনা এবং জুতার নাল থেকে তরবারি ও কামান, শাড়ী ও ওড়না থেকে গালিচা, সেতারের তার থেকে হাতীর অংকুশ পর্যন্ত সব কিছুই সম্রাটের তত্ত্বাবধানে পরিকল্পিত হত।

চিত্রাংকন ছিল আকবরের ব্যসন। কবিতা আবৃত্তি ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও আলোচনা তাঁকে আনন্দ দিত। তিনি নিজে সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। বাদ্যযন্ত্র পাখোয়াজ তাঁরই পরিকল্পনা অনুসারে রূপ পায় বলে শোনা যায়। বীণা-বাদনে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। ভারতের তৎকালীন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞগণ (বজ বাহাদুর, তানসেন, সুরদাস, বৈজু বাওরা, তুলসীদাস প্রভৃতি) আকবরের সমসাময়িক, কেউ বা বন্ধু, ছিলেন।

আকবর সকল শ্রেণীর জ্ঞানী-গুণীদের সমাদর করতেন। আবুল ফজল, ফৈজী, বিহারীমল, টোডরমল, বীরবল, আবদুর রহিম, তানসেন, হাকিম হুমায়ুন ও মোল্লা দোপিঁয়াজা—এই নবরত্নের সমাবেশ হয়েছিল তাঁর দরবারে। তাঁর চিকিৎসক ছিলেন চন্দ্রসেন, রাজচিত্রকর ছিলেন দশরথ ও বসাওন (বসন্ত), বাংগালী নৈয়ায়িক মধুসূদন সরস্বতী ছিলেন তাঁর রাজসভার অন্যতম পণ্ডিত।

দৈহিক শক্তি, মানসিক নির্ভীকতা, উদার প্রকৃতি, রাজনীতি-কুশলতা, ন্যায়পরায়ণতা, সমদর্শিতা প্রভৃতি গুণের সমন্বয়ে আকবর ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্।

মুঘল শাসনব্যবস্থা : বাবর বা হুমায়ুন কোন শাসনব্যবস্থা প্রচলিত করেন নি। আকবর এক সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। তাঁর প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থাই মুঘল শাসনব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থাই পরবর্তী সকল সম্রাটের শাসনকালেও প্রচলিত ছিল এবং আওরংজেবের পরবর্তী সম্রাট্‌গণের অযোগ্যতা সত্ত্বেও রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিল।

সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে মুঘলরা সৈন্য, দুর্গ, যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র, শিবির, চিকিৎসালয় ইত্যাদির যথোচিত ব্যবস্থা করেছিল। আকবরের সময়ে ভারতীয় চতুরংগ বাহিনীর পরিবর্তে পঞ্চাংগ সেনাবাহিনী ছিল—পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তিবাহিনী, গোলন্দাজ ও নৌবহর। গোলন্দাজ বিভাগে পর্তুগীজ সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল। হিন্দুও মুসলমান সৈন্যদলে যোগ দিতে পারত ও যোগ্যতানুসারে উচ্চপদ লাভ করত।

পূর্বে সৈন্যাধ্যক্ষ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা বেতনের পরিবর্তে জায়গীর ভোগ করতেন। এ ব্যবস্থায় রাজকোষে অর্থাগম কম হত এবং ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে জায়গীরদারেরা স্বাধীন হবার চেষ্টা করত।

আকবর জায়গীর প্রথা রহিত করে মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন করেন। দশ থেকে দশ হাজার পর্যন্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে এক একটি মনসব গঠিত হত। প্রতি দলের নায়কের উপাধি ছিল মনসবদার। মনসবদার ছিল তেত্রিশ শ্রেণীর। পদের তারতম্য অনুসারে রাজকোষ থেকে তাদের কম-বেশি বেতন দেওয়া হত। তাদের প্রধান কর্তব্য ছিল যুদ্ধের সময় রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর সংগে যোগদান করা।

পূর্ববর্তী সুলতানদের মত মুঘল সম্রাটরাও ছিলেন স্বেচ্ছাচারী। সম্রাট্‌ই ছিলেন একাধারে প্রধান শাসক, বিচারক, সেনাপতি ও ধর্ম-সমস্যার মীমাংসাকারক। একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ছিল—মন্ত্রীরা বিভিন্ন বিভাগের অধিনায়করূপে সম্রাট্‌কে পরামর্শ দিয়ে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন। রাজস্ব-বিভাগের অধ্যক্ষকে 'দিওয়ান', সৈন্যবিভাগের অধ্যক্ষকে 'মীরবক্সী'. সরকারী কারখানাসমূহের

অধক্ষ্যকে 'মীরসামান', আর ধর্ম বিচার ও দাতব্য বিভাগের অধ্যক্ষকে বলা হত 'সদর'। অনেক সময় 'উকিল' উপাধিধারী আর একজন মন্ত্রীও থাকতেন।

শাসনকার্যের সুবিধের জন্য মুঘল সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন 'সুবা' বা প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক সুবার প্রধান শাসনকর্তাকে প্রথমে 'সিপাহ্-শালার' বা 'নাজিম' এবং পরে 'সুবাদার' বলা হত। সুবাদার-নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে সম্রাটের ইচ্ছানুযায়ী হলেও, সুবার অভ্যন্তরে সুবাদারের ক্ষমতা ছিল অসীম। শাসন ও সামরিক বিভাগের তিনি ছিলেন প্রধান। প্রত্যেক সুবার 'দিওয়ান' রাজস্ব-বিভাগের কার্য পরিচালনা করতেন। প্রত্যেক সুবা কতকগুলো 'সরকার' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। জেলার শাসনকর্তার উপাধি ছিল ফৌজদার। নগরের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করতেন 'কোতোয়াল'। 'মীর আদল' ও 'কাজী' দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করতেন। অন্যান্য প্রাদেশিক কর্মচারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 'সদর' (ধর্ম ও দান বিভাগের কর্তা), 'আমীন' (রাজস্ব আদায়কারী), 'বিতিকৃচি' (রাজস্ব-হিসাব রক্ষক), 'ওয়াকিয়ানবীশ' (সংবাদ-লেখক), 'কুফিয়ানবীশ' (গোয়েন্দা)।

রাজকর নির্ধারণের সুবিধের জন্যে মুঘল যুগে সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরীপ করান হয়েছিল। উর্বরতা ও কৃষির সম্ভাবনা অনুসারে জমি চারভাগে (পোলজ, বানজর, চাচর ও পরতি) ভাগ করে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ বা নগদ দাম রাজকররূপে নির্ধারিত ছিল।

মুঘল আমলে মীর আদল ও কাজী ছিলেন বিচারক ও 'মুফতি' ছিলেন আইনের ব্যাখ্যাকার। কোতোয়াল নগরের শান্তিরক্ষা করতেন ও সাধারণ অভিযোগসমূহের বিচার করতেন। গ্রাম অঞ্চলে হিন্দু যুগেও পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। মুসলিম দণ্ডবিধি প্রচলিত থাকলেও হিন্দুদের বিবাহ, সম্পত্তি বণ্টন, জাতিভেদ ইত্যাদি ব্যাপারে হিন্দুনীতিশাস্ত্রই অনুসরণ করা হত।

সৈন্যদের জন্য 'কাজী-উল-আসকারী' ('আসকারী' অর্থ সৈন্য) উপাধিকারী বিচারক নিয়োগ করা হত।

মুঘল যুগে সম্রাট্‌রাও প্রজাদের রাজদর্শন দিতেন, তাদের অভিযোগ শুনতেন ও বিচার করতেন। আকবরের রাজত্বকালে তাঁর অনুমোদন ছাড়া কারো প্রাণদণ্ড বা অংগচ্ছেদ করা হত না।

মুঘল যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি

সমাজ ঃ মুঘল যুগে হিন্দু মুসলমান দুই সমাজই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বাদশাহ ও তাঁর পরিবার ছিলেন সকল শ্রেণীর উর্ধ্বে।

প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন বাদশাহের আত্মীয়-পরিজন ও আমীর-ওমরাহরা। তাঁরা সকলেই মনসব বা উচ্চ রাজপদের অধিকারী ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন মহাজন, বণিক, লেখক, শিক্ষক, চিকিৎসক, গ্রন্থকার প্রভৃতি জ্ঞানী গুণী বা ধনী ব্যক্তি। ব্যক্তিগত যোগ্যতাই এই শ্রেণীর উন্নতির সোপান ছিল। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল চাষী, শ্রমিক ও শিল্পিগোষ্ঠী। এছাড়া দাস শ্রেণী পৃথক ছিল।

অধিকাংশ মুঘল আমীরই বিলাসব্যসনে মত্ত থাকতেন। তাঁরা উচ্ছৃংখল ও অমিতব্যয়ী জীবন যাপন করতেন। হিন্দু অভিজাতবর্গও আমীরদের মতই বিলাসী হয়ে উঠেছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা রাজানুগ্রহের ওপর নির্ভর করতেন না, নিজেদের বুদ্ধি ও শক্তি দিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন। এই কারণে তাঁরা সাধারণতঃ মিতব্যয়ী ও মিতাচারী হতেন; তৃতীয় শ্রেণীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা মাটির দেওয়াল-ঘেরা, তাল খেজুর বা বাঁশ পাতার ছাউনি-দেওয়া ঘরে বাস করত। তাদের কোমরে এক টুকরো কাপড় ছাড়া আর কোন পোশাক ছিল না।

হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ও কুলীনদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ আকবর সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা করেছিলেন। মারাঠা ও জাঠদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। সমাজে নারীদের বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না।

উচ্চ সমাজে জন্মদিন, বিবাহ, সিংহাসনে আরোহণের দিন, ঈদ, মহরম, হোলী প্রভৃতি উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত। উৎসবে আমীর-ওমরাহরা বাদশাহকে উপহার দিতেন এবং বাদশাহও পদমর্যাদা অনুসারে আমীরদের উপহার দিতেন।

বাদশাহ ও আমীরদের হিন্দু নারী বিবাহ করার ফলে বিবাহ, বসন-ভূষণ প্রভৃতি ব্যাপারে মুসলমান সমাজে নানাপ্রকার হিন্দুপ্রথা চলিত হয়েছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ মুঘল বাদশাহ, বেগম ও আমীরদের বিলাস-ব্যসনে জীবন যাপনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা দেশে উৎপন্ন হত, কিছু বা বিদেশ থেকেও আসত। জিনিস উৎপাদনের জন্যে সরকারী কারখানা ছিল। আকবরের সময়ে সেই সমস্ত কারখানায় প্রায় দু'হাজার কারিগর কাজ করত।

মুঘল আমলে কোন কুটীরশিল্প নষ্ট হয় নি। সেকালের শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে বাংলার মসলিন ও রেশম, আগ্রার রঙীন কাপড়, কাশ্মীরের শাল, লাহোরের কম্বল, বিদরের মীনার কাজ, বাংলার হাতীর দাঁতের সূক্ষ্ম কাজ, উড়িষ্যার রূপালি জরি ও বারাণসীর সোনালি জরির কাজ বিখ্যাত ছিল।

জলপথে ও স্থলপথে ভারতের বহির্বাণিজ্য চলত। রাজধানী ও প্রধান নগরগুলি রাজপথ দিয়ে সংযুক্ত ছিল। বন্দর শুল্ক, বাণিজ্য শুল্ক ও সীমান্ত শুল্ক সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন কর্মচারী নিযুক্ত ছিল।

পর্তুগীজ, ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির সংগে ভারতের বাণিজ্য চলত। ভারতের কাপড়, সুগন্ধি মসলা, রঙ, আফিং, লোহা, চিনি, গন্ধক, লবণ ইত্যাদি ঐ সমস্ত দেশে রপ্তানী হত।

মুঘল সম্রাট্, আমীর, এমন কি, মুঘল হারেমের মহিলারাও ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। সম্রাটের কর্মচারীরা দ্রব্যমূল্য ঠিক করে দিতেন। স্বর্ণকারেরা মহাজনী ব্যবসা করত।

জিনিসপত্রের দাম খুব কম ছিল। নগদ দামের চেয়ে বিনিময়প্রথা বেশি প্রচলিত ছিল। মজুরের মজুরী নিতান্ত কম ছিল।

স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সংগীতঃ সম্রাট্ আওরংজেবের পূর্ববর্তী মুঘল সম্রাট্রা সৌন্দর্যানুরাগী ও শিল্পরসিক ছিলেন। তাঁদের সময়ে মুসলিম ও হিন্দু স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে এক নূতন স্থাপত্যরীতির প্রচলন হয়। এই নূতন স্থাপত্যরীতিতে হিন্দু শিল্পরীতির সংগে পারসিক শিল্পরীতির মিশ্রণ ঘটেছিল।

আকবরের রাজত্বকালে স্থাপত্যশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। হিন্দু ও জৈন মন্দিরের অংকনরীতি আগ্রা দুর্গে অবস্থিত জাহাংগীর মহলে, ফতেপুর সিক্রীর বহু প্রাসাদে এবং লাহোর দুর্গে দেখা যায়।

সাসারামে শের শাহের সমাধিতে ও দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধিতেও হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়।

সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিমন্দিরের গঠনরীতি ভারতের বৌদ্ধবিহার ও কোচিন-চীন দেশের খ্মের স্থাপত্য শিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

আগ্রায় নূরজাহান কর্তৃক নির্মিত তাঁর পিতৃসমাধি-সৌধ ইতিমাদ্-উদ্-দৌলা মুঘল স্থাপত্যশিল্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্যশিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তাঁর প্রিয় মহিষী মমতাজ মহলের স্মৃতিসৌধ তাজমহল সারা পৃথিবীর বিস্ময়। তাজমহল ছাড়া, দিল্লী ও আগ্রার দুর্গের দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, শীষ্ মহল, অংগুরী বাগ প্রভৃতি শিল্প-সৌন্দর্যে অপরূপ। তাঁর নির্মিত জাম-ই-মসজিদ, মোতি মসজিদ ও অন্যান্য বহু সুদৃশ্য সৌধও তাঁর স্থাপত্য-শিল্পপ্রীতির সাক্ষ্য বহন করে।

মুঘল যুগে স্থাপত্যশিল্পের মত চিত্রশিল্পেও ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ভারতীয় ও পারসিক চিত্রাংকন-রীতির সংমিশ্রণের ফলে মুঘল চিত্রের উদ্ভব হয়।

বাবর ও হুমায়ুন চিত্রবিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকবর চিত্রকলার উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদ-প্রাচীর হিন্দু ও পারসিক চিত্রশিল্পীদের দ্বারা সুশোভিত হয়েছিল। জাহাংগীর

নিজে চিত্রাংকনে পারদর্শী ছিলেন ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রকলার সমধিক উন্নতি হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজপুতানায়, বিশেষতঃ জয়পুরে, এক নূতন শিল্প-রীতির উদ্ভব হয়। রাজপুত চিত্রপদ্ধতি উজ্জল বর্ণপ্রয়োগ ও অলংকরণের জন্যে বিখ্যাত। কাংড়া (কাশ্মীর) অঞ্চলের কৃষ্ণলীলা চিত্র ও বাংলার পটচিত্র পরবর্তী কালে বিশেষ উন্নতিলাভ করেছিল।

আকবর, জাহাংগীর ও শাহজাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় মুঘল যুগে সংগীত-বিদ্যার প্রভূত উন্নতি ও প্রসার হয়। সে যুগের সংগীতজ্ঞদের মধ্যে তানসেন ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

সাহিত্য ঃ মুঘল যুগে বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয় এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। বাবর ও জাহাংগীরের আত্মজীবনী (তুজুক), হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরানের কবিতা-সংগ্রহ (দিওয়ান), দারা শিকোহর উপনিষদের অনুবাদ (সর-ই-আসরার) মুঘল রাজবংশের অমর কীর্তি। হুমায়ুনের ভগ্নি গুলবদন হুমায়ুননামা রচনা করেন। জাহাংগীরের মহিষী নূরজাহান, শাহজাহানের কন্যা জাহানারা, আওরংজেবের কন্যা জেব্উন্নিসা ফার্সী কবিতা রচনা করেছেন। মুঘলযুগে অথর্ব বেদ, মহাভারত, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, নল-দময়ন্তী উপাখ্যান ও বহু চিকিৎসা গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়। এ যুগে আবুল ফজল (আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামা রচয়িতা), নিজামউদ্দিন বক্সী, বদাউনী, আবদুল হামিদ লাহোরী ও কাসিম ফেরিস্তা ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করে বিখ্যাত হন। সুজনরায় ক্ষেত্রী, ঈশ্বরদাস নগর, ভীমসেন প্রভৃতি হিন্দু ঐতিহাসিকগণ বিখ্যাত ছিলেন। আওরংজেবের রাজত্বকালে ইতিহাস রচনা নিষিদ্ধ হলেও কাফি খান ছদ্ম নামে ইতিহাস রচনা করেন।

মুঘল আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এক নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। বাংলা মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাস, চণ্ডীমংগলের কবি মুকুন্দরাম, অন্নদামংগলের কবি ভারতচন্দ্র এ যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি। গোবিন্দদাসের কড়চা,

জ্ঞানদাসের পদাবলী, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, জয়ানন্দের চৈতন্যমংগল এ যুগের রচনা। বাংলার মংগল-কাব্য ও পাঁচালী মুঘলযুগে বাঙালীদের বিশিষ্ট সাহিত্য-কীর্তি। বিপ্রদাসের মনসামংগল, ক্ষেমানন্দের বেহুলা-লখীন্দরের পাঁচালী ও দ্বিজ জনার্দনের মংগলচণ্ডীর পাঁচালী মুঘলযুগেরই রচনা।

মুঘলযুগের রচনা বাংলা বাউল গানে হিন্দু-মুসলিম বাঙালী মনের অপূর্ব আধ্যাত্মিক সমন্বয় সুষমামণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

তুলসীদাস, মীরাবাঈ, সুরদাস, নরহরি, ভূষণ প্রভৃতি লেখকের রচনায় মুঘলযুগে হিন্দী ভাষা ও কাব্য অপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করে। সুরদাসের 'সুরসাগর' ও তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' এখনও অগণিত ভারতবাসী আনন্দ ও শ্রদ্ধার সংগে পাঠ ও গান করে থাকে। মীরাবাঈয়ের ভজন আজও সারা ভারতে গীত হয়।

আকবর, জাহাংগীর, শাহজাহান ও দারাশিকোহ্-র পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক আরবী-ফার্সী গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনূদিত হয়। মানসিংহ, বীরবল, টোডরমল, জয়সিংহ প্রভৃতিও হিন্দীভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। অনেক মুসলমান পণ্ডিতও হিন্দীভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আকবরের মন্ত্রী আবদুর রহিম (খান খানান) বিখ্যাত দোহা-রচয়িতা ছিলেন।

শিবাজীর গুরু রামদাস 'দাসবোধ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করে মারাঠা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং ধর্মবিষয়ক রচনাকে কেন্দ্র করে মুঘলযুগে মারাঠা ভাষা ও সাহিত্য উন্নতি লাভ করে।

মুঘলযুগের বৈদেশিক পর্যটকগণ

মুঘলযুগের বৈদেশিক পর্যটকদের মধ্যে ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ্, হকিন্স ও স্যার টমাস রো; ওলন্দাজ পেলসায়ার্ত; ফরাসী ট্যাভারনিয়ে ও বার্নিয়ে এবং ইতালীর মানুচ্চি বিখ্যাত।

র‍্যালফ ফিচ্ ঃ আকবরের রাজত্বের শেষভাগে ফিচ্ ভারতে আসেন। সে সময় আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রী এই দুটি শহরই তৎকালীন লণ্ডনের চেয়ে বড় ছিল। বাংলার বাখরগঞ্জে অবস্থিত বাক্লা একটি সুন্দর শহর ছিল।

[এই সময় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্যে একোয়াভিবা, জেভিয়ার ও মনসারেট ভারতবর্ষে আসেন। একোয়াভিবা ও মনসারেটের বিবরণে সে যুগের ধর্ম সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। জেভিয়ার রাজনীতিও আলোচনা করেছেন।

জাহাংগীরের রাজত্বকালে হকিন্স ও স্যার টমাস রো ভারতে আসেন।]

পেলসায়ার্ত ঃ ইনি জাহাংগীরের সময়ে আগ্রার ওলন্দাজ কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। এঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে শাসকদের অত্যাচারে প্রজাসাধারণের জীবন তখন দুর্বহ ছিল। রাজস্ব-আদায় ও অন্যান্য অজুহাতে প্রজাদের ওপর উৎপীড়ন হত। অভিজাতবর্গ বিলাসব্যসনে মত্ত থাকতেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা (শ্রমিক, ভৃত্য ইত্যাদি) কার্যতঃ দাস-জীবন যাপন করত। উড়িষ্যা থেকে পূর্ববংগ পর্যন্ত সর্বত্র কার্পাস শিল্প প্রচলিত ছিল। রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য উৎপাদনে বাংলা অগ্রণী ছিল।

ট্যাভারনিয়ে ঃ ইনি শাহজাহানের সময়ে ভারতে আসেন। তিনি সে যুগের রাজকীয় ঐশ্বর্যের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এঁর বিবরণেও বাংলার রেশমশিল্পের অগ্রগতির উল্লেখ আছে।

বার্নিয়ে ঃ ইনি শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দিকে ও আওরংজেবের রাজত্বের কিছুকাল ভারতে ছিলেন।

রাজকীয় ঐশ্বর্য, প্রাদেশিক শাসকদের অত্যাচার, কৃষকদের দুর্দশা ইত্যাদির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের কার্পাস ও রেশম-শিল্পের উন্নতি, শস্য ও খাদ্যের প্রাচুর্য, পল্লীর শ্রী ইত্যাদির তিনি অতি উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

মানুচিঃ ইনি আওরংজেবের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। এঁর মতে দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী। এঁর বিবরণে রাজকর্মচারীদের অত্যাচার, কৃষকদের দুরবস্থা ও মুঘল রাজ-অন্তঃপুরের অনেক গ্লানিকর কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

প্রশ্ন

১ মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা এবং সেই প্রসংগে প্রধান প্রধান মুঘল সম্রাটদের জীবনেতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[Give in brief, an account of the establishment of the Mughal empire and describe in this connection the life stories of the Great Mughal.]

২। মুঘল সম্রাট্দের মধ্যে আকবর ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ—তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[Akbor was the greatest of the Mughal Emperors— Discuss in brief, the reasons of his greatness.]

৩। মুঘল যুগের শিল্পকলা ও স্থাপত্যের কথা সংক্ষেপে লেখ।

[Write what yon know about art and architecture in the Mughal age.]

৪। মুঘল শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে কি জান?

[Write what you know about Mughal administration.]

৫। মুঘলযুগে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[Describe in brief the social and economic condition of India in the Mughal age.]

৬। মুঘলযুগের ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[Write what you know about Indian literature in the Mughal age.]

৭। মুঘলযুগে যে সমস্ত বিদেশী পর্যটক ভারতে আসেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রধান তাঁদের নাম বল। তাঁদের বিবরণ থেকে তৎকালীন ভারত সম্বন্ধে কি জানা যায়?

[Name the more famous of the foreign travellers who visited India during the Mughal period. What light do their account throw on the India of those days.]

॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ ॥

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন : মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আওরংজেবের অনুদার সংকীর্ণ শাসননীতি শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করে তুলেছিল এবং তাঁর পরবর্তী কালে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে। ফলে, ভারতের বিভিন্ন অংশে বহু স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠতে লাগল।

এই সময় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে তিনটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : শিবাজী-প্রতিষ্ঠিত মারাঠা রাজ্য, পঞ্জাবের শিখরাজ্য ও মহীশূর রাজ্য।

কিন্তু এই সমস্ত রাজ্যের কোনটিই স্থায়ী হয় নি। অল্পকালের জন্যে যার যার নিজস্ব একটা পরিধির মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে শেষ পর্যন্ত এই রাজ্যগুলো স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। তখন বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি—পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ—বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতে উপস্থিত হয়। দেশে উল্লেখযোগ্য কোন কেন্দ্রীয় শাসন বা শক্তির অনুপস্থিতি, পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের জায়গায় নতুন কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় দেশীয় রাজাদের অসামর্থ্য এবং তাদের ঘরোয়া কলহ-বিরোধের ফলে বিদেশী শক্তিগুলো ভারতে রাজ্যস্থাপনের প্রয়াসী হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সমস্ত দেশীয় শক্তিকে এবং অন্যান্য বিদেশী শক্তিকে পরাজিত করে ইংরেজরাই ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল।

মারাঠা রাজ্য : শিবাজীই মারাঠা শক্তি ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। শিবাজীর বীরত্ব আর দেশপ্রেমের কথা ভারতের সর্বত্র বিদিত। আওরংজেবের সংগে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে তিনি স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে যান। শিবাজীর মৃত্যুর পর আওরংজেব তাঁর পুত্র শম্ভুজীকে হত্যা করেন এবং পৌত্র শাহুকে বন্দী করেন। কিন্তু এতেও মারাঠাশক্তি

লোপ পেল না, বাধা পেল মাত্র। আওরংজেবের মৃত্যুর পর মারাঠারা আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। তখন মারাঠা রাজ্যের প্রকৃত শাসক হলেন পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী। মারাঠাশক্তির পুনরুত্থানের মূলে ছিলেন পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ। বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাজীরাও পেশোয়া হয়ে মারাঠা শক্তিকে অধিকতর সুসংহত ও শক্তিশালী করে তোলেন। সারা ভারত জুড়ে এক অখণ্ড হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কল্পনা তাঁর ছিল এবং সে কল্পনা সমগ্র মারাঠা জাতিকে নতুন প্রেরণা দিল। বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর পেশোয়া হলেন তাঁর পুত্র বালাজী বাজীরাও। তাঁর অধীনে মারাঠা শক্তি চরম বিকাশ লাভ করে। এই সময় পূর্ব ভারতের উড়িষ্যা ও উত্তর ভারতের পঞ্জাব পর্যন্ত মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। কিন্তু ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণ রোধ করতে গিয়ে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তির শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়ে যায়।

পঞ্জাবের শিখরাজ্য: জাহাংগীর শিখগুরু অর্জুনকে হত্যা করেন। তখন থেকেই শিখরা মুঘলদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। আওরং-জেবের সময়ে সে বিদ্বেষ বিদ্রোহের রূপ নেয়। নবম শিখগুরু তেগবাহাদুর আওরংজেবের আদেশে নিহত হন। তেগবাহাদুর খালসা বাহিনীর সংগঠক ছিলেন। তেগবাহাদুরের পুত্র গুরু গোবিন্দ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও তাঁর পুত্র বান্দা শিখশক্তির বৃদ্ধি সাধন করেন। কিন্তু তিনিও দিল্লীতে নৃশংসভাবে নিহত হন। তখন শিখজাতি নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে।

নাদির শাহের আক্রমণে পঞ্জাবে অব্যবস্থা দেখা দিলে শিখরা আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং আহম্মদ শাহ আবদালীর ভারত ত্যাগের পর শিখরা এক স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ বিভিন্ন শিখ মিস্‌ল বা স্বাধীন দলপতিদের ঐক্যবদ্ধ করে শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরস্থ সমস্ত পঞ্জাব অঞ্চল অধিকার করেন। ইংরেজদের সংগে মিত্রতা স্থাপন করে তিনি তাঁর মৃত্যু (১৮৩৯) পর্যন্ত নির্বিঘ্নে

রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে শিখরা ক্রমশঃ হীনবল হয়ে পড়ে। এই সময় শিখদের সংগে ইংরেজদের বিরোধ হয়। প্রথম শিখযুদ্ধে শিখরাজ্য ইংরেজদের প্রভাবাধীন হয় এবং দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে পঞ্জাব ইংরেজ-অধিকারভুক্ত হয় (প্রথম শিখযুদ্ধ ১৮৪৫-৪৬ : দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ ১৮৪৮-৪৯)।

মহীশূর রাজ্য : মহীশূরের হিন্দুরাজ্য হায়দর আলি ছলে-বলে-কৌশলে হস্তগত করেন ও মহীশূরের সীমা বিস্তার করে নিজেকে এক শক্তিশালী সুলতানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। হায়দর আলির ক্ষমতাবৃদ্ধিতে মারাঠা, হায়দরাবাদের নিজাম ও ইংরেজ তিন পক্ষকেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এই তিন পক্ষ কখনও পৃথকভাবে, কখনও মিলিতভাবে মহীশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। হায়দর দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদের জন্যে আমরণ সংগ্রাম করেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র টিপুও পিতার পথ অনুসরণ করেন এবং চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধে (১৭৯৯) প্রাণ হারান। টিপুর মৃত্যুর পর মহীশূর রাজ্যের পতন হয় এবং ঐ রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ইংরেজ, নিজাম ও মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের মধ্যে বণ্টিত হয়।

এইভাবে মারাঠা, শিখ ও মহীশূর রাজ্যের পতনের পর ব্রিটিশ শক্তিকে প্রতিরোধ করার মত আর কোন শক্তি ভারতে রইল না এবং কালক্রমে ব্রিটিশ শক্তি ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল।

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা : ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে পোর্তুগীজেরা ভারতে প্রথম আসে (১৪৯৮)। পোর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোর তত্ত্বাবধানের জন্যে ভারতে একজন করে গভর্ণর থাকত। আলবুকার্ক-এর নিয়োগের সময় (১৫০৯) থেকে পোর্তুগীজদের শক্তিবৃদ্ধি সুরু হয়। কালক্রমে তারা গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট, বেসিন, বোম্বাই, সান্টোম এবং বাংলাদেশের হুগলী অধিকার করে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকে পোর্তুগীজদের পতন সুরু হয় এবং কালক্রমে গোয়া, দমন ও দিউ ছাড়া অন্যান্য জায়গা তাদের হস্তচ্যুত হয়। গোয়া, দমন ও দিউ আজও পোর্তুগীজ-অধিকারে রয়েছে।

পোর্তুগীজদের পরে আসে ওলন্দাজরা। ওলন্দাজ বণিকরা করমণ্ডল, গুজরাট, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিল। কালক্রমে তারা সিংহল ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপনে সমধিক ব্যস্ত হয়ে উঠল এবং ভারতবর্ষে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে তখন রইল শুধু ফরাসী ও ইংরজেরা।

১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে ও ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মসুলিপটমে কুঠি স্থাপন করে ফরাসী বণিকরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য আরম্ভ করে। পরে ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তারা পণ্ডিচেরী নগরের পত্তন করে। সেই সময়ই বাংলার নবাব তাদের চন্দননগর দিয়ে দেন। পরে মাহে ও কারিকল ফরাসীদের অধিকারভুক্ত হয়।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ডুপ্লে পণ্ডিচেরীর গভর্ণর হয়ে আসেন। ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের সংকল্প তাঁর ছিল। এরই ফলে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের ইংল্যাণ্ড আর ফরাসী দেশের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হয় এবং তখনই ভারতের বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হয়। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধের অবসান হয়। কিন্তু ফরাসী শক্তি এত হীনবল হয়ে পড়ে যে তার পুনরুত্থানের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

দাক্ষিণাত্যে ইংগ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রিটিশ শক্তির জয়লাভ ভারতে ব্রিটিশের রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান।

বাংলাদেশেও ফরাসীদের বিপক্ষে নিজেদের সুরক্ষিত করার জন্যে ইংরেজরা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে পরিখা খনন সুরু করে। ব্যবসার উপলক্ষে বাংলায় অবস্থানকারী ইংরেজদের এই যুদ্ধ-প্রস্তুতি অন্যায় ছিল এবং তৎকালীন বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্বভাবতই তা ভাল চোখে দেখতে পারেন নি। তিনি কলকাতা দখল করলেন। শীঘ্রই ইংরেজরা তা আবার দখল করল, নবাব তাদের পরাস্ত করতে পারলেন না। তিনি তাদের নানা বাণিজ্যিক সুবিধে দিতে রাজী হলেন।

এদিকে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ চন্দননগর দখল করে নবাবের অসন্তুষ্ট ও ক্ষমতালোভী অমাত্যদের সংগে নবাবের বিরুদ্ধে এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে পরাস্ত করে তিনি বাংলায় ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপন করলেন। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ ভারতে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের দ্বিতীয় সোপান।

ইংরেজরা সিরাজউদ্দৌলার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফরকে বাংলার নবাবের গদীতে বসিয়ে প্রচুর অর্থ আদায় করল। মীরজাফরের পরবর্তী নবাব মীরকাশিম বাংলায় স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাস্ত হন (বক্সারের যুদ্ধ ১৭৬৪)। পরের বছর (১৭৬৫) ক্লাইভ দিল্লীর সম্রাট্ শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার 'দেওয়ানী' আদায় করেন। দেওয়ানের কাজ ছিল রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী মামলার বিচারের ব্যবস্থা করা। রাজস্বব্যবস্থা ইংরেজদের হাতে যাওয়াতে বাংলার নবাবের বাস্তবিক কোন ক্ষমতাই রইল না। নবাব ইংরেজের হাতের বৃত্তিভোগী ক্রীড়নক মাত্র হয়ে রইলেন। 'নিজামত' বা শাসনবিভাগের ও ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা নবাবের হাতে রইল বটে, তার জন্যে দুজন নায়েব-নাজিমও নিযুক্ত হলেন; কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীর সম্মতি ছাড়া কেউই এ পদ পেত না। তাই, প্রকৃত পক্ষে শাসনের সমস্ত ক্ষমতাই ইংরেজদের হস্তগত হল, অথচ আইনতঃ শাসন সম্পর্কে কোন দায়িত্বই তাদের রইল না।

ক্রমে কলকাতা ইংরেজদের রাজধানী ও প্রধান কর্মস্থল হয়ে উঠল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় যখন এক বিশেষ স্তরে এসে পৌঁছেছে সেই সময়ে (অষ্টাদশ শতাব্দীতে) আর এক সংস্কৃতির ধারা ভারতে এসে পৌছল। এই তৃতীয় সংস্কৃতি হল ইউরোপীয় সংস্কৃতি। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সংস্পর্শের আদিযুগে যেমন এক সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল এবারও প্রথমে সংঘর্ষই হল, ক্রমে তিন সংস্কৃতিই এক সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ে পৌছল। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজকে

কেন্দ্র করে বৈদেশিক প্রভাব ও অধিকার বিস্তৃতি লাভ করেছিল বলে এই সমস্ত নগর অঞ্চলেই প্রথম ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব অনুভূত হয়। ইউরোপীয় সংস্কৃতি গ্রহণের ব্যাপারে, সমাজ-হিসেবে মুসলমান সমাজের চেয়ে হিন্দু সমাজই অগ্রণী হয়েছিল। মুসলমান-সমাজ রক্ষণশীল মনোভাব দেখিয়েছিল। অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশেই প্রথম এই নতুন প্রভাব বিস্তার লাভ করে। কলকাতায় ইংরেজদের কর্মকেন্দ্রের অবস্থিতিই বোধ হয় এর কারণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেশব্যাপী একটা অব্যবস্থা চলছিল এবং জনসাধারণের চরম দুঃখদুর্দশা দেখা দিয়েছিল। মুঘল, মারাঠা, ব্রিটিশ বা অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি যার যেখানে কর্তৃত্ব বা সুযোগ ছিল সেখানেই তারা জনসাধারণকে উৎপীড়ন করেছে।

ভারতে যখন ইংরেজ কোম্পানী আর নবাবের দ্বৈত শাসন চলছিল তখন দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক শোষণ ও উৎপীড়নের সীমা ছিল না। সে সময় বাংলা দেশে (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬ সনে হয়েছিল বলে) নামে কুখ্যাত। এই মন্বন্তরের সময় খাদ্যাভাবে ও নানা রোগে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষপীড়িত, অনশনক্লিষ্ট কৃষকদের কোন সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাদের কাছ থেকে নির্মম ঔদাসীন্যের সংগে রাজস্ব আদায় করা হয়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের মতে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের চেয়ে বেশী রাজস্ব আদায় হয়েছিল।

সাধারণতঃ গ্রামীণ সমাজে কিন্তু তখনও স্বয়ংসম্পূর্ণতার ভাব ছিল। গ্রাম্য জীবনে তখনও পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অনুপ্রবেশ করে নি। সমাজ তখন নানা সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ও বিভেদে পরিপূর্ণ ছিল। কৌলীন্য-প্রথাজনিত নানা কু-রীতি, পর্দাপ্রথা, সতীদাহ, বিধবার প্রতি অবিচার তখন হিন্দুসমাজে বহু-প্রচলিত ছিল।

ইংরেজ আমলের স্বরু থেকে যেমন এক নূতন মসীজীবী ভদ্রলোক শ্রেণীর উদ্ভব হয়, নতুন রাজস্বনীতির ফলে তেমনি সামন্তশ্রেণী লোপ পেয়ে এক নতুন জমিদার শ্রেণী দেখা দেয়। এই সময়ই আবার ব্রিটেনের কলে উৎপন্ন নানা মাল ভারতে আমদানী হতে লাগল এবং সেই স্বত্রে এক নতুন বণিকশ্রেণীরও উদ্ভব হল। সম্প্রতি জমিদার শ্রেণী উঠে গেছে বটে, তবে অন্য দুই শ্রেণী ভারতীয় সমাজে এখনো প্রভাবশালী শ্রেণী হিসেবে বিদ্যমান।

বিলেতী সস্তা মালের আমদানীর ফলে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার ও গ্রামীণ শিল্পীদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠতে লাগল। প্রতিযোগিতায় না টিকতে পেরে এবং অত্যাচার-উৎপীড়নের ফলে বাংলা ও গুজরাটের বস্ত্রশিল্প ও শিল্পীরা এক শোচনীয় অবস্থায় এসে পৌঁছল।

গ্রামীণ শিল্পের অবনতির ফলে জনসাধারণ অত্যধিক পরিমাণে কৃষিনির্ভর হয়ে উঠল—দেশে দারিদ্র বাড়ল।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) প্রবর্তনের ফলে এক স্থায়ী জমিদার শ্রেণীর হাতে জমির মালিকানা চলে যায় এবং এ ব্যবস্থায় কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়ায় কোন কোন জায়গায় কৃষকদের ওপর অত্যাচার বাড়ে।

অষ্টাদশ শতব্দীতে বিদেশী শাসনের সংগে শোষণ যুক্ত হয়ে ভারতবাসীর জীবনে পরাধীনতার দুর্ভোগ নানাভাবে অনুভূত হতে লাগল।

এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষার দুই স্বতন্ত্র ধারা প্রবাহিত ছিল—হিন্দুদের টোল ও চতুষ্পাঠী এবং মুসলমানদের মক্তব ও মাদ্রাসা। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কাশীর সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংরেজদের সংস্কৃতির সংস্পর্শে ও প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই দেশীয় সংস্কৃতির রূপান্তর স্বরু হয়।

প্রশ্ন

১। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও মহীশূরে যে সমস্ত দেশীয় শক্তি প্রধান হয়ে ওঠে তাদের উত্থান-পতনের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[Describe, in brief, the stories of the rise and fall of the Indian powers, that became prominent in Maharastra, the Punjab and Mysore, after the fall of the Mughal Empire.]

২। ব্রিটিশ শক্তি কী ভাবে ভারতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে তার কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

[Describe, in brief, how the British power established itself in India.]

৩। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে বল।

[Write what you know about the society and culture in India in the 18th century.]

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

রবার্ট ক্লাইভই প্রকৃতপক্ষে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে ফরাসী ও ডাচ (ওলন্দাজ) ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনে অভিলাষী হয়েছিল। ক্লাইভ দাক্ষিণাত্যে কূটনীতিতে ও রণক্ষেত্রে ফরাসীদের পরাস্ত করে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপন করেন। বাংলায় ওলন্দাজদের সংগে সংঘর্ষে ক্লাইভ তাদের জলে ও স্থলে পরাজিত করে ইংরেজ আধিপত্য সম্পূর্ণ করেন। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ ক্লাইভের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর বুদ্ধি ও বাহুবলেই বাংলার বিরাট সম্পদ ব্রিটিশের করতলগত হয়েছিল। দিল্লীর সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা সুবার (তৎকালীন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার) 'দেওয়ানী' গ্রহণ করে ক্লাইভ প্রকৃত দেশ-শাসনের অধিকার লাভ করেন।

রবার্ট ক্লাইভ যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতে প্রতিষ্ঠা করেন তার এক অতি সংকটকালে **ওয়ারেন হেস্টিংস** তা রক্ষা করেন এবং সে-সাম্রাজ্যকে সুসংহত ও দৃঢ়তর করেন।

হেস্টিংস যখন এদেশের গভর্নর-জেনারেল, ইংলণ্ড তখন ফ্রান্স ও স্পেনের এবং আমেরিকার উপনিবেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। ইংলণ্ড থেকে অর্থ বা সৈন্য সাহায্যের আশা ছিল না এবং এদিকে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে বাংলার অর্থভাণ্ডারও শূন্যপ্রায়। এমন সময়ে মারাঠা, নিজাম ও হায়দর আলি কর্তৃক ইংরেজরা আক্রান্ত হয়। এই সংকটমুহূর্তে হেস্টিংস ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সুসংহত করার জন্য হেস্টিংস শাসনব্যবস্থায় নানা সংস্কার সাধন করেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি ইংরেজ 'কলেক্টর' (Collector) নিযুক্ত করেন, রাজকোষ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। কৃষক ও জমিদারদের সংগে পাঁচশালা (পাঁচবছরের জন্য স্থায়ী) বন্দোবস্ত করেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের জন্য তিনি কলকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠা করেন।

হেস্টিংস প্রাচ্যদেশীয় বিদ্যাচর্চার জন্য 'এসিয়াটিক সোসাইটি' ও 'কলিকাতা মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন।

লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতি লাভ করে নি। তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে মালাবার, সালেম ও মাদুরার কিছু অংশ মাত্র ব্রিটিশের হস্তগত হয়। নানাবিধ সংস্কারের জন্য (প্রধানতম সংস্কার—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল স্মরণীয়। তবে তাঁর শাসনকালে ব্রিটিশ আধিপত্য দৃঢ়তর হয়েছিল।

লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁর অনুসৃত রাজ্যবিস্তারের নীতি 'বশ্যতামূলক মৈত্রী' (Subsidiary Alliance) নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থা অনুসারে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়

মিত্রদের বহিঃশত্রু ও গৃহশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মিত্ররাজ্যে ব্রিটিশ সৈন্য রাখার ব্যবস্থা হল এবং সৈন্যদের ব্যয়নির্বাহার্থে প্রত্যেক আশ্রিত মিত্ররাজাকেই তাঁদের রাজ্যের এক অংশ ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিতে হল। বশ্যতামূলক মৈত্রী অনুসারে চুক্তিবদ্ধ কোন রাজ্যের কোন বিদেশী শক্তির সংগে সন্ধি-বিগ্রহের স্বাধীনতা রইল না। স্বাধীনতার পরিবর্তে রাজারা তাঁদের রাজ্যরক্ষার প্রতিশ্রুতি পেলেন।

বশ্যতামূলক মৈত্রীর ফলে হায়দরাবাদ, অযোধ্যা, মারাঠা রাজ্যসমূহ তাঞ্জোর, সুরাট, কর্ণাট প্রভৃতি বহু রাজ্য ও টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর মহীশূর রাজ্যের এক বিরাট অংশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়।

লর্ড হেস্টিংস ওয়েলেসলির আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করেন। গুর্খাদের পরাস্ত করে তিনি বর্তমান কুমায়ুন, গাড়োয়াল জেলা ও তরাইয়ের অধিকাংশ লাভ করেন। তাঁর শাসনকালে সিকিম রাজ্যের সংগে সন্ধি হয় ও নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে ব্রিটিশ 'রেসিডেণ্ট' রাখার ব্যবস্থা হয়।

তিনি পিণ্ডারী নামক দুর্দান্ত দস্যুদলকে দমন করে রাজ্য নিরুপদ্রব করেন।

তাঁর সময় তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে (১৮১৭-১৯) মারাঠা শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। পেশোয়ার পদ লুপ্ত হল; পদচ্যুত পেশোয়া বাজীরাও, বৃত্তিভোগী নির্বাসিতের জীবন যাপন সুরু করেন। ভোঁসলা ও হোলকার আত্মসমর্পণ করেন। ভূপাল ও বুন্দেলখণ্ড ব্রিটিশের আশ্রিত রাজ্য হয়ে রইল। মেবার, মারওয়াড় ও জয়পুর ব্রিটিশের অধীনতা স্বীকার করল। নামাবশেষ বাদশাহ ইংরেজের বৃত্তিভোগী হলেন।

এই ভাবে শতদ্রু থেকে ব্রহ্মপুত্র ও হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রভুত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে **লর্ড হেস্টিংস যখন** ভারত ত্যাগ করেন তখন রণজিৎ সিংহের পঞ্জাব ও নেপালের গুর্খারাজ্য ছাড়া ভারতে কোন প্রকৃত স্বাধীন রাজ্য ছিল না।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কাছাড় ও কুর্গ রাজ্য অধিকার করেন। **এলেনবরা** সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করেন এবং **হার্ডিঞ্জের** আমলে প্রথম শিখযুদ্ধের ফলে শিখরা হীনবল হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চরম বিস্তার লাভ করে **ডালহৌসীর** শাসন-কালে। তিনি শিখদের পরাস্ত করে পঞ্জাব দখল করেন (মার্চ. ১৮৪৯) ও রেঙ্গুন, প্রোম ও পেগু জয় করে দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।

দেশীয় সামন্তরাজাদের রাজ্য দখল করার জন্য ডালহৌসী স্বত্ববিলোপ নীতি (Doctrine of Laps) বলে এক নীতি কঠোর ভাবে অনুসরণ করতে লাগলেন। তিনি প্রচার করলেন যে ব্রিটিশের আশ্রিত বা অনুগৃহীত কোন দেশীয় রাজ্যের রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে সে রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-ভুক্ত হবে। ব্রিটিশ সরকার অনুমোদন না করলে কোন রাজ্যে দত্তক পুত্রের স্বত্ব স্বীকৃত হবে না। এই নীতি অনুসারে আরো কয়েকটি রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের বাজেয়াপ্ত হল। কর্ণাট ও তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব রাজাদের বৃত্তি ও পদমর্যাদা সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা করা হল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর পুত্র নানা-সাহেবকে বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করা হল।

ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

ডালহৌসী রাজ্যবিস্তারের সংগে সংগে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা করে, বড় বড় রাস্তা তৈরী করিয়ে ও খাল কাটিয়ে যানবাহন ও যোগাযোগের সুব্যবস্থা করেন। এসব তাঁর দূরদর্শিতা প্রমাণ করে। বিশাল রাজ্যের সুশৃংখল শাসনব্যবস্থার জন্য এ সব অত্যাবশ্যক ছিল।

শাসনব্যবস্থা: ক্লাইভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার কিছু আভ্যন্তরীণ সংস্কার করেছিলেন। কিন্তু ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পাবার পর দেশে দ্বৈত শাসন প্রচলিত হল। নবাবের ক্ষমতা রইল না কিন্তু দায়িত্ব রইল, এবং কোম্পানীর হাতে দায়িত্বহীন ক্ষমতা এল। এই ব্যবস্থার ফলে দেশে বিশৃংখলা দেখা দিল।

ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটালেন। তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়াদির তত্ত্বাবধানের জন্য 'রেভেনিউ বোর্ড' (Revenue Board) প্রতিষ্ঠা করেন, রাজকোষ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন ও ব্রিটিশ 'কলেক্টর' নিযুক্ত করেন। কৃষক ও জমিদারের সংগে পাঁচশালা ব্যবস্থা হল। সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামে দুটি বিচারালয় এবং প্রত্যেক জেলায় মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক বণিকসংঘ হলেও ভারতের বিশাল অংশ অধিকার করে রাজত্ব সুরু করার পর, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' (Regulating Act) বা নিয়ামক আইন নামে এক আইন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত হল। এই আইন অনুসারে স্থির হল যে ভারত-সম্পর্কিত কাগজপত্র এরপর মন্ত্রীদের অবগতির জন্য বিলেতে পাঠাতে হবে। বাংলার গভর্নর হলেন গভর্নর-জেনারেল। গভর্নর-জেনারেল ব্যতীত চারজন সদস্য নিয়ে তাঁর এক পরিষদ (Council) গঠিত হল। সপরিষদ গভর্নর-জেনারেল ভারতবর্ষের অন্যান্য ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশের ওপর পররাষ্ট্র, যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক বিষয়ে কর্তৃত্ব পেলেন। একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন সাধারণ বিচারপতি নিয়ে কলকাতায় এক সুপ্রীম কোর্ট (Supreme Court) স্থাপিত হল।

কোম্পানীর বিশৃংখল শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' প্রণীত হলেও, এর অন্তর্নিহিত কতগুলো ত্রুটির জন্য এ আইনের সংস্কার দরকার হল।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' (India Act) নামে আর এক আইন প্রণীত হল। এই আইনের ফলে প্রকৃতপক্ষে ভারতের শাসন-ক্ষমতা কোম্পানীর হাত থেকে ইংলণ্ডের সরকার দপ্তরে স্থানান্তরিত হল।

ভারতবর্ষের সামরিক ও অসামরিক কর্তৃত্ব ছয়জন সভ্যবিশিষ্ট এক বোর্ড-এর ওপর ন্যস্ত হল। তার নাম "Board of Commissioners for the Affairs of India": পরে এর নাম হয় "Board of control".

এই আইন অনুসারে স্থির হয়, বোর্ড-এর সভাপতি ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার সদস্য হবেন। এই সময় থেকে তিনিই সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করতে লাগলেন। ভারতের শাসনভার অর্পিত হল গভর্নর-জেনারেল ও তিনজন সভ্য (তাঁদের একজন হবেন প্রধান সেনাপতি) বিশিষ্ট এক মন্ত্রিসভার ওপর। যুদ্ধ, শান্তি, অর্থ ও বৈদেশিক ব্যাপারে তাঁর অধীন অন্যান্য প্রদেশের (বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) কার্য-পরিচালনার জন্য তিনি দায়ী হলেন।

লর্ড কর্নওয়ালিস বিচার-ব্যবস্থার অনেক উন্নতি করেন। দেওয়ানী বিচারের জন্য সর্বনিম্ন আদালত হল মুন্সেফী আদালত। তার ওপর জেলা আদালত। জেলা আদালতের ওপর চারটি প্রাদেশিক আদালত ও সর্বোপরি সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত স্থাপিত হয় (তিনি চারটি ভ্রাম্যমান আদালত স্থাপন করেন। ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারকরা বছরে দুবার করে প্রতি জেলায় গিয়ে জেলার জটিল মামলাগুলোর বিচার করতেন)।

রাজস্ব-ব্যবস্থার সংস্কার ও ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (Indian Civil Service : I.C.S.)-এর কার্যনীতি স্থিরীকৃত করে কর্নওয়ালিস শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন।

শাসন-ব্যবস্থার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হয় লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালে। তিনি ভ্রাম্যমান আদালত চারটি তুলে দেন। তিনি জেলা 'ম্যাজিস্ট্রেট' ও জেলা 'কলেক্টর'-এর দায়িত্ব একই ব্যক্তির ওপরে ন্যস্ত করেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই শাসন-ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল।

উপরিউক্ত শাসন-ব্যবস্থার দোষগুণ যাই হোক না কেন, এ শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয়দের যোগ্য অংশ ছিল না এবং তারতীয়দের দায়িত্ব অর্পণ এ শাসন-ব্যবস্থার নীতিও ছিল না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক : বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ অনুমতি ও বিশেষ কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে রচিত

'চার্টার অ্যাক্ট' দ্বারাই প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গঠনতন্ত্র ও কার্যাদি নিয়ন্ত্রিত হত। এই বণিকসংঘ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও শাসনাধিকার হস্তগত করার সংগে সংগে কোম্পানীর রাজত্বে নানা বিশৃংখলা দেখা দেয়। সেই বিশৃংখলা দূর করে কোম্পানীর কাজ নিয়ন্ত্রণে ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ সরকার মনোযোগী হয়ে ওঠে। রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩) ও ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৭৮৪) কোম্পানীর ভারতীয় রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যেই রচিত ও গৃহীত হয় (এই দুই আইন সম্বন্ধে আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে)।

'রেগুলেটিং অ্যাক্ট'-এ কলকাতা কাউন্সিল ও বাংলার গভর্নর-জেনারেল-এর সংগে বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিল-এর সম্পর্ক এবং সুপ্রীম কোর্ট-এর সংগে গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত ছিল না। ফলে নানা বিরোধের সৃষ্টি হয়। তাই, ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের 'চার্টার অ্যাক্ট'-এ গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সংগে সুপ্রীম কোর্ট-এর সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট'-এ কোম্পানীকে কুড়ি বছরের জন্য ভারতে একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের আর এক 'চার্টার অ্যাক্ট'-এ আরও কুড়ি বছরের জন্য কোম্পানীর ব্যবসার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে আর এক 'চার্টার অ্যাক্ট' পাশ হয়। কোম্পানী কুড়ি বছরের জন্য আবার নতুন সনন্দ পেল। তবে ভারতের সংগে কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার রহিত হল। এই আইনেই প্রথম ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বাৎসরিক অন্যূন এক লক্ষ টাকা খরচ করতে কোম্পানীকে নির্দেশ দেওয়া হল।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীকে আবার নতুন সনন্দ দেওয়া হয় (চার্টার অ্যাক্ট, ১৮৩৩)। এই সনন্দ অনুসারে বাংলার গভর্নর-জেনারেল ভারতের গভর্নর-জেনারেল হলেন (লর্ড বেন্টিঙ্ক ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল)। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লুপ্ত হল। গভর্নর-

জেনারেল-এর শাসন-পরিষদে একজন আইন-সচিব (Law Member) নিযুক্ত হলেন। **লর্ড মেকলে** ভারতের প্রথম আইন-সচিব। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতীয়দের সরকারী চাকরী লাভের সুযোগ দেওয়া হল।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী শেষ সনন্দ পেল (চার্টার অ্যাক্ট, ১৮৫৩)। এই সনন্দ অনুসারে বিলেতে কোম্পানীর পরিচালক সভার (Board of Directors) গঠন পরিবর্তিত হয় ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা উচ্চ রাজকার্যে (সিভিল সার্ভিস) কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। আইন প্রণয়নের জন্য ভারতে এক ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) স্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থাপক সভায় বার জন সভ্য ছিলেন: গভর্নর-জেনারেল, প্রধান সেনাপতি, গভর্নর-জেনারেল-এর কাউন্সিলের চারজন সভ্য, সুপ্রীম কোর্ট-এর প্রধান বিচারপতি ও আর এক জন বিচারপতি এবং বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একজন করে মনোনীত সদস্য।

সিপাহী-বিদ্রোহ কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটাল। ইংলণ্ডবাসীরা ভারতের মতো একটা দেশের শাসনভার এক বণিক-সংঘের হাতে রাখা আর সংগত মনে করল না। তাই, ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন (গভর্নমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৮৫৮)। স্থির হল, তাঁর নামে রাজমন্ত্রীদের মধ্যে একজন, পনের জন সদস্য নিয়ে গঠিত এক সভার সাহায্যে, ভারতের শাসন-সংরক্ষণের কাজ পরিচালনা করবেন। ভারতের শাসন-সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভারত-সচিব (Secretary of State for India) আখ্যা পেলেন আর তাঁর পরামর্শ সভার নাম হল 'ভারত সভা' (Council of India)। গভর্নর-জেনারেল রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) হলেন। লর্ড ক্যানিং হলেন প্রথম 'ভাইসরয়'।

ব্রিটিশের সংগে গণবিরোধ: দেশীয় নৃপতিদের রাজ্য ও ক্ষমতাচ্যুত করে ইংরেজরা নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করার ফলে দেশের নানা অংশে ব্রিটিশ-বিরোধী এক মনোভাব দেখা দেয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক দুর্দশা দেখা দেয়। তার জন্যও ব্রিটিশের প্রতিকূল

মনোভাব ভারতবাসীদের মধ্যে সৃষ্ট হয়। ধর্মনৈতিক কারণেও মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশবিরোধী হয়ে উঠেছিল।

বারাণসীর রাজা চৈৎসিহ হেস্টিংসের উৎপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ সৃষ্টি করেন (১৭৮১)। সে বিদ্রোহ বিহার ও অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

অযোধ্যার নবাবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ওয়াজীর আলি নবাবের গদীতে বসেন। কিন্তু কোম্পানী তাঁকে সরিয়ে মৃত নবাবের ভাইকে গদীতে বসান। ওয়াজীর আলি বিদ্রোহী হলেন। তিনি কাবুলের আমীরকে ভারত আক্রমণে প্ররোচিত করেন। ওয়াজীর আলির বিদ্রোহ সহজেই দমিত হয়। এ বিদ্রোহের পশ্চাতে কাবুলের আমীর, টিপু সুলতান, ঢাকার নবাব ও সিন্ধিয়া প্রভৃতির সমর্থন ছিল।

অর্থনৈতিক কারণে এবং বিশেষতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়ত ও জমিদারের ওপর যে খাজনার চাপ পড়ে তার জন্যে ধলভূমের রাজা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রংপুর, বিষ্ণুপুর, তিনেভেলী, বেরিলী, আলিগড়, খান্দেশ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকরাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকিরদের এক বিদ্রোহ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলাদেশে এক ভয়ানক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ এ বিদ্রোহকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বলা হয়।

মুসলমানদের 'ফরাইদি' আন্দোলন (১৮০৪) পূর্ববংগে দেখা দেয়। ব্রিটিশ-শাসনাধীন থাকা মুসলমানের ধর্মবিরোধী—এই বিশ্বাসে এ আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদ সাধন করতে চায়। 'ওহাবী' আন্দোলন নামে মুসলমানদের এক ধর্মীয় আন্দোলনও (১৮১০) ক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে ব্রিটিশ শক্তির উচ্ছেদে প্রয়াসী হয়। বাংলাদেশে এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন তিতুমীর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এরকম বহু খণ্ড খণ্ড আন্দোলন বিভিন্ন কারণে দেখা দেয়। প্রত্যেক আন্দোলনেরই

উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শক্তির বিতাড়ন। এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ বলে খ্যাত জাতীয় আন্দোলনই শক্তি ও ব্যাপকতায় সর্বপ্রধান।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহঃ লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি ও দিল্লীর বাদশাহকে দিল্লী থেকে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা সমস্ত প্রাচীন রাজ-বংশীয়দের মনে উদ্বেগের সঞ্চার করেছিল। কোম্পানীর সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত বহু সিপাহী দেশীয় রাজ্যসমূহের অধিবাসী ছিল বলে তাদের মনেও নানা উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল। কোম্পানীর নানা সামাজিক সংস্কার ও নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তন ইত্যাদি সংরক্ষণশীল হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মনে এই আশংকা জন্মিয়েছিল যে ভারতবাসীদের ইউরোপীয় ধর্ম ও সংস্কারের অনুগামী করে তোলাই কোম্পানীর উদ্দেশ্য। ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ করতে যেতে বাধ্য হওয়ার ফলেও সিপাহীদের মনে অসন্তোষ বাড়ল। বহু পূর্ব থেকেই তাদের বেতনের স্বল্পতা ও ইউরোপীয় সৈন্যদের সংগে আচরণ ও সুযোগ-সুবিধাগত পার্থক্য দেশী সিপাহীদের মনে বিশেষ অসন্তোষ সঞ্চার করছিল।

অবশেষে সৈন্যদলে 'এনফিল্ড রাইফেল' বলে একরকম বন্দুক প্রচলিত হল। এ বন্দুকের টোটা পশুচর্বিতে তৈরী এবং এ টোটা দাঁতে কেটে বন্দুকে ভরতে হত। গরু ও শূকরের চর্বিমিশ্রিত কার্তুজ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ধর্মনাশের চতুর কৌশল মনে করা হল এবং উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদের মধ্যেই প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে মংগল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহী প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১০ই মে মীরাটে গুরুতরভাবে বিদ্রোহ দেখা দিল। সিপাহীরা ইউরোপীয়দের হত্যা করল, জেল অধিকার করল ও তারপর দিল্লীর দিকে ধাবিত হল। দিল্লীর মুসলমানরা বিদ্রোহে যোগ দিল ও বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে ঘোষণা করা হল। বিদ্রোহের আগুন গংগাতীরবর্তী প্রদেশ ও মধ্যভারতে ছড়িয়ে পড়ল।

দিল্লী, কানপুর ও লক্ষ্ণৌয়ে বিদ্রোহ ভয়ানক রূপ ধারণ করল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর পুত্র নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপি, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, এঁরা বিদ্রোহের নায়কত্ব গ্রহণ করেন।

সামরিক শক্তিতে অধিক বলশালী ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করে। বাহাদুর শাহ রেংগুনে নির্বাসিত হলেন। লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন, তাঁতিয়া টোপির ফাঁসী হল। নানাসাহেব নেপালের জংগলে আশ্রয় নিলেন। তাঁর পরিণতি সম্বন্ধে সঠিক কোন সংবাদ জানা যায় না।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই সমগ্র ভারতে শান্তি ঘোষণা করা হল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ মুখ্যতঃ সিপাহীদের ব্যাপার হলেও কোন কোন অঞ্চলে এ বিদ্রোহ যে জাতীয় বিপ্লবের আকার ধারণ করেছিল এবং এ বিদ্রোহের প্রতি অগণিত ভারতবাসীর যে আন্তরিক সমর্থন ছিল তা নিশ্চিত।

এই বিদ্রোহের ফলে স্বত্ববিলোপনীতি পরিত্যক্ত হল। ঘোষণা করা হল যে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার চায় না। শাসনকার্যে ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি প্রচলিত হল। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা পরিহার করে বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিল-এর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হল।

বহু ব্রিটিশ সৈন্য ভারতবর্ষে আনান হল এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজে কেবল ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগের নীতি প্রবর্তিত হল। সামাজিক সংস্কার প্রবর্তনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখন থেকে সতর্ক হলেন।

হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত বিদ্রোহে ভীত ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতি প্রচলন করতে লাগলেন আর সে বিভেদনীতির বিষম ফল ভারত আজও ভোগ করছে।

প্রশ্ন

১। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ইংরেজ শাসনকর্তার অবদান সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

[Describe, in brief, the achievements of different English administrators in establishing the British Empire in India.]

২। কোম্পানীর আমলে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা কি ভাবে পরিচালিত হত তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Give a brief description of the system of administration under the East India Company.]

৩। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংগে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[What do you know about the relation of the British Parliament with the East India Company ?]

৪। কোম্পানীর আমলে ব্রিটিশের সংগে ভারতের গণবিরোধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বল।

[Give a short account of the popular rising in India against the British during the rule of the East India Company.]

৫। সিপাহী যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[Describe the causes and effects of the Sepoy War.]

ব্রিটিশ শাসনে ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর

পুরনো ব্যবস্থার অবসান : অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে গ্রাম-কেন্দ্রিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রাজা বা রাজবংশের রদ-বদলে সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হত না। গ্রামগুলোতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল—সমবায়-ভিত্তিক একটা সমাজ ছিল। গ্রামের সম্পদ অনুযায়ী গ্রাম-ভিত্তিতে গ্রামের প্রধানরা যে রাজস্ব নির্ধারণ করতেন—রাজকর্মচারীরা তাই মানতেন এবং জমিদাররা সেই নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করতেন। কৃষকরা পুরুষানুক্রমে জমি ভোগ-দখল করত। নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতে পারলে কোন কারণেই জমি তাদের হাতছাড়া হত না।

"বিভিন্ন শিল্পবৃত্তির কৌলিক অথবা জাতিগত একচেটিয়া অধিকার

স্বীকার করে এবং গ্রাম, মেলা, নগর ও তীর্থস্থানসমূহকে আশ্রয় করে সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তার ফলে সমসাময়িক অপর বহু দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিশালী হতে সমর্থ হয়েছিল।" মুসলমান আমলেও শহরের আশেপাশে প্রাচীন ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হলেও গ্রামে পূর্বেকার উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাই টিকে ছিল।

ভারতের সমাজ আর অর্থনীতির মূলে প্রচণ্ড আঘাত এল ব্রিটিশ শাসনের আমলে। ইংরেজরা তাদের দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট ও উৎপাদন-ব্যবস্থা এ দেশে প্রচলন করার চেষ্টা করায় সে আঘাত এল। সে আঘাতের ফলে গ্রামের সমাজে ও উৎপাদন-ব্যবস্থায় ভাঙন ধরল। দেশীয় শিল্পসমূহ নষ্ট হল—শিল্পীরা কৃষিজীবী হল। এক নতুন ধনকৌলীন্য প্রবর্তিত হল। জমিদার, মধ্যস্বত্ব-ভোগী ও চাকুরীজীবী প্রভৃতি নানা নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হল। আধুনিক যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠা হল এবং নতুন নতুন শাসন-কেন্দ্রে ও শিল্পকেন্দ্রে শহর গড়ে উঠতে লাগল। গ্রামগুলো ও সেখানকার অধিবাসী জনসমাজ অজ্ঞতা, অস্বাস্থ্য আর দারিদ্রে ডুবে গেল।

ভূমি-ব্যবস্থা ঃ পুরনো সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসানের কারণ হিসেবে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সুবার দেওয়ানী পাবার পর থেকে কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য যে সমস্ত ভূমি-ব্যবস্থা করেছিল সেই সমস্ত ব্যবস্থার গুরুত্ব অনেকখানি।

দেশের কল্যাণ-অকল্যাণের কোন দায়িত্ব কোম্পানীর ছিল না। যত বেশী সম্ভব রাজস্ব আদায়-ই কোম্পানীর লক্ষ্য ছিল। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য যে সবচেয়ে বেশী রাজস্ব দিতে রাজী হত কোম্পানী তাকেই সে অঞ্চলের জমিদারী দিত। এ ব্যবস্থা কখনও এক বছরের জন্য, কখনও পাঁচ বছরের জন্য আবার কখনও বা দশ বছরের জন্য করা হত। অনেক পুরনো জমিদার আর জমিদার রইল না—নতুন নতুন বহু অস্থায়ী জমিদার গজাতে লাগল। সহজেই অনুমান করা যায় যে এই সমস্ত জমিদারের প্রজাসাধারণের মংগলের দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে যত বেশী সম্ভব রাজস্ব

আদায়ই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। প্রজাদের সংগে পুরুষানুক্রমিক কোন সম্বন্ধ ছিল না বা তা গড়ে ওঠাও সম্ভব ছিল না।

অবশেষে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারদের সংগে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা (Permanent Settlement) করলেন। রাজস্ব স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হল। সেই সংগে ব্যবস্থা হল যে নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের মধ্যে কোন জমিদার তার দেয় রাজস্ব দিতে না পারলে তার জমিদারী নিলাম হয়ে যাবে।

এ ব্যবস্থায় কোম্পানীর রাজস্বখাতে আয় প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেল এবং তাতে কোম্পানীর সুবিধেই হল। এ ব্যবস্থায় জমিদারদের অবস্থার উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় নি। কৃষকদের পরিশ্রমলব্ধ লাভের অংশ এবং বাজার-দরের তারতম্যে যে লাভ হত তা জমিদারেরা বিনা পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে পেতেন। এই ব্যবস্থায় পরে আরও একটা গুরুতর অসুবিধে দেখা দিল। সরকার জমিদারী ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বলে তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না; ফলে অতিরিক্ত ব্যয় সংকুলানের জন্য অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের ওপর নানারকম কর চাপাতে লাগলেন। এদিকে জমিদার প্রজাদের খাজনা বাড়াতে পারতেন ও জমির স্বত্ব কেড়ে নিতে পারতেন। তাই, প্রজাদের ওপর নানারকম উৎপীড়ন চলত। জমিদাররা জমিদারী পত্তন দিতে পারতেন এবং তার ফলে অনেক জরিদার জমিদারীর উপস্বত্ব দিয়ে প্রজাশোষক মধ্যশ্রেণী সৃষ্টি করলেন।

পরবর্তীকালে অবশ্য প্রজাস্বত্ব আইনের দ্বারা কৃষদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসংগে লর্ড রিপনের প্রচেষ্টা ও ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার উপযোগিতা বা উপকারিতা লোপ পাওয়ায় সে ব্যবস্থাই উঠে গেছে (১৯৫৩)।

দক্ষিণ ভারতে ও বাংলা ছাড়া উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশে সোজাসুজি রায়তের সংগে রায়ত-ওয়ারী বা মহাল-ওয়ারী ব্যবস্থাও গ্রাম্য সমাজের ধ্বংসেরই কারণ হয়েছে। রাজস্বের হার আর সরকারী অত্যাচার বৃদ্ধির ফলে কৃষকের পক্ষে চাষ লাভজনক না হওয়ায় কৃষকরা চাষ ছেড়ে দেয়।

ব্রিটিশ আমলের ভূমিব্যবস্থা, জমিদার ও তার অধীন উপস্বত্বভোগী শ্রেণীদের দায়িত্বহীন ঔদাসীন্য ও গ্রামত্যাগ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাকুরী-জীবী হয়ে শহরে বাসা-বাঁধা—এই সমস্ত কারণ কৃষির ও গ্রামীণ শিল্পের অবনতি ও গ্রামবাসীদের দুর্দশা ঘটায়।

গ্রাম্য সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে গেল, কিন্তু সংগে সংগে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতির অভাবে বহু লোকের কর্মের সংস্থান রইল না।

বাণিজ্য, পরিবহন ও শিল্পে অবস্থান্তরঃ অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতের গ্রামে গ্রামে কারিগর শ্রেণীর লোকেরা বাস করছিল। তারা গ্রাম্য সমাজের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করে, গ্রামেই বিক্রয় করত। ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের এক অংশ মাত্র বাইরে চালান যেত।

ইংরেজরা যখন এদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে তখন ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব হয়ে গেছে। যন্ত্রের সাহায্যে সস্তায় বহু মাল তখন সে দেশে তৈরী হচ্ছিল। ইংরেজদের স্বভাবতই লক্ষ্য ছিল যে তারা বিলিতী কলকারখানার জন্য ভারত থেকে সস্তা কাঁচামাল সংগ্রহ করবে এবং সেখানকার তৈরী মাল এ দেশের বাজারে চড়া দরে বিক্রী করবে।

বব্যসায় ও রাজ্যশাসনের সুবিধার জন্য লর্ড ডালহৌসী এদেশে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ ব্যববস্থা প্রতিষ্ঠা করেন ও বড় বড় রাস্তাঘাট নির্মাণ করান। তার ফলে দেশের বিভিন্ন অংশের সংগে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং দেশের সর্বত্র মাল চলাচলের সুবিধা হয়। ভারতের গ্রামে গ্রামে কলে-তৈরী সস্তা বিলিতী মাল পৌঁছল। ভারতের অন্তর্বাণিজ্য অনেক বেড়ে গেল।

অন্যদিকে সে সময়ের মধ্যে ভারতের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রুচি বদলে গিয়েছিল, সাহেবরা তাঁদের মনে এক সাহেবী মোহ সৃষ্টি করেছিল এবং তার ফলে তাঁরা বিলিতী দ্রব্যের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন।

সরকারের উদ্দেশ্য ও নীতির ফলে, বাষ্পীয় যানবাহনের চলাচল ও রাস্তাঘাটের উন্নতিতে ও দেশীয় লোকের রুচি-বিকার হেতু দেশীয় শিল্পীরা এক সংকটে পড়ে এবং তারা চরম দুর্দশায় উপনীত হয়। শিল্পকাজের দ্বারা

জীবিকার্জন অসম্ভব হলে তারা কৃষিজীবী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে কৃষি ও ভূমির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা বাড়ে ও দেশে দারিদ্র্য তীব্রতর হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত রেশম ও তুলার বস্ত্র-বয়নশিল্প ভারতের প্রাধান শিল্প ছিল এবং রেশম ও তুলাজাত দ্রব্য বহুকাল আগে থেকেই ভারত বিদেশে রপ্তানী করত। এই দুই শিল্পের ধ্বংসের জন্য কোম্পানীর নীতিকেই দায়ী করা যায়। কোম্পানীর চেষ্টা ছিল যাতে রেশম ও কাঁচা তুলার উৎপাদন বাড়ে অথচ এদেশের বয়নশিল্প ধ্বংস হয়। বয়ন-শিল্পীদের বাধ্য করা হয় কোম্পানীর কুঠিতে কাজ করতে। তারা বাইরে কাজ করতে পারত না। এ অত্যাচার অসহ্য হওয়াতে ভারতের বহু পুরুষানুক্রমিক আত্মসম্ভ্রমসম্পন্ন শিল্পী নিজেদের আঙ্‌ল কেটে ফেলে। তূলা বিলেতে চালান দিয়ে সেখানকার কলে-তৈরী কাপড় ভারতের বাজারে বিক্রী করে লাভবান হওয়াই ছিল কোম্পানীর নীতি ও উদ্দেশ্য।

পুরনো শিল্প ও শিল্পিশ্রেণী প্রায় ধ্বংস হয়ে গেলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে ভারতে যন্ত্রচালিত শিল্পের প্রতিষ্ঠা সুরু হয়। এ সমস্ত শিল্প প্রায় সবই বিদেশী মূলধনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এদেশের শিল্পোন্নতি এ প্রচেষ্টার অবশ্যম্ভাবী আনুষংগিক হলেও এর মূলগত মুনাফার লোভ অনস্বীকার্য। ভারতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের মধ্যে পাঁট ও কাপড়ের কল প্রাচীনতম। কলকাতার ধারে হুগলী নদীর তীরে এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। তা'ছাড়া, চা কফি, নীল প্রভৃতি বাগিচা-শিল্প ও কয়লাখনি-শিল্প ভারতে যন্ত্র-শিল্প প্রচেষ্টার আদিযুগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষে বিলিতী মালের আমদানী, অন্তর্বাণিজ্যের প্রসার ও যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার সংগে দেশে আধুনিক অর্থনৈতিক জীবনের সূচনা হয়েছে। আজও যন্ত্রশিল্প-বিরোধী মত ভারতে প্রচলিত আছে। কিন্তু সময়কে আর ঘড়ির কাঁটার মত ঠেলে পেছনে হটিয়ে দেওয়া যাবে না। আজকের পৃথিবীতে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাব অস্বীকার করে অন্য সকল জাতির সংগে একতালে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। আধুনিক ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার

সংগে শিল্পোন্নতি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কৃষির ওপর নির্ভরশীল বিশাল জনসংখ্যার দারিদ্র্য আর বেকারী দূর করতে দ্রুত শিল্পায়ন আবশ্যক; তবে, কৃষি আর শিল্পের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমতলীয় উন্নতি-পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক। কারণ, কৃষি ও শিল্প একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এ দুয়ের অগ্রগতির সামঞ্জস্য রক্ষিত না হলে অর্থনৈতিক উন্নতির গতি ব্যাহত হবে—দেশ ও দেশবাসীর দুর্দশা আসবে।

প্রশ্ন

১। "অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে গ্রাম-কেন্দ্রিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।"—ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে কেমন করে সেই পুরনো ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[Village-centred society and economic system were in vogue in India from very ancient times. Briefly describe how that old system broke down after the establishment of British rule in India.]

২। ইংরেজ আমলে ভারতের ভূমিব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সাধিত হয় তার ফলে ভারতের গ্রাম্য সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামো কেন ভেঙে পড়ল?

[Why did rural society and its economic framework break down as a result of the changes brought about in the land system in India in the British period ?]

৩। ইংরেজ শাসনের সুরু থেকে বাণিজ্য ও শিল্পে কিভাবে ও কেন অবস্থান্তর ঘটতে থাকে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[Discuss why and how changes came about in trade and industry from the beginning of English rule in India.]

ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব

বাংলার জাগরণঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব, দাসপ্রথা নিষিদ্ধীকরণ, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী চিন্তাধারার প্রচার, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানে নতুন চিন্তা ও বহু বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কার প্রভৃতির ফলে ইউরোপে এক নতুন জাগরণের সাড়া পড়ে। ইউরোপের আন্দোলনের ঢেউ ভারতেও পৌছয়। তখন বাংলাদেশ বিশেষতঃ কলকাতা ছিল ব্রিটিশের সর্বপ্রধান কর্মকেন্দ্র। ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল কলকাতা। তাই, কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক জাগরণ সূচিত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি আর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারার সমন্বয়ে আধুনিক ভারত জন্ম নেয় বাংলার সূতিকাগারে। বাংলাদেশ থেকেই আধুনিক চিন্তাধারা কালক্রমে ভারতের নানা অংশে বিস্তার লাভ করে।

আধুনিক চিন্তা ও দৃষ্টিভংগীঃ এই নব-জাগরণ আর নতুন যুগের সূচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য চিন্তার স্বাধীনতা—সনাতন সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি—যুক্তি ও বিচার দিয়ে আদর্শ ও পদ্ধতির নতুন মূল্যায়ন। নতুন চিন্তা আর দৃষ্টিভংগী হল মানবমুখী। আধুনিক চিন্তা আর কার্যের কেন্দ্র ও লক্ষ্য হল মানুষ এবং অভীষ্ট হল মানুষের সর্বাংগীণ কল্যাণ—মানুষকে আত্মমর্যাদা, স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত করা। এ চিন্তার প্রবাহ হল সর্বতোমুখী। দেশে ধর্ম, সমাজ সাহিত্য ও শিক্ষা সংস্কারের এক প্রবল প্রয়াস সুরু হল।

পাশ্চাত্য শিক্ষাঃ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট-এ কোম্পানীকে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বছরে এক লক্ষ টাকা খরচ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ অনুসারে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে Committee of Public Instruction-নামে এক সংস্থা স্থাপিত হয়। এই সংস্থার সংকল্প ছিল দেশীয় বিদ্যাচর্চার সুযোগ বাড়ান। তখন আধুনিক ভারতের স্রষ্টা ও প্রতীক রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট-এর কাছে প্রতিবাদে জানান যে ভারতের প্রয়োজন রসায়নবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ।

রামমোহন ও ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণে হিন্দু কলেজ-এর দান যথেষ্ট। হিন্দু কলেজ-এর তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিও তাঁর একদল শিষ্যকে নতুন প্রগতিশীল ভাবধারায় দীক্ষিত করেন। তাঁর শিষ্যদলকে "Young Bengal" বলা হত। পরবর্তী কালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এই ছাত্রদল সমাজের নানা কুসংস্কার ও আচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দেই ডেভিড হেয়ার ইংরেজী পুস্তক রচনা ও প্রকাশের জন্য School Book Society নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। স্কটিশ মিশনারী ডাঃ ডাফ সে-সময় জেনারেল অ্যাসেমব্লীজ ইনস্টিটিউশান স্থাপন করেন।

রামমোহন নিজে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ও বেদান্ত কলেজ স্থাপন করে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করেছিলেন।

রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেন এবং মিশনারীদের চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন সাহেব কলকাতায় এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

সাহিত্যের বিকাশঃ ইউরোপীয় সংস্পর্শ, ভাবধারা ও শিক্ষার ফলে শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তা আর যুক্তি সংস্কারমুক্ত হল। সে মুক্তির ফলে বুদ্ধি, যুক্তি, বিচার ও বিশ্লেষণের ভাষায় বাংলা গদ্যের জন্ম হল। বাংলা গদ্যের স্রষ্টা হিসাবে রামমোহন স্মরণীয়। বাংলা গদ্য গড়ে উঠল বিদ্যাসাগরের হাতে এবং পরে অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর রচনায় সৃজনশীল বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব হল। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও মেঘনাদবধ কাব্য, শর্মিষ্ঠা নাটক সাহিত্য-জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে ও প্রবন্ধে এক নবচেতনা সঞ্চার করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ বাঙালীকে এক নতুন জাতীয়তামন্ত্রে দীক্ষিত করল। তাঁর "বন্দে মাতারম্" আজ জাতীয় সংগীতে পরিণত হয়েছে।

সমাজ-সংস্কারঃ আমাদের দেশে নানা সামাজিক কুপ্রথা বহুকাল ধরে চলে আসছিল। কুপ্রথাগুলো বহু পুরাতন বলে প্রায় সনাতন হিসেবে

গৃহীত হয়েছিল এবং লোকে বিশ্বাস করত যে এ সমস্ত কুপ্রথা শাস্ত্রসম্মত। এই কুপ্রথাগুলোর মধ্যে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল-বিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রতিরোধ ইত্যাদি প্রধান। সমাজে স্ত্রীলোকের মানবিক বা সামাজিক অধিকার প্রায় কিছুই ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারমুক্ত উদার মানবতা এই সমস্ত কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল ও এগুলো নির্মূল করতে আন্দোলন সুরু হল। এই শুভ আন্দোলনেও অগ্রণী ছিলেন রামমোহন। তিনি বই লিখে, হিন্দুশাস্ত্রের কথা উল্লেখ করে প্রমাণ করলেন যে সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত নয় এবং মানবিক যুক্তিতে এ প্রথা বর্বরোচিত। আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রচার করে আন্দোলন সুরু করেন। বিধবা-বিবাহের সপক্ষে সফল আন্দোলন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'সুহৃদ্ সমিতি', কেশব-চন্দ্র সেনের 'Social Reform Association' সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের সহায়তা করে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'Civil Marriage Act' পাশ হয়। এ আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকার হয় এবং বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সামাজিক অধিকার সম্প্রসারিত হয়।

স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিবারণের উদ্দেশ্যে পঞ্জাবে, বোম্বাইয়ে ও মাদ্রাজেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে আন্দোলন সুরু হয়েছিল। পঞ্জাবে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন পরিচালিত হয় দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত 'আর্য সমাজ'-এর নেতৃত্বে। বোম্বাই অঞ্চলে নেতৃত্ব করেন আত্মারাম পাণ্ডুরংগ তারখুদ, বাসুদেব বাবাজী নৌরংগী, বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী প্রভৃতি এবং মাদ্রাজে নেতৃত্ব করেন কাশীবিশ্বনাথ মুদালিয়ার ও বীরেশলিংগম প্রভৃতি। সর্বত্রই নবশিক্ষিত যুবকদল সংস্কার-প্রচেষ্টায় যোগ দিয়েছিল।

ধর্ম-সংস্কার ঃ ইংরেজ আমলে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা আমাদের দেশের লোকদের খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা হিন্দুধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করতে জাতিভেদ, মূর্তিপূজা, বহু দেবদেবীর আরাধনা ও হিন্দু সমাজে প্রচলিত নানা কু-সংস্কারের কথা প্রচার করে বেড়াতেন। তখন রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্মকে সংস্কার করে উদার সমন্বয় ও প্রকৃত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়াসী হলেন।

রামমোহন কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন, পাটনায় আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি ইংরেজী, গ্রীক, হিব্রু ও সিরীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থসমূহ গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন ইউরোপীয় যুক্তিবাদীদের ভাবধারার সংগে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও প্রধান প্রধান সমস্ত ধর্মনীতির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। সে সমন্বয় তাঁকে একেশ্বরবাদী করে তুলেছিল।

তিনি প্রচার করলেন যে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা হিন্দুদের মূলকথা। এ তত্ব আলোচনার জন্য তিনি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রহ্মোপাসনার জন্য এক সভা স্থাপন করেন—এই সভাই 'ব্রাহ্ম সমাজ' নামে খ্যাতিলাভ করে।

মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তিনি ফার্সী ভাষায় একখানা বই লেখেন ('তুহফাৎ'—১৮০৪)।

সেকালের অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ও পরিবার তাঁর মতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

রামমোহনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে ব্রতী হলেন। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯) স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথের পর ব্রাহ্মসমাজের নেতা হন কেশবচন্দ্র সেন। কালক্রমে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের গণ্ডিবহির্ভূত এক স্বতন্ত্র ধর্মের মতো হয়ে দাঁড়ায়।

কেশবচন্দ্র সেনের সময়ে আর একজন ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর নাম—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তিনি নিজের জীবনে হিন্দুধর্মের সকল

প্রকার সাধনা এবং ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মানুযায়ী সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করেন ও প্রচার করেন "যত মত তত পথ।" বিভিন্ন ধর্মমতে উপাস্য ঈশ্বরে ঈশ্বরে বা মানুষে মানুষে প্রভেদ অস্বীকার করে তিনি এক প্রেম ও সমন্বয়ের পথ প্রদর্শন করেন। মূর্তিপূজার মাধ্যমেও আধ্যাত্মিক চরম উপলব্ধি সম্ভব, তা প্রমাণ করে তিনি হিন্দুধর্মের শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সমসাময়িক প্রায় সমস্ত বাঙালী মনীষী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর যোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে তাঁর মত বহুবিস্তৃতি লাভ করে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশন' জনকল্যাণ ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত।

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কার-আন্দোলন বোম্বাই-অঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে 'পরমহংস সভা' স্থাপিত হয়। পরে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে 'প্রার্থনা সমাজ' স্থাপিত হয়। এ সমাজের দুজন প্রধান কর্মীর নাম মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর। 'প্রার্থনা সমাজ' সমাজ সংস্কারেই বেশী মনোযোগী হয়েছিল।

হিন্দুধর্ম সংস্কার করে প্রাচীন বৈদিক আর্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত 'আর্য সমাজ'-এর নেতৃত্বে পঞ্জাবে অপর এক ধর্মসংস্কার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। 'আর্য সমাজ' শুদ্ধি-আন্দোলন (শুদ্ধি = অহিন্দুকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করার অনুষ্ঠান) প্রবর্তন করে।

প্রশ্ন

১। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর।

[Narrate, in brief, the history of the Renaissiance of Bengal in the nineteenth century.]

———

জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা

জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঃ সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই ভারতীয়দের মনে জাতীয় চেতনার সঞ্চার হচ্ছিল। জাতীয় চেতনার বহুবিধ বিকাশ হয় বাংলা দেশে। নীলকরেরা নীল চাষ করবার জন্য কৃষকদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করছিল। জাতীয় চেতনা এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট রূপ নেয়। কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় চারিদিকে। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনী তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এ অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সে নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। পাদ্রী লঙ্ সাহেবের নামে সে অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ফলে লঙ্ সাহেব ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে মামলা হয়। তখন নীলকরের অত্যাচার নিয়ে দেশব্যাপী আলোড়ন হয় এবং এতে দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগে।

সেকালের নেতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। সে সময়কার **হিন্দু মেলা** সংগঠন, শিশিরকুমার ঘোষের **"অমৃতবাজার পত্রিকা"** প্রতিষ্ঠা, **ইণ্ডিয়ান লীগ** প্রতিষ্ঠা, আনন্দমোহন বসুর **স্টুডেণ্টস্ অ্যাসোসিয়েশান** স্থাপন, ব্রাহ্মদের উদ্যোগে **ভারত সভা** (Indian Association) স্থাপন জাতীয়তার উন্মেষ ও প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

কংগ্রেস—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দেবার জন্য তখন গড়ে তোলে এক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান—গোড়াপত্তন হয় ভারতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫ খ্রীঃ অঃ)।

প্রথম দিকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শিল্পপতি দাদাভাই নৌরজী, গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে প্রমুখ শিক্ষিত ধনী ও মধ্যবিত্ত নেতারাই ছিলেন কংগ্রেসের পরিচালক। এঁরা ইংরেজদের বিরোধিতা করতে চান নি। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে কয়েকটা বেশী চাকরী, কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রভৃতিই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। আবেদন-নিবেদনের মধ্যে দিয়েই ইংরেজ সরকারের কাছে তাঁরা তাঁদের দাবিগুলো জানাচ্ছিলেন—ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের কথা তাঁদের কল্পনাতেও স্থান পায় নি।

বংগভংগ ও প্রতিক্রিয়া—উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীঃ অঃ)। দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণকে অর্থসাহায্য দান করে, লবণ কর প্রায় অর্ধেক কমিয়ে, অল্প-উপায়ী ভারতীয়দের আয়কর হতে মুক্তি দিয়ে এবং কৃষি-ব্যবস্থার বহু সংস্কার সাধন করে তিনি ভারতীয় জনগণের চিত্ত জয় করতে চেষ্টা করেন। শিক্ষা-ব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনবার জন্য তিনি 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন' পাশ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল ভারতীয় পুরাকীর্তিগুলির সংরক্ষণের জন্য আইন প্রবর্তন। পুরাকীর্তি রক্ষা ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য তিনি পুরাতত্ত্ব বিভাগও প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সমস্ত ভাল ভাল কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি এমন একটি কাজ করে বসেন যার ফলে সমস্ত বাংলাদেশ তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে ওঠে। কার্জন লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাঙালীর মস্তিষ্কই কংগ্রেসকে পরিচালিত করছিল। সুতরাং কংগ্রেসকে শক্তিহীন করবার জন্য, শাসনকার্যের সুবিধার অছিলায় বাংলাদেশকে তিনি দু'খণ্ডে ভাগ করে ফেললেন—এর বিরুদ্ধে শত আবেদনেও তিনি কান দিলেন না। এক খণ্ড অর্থাৎ পশ্চিম বাংলাকে জুড়ে দেওয়া হল বিহার ও উড়িষ্যার সংগে, দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ পূর্ব বাংলাকে জুড়ে দেওয়া হল আসামের সংগে।

এতে বাংলার তরুণ দল ক্ষেপে উঠল। বিলিতী জিনিস বর্জন করে স্বদেশী জিনিস দিয়ে তার অভাব পূর্ণ করব, দেশে জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করব, দেশের শিল্পের উন্নতি করব, দেশের টাকা দেশেই রাখব, ইংরেজকে লুটতে দেব না—ইত্যাদি সংকল্প নিয়ে অপূর্ব উৎসাহ ও উন্মাদনার সংগে তারা এক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সংগে বাংলাদেশের আরো অনেক মনীষীই সেদিন এসে দাঁড়িয়েছিলেন এই তরুণ দলের পুরোধা রূপে। জাতির সমস্ত শক্তি যাতে সংহত হয়ে ইংরেজের এই জঘন্য ব্যবস্থাকে বাধা দিতে পারে তার জন্য রাখী-পূর্ণিমার দিনে হিন্দু-মুসলমান সমস্ত বাঙালীর হাতে রাখী পরিয়ে দেবার এক বিপুল ঘটা দেখা দিল। সেদিন বাঙালী জাতির মানসতটে জাতীয়তাবোধের এক উত্তাল তরংগ এসে আঘাত করেছিল।

বাঙালী তরুণদের এই উদ্দীপনা লক্ষ্য করে ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে গেল। তবু ইংরেজ তখন নির্মমভাবে তার অত্যাচারের লৌহশকট এই আন্দোলনের বুকের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিল। দাঁতের বদলে দাঁত চাই, চোখের বদলে চোখ—এই সংকল্প নিয়ে ইংরেজের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যও দেশের নানা জায়গায় গড়ে উঠল বহু গুপ্তসমিতি। গীতার কর্মযোগ এই সমস্ত সমিতির সভ্যদের প্রেরণা যোগাল, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' হল তাঁদের সাধন-মন্ত্র। ঋষি অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ নেতারা হলেন এই সমস্ত গুপ্তসমিতির নায়ক। ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ স্বাধীনতা-সংগ্রামী যোদ্ধাদের হাতে বহু ইংরেজ কর্মচারীকে এবং সেই সংগে ইংরেজের অনুগ্রহ-ভাজন অনেক অত্যাচারী বাঙালী কর্মচারীকেও প্রাণ দিতে হল। স্বাধীনতা আন্দোলনকে গলা টিপে মারবার জন্য ইংরেজের পুলিশ অকথ্য অত্যাচার চালাতে লাগল। স্বদেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাই প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক নির্ভীক যোদ্ধাই ইংরেজের ফাঁসির দড়ি গলায় পরে হাসতে হাসতে প্রাণ দিলেন। ব্যর্থ হয় নি তাঁদের সেই আত্মদান—"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই"—ভারতবাসীর মনোমন্দিরে তাঁরা চিরকাল অমর হয়েই থাকবেন।

মর্লি-মিণ্টো সংস্কার (১৯০৯)—ইতোমধ্যে কংগ্রেসের মধ্যেও এক চরমপন্থী দলের আবির্ভাব হয়েছিল। লোকমান্য বালগংগাধর তিলক, বাগ্মিবর বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ ছিলেন এই চরমপন্থীদের নেতা। তাঁরা বললেন—ইংরেজের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, কংগ্রেসের আর 'আবেদন আর নিবেদন থালা বহি বহি নতশির' হয়ে থাকলে চলবে না, ইংরেজের হাত থেকে জোর করে ছিনিয়ে আনতে হবে অমূল্য রত্ন—স্বদেশের স্বাধীনতা। তখন ভারত-সচিব ছিলেন কূটবুদ্ধি লর্ড মর্লি এবং ভারতের বড়লাট ছিলেম লর্ড মিণ্টো। তাঁদের সুপারিশে এক শাসন-সংস্কার আইন পাশ হল। শাসন-পরিষদে ও ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় সদস্যদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হল, সামান্য কিছু শাসনতান্ত্রিক সংস্কারও যে সাধিত হল না তা নয়। ফলে ভারতের মুক্তি আন্দোলন কিছুটা ধামাচাপা পড়ে গেল। বিপ্লবীরা কিন্তু এতেও নিরস্ত হলেন না, গোপনে গোপনে তাঁদের কাজ করে চললেন।

মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের পর এক বৎসর যেতে না যেতেই তখনকার বড়লাট লর্ড হার্ডিংয়ের গাড়ীর ওপর বোমা পড়ল। হার্ডিং আহত হলেন, তাঁর একজন অনুচর মারা পড়লেন। হার্ডিং বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞের মতোই এই বিপ্লবের মূল কারণ দূর করতে চাইলেন। যাতে ভাঙা বাংলা-দেশকে আবার আগেকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারা যায় তার জন্য তিনি তোড়-জোড় করতে লাগলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড-রাজ ও ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ ও মহারাণী মেরী ভারতে এলেন। ধূমধামের সংগে দিল্লীতে সম্রাট্-দম্পতীর অভিষেক হল। ভাঙা বাংলা আবার জোড়া লাগল, তবে কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হল দিল্লীতে—এখনও দিল্লীই ভারতের রাজধানী। হৈ-চৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে ভারতবাসী কিছুদিনের জন্য তাদের পরাধীনতার জ্বালা ভুলে রইল।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার—কিছুদিন যেতে না যেতেই ইউরোপে বেজে উঠল প্রথম মহাযুদ্ধের রণ-দামামা। এই সুযোগে ইংরেজের হাত থেকে

দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবার জন্য ভারতের দিকে দিকে বিপ্লবীরা তৎপর হয়ে উঠলেন। সশস্ত্র বিপ্লব অনুষ্ঠানের জন্য জার্মানি প্রভৃতি দেশ হতে অস্ত্রশস্ত্র গোপনে আমদানি করবার চেষ্টা হতে লাগল। পঞ্জাবের গদর দল এবং বাংলার 'বাঘা' যতীন (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), রাসবিহারী বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ-পরিচালিত সন্ত্রাসবাদী দলগুলো এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নেয়। বিভিন্ন স্থানে সরকার পক্ষের সংগে বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষও ঘটেছিল। এ রকমই এক সংঘর্ষে বালেশ্বরে 'বুড়ি বালামের তীরে' বিপ্লবী বীর বাঘা যতীন দেহরক্ষা করেন।

সরকার পক্ষের সতর্কতা এবং বিপ্লবীদের অনভিজ্ঞতার জন্য এই সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন সাফল্যলাভ করতে পারে নি। কিন্তু বিপ্লবী বীরদের কার্যকলাপ যে সাধারণ ভারতবাসীর মনেও গভীর সাড়া জাগিয়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইংরেজ সরকার বিপ্লব আন্দোলনকে অংকুরেই বিনষ্ট করলেও সেই সংগে বুঝতে পেরেছিল যে, জার্মানির সংগে যুদ্ধে ভারতের বীর যোদ্ধাদের সাহায্য ও ভারতবাসীর সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজন। বিনিময়ে, যুদ্ধশেষে ভারত-বাসীকে স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রতিশ্রুতিও দিল ইংরেজরা। চার বৎসর যুদ্ধ চলার পর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাইয়ের সন্ধির সংগে সংগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ওপর যবনিকা পড়ল। ভারত সচিব মিস্টার মণ্টেগু আর বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সুপারিশে একটি শাসন-সংস্কার আইনও পাশ করল ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট। কিন্তু, হায়! বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াই হল। স্বায়ত্তশাসনের নামে ভারতবাসী যা পেল, তা হল আইনসভায় কয়েকটা বেশি আসন আর যৎসামান্য রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। আশাভংগে আবার গভীর অসন্তোষ এসে ভারতবাসীর মন জুড়ে বসল।

মহাত্মা গান্ধী—এমন সময় ভারতের রাষ্ট্রনীতির আকাশে নব নক্ষত্রের মতো উদয় হলেন গান্ধীজী। তিনি ছিলেন রাজকোট রাজ্যের এক দেওয়ানের ছেলে। তরুণ বয়সে বিলেতে গিয়ে আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের

ছেলের মতোই ব্যারিস্টারী পাশ করে তিনি দেশে ফেরেন। কিছুদিন পরে আফ্রিকায় একটি মামলা চালাবার ভার পেয়ে তিনি আফ্রিকা যান। সেখানে আফ্রিকাবাসী ইংরেজরা তখন প্রবাসী ভারতবাসীদের এবং আফ্রিকার আদিবাসীদের ওপর যে অত্যাচার চালাচ্ছিল তাতে গান্ধীজী মনে বড় রূঢ় আঘাত পেলেন। ইংরেজের ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে তাঁর পূর্বে যে উচ্চ ধারণা ছিল তা বদলে গেল। সত্যের আলোকে তাঁর চিত্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নির্য্যাতিত অপমানিত মানুষের পক্ষ অবলম্বন করে ইংরেজদের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সত্য এবং অহিংসার অমোঘ অস্ত্র নিয়ে তিনি পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। এর জন্য, ইংরেজদের হাতে তাঁকে ও তাঁর অনুগামীদের বহু লাঞ্ছনা, অপমান, ও অত্যাচার সহ্য করতে হল। বহুবার কারাবরণও করতে হল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু জয় হল তাঁরই—মানুষ বলে স্বীকৃতি পেল আফ্রিকার আদিবাসীরা ও আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়েরা। তখনই সারা পৃথিবী অবাক হয়ে এই শীর্ণদেহ সত্যব্রতীর দিকে তাকিয়ে রইল।

কয়েক বৎসর পরে আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে তিনি এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফুর খাঁ প্রমুখ জননেতারা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। ইংরেজের অন্যায় অত্যাচার ও গুলি-গোলা-বারুদের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংসা ও সত্যের হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়াল ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস গান্ধীজীর পরিচালনায় জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল।

খিলাফৎ আন্দোলন: গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ—প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের ফলে তার মিত্র তুরস্কের খলিফাকে রাজ্য হারাতে হয়েছিল। কিন্তু খলিফা ছিলেন সারা পৃথিবীর মুসলমানদের ধর্মগুরু। ইংরেজ ও তার মিত্রশক্তির জন্য খলিফাকে রাজ্য হারাতে হয়েছিল বলে ভারতের মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হল। খিলাফৎ আন্দোলন নামে এক আন্দোলনের

মধ্য দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের অসন্তোষ প্রকাশ পেল।

এই সময় গান্ধীজীও ইংরেজের বিরুদ্ধে অহিংস গণ-আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন (১৯২০ খ্রীঃ অঃ)। এই দুই আন্দোলন একত্রে মিশে গিয়ে এক বিরাট রূপ ধারণ করল। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ই সাময়িকভাবে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করল। ছাত্ররা স্কুল কলেজ ছাড়ল, উকিলরা আদালতে যাওয়া বন্ধ করল। বাজারে বাজারে চলল হরতাল, বিদেশী দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি। অবশেষে কয়েকটি জায়গায় কেউ কেউ হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করায় গান্ধীজী সাময়িকভাবে আন্দোলন বন্ধ করলেন। পরে আবার আইন অমান্য আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ প্রভৃতি নানা যুগান্তকারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী গান্ধীজীকে অনুসরণ করে স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হয়েছিল।

ইংরেজ সরকার এই গণবিক্ষোভ শান্ত করবার জন্য ভারতের সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে তিনটি গোল টেবিল বৈঠক বসাল। শেষের গোল টেবিল বৈঠক থেকে গান্ধীজী শূন্যহাতে দেশে ফিরলেন। ইংরেজ সরকার বিশেষ কিছুই দিল না। আবার আন্দোলন চলল (১৯৩০ খ্রীঃ অঃ)। গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস আন্দোলন ছাড়াও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি সশস্ত্র বিপ্লব-আন্দোলনও দেখা দিল। ইংরেজ তখন আবার এক শাসন সংস্কার আইন পাশ করল (১৯৩৫ খ্রীঃ অঃ)। ভারতবাসী কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও "ভারত-ছাড়ো" আন্দোলন—দেখতে দেখতে এসে পড়ল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। হিটলারের সংগে যুদ্ধে ভারতবাসীর সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে চলবে না—এ কথা ইংরেজ বেশ ভাল করেই বুঝতে পারল। এবারও, যুদ্ধশেষে স্বাধীনতা দেবার কথা বিবেচনা করা হবে—এই বলে তারা ভারতের মন ভোলাবার চেষ্টা করল। কিন্তু এবার আর ভারতবাসী ভুলল না।

কিছুদিন পরে জাপানীরাও যুদ্ধে নামল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। সিংগাপুর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি এক এক করে কেড়ে নিয়ে ভারতের দিকে তারা অগ্রসর হয়ে এল। ইংরেজ দেখল মহা বিপদ! ভারতবাসীর সাহায্য ছাড়া এবার আর রক্ষা নেই। তখন ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভার কাছ থেকে এক প্রস্তাব নিয়ে বিলেত থেকে এলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস। কিন্তু এই প্রস্তাবের ফাঁকা বুলিতে ভারতবাসীর মন ভরল না। মহাত্মাজী তখন ইংরেজকে বললেন—ভারত ছাড়ো তোমরা।

তখন তাঁকে আর দেশের অন্য অন্য নেতাদের বন্দী করে ইংরেজ এর উত্তর দিল। দেশবরেণ্য নেতাদের ওপর এই অত্যাচারে দেশবাসী ক্ষেপে উঠল। দেশের নানাদিকে দেখা দিল দারুণ বিপ্লব।

নেতাজী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ—এদিকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নেতাজী সুভাষ এই ঘটনার এক বছর আগে ইংরেজদের কড়া পাহারা এড়িয়ে ভারতের বাইরে পালিয়ে গিয়ে ইংরেজের শত্রুদের সংগে যোগ দিয়েছিলেন। জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলেছিলেন। যুদ্ধ করতে করতে জাপানীদের সংগে তাঁরাও এই সময় ভারতের পূর্বদ্বার প্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন। ইংরেজ আতংকিত হয়ে উঠল। তারা বুঝল যে, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জিতলেও ভারতে আর তাদের ঠাঁই হবে না।

ভারতের স্বাধীনতা লাভ—রাশিয়া ও আমেরিকার সাহায্যে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই জয়ী হল। কিন্তু এবার ভারতবাসীর মনের গতি লক্ষ্য করে তারা সত্য-সত্যই ভারত ছেড়ে দিতে বাধ্য হল! ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট বহু-আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বাদ পেল ভারতবাসী। জাতির জনক গান্ধীজীর নেতৃত্বে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ জানা-অজানা লক্ষ লক্ষ দেশভক্তের সাধনায় এবং নেতাজী সুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজের অসাধারণ বীরত্বেই এই অসাধ্য-সাধন শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের কথা

এই যে, ভারত ছাড়বার পূর্বক্ষণেও কূটনীতি-বিশারদ ইংরেজ শেষবারের মতো পদাঘাত করতে ছাড়ল না। মুসলিম লীগ (প্রতিষ্ঠিত ১৯০৬ খ্রীঃ অঃ)-নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার দাবি ছিল যে হিন্দু ও মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি, সুতরাং আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি অনুসারে এই দুই জাতির জন্য দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র থাকা ন্যায়সংগত। এই দাবি সমর্থন করে ইংরেজরা ভারতবর্ষকে হিন্দু-প্রধান 'ভারত' ও মুসলমান-প্রধান 'পাকিস্তান' এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করে ভারতের অখণ্ডত্ব নষ্ট করে দিল, এবং নবগঠিত এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করে গেল।

সাধারণতন্ত্রী ভারত—স্বাধীনতা লাভের পর দু-বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্বাধীন ভারতের গণপরিষদ রচনা করল ভারতের সংবিধান—১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী থেকে এই সংবিধান প্রচলিত হয়েছে। এই সংবিধান অনুসারেই ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের রাষ্ট্রপতিত্বে ও মহাত্মাজীর মন্ত্রশিষ্য শ্রীজওহরলাল নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বে বর্তমান ভারতের শাসনকার্য চলছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে দেশে পুনর্গঠনের কাজও সুরু হয়ে গিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতও যে শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে দেখা দেবে তারও আশা দেখা যাচ্ছে। জওহরলালজীর নেতৃত্বে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের আন্তরিক প্রচেষ্টা বিশ্বের দরবারে ভারতকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

ভারতের সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ভারতে এক সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সে অবস্থায় ভারতীয় সমাজ পৌঁছবে অহিংস ও নিরুপদ্রব উপায়ে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল কথা সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে—অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য। সমাজব্যবস্থার ভিত্তি হবে ন্যায়; জাতি-ধর্ম-শ্রেণীনির্বিশেষে সকলে সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হবে; আত্মবিকাশের সুযোগ সকলের জন্য সমানভাবে অবারিত থাকবে।

ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সামনে রেখে সুপরিকল্পিত উপায়ে ও পথে অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

প্রশ্ন

১। কিভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয় সংক্ষেপে বল।

[Narrate, in brief, how national consciousness rose in the minds of the people of India against the British.]

২। লর্ড কার্জনের বংগ-ভংগ ও তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে যা জান বল।

[Write what you know about Lord Curzon's Partition of Bengal and its consequences.]

৩। গান্ধীজীর পরিচালনায় ভারত কি ভাবে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যায়, উহা সংক্ষেপে বল।

[State, in brief, how India, under the leadership of Mahatma Gandhi, went forward on the road to freedom.]

তৃতীয় ভাগ

রাষ্ট্র ও নাগরিক

॥ সমাজ-জীবন ॥

ভূমিকা ঃ মানুষ সামাজিক জীব। সংগপ্রিয়তা তার সহজাত প্রবৃত্তি। বিভিন্ন কাজে মানুষ চায় পারস্পরিক সহযোগিতা। পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করার ও স্নেহ-ভালবাসা-প্রীতি বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন বনে-জংগলে ঘুরে বেড়াত, তখনও সে বিচ্ছিন্নভাবে একক জীবন যাপন করত না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি জন্তু-জানোয়ারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে, আহার্য সংগ্রহের জন্যে, সেবা-শুশ্রূষা স্নেহ-ভালবাসা পাবার জন্যে সেদিনও মানুষ দল বেঁধেই থাকত—সংগিহীন জীবন সেদিনও মানুষের পক্ষে ছিল দুঃসহ।

ক্রমে মানুষ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হতে লাগল ততই তার এই সংগপ্রিয়তা থেকে এক এক ধরণের সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল। এইভাবেই গড়ে উঠল এক একটা **পরিবার**। ক্রমে কতকগুলো পরিবার নিয়ে গড়ে উঠল এক একটা **গোষ্ঠী**। এক একটা গোষ্ঠী থেকে ক্রমে গড়ে উঠল এক একটা **জাতি**। ক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার অধিবাসী বিভিন্ন জাতির লোকেরা তাদের নিজের নিজের দেশে গড়ে তুলল সার্বভৌম-ক্ষমতাসম্পন্ন এক বিশেষ ধরণের সামাজিক সংগঠন। তাকেই বলা হয় **রাষ্ট্র**।

রাষ্ট্র ঃ যে ধরণের সামাজিক সংগঠনকে রাষ্ট্র বলা হয় তার বৈশিষ্ট্য হল ঃ প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটা **নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে** স্থায়ী অধিকার থাকা চাই। এই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে তার **কর্তৃত্ব** হবে **সার্বভৌম**—কোন বহিঃশক্তি বা সংগঠন কি কোন আভ্যন্তরীণ শক্তি বা সংগঠন এই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে তার ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবে না। আদর্শ উপলব্ধির পথে সুশৃংখলভাবে অগ্রসর হবার জন্যে রাষ্ট্রের হাতে থাকবে এক সুগঠিত **শাসনযন্ত্র**। এই শাসনযন্ত্রের নির্দেশ রাষ্ট্রের সভ্যদের অধিকাংশই স্বভাবতঃ মেনে চলবে। সংক্ষেপে বলা চলে—**কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে যার স্থায়ী অধিকার থাকে, এবং সেই**

নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে অন্য কোন শক্তি বা সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ যার ওপর খাটে না, যার হাতে থাকে এমন এক সুগঠিত শাসন-ব্যবস্থা ঐ ভূখণ্ডের অধিকাংশ অধিবাসী স্বভাবতঃই যার অনুগত, বহুসভ্যবিশিষ্ট সেই ধরণের জনসমাজকেই বলে রাষ্ট্র।

নাগরিক ঃ 'নাগরিক' কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—'নগরের বাসিন্দা'। অনেক দিন আগে গ্রীস যখন য়ুরোপের দেশগুলোর মধ্যে সভ্যতায় ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ, তখন গ্রীসে এক-একটা নগর (আর তার খুব কাছাকাছি সামান্য কয়েকটা গ্রাম) নিয়ে তৈরী হত এক-একটা রাষ্ট্র। এই সমস্ত রাষ্ট্রকে বলা হত **নগর-রাষ্ট্র** (City-State)। এই সব নগর-রাষ্ট্রের যে সমস্ত পুরুষ বাসিন্দা রাষ্ট্রের শাসন-কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারত, মাত্র তাদেরই সেকালে নাগরিক বলা হত—স্ত্রীলোক ও ক্রীতদাসেরা নাগরিক বলে গণ্য হত না। এখন অবশ্য গ্রীসের সেদিন নেই, আর নগর-রাষ্ট্র বলেও কিছু নেই। একটা মাত্র নগরের মতো অতটুকু ভূখণ্ড নিয়ে আজকালকার দিনে কোন রাষ্ট্র গড়ে ওঠার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। তবে সেই প্রাচীন কাল থেকেই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের বোঝাতে সাধারণভাবে 'নাগরিক' কথাটাই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অবশ্য নাগরিক কথাটা এতখানি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন না। তাঁদের মতে—কোন রাষ্ট্রের যে-সমস্ত বাসিন্দা সেই রাষ্ট্রেরই অনুগত, এবং যাদের সেই রাষ্ট্রে নির্বিঘ্নে সম্পত্তি ভোগ-দখল করার, লেখাপড়া করার, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে নিরাপদে পারিবারিক জীবন যাপন করার, আর এমনি ধারা আরও নানা সামাজিক অধিকার রয়েছে, আর সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের শাসন-কাজ পরিচালনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অংশ নেবার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারও রয়েছে, কেবল সেই সমস্ত বাসিন্দাই হল সেই রাষ্ট্রের নাগরিক। অর্থাৎ—**সামাজিক আর রাষ্ট্রনৈতিক দু-রকম অধিকারই যাদের আছে, রাষ্ট্রের অনুগত এমন সমস্ত অধিবাসীকেই মাত্র নাগরিক বলা যায়,** রাষ্ট্রের বাকী বাসিন্দারা নাগরিক নয়।

মানুষের পারিবারিক ও স্থানীয় জীবন ঃ এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একই প্রাকৃতিক পরিবেশে, একই প্রকার প্রত্যয়-প্রতীতি, আশা-আদর্শ ও রীতি-নীতি অবলম্বন করে সমবেত জীবনযাপনকারী যে মনুষ্য-সমাজ আমরা আজ দেখি তার প্রাচীনতম ও ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠান **পরিবার**। আদিম মানুষের সংগপ্রিয়তার ভিত্তিতেই এই সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠেছে।

স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদি নিয়ে এক একটা পরিবার গড়ে ওঠে। পরিবারস্থ সকলের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ ও প্রত্যক্ষ আত্মীয়তা থাকে। পিতা-মাতা ও শুধু তাদের সন্তানাদি নিয়ে কোন পরিবার গঠিত হলে সে পরিবারকে একক পরিবার (Single Family) বলা হয়। অনেকগুলো একক পরিবার মিলে একটি বৃহত্তর পরিবার যৌথ পারিবারিক জীবন যাপন করলে তাকে যৌথ পরিবার (Joint Family) বলা হয়। (মনে কর, বাবা-মা, তাদের তিন ছেলে, তাদের স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততি একই পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করে। এরা সবাই মিলে একটা যৌথ পরিবার হল।)

কিছুকাল আগে পর্যন্ত আমাদের দেশের পরিবারগুলি যৌথ ছিল। যৌথ পরিবার আমাদের দেশের (বিশেষতঃ হিন্দু সমাজের) সমাজ-গঠনের একটা বিশেষত্ব ছিল। তবে আধুনিক নাগর সভ্যতার ফলে যৌথ পরিবার প্রায় ভেঙে গেছে বা দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে।

পরিবারের গঠন যাই হোক্, মানব শিশু কোন না কোন এক ধরণের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। সদ্যোজাত অসহায় মানবশিশু পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনের সযত্ন লালন-পালন ছাড়া বাঁচতেই পারে না। পশু-পাখী, জন্মের কিছুকাল পরেই, নিজের নিজের চেষ্টায় বাঁচতে শেখে, কিন্তু মানব শিশুর অসহায় শৈশব দীর্ঘকালস্থায়ী। সেই অসহায় শৈশবে শিশু প্রধানতঃ মায়ের ওপরই নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু মায়ের পারিবারিক আবেষ্টন দরকার। সন্তান-পালন মায়ের একার সাধ্য নয়।

শুধু বেঁচে থাকা বা বেঁচে থাকার কৌশল আয়ত্তীকরণ মানব শিশুর পক্ষে যথেষ্ট নয়। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে প্রয়োজন তার শিক্ষার, তার চরিত্রগঠনের।

ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি হিসেবে শিশুর শিক্ষা ও চরিত্রগঠন আরম্ভ হয় তার পারিবারিক পরিবেশে।

পারিবারিক জীবনের শিক্ষা ঃ পরিবারের ভিত্তি পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মমতা, সহানুভূতি ও দশে-মিলে ভোগ করার প্রবৃত্তি। পরিবারে আমরা অপরের কাছে স্নেহ-মমতা পাই এবং অপরের প্রতি স্নেহ-মমতাশীল হই, আমাদের সুখে-দুঃখে অপরে সুখী বা দুঃখিত হয়। তাই, আমরা অপরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হই। বিত্ত-সম্পত্তি থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র সামগ্রী পর্যন্ত পরিবারস্থ সকলে ভাগ করে ভোগ করে। এ থেকে এক বিশেষ নৈতিক শিক্ষা লাভ হয় এবং লোভ ও আত্মকেন্দ্রিকতা সংযত হয়।

পরিবারস্থ এক ব্যক্তি তার চেয়ে ছোট, বড় ও তার সমান অন্যান্যদের সংগে বাস করে। তরে ফলে সে ছোটকে আদেশ করতে, বড়কে মানতে ও সমানের সংগে সহযোগিতা করতে শেখে। এ শিক্ষা পরবর্তী জীবনে অত্যাবশ্যক।

পারিবারিক জীবনযাপনের ফলে, পারিবারিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা লাভ করে। মানুষ পারিবারিক জীবনের মাধ্যমে কৌলিক বৃত্তি শেখে ও সে বৃত্তিকে কেন্দ্র করে তার অর্থনৈতিক শিক্ষা সুরু হয়।

সংঘ-জীবনের শিক্ষা ঃ মানবশিশু যত বড় হতে থাকে তার জীবনের পরিধি তত বাড়ে। ক্রমশঃ সে পরিবারের লোকজন ছাড়া অন্যান্যদের সংস্পর্শে আসে। সে অন্যান্যদের সংগে খেলে, খেলার সংগীদের সংগে মেলামেশা করে। সে স্কুলে-কলেজে যায়, সেখানে সহপাঠীদেরর সংগে তার নানা সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারপর সে সমবৃত্তি-অবলম্বীদের সংগে যুক্ত হয় ঃ নানা ক্লাব-এ, পার্টিতে, ট্রেড ইউনিয়ন-এ যোগ দেয়।

স্কুল, কলেজ, ক্লাব, ট্রেড ইউনিয়ন ও সভা-সমিতি ইত্যাদি সংগঠন পরিবারের মতই এক একটি মানবগোষ্ঠী। তবে, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিবার থেকে ভিন্ন ধরণের।

পরিবারের সকলের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা থাকে। কিন্তু এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সভ্যদের মধ্যে কোন আত্মীয়তা থাকে না। তারা সকলে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মিলিত হয় (যেমন ফুটবল খেলার জন্যে ফুটবল ক্লাব)। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, সভ্য হবার বা সভ্যপদ হারাবার সর্ত ও নিয়মাবলী ও কার্য-পরিচালনবিধি ইত্যাদি ঘোষণা করা হয়ে থাকে ও লিপিবদ্ধ থাকে। কিন্তু পরিবার গঠনের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বা নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ নেই বা কেউ কখনও কারো কাছে ঘোষণা করে নি। মানুষের প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির তাগিদে স্বাভাবিকভাবে এই সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের দ্বারাই এ সংগঠন নিয়ন্ত্রিত হয়।

আধুনিক সভ্য সমাজে বিভিন্ন প্রকারের বহু সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং বহু লোক নিজ নিজ রুচি অনুসারে এই সমস্ত সংগঠনের সভ্য হয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে নাগরিকেরা এই জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলার ও যে কোন সংগঠনের সভ্য হবার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। এই স্বাধীনতা আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের এক মৌলিক অধিকার। শুধু তাই নয়, একই ব্যক্তি একাধিক সংগঠনেরও সভ্য হতে পারে।

রক্তের সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়-স্বজন নিয়ে গঠিত পরিবার ব্যক্তির অন্তরংগ গোষ্ঠী (Inner Circle) এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংঘ ইত্যাদি তার বহিরংগ গোষ্ঠী (Outer Circle)। ব্যক্তির চরিত্র ও ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির জন্যে এই দুই গোষ্ঠীই প্রয়োজন।

বহিরংগ গোষ্ঠীর শিক্ষা ঃ বহিরংগ গোষ্ঠীগুলিতে নানা পরিবারের লোক মিলিত হয়। এ রকম গোষ্ঠীতে বহু লোকের সংগে মেলামেশায় আমাদের কূপমণ্ডুকতা দূর হয় ও সহানুভূতির ক্ষেত্র প্রশস্ততর হয়।

এ জাতীয় গোষ্ঠীতে বহু লোকের মতের সংগে নিজের মত মিলিয়ে কাজ করতে হয়। বহু মতের সংগে নিজের মতের সামঞ্জস্য বিধান করতে শেখা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক শিক্ষা এবং এ থেকে পরমতসহিষ্ণুতা আসে।

পরের মতকে নিজের মতের অনুকূলে আনার চেষ্টায় ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা হয়। দশে মিলে এক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় নেতৃত্বের বিকাশ ও অপরের নেতৃত্ব মানার শিক্ষাও অভ্যস্ত হয়।

দশের সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার সুযোগে ব্যক্তির চরিত্রের নানা সামাজিক দোষ দূর হয় এবং সে নানা সামাজিক গুণ লাভ করে। তবে, সংঘ সুজন নিয়ে গঠিত না হলে বা সংঘের উদ্দেশ্য সাধু না হলে ব্যক্তির চরিত্র দুষ্টও হতে পারে।

পরিবারের অন্তরংগ গোষ্ঠী ও নানা বহিরংগ গোষ্ঠী ব্যক্তি-চরিত্রে বিশেষ প্রভাবশীল হলেও পরিবারের প্রভাব অধিক শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী।

সুনাগরিকের গুণাবলী ঃ সমাজ ও রাষ্ট্র মানুষের কল্যাণের জন্যেই সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্র কল্যাণধর্মী হয়ে উঠতে পারে যদি নাগরিকেরা সুনাগরিকরূপে তাদের নাগরিক দায়িত্ব পালন করে। সে দায়িত্ব পালন করতে হলে নাগরিকদের মনে সমাজচেতনা বা রাষ্ট্রচেতনা থাকা দরকার। নাগরিককে বুঝতে হবে যে ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থ পরস্পরের সংগে জড়িত। সমাজের স্বার্থ রক্ষা না করলে ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষিত হয় না। ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্যেই ব্যক্তিকে অপরের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করতে হয়। ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থ একসংগে রক্ষার জন্যে নিয়ম-শৃংখলা বা আইন মানতে হয়।

এ মনোভাব কোন মূঢ় ব্যক্তির কাছে আশা করা যায় না। সুনাগরিকোচিত এ মনোভাবের জন্যে নাগরিকের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকা চাই। সেই বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশের জন্যে সুনাগরিককে শিক্ষিত হতে হয়।

সৎ ও স্বাধীন জীবিকা নির্বাহের ক্ষমতা প্রতিটি সুনাগরিককে অর্জন করতে হয়। না হলে সে সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছে ভারস্বরূপ এবং তার জন্যে সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সৎ ও স্বাধীন জীবিকার্জনের যোগ্যতা লাভ করতেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা প্রয়োজন। অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তি সমাজের বা রাষ্ট্রের কাছে বোঝার মত।

সুস্থ জীবন যাপনের জন্যে ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ও সামুদয়িক স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হতে হয়।

কোন নাগরিক যদি নিজের অধিকার ও স্বাধীনতা অবাধভাবে ব্যবহার করে তবে অপরের অধিকার ও স্বাধীনতা নষ্ট হতে বাধ্য। ভেবে দেখ, কেউ যদি তার বন্দুক ব্যবহারের অধিকার ও স্বাধীনতা অবাধভাবে ব্যবহার করে তবে অপর কারো প্রাণধারণের অধিকারই থাকবে না।

মোট কথা, সমষ্টির স্বার্থের জন্যে নিজের স্বার্থকে বলি দিতে যে কুণ্ঠিত হয় না, নিজের বা দলের স্বার্থের জন্যে যে রাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে না, রাষ্ট্রে কোন জটিল সমস্যা দেখা দিলে তা বোঝার, বিশ্লেষণ করার ও সমাধান করবার মত বুদ্ধির যার অভাব হয় না এমন উপযুক্ত-গুণসম্পন্ন নাগরিককেই বলা যায় সুনাগরিক।

উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ, অভ্যাস গঠন, সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনে নিরলস আত্মনিয়োগ দ্বারা সুনাগরিকত্ব লাভ করতে হয়।

জনস্বাস্থ্য ঃ আগেই বলা হয়েছে যে কোন অসুস্থ বা অক্ষম ব্যক্তি নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে পারে না এবং সে সমাজের ভারস্বরূপ। সুতরাং নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও সামুদয়িক স্বাস্থ্যবিধির প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। স্বাস্থ্যবান জনসমষ্টির শ্রমের ওপর সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্ভর করে।

আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশে এক সুদৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তুলতে হলে আমাদের অনেক শ্রম করতে হবে এবং শ্রম করার উপযুক্ত স্বাস্থ্যও আমাদের গড়তে হবে। কিন্তু জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে ভারত বা আমাদের পশ্চিম বংগ পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের চেয়ে অনেক পেছনে পড়ে আছে।

প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে বাৎসরিক মৃত্যুর হার আমেরিকায় ১৮, ইংলণ্ডে ১২, আর **ভারতে ২২**! হাজার-করা বাৎসরিক শিশু-মৃত্যুর হার ইংলণ্ডে ৫৮, আমেরিকায় ৬৪, অস্ট্রেলিয়ায় ৩৭ আর **ভারতে ১৬০**।

সারা ভারতেই জনস্বাস্থ্য আশানুরূপ নয়। নগরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে

জনস্বাস্থ্য আরও খারাপ। জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্যে স্বাস্থ্যপূর্ণ পরিবেশে নগর, গ্রাম ও গৃহ পরিকল্পনা করা এবং পুরনো নগর ও গ্রামের উন্নয়ন, পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ, বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানদান, পার্ক, ব্যায়ামাগার ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। সংক্রামক নানা রোগের প্রতিরোধ বা বিস্তার রোধ করতে সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে গবেষণা ও প্রতিরোধক টিকা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা দরকার।

রোগের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা প্রতিকার-ব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। রোগীর চিকিৎসার চেয়ে কারো রোগ না হয় তাই দেখাই সমাজের প্রথম কর্তব্য।

কিন্তু সম্ভাব্য সমস্ত প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সত্ত্বেও রোগ হয়। তাই, রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসা-ব্যবস্থাও সমাজের করণীয়। চিকিৎসা-ব্যবস্থার জন্যে হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আমাদের দেশে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান অনেক বেড়েছে ও বাড়ছে; তবে এখনও তাদের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। গ্রামাঞ্চলে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান বেশি প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমানে সেখানে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রচুর। আমাদের দেশে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে কোন চিকিৎসালয় বা ডাক্তার নেই।

পশ্চিম বংগে ৪৩১টি সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Health Centre), ৩১টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতাল, ৫৫টি থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ২২২টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে (১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের হিসেব)।

কলিকাতা কর্পোরেশন-এর নিজস্ব স্বাস্থ্যবিভাগ আছে। অনেক মিউনিসিপ্যালিটির হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা আছে। জেলা বোর্ড জেলার গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা-ব্যবস্থার জন্যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে।

পশ্চিম বংগে হাজার-করা বাৎসরিক মৃত্যুর হার কমে আসছে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জনস্বাস্থ্য দপ্তর স্থাপিত হয়েছে এবং তখন থেকে একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছেন। স্বাস্থ্যবিষয়ক

গবেষণা, বন্দর বিমানঘাঁটি রেলওয়ে এবং কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চল ও খনি অঞ্চলের স্বাস্থ্যরক্ষা, কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধি (যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ক্যান্সার প্রভৃতি) প্রতিকারের জন্যে গবেষণা ও প্রচার-পরিচালনা ও কতকগুলো সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য-দপ্তরের কাজ।

ভারতবর্ষ বিশ্বস্বাস্থ্যসংঘ (Word Health Organisation, সংক্ষেপে WHO) নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য এবং এই প্রতিষ্ঠান থেকে ভারত নানা সাহায্য পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রশ সংস্থা থেকেও ভারত জনস্বাস্থ্য-উন্নয়ন ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য পায়।

জনস্বাস্থ্য প্রধানতঃ প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারের (State Government) দায়িত্ব। রাজ্য সরকারেও স্বাস্থ্যদপ্তর ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছে। রোগ ও মহামারীর নিবারণ ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা এই দপ্তর পরিচালনা করে।

সমাজের ভবিষ্যৎ কিশোর আর যুবকদের ওপর নির্ভর করে। আমাদের কিশোর ও যুবক ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিষয়ে অনুসন্ধান করে নানা নৈরাশ্যজনক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তাই তাদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হয়েছে ও হচ্ছে। শুধু ছাত্রদের চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় এক হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার জন্যেও নানা ব্যবস্থা হয়েছে।

তবে এ কথা বুঝতে ও মনে রাখতে হবে যে, জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য-নীতি বিষয়ে জ্ঞানের বহুল প্রচার ও তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠিত না হলে আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন সম্ভব হবে না। আমাদের দেশে বাড়ী-ঘরের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে গৃহস্থেরা কিছুটা সচেতন হলেও, জনসাধারণের ব্যবহৃত স্থান বা যানবাহনের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই। এর ফলে নানা রোগ ছড়ায়।

অজ্ঞতা ও কুসংস্কারবশতঃ আমাদের দেশের জনসাধারণ আজও রোগ-প্রতিরোধক নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্বাসী নয়। এখনও বহু লোক দেখা

যায় যারা বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করতে টিকা নেয় না। শুধু বসন্ত নয়, আমাদের বহু রোগভোগের মূলে আছে আমাদের অজ্ঞতা আর কুসংস্কার। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে বহুল প্রচার দ্বারা লোকের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করা দরকার ও এ প্রচেষ্টায় সরকারকে ও শিক্ষিত জনসাধারণকে মিলিতভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

আমাদের দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য তাদের স্বাস্থ্যহীনতার এক বিশেষ কারণ। দারিদ্র্যের জন্যে আমাদের ঘর-বাড়ী, পরিবেশ ও খাদ্য স্বাস্থ্যকর নয়। আমাদের দেশের গরীব লোকেরা যে জীবন যাপন করে তাতে সুস্বাস্থ্য আশা করা যায় না।

বর্তমানে খাদ্যের অভাব ও দুর্মূল্যতার সংগে খাদ্যে ভেজাল এক নূতন সামাজিক সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে। সমাজ ও সরকারকে লোভী ব্যবসায়ীদের এই অপচেষ্টা কঠোরতার সংগে রোধ করতে হবে। সবচেয়ে দুঃখের কথা যে শিশু-খাদ্য ও ঔষধপত্রেও আমাদের দেশে ভেজাল চলছে।

আমাদের দেশের রন্ধন-প্রণালীও অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যপ্রাণ নষ্ট করে ও তার ফলে খাদ্যে পুষ্টির অভাব হয়। তাই সহজলভ্য খাদ্য কি ভাবে রন্ধন করলে যথেষ্ট পুষ্টিকর হয় এ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার আবশ্যক।

ব্যক্তিগত ও সামুদয়িক স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে চেষ্টা করা প্রত্যেক সুনাগরিকেরই কর্তব্য।

সামাজিক আমোদ-প্রমোদ ও কৃষ্টি : মানুষ যন্ত্র নয়। জীবিকার্জনের পরিশ্রমের পর শ্রম অপনোদন ও মানসিক বিনোদনের জন্যে তার আমোদ-প্রমোদ দরকার। আমোদ-প্রমোদ দেহ-মন দুইয়ের ওপরই প্রভাব বিস্তার করে—দুইকেই সজীব করে তোলে। আমোদ-প্রমোদ না থাকলে মানুষের জীবন একঘেয়ে ও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তা ছাড়া সামাজিক আমোদ-প্রমোদ সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে।

তাই, অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের সমাজে সামাজিক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। কোন নির্দিষ্ট সমাজের আমোদ-প্রমোদের রূপ

ও ব্যবস্থা সে সমাজের জনসাধারণের জীবিকার্জনের উপায় ও প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে। তবে, সাধারণভাবে দেখতে গেলে, নাচ-গান-অভিনয় অতি প্রাচীন কাল থেকেই প্রায় সমস্ত সমাজে চিত্ত-বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত। তখনও দিনের কাজের শেষে বহুলোক মিলে নাচ-গান-অভিনয়ে আনন্দ উপভোগ করত, কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমস্ত স্থানীয় সমাজ মিলিত হত।

কিছুকাল আগেও আমাদের কৃষিপ্রধান গ্রামাঞ্চলে কৃষকেরা ফসল তোলার পর অবসর সময়ে নানা আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করত। আমোদ-প্রমোদের অংগ হিসেবে নানারকম খেলাধূলারও প্রচলন ছিল।

সে সময়ে প্রচলিত আমাদের দেশের সামাজিক আমোদ-প্রমোদে ধর্মীয় প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণ গান, পুরাণ পাঠ, কৃষ্ণকীর্তন, কালী-কীর্তন, বাউলগান প্রভৃতির ভিত্তি ধর্মীয়। অনেক যাত্রাগানের পালা, কবির গান রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনা ও অন্যান্য নানা পৌরাণিক ঘটনা নিয়ে রচিত।

কিন্তু এই গ্রাম্য সমাজ বিকল হয়ে যাবার ফলে গ্রামাঞ্চলে এই সামাজিক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও আজ আর অক্ষুণ্ণ নেই। নগরাঞ্চলেও আধুনিক খেলাধূলা, থিয়েটার-সিনেমা প্রভৃতিই এখন আমোদ-প্রমোদের বাহন। সিনেমা গ্রামবাসীদেরও যথেষ্ট আকর্ষণ করছে।

সামাজিক কোন আমোদ-প্রমোদ-ব্যবস্থার গুণাগুণ বিচারে লক্ষণীয় হল এই যে বহুলোক তাতে একসংগে যোগ দিতে পারে কিনা এবং সেই ব্যবস্থাধীন আমোদ-প্রমোদ যোগদানকারীর মনে কোন অসামাজিক বা সমাজ-বিরোধী ভাব জাগায় কিনা। যে-ব্যবস্থায় বহু লোক একসংগে আনন্দ উপভোগ করতে পারে এবং জনসাধারণের মনে কোন সমাজবিরোধী বা অসামাজিক ভাব জাগে না তাই গ্রহণীয়।

কোন জনসমাজে এক বিশেষ পরিবেশে জীবিকার্জনের ও ধনোৎপাদনের প্রচেষ্টায় জনসাধারণের যে বিশেষ মনোভাব গড়ে ওঠে তাই তার কৃষ্টি।

সে-সমাজের স্থাপত্য, শিল্প, কাব্য, সাহিত্য, নৃত্য, গীত, নাটকে সেই কৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ হয়।

ভারত এক অতি প্রাচীন দেশ ও এক প্রাচীন কৃষ্টি ধারণ করে। আমাদের সামাজিক জীবনের উন্নতি সেই কৃষ্টির ধারাকে অনুসরণ করেই করতে হবে। তাই, শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় কৃষ্টির সংগে আমাদের পরিচিত হতে হবে এবং বিবিধ সৎকর্মের পরিকল্পনা ও পরিচালনা দ্বারা সেই কৃষ্টিকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে হবে।

ভারত সরকার আমাদের কৃষ্টিগত উন্নতি সাধনের জন্যে অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। যেমন, সাহিত্য আকাদামী (Academy), ললিতকলা আকাদামী, সংগীত-নাটক আকাদামী, চলচ্চিত্র বিভাগ ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় উৎসব আয়োজনের দ্বারা সর্বভারতীয় কৃষ্টির বৈচিত্র্য ও অন্তর্নিহিত ঐক্য প্রদর্শন করে ও জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে।

বিভিন্ন রাজ্য সরকার সাংস্কৃতিক ও শরীর-চর্চার নানা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করে থাকেন। যে সমস্ত খেলাধূলার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশ অংশ গ্রহণ করে সে সমস্ত খেলাধূলার অভ্যাস ও মানোন্নয়নের জন্যেও ভারত সরকার অর্থ ব্যয় করেন।

শিক্ষা ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে নাগরিক দায়িত্ব পালন করার জন্যে নাগরিকের শিক্ষার প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকের বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। উপযুক্ত শিক্ষার অভাব হলে সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে না।

জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যেও জনসাধারণের শিক্ষা দরকার।

কোন সমাজের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সংগে পরিচিত হতে গেলেও ব্যক্তির শিক্ষা দরকার।

তাই, মূঢ় জনগণকে নিয়ে গণতন্ত্র সার্থক হয় না—গণতন্ত্রের উন্নতি হয় না। আমাদের দেশে এক বিরাট জনসংখ্যা অজ্ঞ, নিরক্ষর। সুতরাং এ-দেশে গণতন্ত্রকে সফল করে তুলতে হলে শিক্ষার প্রসার অত্যাবশ্যক। যে কোন

সামাজিক সংস্কার সাধনের গোড়ার প্রয়োজন জনসাধারণের মনে জ্ঞানের উন্মেষসাধন—Renaissance must precede Reformation।

গণতন্ত্রে জনসাধারণের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অধিকার হল তাদের ভোট দেবার অধিকার। তারা যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করে ভোট দিতে না পারলে অযোগ্য বা অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি বা দলের হাতে দেশের শাসনভার ন্যস্ত হতে পারে এবং সমাজের বহু অকল্যাণ সংঘটিত হতে পারে। তাই, সার্বজনীন ভোটাধিকারের পূর্বে সমাজে সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া দরকার—Universal education before universal franchise।

স্ত্রীপুরুষ উভয় শ্রেণীরই শিক্ষা সমান দরকার। কারণ, আমাদের দেশে ও অন্যান্য সমস্ত আধুনিক গণতন্ত্রে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারের নীতি স্বীকৃত হয়েছে। রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন বাদ দিলেও, শিশুর শিক্ষা বা সমস্ত পরিবারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্যে স্ত্রী-শিক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার বিস্তার ছাড়াও, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদিও এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার যাতে প্রবর্তিত শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থী গণতান্ত্রিক সমাজের যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের দেশে এক বয়স্ক জনসংখ্যা আছে যারা কোন সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের বয়ঃসীমা অতিক্রম করেছে। কিন্তু তাদেরও অন্য সকলের মতই সমস্ত নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। তাই তাদের শিক্ষার জন্যে এক স্বতন্ত্র শিক্ষা-ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

সমাজের ধনোৎপাদন বাড়াতে হলেও জনসাধারণের শিক্ষা দরকার। অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিক যোগ্যতায় শিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিকের চেয়ে হীন হয়।

দেশের স্বাস্থ্য ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে নানা বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থাও সমাজের জন্যে আবশ্যক।

আমাদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার সমস্ত স্তরে, শিক্ষক-শিক্ষণ ও নানা বৈষয়িক শিক্ষায়, স্ত্রীশিক্ষা ও বয়স্কশিক্ষায় নানা সংস্কারের প্রবর্তন করেছেন ও করছেন।

নানাপ্রকার বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে। নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ও হচ্ছে। পশ্চিমবংগে বিশ্বভারতী (বোলপুর ঃ বীরভূম) ও যাদবপুর (কলকাতার নিকটবর্তী) বিশ্ববিদ্যালয় নূতন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্ধমান ও কল্যাণীতে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়েছে। নূতন নূতন গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে গবেষণা সুরু হয়েছে। বিশেষ শিক্ষার জন্যে বহু ছাত্র বিদেশে প্রেরিত হচ্ছে।

নানা কারণে আর্থিক অনটনে শিক্ষার বাঞ্ছনীয় সমস্ত সংস্কার ও বিস্তার এখনো সম্ভব হয় নি ঃ দেশের বহু অংশে এখনও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয় নি। তবে আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষার অভীষ্ট উন্নতি সাধিত হবে। দেশে শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্যে চেষ্টা করা প্রত্যেক সুনাগরিকেরই কর্তব্য।

॥ সমাজ ও সরকার ॥

ভূমিকায় জেনেছ রাষ্ট্র কাকে বলে। সে-আলোচনায় দেখেছ যে রাষ্ট্রাধীন জনসংখ্যার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনের জন্যে নাগরিকদের নানা বিধি-নিষেধ মানতে হয়। তোমাদের স্কুলে তোমরা অনেক ছাত্র বা ছাত্রী পড়, শিক্ষক বা শিক্ষিকারা আছেন, প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা আছেন, কার্য-নির্বাহক সমিতি আছে। তোমাদের স্কুলের কাজ যাতে সুশৃংখলভাবে চলতে পারে তার জন্যে স্কুলের পরিচালনার সংগে যুক্ত বিভিন্ন পক্ষের কর্তব্য ও আচরণ সম্পর্কে নানা বিধান আছে। সকলে সে সমস্ত বিধান মেনে চলার ফলে স্কুল শৃংখলার সংগে চলে, স্কুলে পড়া আর পড়ানর কাজে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না।

স্কুলের মতই, মানুষ যত সংগঠন, সংঘ-সমিতি গড়ে তুলেছে তার প্রত্যেকটির জন্যে বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রত্যেক সংগঠনের সভ্যেরা নিজেদের প্রণীত সেই বিধি-বিধান স্বেচ্ছায় মেনে চলে। রাষ্ট্র মানুষের সব চেয়ে বড় সংগঠন। ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের জন্যে মানুষ রাষ্ট্র গড়েছে, তার আইন-কানুন প্রণয়ন করেছে ও স্বেচ্ছায় তা মেনে চলেছে।

রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র অর্থাৎ যার মারফত রাষ্ট্রের সমস্ত ইচ্ছা, সব বিধি-নিষেধ বা আইন-কানুন প্রকাশিত হয় তাই রাষ্ট্রের সরকার (Government)। এই যন্ত্রের সাহায্যেই চালিত হয় রাষ্ট্রের সমস্ত কাজ। রাষ্ট্রের পরিচালনা ও রাষ্ট্র-শাসনের ভার যে সমস্ত রাষ্ট্র-নাগরিকের হাতে থাকে তাদের সংগঠনকে বা মিলিত রূপকেই বলে **সরকার**। সরকার রাষ্ট্রের মূর্ত রূপ। তাই, আমরা সাধারণতঃ সরকারকেই রাষ্ট্র বলে ভুল করি। সরকার রাষ্ট্র নয়—রাষ্ট্রের এক অতি-প্রয়োজনীয় উপাদান, এক বিশিষ্ট অংশ। রাষ্ট্রকে যদি জীবদেহের সংগে তুলনা করা যায় তবে সরকারকে মস্তিষ্কের সংগে তুলনা করা যেতে পারে।

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো চোখে পড়ে তা হল এই যে, রাষ্ট্র এক ভাবমূর্তি, সরকার তার প্রত্যক্ষ রূপ। রাষ্ট্র সমগ্র, সরকার তার এক প্রধান অংশ ; সরকার রাষ্ট্রের ইচ্ছা বা বিধি-নিষেধকে প্রকাশ করার ও কাজে পরিণত করার এক অতি-শক্তিশালী যন্ত্র।

এ ছাড়া একটা বড় রকমের তফাৎ হল এই যে, রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব সরকারের স্থায়িত্বের চেয়ে ঢের বেশি দীর্ঘ। দৃষ্টান্ত হিসেবে চীনের কথাই ধরা যাক। যতদিন চিয়াঙ্-কাই-শেক গদিতে ছিলেন, ততদিন চীনা সরকারের চেহারা ছিল এক রকম। সেই চিয়াঙ্-কাই-শেকের জায়গায় যেই মাও-সে-তুঙ বসলেন গদিতে, অমনি চীনা সরকারের চেহারা গেল বদলে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে রুশিয়াতেও এমনি ধারা ঘটনা ঘটেছিল। আগে সেখানে চলছিল রুশ-সম্রাট বা 'জার'-এর (Czar) স্বৈরাচার। তারপর যখন সম্রাটের স্বৈরাচার ধ্বংস হয়ে ক্ষমতা চলে এল জন-সাধারণের হাতে, তখন রুশ সরকারের চেহারা 'জার'-এর সময়ে যা ছিল তা থেকে একেবারে আলাদা হয়ে গেল। ওপরের উদাহরণ দুটো থেকে দেখা যায় যে এই দুই ক্ষেত্রে শুধু সরকারেরই রূপ বদলেছে, রাষ্ট্রের রূপ বদলায় নি। চিয়াঙ্-কাই-শেকের সময় চীন-রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায় আজও তাই বোঝায় ; রুশ-সম্রাটের আমলে যেমন ছিল রুশিয়ার রাষ্ট্ররূপ, আজও তেমনিই আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সরকারের রূপের মতো রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তনশীল নয়—শুধু এক, অন্য রাষ্ট্রের দখলে গেলে, কিংবা দৈব-দুর্ঘটনায় ধ্বংস পেলে, কিংবা এই রকম কোন অসাধারণ কারণ ঘটলে তবেই কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রত্ব নষ্ট হয়। তা না হলে, রাষ্ট্র যতদিন রাষ্ট্রই থাকে ততদিন তার রূপও থাকে অপরিবর্তিত ; তবে যে কোন রাষ্ট্রের সরকারের অদল-বদল যখন-তখনই হতে পারে।

রাষ্ট্রের সংগে সরকারের আর এক তফাৎ হল এই—দেশের সমস্ত নাগরিক আর প্রজা নিয়েই রাষ্ট্র তৈরী, কিন্তু সরকার তৈরী শুধু দেশের সেই সমস্ত নাগরিককে নিয়ে, যাঁদের হাতে থাকে রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগ, ব্যবস্থা-বিভাগ আর বিচার-বিভাগ পরিচালনার ভার।

আরও একটা তফাৎ আছে রাষ্ট্র আর সরকারের মধ্যে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন নাগরিক বা প্রজার কোন অধিকার থাকতে পারে না, তবে সরকারের বিরুদ্ধে যে কোন নাগরিক বা প্রজারই অধিকার থাকতে পারে। রাষ্ট্র সমস্ত নাগরিক আর প্রজারই সংগঠন, তাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকার মানে নাগরিক বা প্রজার নিজেরই বিরুদ্ধে অধিকার—অর্থাৎ, এক অসম্ভব ব্যাপার। তবে, কোন সরকার যদি ভালোভাবে রাষ্ট্রের শাসন-কাজ পরিচালনা করতে না পারে, তার কু-শাসনে যদি দেশবাসীর কষ্ট বা দুঃখ বাড়ে, দেশের জনসাধারণের ওপর যদি তার অত্যাচার চলে অকারণে, তাহলে সেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার—আর অবস্থা যদি তেমন সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেই সরকারকে উচ্ছেদ পর্যন্ত করার—অধিকার রয়েছে নাগরিকদের।

আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মতো। গঠনের দিক থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সব রাষ্ট্রই জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, শাসনতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি উপাদানে তৈরী। কিন্তু বিভিন্ন সরকারের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য থাকা বিচিত্র নয়, আর আছেও তাই। কোন রাষ্ট্রের শাসনবিভাগের পরিচালনার ভার রয়েছে হয়তো একজন রাজা বা নায়কের হাতে, আবার কোথাও হয়তো নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। এই সমস্ত রাষ্ট্রের সরকারকে যথাক্রমে বলা হয় **একনায়কতান্ত্রিক** এবং **গণতান্ত্রিক সরকার**। এ ছাড়া **এক-কেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়** প্রভৃতি ভেদও রয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে।

গণতন্ত্রের আধুনিক সংজ্ঞা ঃ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন—**জনগণের হিতার্থে জনগণ কর্তৃক জনগণের শাসন** (Government of the people, by the people and for the people)। যে ধরণের শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সমস্ত সভ্যই (একেবারে সমস্ত না হলেও, অধিকাংশ তো বটেই) রাষ্ট্র-শাসনের কাজে অংশ নিতে পারে তাকেই বলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা—এই হল আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের মত। গণতান্ত্রিক সরকারকে তাই **জনপ্রিয়** সরকারও (Popular Government) বলা হয়।

গণতন্ত্রের বাস্তব রূপ ঃ জনগণের মংগলের জন্যেই জনগণ শাসন করবে জনগণকে—এটা হল গণতন্ত্রের আদর্শ। বাস্তবে কিন্তু এই আদর্শ সম্পূর্ণ মেনে চলা হয় না, আর তা সম্ভবও নয়। কেননা, আজকালকার বিশাল বিশাল রাষ্ট্রে (অধিবাসীর সংখ্যা যেখানে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি) সমস্ত নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্র-শাসনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র—আজকাল তাই প্রতিনিধি মারফৎই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকেরা রাষ্ট্র-শাসনের কাজে অংশ নিয়ে থাকে। এখন গণতন্ত্র বলতে বোঝায় **পরোক্ষ গণতন্ত্র** (Indirect Democracy) বা **প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা** (Representative Government)। প্রতিনিধি-মারফৎই নাগরিকরা প্রকাশ করে তাদের মতামত। তাই আজকালকার গণতন্ত্রে 'জনগণ-কর্তৃক শাসন' মানে জনমতের দ্বারা শাসনই বোঝায়। এই জনমত প্রকাশ পায় সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। জনপ্রিয় সরকার গঠন করবার জন্যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সময়ে সময়ে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সমস্ত নির্বাচনের সময় ভোট দিয়ে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে নাগরিকরা। এক-একটা ভোট-গ্রহণ এলাকা থেকে যে-সমস্ত প্রতিনিধি সেই সেই এলাকার অধিকাংশ ভোটদাতার ভোট পান, তাঁরাই সেই সেই এলাকার নাগরিকদের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করবার অধিকার পেয়ে থাকেন।

আধুনিক গণতন্ত্র ও দলতন্ত্র ঃ প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ আর নীতি নিয়ে তৈরী একাধিক রাষ্ট্রনৈতিক দল থাকে। এই সমস্ত দলের মধ্যে যে দল বেশি সুগঠিত, নিজেদের আদর্শ আর নীতি ব্যাখ্যা করে যে দল বেশির ভাগ নাগরিকের মনকে প্রভাবিত করে তুলতে পারে, নির্বাচনে সেই দলের মনোনীত প্রার্থীরাই জেতেন বেশি সংখ্যায়। তাই 'জনগণের মংগলের জন্যে জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন' না বলে, 'রাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রনৈতিক দলের দ্বারা জনগণের শাসন' বললেই বোধ হয় আধুনিক গণতন্ত্রের যথার্থ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। গণতন্ত্র বাস্তবে আজ **দলতন্ত্র** (Party Government) হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রশাসনে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণঃ সে যাই হোক, বাস্তবে প্রতিনিধিদের মারফৎ রাষ্ট্রের শাসন-কাজে অংশ গ্রহণ করলেও, নাগরিকরা যে এক হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে শাসন-কাজে অংশ নেয়—এ-কথা বলা যেতে পারে। কেননা, এই প্রতিনিধিরা এক হিসেবে নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণের অধীন। প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত হবার পর তাঁরা যদি নাগরিকদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করতে আরম্ভ করেন তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁদের আর নির্বাচিত না করে নাগরিকরা তাঁদের দস্তুরমতো শিক্ষা দিতে পারে। অন্য কোন কারণে না হোক, অন্ততঃ পুনর্নির্বাচনের আশাতেও প্রতিনিধিরা সাধারণতঃ নাগরিকদের স্বার্থহানিকর কোন কাজ করতে পারেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নাগরিকরা এইভাবে প্রতিনিধিদের, আর সেই সংগে সরকারের মতামত, নীতি ইত্যাদিও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে তাই বলা যায় যে নাগরিকরা একরকম প্রত্যক্ষভাবেও শাসন-কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ-ছাড়া আরও তিন রকমের ব্যবস্থা রয়েছে যার দ্বারা নাগরিকরা রাষ্ট্রের শাসন-কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে এবং প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; এই তিন রকম ব্যবস্থার নাম হল—**গণভোট, গণোদ্যোগ ও পদচ্যুতি।**

গণভোট (Referendum) হল এমন এক শাসনতান্ত্রিক বিধান যার বলে নাগরিকরা প্রস্তাবিত কোন আইনকে দেশের সমস্ত নাগরিকের অনুমোদনের জন্যে উপস্থাপিত করার দাবি জানাতে পারে। দেশের সমগ্র নাগরিকদের মধ্যে থেকে ভোট নেবার পর ঐ প্রস্তাবিত আইন যদি ভোটের আধিক্যে পাশ হয় তাহলেই সেটা আইন হিসেবে বিধিবদ্ধ হতে পারবে, নাহলে নয়। এই গণভোট ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকও হতে পারে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সমস্ত জরুরী আইনই সমগ্র নাগরিকদের অনুমোদনের জন্যে উপস্থাপিত করার বাধ্যতামূলক বিধানও সংবিধানে থাকতে পারে।

গণোদ্যোগ (Initiative) হল এমন এক সংবিধানসম্মত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি

যার সাহায্যে নির্বাচকরা নিজেরাই আইন তৈরীর ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারে। এই ব্যবস্থায়, জনকয়েক ভোটদাতা আবেদন করে ব্যবস্থাপক সভাকে দিয়ে কোন একটা আইন বিধিবদ্ধ করাতে পারে; কোন কোন ক্ষেত্রে আবার নাগরিকরা নিজেরাই কোন এক আইনের খসড়া তৈরী করে ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদনের জন্যে পেশ করতে পারে। ব্যবস্থাপক সভা অনুমোদন করার পর চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত করাবার জন্যে ঐ খসড়াকে আবার জনগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করতে হয়।

নাগরিকদের হাতে প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণ করবার তৃতীয় নিয়মতান্ত্রিক হাতিয়ার হল **পদচ্যুতি** (Recall)। একবার নির্বাচিত হবার পর কোন প্রতিনিধি যদি দেশের বা নির্বাচকদের অনিষ্ট সাধন করবার চেষ্টা করতে থাকেন তখন তাঁকে প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্যে নির্বাচকরা এই হাতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে। নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্বাচক যদি আবেদন করে জানায় যে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের বিরুদ্ধে কাজ করছেন, তাহলে ঐ প্রতিনিধিকে পদত্যাগ করে পুনর্নির্বাচনের জন্যে দাঁড়াতে হবে।

বাস্তবে অবশ্য এই সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োগ হয় না বললেই চলে। ফলে, প্রতিনিধিরা তাঁদের দলের নেতাদের খেয়াল-খুশিমতোই 'হাঁ', 'না' করে তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন—তাঁদের নির্বাচক নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার কথা, একবার নির্বাচিত হয়ে যাবার পর, আর বড় একটা তাঁদের মনেই থাকে না।

গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ—এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়ঃ এখন আধুনিক গণতন্ত্রের কয়েক রকম রূপের কথা বলা যাক। প্রথমতঃ জেনে রাখা দরকার যে গণতান্ত্রিক সরকার **এককেন্দ্রিক** (Unitary) হতে পারে, আবার **যুক্তরাষ্ট্রীয়** (Federal) হতে পারে। **এককেন্দ্রিক গণতন্ত্র** মানে এমন গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা যাতে রাষ্ট্রের পরিচালনা করা হয় একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে। এ-ধরণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসনের সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। শাসন-কাজের সুবিধের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রকে হয়তো বিভিন্ন প্রদেশে বা অংশে ভাগ করতে পারে, কিছু কিছু

ক্ষমতাও হয়তো ছেড়ে দিতে পারে এই সমস্ত প্রদেশ বা অংশের স্থানীয় সরকারের (Local Government) হাতে। তাহলেও এই সমস্ত স্থানীয় সরকার সর্বতোভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকে। ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা এই রকম এককেন্দ্রিক।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কিন্তু রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রীভূত থাকে না। এই ধরণের শাসন-ব্যবস্থা যে সমস্ত রাষ্ট্রে বর্তমান সেই সমস্ত রাষ্ট্র অনেকগুলো অংশে ভাগ করা থাকে। এই অংশগুলোকে বলে **প্রদেশ** বা **রাজ্য** (States)। এই সমস্ত প্রদেশ বা রাজ্য থাকে এক একটা প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বাধীনে। এই সমস্ত প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার ছাড়া রাষ্ট্রে এক **কেন্দ্রীয়** (Central) সরকারও থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ অধীন নয়। এই ধরণের রাষ্ট্র পরিচালিত হয় লিখিত, সুস্পষ্ট, আর সহজে পরিবর্তন করা যায় না এমন এক **সংবিধান** (Constitution) অনুসারে। এই সংবিধানেই কেন্দ্রীয় সরকার আর প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারের ক্ষমতা পৃথক পৃথক ভাবে সুনির্দিষ্ট করা থাকে। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আর প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার দুইই যথাসম্ভব স্বায়ত্তশাসন (Autonomy) বা স্বাধীনতা ভোগ করে। যে-সমস্ত ব্যাপার সমস্ত দেশের জনসাধারণের স্বার্থের সংগে জড়িত এবং যে সমস্ত কাজ পরিচালনা করতে হলে এক জায়গায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকা প্রয়োজন, সংবিধানে সেই সমস্ত বিষয়ের কর্তৃত্ব দেওয়া থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে; আর যে সমস্ত বিষয় প্রদেশ বা রাজ্যের স্থানীয় স্বার্থের সংগে সংশ্লিষ্ট, সংবিধান অনুসারে সেই সমস্ত বিষয়ের কর্তৃত্ব থাকে প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারের হাতে। তাই বাইরের রাষ্ট্রের সংগে সম্পর্ক, যুদ্ধ-বিগ্রহ-সন্ধি, দেশরক্ষা, রাষ্ট্রের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত, ডাক ও তার, বেতার, সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতি-বিধায়ক নানা ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের কর্তৃত্ব থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে; প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারের হাতে থাকে প্রদেশ বা রাজ্যের উন্নতিমূলক এবং প্রদেশ বা রাজ্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের

কর্তৃত্ব। কোন যুক্তরাষ্ট্রে যদি কখনও প্রদেশে প্রদেশে বা রাজ্যে রাজ্যে, কিংবা প্রদেশের বা রাজ্যের সরকারের সংগে কেন্দ্রীয় সরকারের মতবিরোধ দেখা দেয়—তা হলে সেই বিরোধের মীমাংসা করে **যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত** (Federal Court বা Supreme Court)। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ্-শাসিত ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত গণতন্ত্র ঃ এই প্রসংগে জেনে রাখা দরকার যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে **মন্ত্রিপরিষদ্-শাসিত** (Cabinet form of Democratic Government) এবং **রাষ্ট্রপতি-শাসিত** গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা (Presidential form of Democratic Government)—দুই-ই বোঝাতে পারে।

মন্ত্রিপরিষদ্-শাসিত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলা হয় সেই ধরণের শাসন-ব্যবস্থাকে যাতে রাষ্ট্রের **নামে মাত্র কর্তা** হলেন একজন রাজা (বা রাণী) বা রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রের নিয়মতন্ত্র অনুসারেই এঁদের চলতে হয়, রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে স্বেচ্ছায় কোন কিছু করতে পারেন না এঁরা। তাই এঁদের বলা হয় **নিয়মতান্ত্রিক শাসক** (Constitutional Ruler)। এঁদের কর্তৃত্ব থাকে শুধু নামেই, আসল কর্তৃত্ব থাকে জনসাধারণের হাতে। রাষ্ট্রীয় পার্লামেণ্ট বা বিধান-সভায় জনসাধারণ যে-সমস্ত প্রতিনিধি পাঠায়, সেই সমস্ত প্রতিনিধিদের মারফৎ, অর্থাৎ পার্লামেণ্টের মারফৎই দেশের শাসন-কাজ পরিচালিত হয়। পার্লামেণ্টে যে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সংখ্যায় ভারী হন, সাধারণতঃ সেই দলেরই প্রধান প্রতিনিধিকে রাষ্ট্রের রাজা (আর রাজা না থাকলে রাণী) বা রাষ্ট্রপতি বেছে নেন প্রধান মন্ত্রী হিসেবে এবং তাঁরই ওপর দেন অন্যান্য মন্ত্রী বেছে নেবার ভার। প্রধান মন্ত্রী তখন পার্লামেণ্টের সভ্যদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে বেছে নেন মন্ত্রী হিসেবে। তাঁর মনোমত এই সমস্ত মন্ত্রীদের একটি তালিকা তিনি তারপর পেশ করেন রাজা বা রাষ্ট্রপতির কাছে। রাজা বা রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ এই তালিকা বিনা দ্বিধায় অনুমোদন করে দেন। এইভাবে মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁরা আবার গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ভার পান তাঁদের নিয়ে তৈরী হয়

মন্ত্রিপরিষদ্ (Cabinet)। রাষ্ট্রশাসনের সমস্ত দায়িত্ব থাকে এই মন্ত্রিপরিষদ্-এরই ওপর। মন্ত্রীরা তাঁদের কাজের জন্যে দায়ী থাকেন বিধান সভার কাছে এবং বিধান সভার অনাস্থাভাজন হলে তাঁদের পদত্যাগ করতে হয়। ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র, ভারতের শাসনতন্ত্র প্রভৃতি হল মন্ত্রিপরিষদ্-শাসিত শাসন-ব্যবস্থার উদাহরণ।

দোষগুণ ঃ এই ধরণের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের শাসন-বিভাগের যাঁরা কর্তা, অর্থাৎ মন্ত্রীরা, তাঁরা ব্যবস্থা-বিভাগেরও সভ্য। যতদিন তাঁদের ওপর ব্যবস্থা-বিভাগের আস্থা থাকে মাত্র ততদিনই তাঁরা মন্ত্রিত্ব করতে পারেন। সুতরাং ব্যবস্থা-বিভাগকে অগ্রাহ্য করে মন্ত্রীরা স্বেচ্ছাচারিতা করতে পারেন না। তাছাড়া মন্ত্রীরা ব্যবস্থা-বিভাগের সভ্য হওয়ায় শাসন-বিভাগ এবং ব্যবস্থা-বিভাগের মধ্যে সহযোগিতাও থাকে। দেশের প্রকৃত মংগলবিধায়ক আইন প্রণয়ন ও প্রবর্তন ব্যাপারে দুই বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা দেখা যায়—এক বিভাগ অন্য বিভাগের বিরুদ্ধাচরণ করে দেশের কল্যাণ সাধনের পথে বাধার সৃষ্টি করে না।

কিন্তু জরুরী অবস্থায় যখন ঐক্যবদ্ধভাবে দ্রুত কাজ করার দরকার হয়ে পড়ে তখন এই ধরণের শাসন-ব্যবস্থা তেমন কার্যকর হয় না। আর একটা দোষ হল এই যে, এই ধরণের শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতিতে ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ব্যবস্থা-বিভাগের অনাস্থাভাজন হওয়ার ফলে মন্ত্রিসভার পতন যখন-তখনই ঘটতে পারে। নিত্য নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে শাসন-নীতির ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা থাকে—কেননা বিভিন্ন দলের বিভিন্ন ধরণের কর্মনীতি থাকতে পারে। ফলে নিত্যই সরকারের আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে—যা দেশের দিক থেকে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ঃ যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির হাতেই থাকে রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতা, জনসাধারণের প্রতিনিধি-স্থানীয় মন্ত্রীরা যে গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির অধীন কর্মচারী মাত্র, সেই গণতন্ত্রের শাসন-ব্যবস্থাকে বলে **রাষ্ট্রপতি-শাসিত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা**

(Presidential form of Democratic Government)। এই ধরণের শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা-বিভাগের কাছে শাসন-বিভাগের কোন দায়িত্বই থাকে না। রাষ্ট্রপতিই সেই রাষ্ট্রের প্রকৃত কর্তা, মন্ত্রীরা তাঁর ইচ্ছা পালন করবার যন্ত্র মাত্র। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতি-শাসিত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রাষ্ট্রপতি-শাসিত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ ঃ এই ধরণের শাসন-ব্যবস্থার প্রধান গুণ হল এই যে জাতীয় সংকটের সময় দ্রুত কোন কর্মনীতি অনুসরণ করা এতে সম্ভব হয়, যা মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় হয় না।

এই ধরণের শাসন-ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কার্যকালের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে পদ থেকে অপসারণ করা যায় না। সুতরাং যতদিন কার্যকাল নির্দিষ্ট থাকে ততদিন এক ধরণের নীতি অনুসারে শাসন কার্য চালানো রাষ্ট্রপতির পক্ষে সম্ভব হয়। ফলে বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ নীতিতে দীর্ঘ দিন রাষ্ট্রে একটা ধারাবাহিকতা অনুসৃত হয়।

কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এ-ধরণের শাসন-ব্যবস্থায় একটা গুরুতর ত্রুটি দেখতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপতি যেহেতু ব্যবস্থা-বিভাগের সভ্য নন এবং শাসন-সংক্রান্ত কাজের জন্যে ব্যবস্থা-বিভাগের কাছে দায়ীও নন, তাই ব্যবস্থা বিভাগে যদি তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয়দের প্রাধান্য থাকে তাহলে নানা ব্যাপারেই তাঁর সংগে ব্যবস্থা-বিভাগের সংঘর্ষ দেখা দেবে। সরকারের দুই বিভাগের মধ্যে এই সংঘর্ষের ফলে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশংকা থাকে।

এই প্রসংগে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, কোন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনকর্তাকে রাষ্ট্রপতি (President) বলে অভিহিত করলেই যে সে-রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলে ধরে নিতে হবে, তা নয়। কোন গণতন্ত্র মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত না রাষ্ট্রপতি-শাসিত তা বলা যাবে সে রাষ্ট্রে কী ধরণের শাসন-ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাই বিচার করে। ফ্রান্সে বা আমাদের ভারতেও রাষ্ট্রপতি রয়েছেন, কিন্তু এই দুই দেশের শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতি-শাসিত গণতন্ত্র নয়—মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত গণতন্ত্র।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)—গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শাসন-ব্যবস্থাকে বলা হয় একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা। এই ধরণের শাসন-ব্যবস্থায় একজন নায়কই থাকেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হয়ে—তা তিনি রাজাই হোন্ আর কোন সর্বজনমান্য নায়কই হোন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইটালি, জার্মানী, স্পেন প্রভৃতি রাষ্ট্রে এই ধরণের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ইটালির মুসোলিনী, জার্মানীর হিৎলের, স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কো প্রভৃতি হলেন চরম একনায়কত্বের মূর্ত প্রতীক।

প্রত্যেক একনায়কেরই নিজস্ব দল থাকে। এই দলের বিরোধী কোন দলের অস্তিত্ব একনায়কতন্ত্রে সহ্য করা হয় না।

তবে রাষ্ট্রনায়ক যদি সত্যই রাষ্ট্রের হিতৈষী হন তা হলে তাঁর পরিচালিত রাষ্ট্র, কোন মতবিরোধিতা না থাকায়, অতি দ্রুত প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারে। অন্যথায় রাষ্ট্রের অগ্রগতি ব্যাহত হবে এবং তাঁর একান্ত অনুগত না হলে প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় হবে।

তাই, একনায়কতন্ত্রকে আদর্শ শাসন-ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা যায় না।

ভারতীয় গণতন্ত্রে নির্বাচন-রীতি : সারা দেশের নির্বাচন-ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালনা করা এক কঠিন সমস্যা। নির্বাচন পরিচালনের জন্য **নির্বাচন কমিশন** (Election Commission) নামে এক স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সংস্থার প্রধানকে প্রধান নির্বাচনকর্তা (Chief Election Commissioner) বলা হয়। নির্বাচন সম্পর্কিত অভিযোগ ইত্যাদির বিচারের জন্যে এক স্বতন্ত্র আদালত গঠনের অধিকার প্রধান নির্বাচনকর্তার আছে। এই আদালতকে Election Tribunal বলে। প্রধান নির্বাচনকর্তা বহু সহকারীর সাহায্যে নির্বাচন-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনের কাজ পরিচালনা করার জন্যে সমগ্র দেশকে কতকগুলি **নির্বাচন কেন্দ্রে** (Constituency) ভাগ করা হয়েছে। প্রতি কেন্দ্র থেকে সাধারণতঃ একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তবে দুই প্রতিনিধির নির্বাচন-কেন্দ্রও আছে।

ভারতে রাজ্য বিধান-সভার এক একটি নির্বাচন-কেন্দ্র ৫০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার নাগরিকের বসতির এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় লোকসভার এক একটি নির্বাচন-কেন্দ্র পাঁচ লক্ষ থেকে সাড়ে সাত লক্ষ নাগরিকের বসতির এলাকা নিয়ে গঠিত হয়।

১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য বিধান-সভায় ২৯০১ জন ও কেন্দ্রীয় লোকসভায় ৪৯৪ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আমাদের দেশে **সাধারণ নির্বাচন** (General Election) অনুষ্ঠিত হয়। তবে তার আগেই যে-কোন কারণে দু'একটি সভ্যপদ খালি হলে সেই পদগুলি পূরণের জন্যে কোন কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে যে নির্বাচন হয় তাকে **উপনির্বাচন** (Bye-Election) বলে।

ভারতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্কের (অন্যূন ২১ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির) ভোট আছে। বুদ্ধি-বিবেচনার অপরিপক্কতার জন্যে অপ্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকার নেই। কোন গুরু অপরাধে অপরাধী, উন্মাদ প্রভৃতিরও ভোটাধিকার নেই।

গণতান্ত্রিক ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে। তখন ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৩২ লক্ষ। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে এ সংখ্যা বেড়ে হয় ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ।

ভোট দেওয়াকে ইংরেজিতে বলে 'Polling' এবং ভোট দেবার নির্দিষ্ট স্থানকে বলে 'Polling Station' (ভোট-কেন্দ্র)।

ভোটাধিকার নাগরিকের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অধিকার। নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে যে কোন নির্বাচন-প্রার্থীকে ভোট দেওয়া যায়। কোন প্রকার ভয় বা লোভে ভোট দিলে এ অধিকারের অপব্যবহার করা হয়। কোন নির্বাচন-প্রার্থী ভয় বা লোভ দেখিয়ে ভোট চাইলে সে অপরাধী হয়। ভোট-কেন্দ্রের সীমানার মধ্যে কোন প্রকার প্রচার বা প্ররোচনা নিষিদ্ধ থাকে।

আধুনিক ভোটদান-ব্যবস্থায় গোপনে ভোট দেওয়া হয়। ভোটদাতাকে একখানা কাগজ দেওয়া হয়। নির্বাচন-প্রার্থীদের জন্যে পৃথক পৃথক প্রতীকচিহ্নে

চিহ্নিত সুরক্ষিত বাক্স থাকে। ভোটদাতা যাকে ভোট দিতে চায় তার চিহ্নিত বাক্সে কাগজখানা ফেলে আসে। ভোট দেওয়া শেষ হয়ে গেলে নির্দিষ্ট গণনা-কেন্দ্রে বাক্সবন্দী ভোটের কাগজ বাক্স খুলে গণনা করা হয়। যিনি সর্বাধিক ভোট পান তিনি নির্বাচিত হন।

গোপনে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিকে voting by ballot ও যে কাগজখানা ভোটদাতা বাক্সে ফেলে তাকে ballot paper বলে।

গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও দায়িত্ব ঃ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার অধিকার নাগরিকদের এক প্রধান মৌলিক অধিকার। প্রত্যেকেরই প্রতি বিষয়ে স্বাধীন মতামত থাকতে পারে। এ মত প্রকাশিত হতে পারে মুখের কথায়, সভা-সমিতিতে, বেতার মারফৎ বক্তৃতায়, অথবা খবরের কাগজে বা বই-পত্রে। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের জন্যে বলিষ্ঠ জনমত গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। তাই ঐ ধরণের শাসন-ব্যবস্থায় নাগরিকদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়।

কিন্তু প্রত্যেক অধিকারের সংগে সংগে দায়িত্ব আসে। তাই এ অধিকার ব্যবহারে নাগরিকদের অবাধ স্বাধীনতা থাকে না। কোন মতামত যদি রাষ্ট্রের কল্যাণের পরিপন্থী হয় বা বিদ্রোহাত্মক হয়, অথবা কোন নাগরিকের স্বাধীনতা বা সম্মানের হানিকর হয় তবে রাষ্ট্র সে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে। যুদ্ধ প্রভৃতি বিপদের সময়েও নাগরিকদের মতামত প্রকাশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না—বিশেষ অবস্থায় রাষ্ট্র তা সংকুচিত করতে পারে।

মানুষ সামাজিক জীব। সংঘবদ্ধ হবার প্রবৃত্তি তার সহজাত এবং এই প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা সংগঠন গড়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নাগরিকদের সংঘবদ্ধ হয়ে নানা সংগঠন গড়বার অধিকার থাকা উচিত এবং আধুনিক গণতন্ত্র এ অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে।

এই অধিকার লাভের সংগে সংগেও নাগরিকদের এক বিশেষ দায়িত্ব জন্মেছে। নাগরিকদের কোন সভা-সমিতি বা সংঘের উদ্দেশ্য বা কার্য অবৈধ বা রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রতিকূল হবে না। যদি উদ্দেশ্য বা কার্য অবৈধ বা রাষ্ট্র-

স্বার্থের প্রতিকূল হয় তবে রাষ্ট্র নাগরিককে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে। যুদ্ধ প্রভৃতি সংকটের সময়েও নাগরিকদের এ অধিকার সংকুচিত হতে পারে।

আধুনিক সমাজের রাজনৈতিক জীবন ঃ রাজনীতি আধুনিক সমাজ-জীবনে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। শিক্ষার বিস্তার, চলাচলের সুবিধা, সুলভ পত্রিকা প্রচার, রেডিও মারফৎ প্রচার ইত্যাদির ফলে জনসাধারণ রাজনীতির নানা খবর সহজে পায় ও সে সকল খবরে উৎসাহবোধ করে। সার্বজনীন ভোটাধিকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার জনসাধারণকে সচেতন করে তুলেছে, তাদের রাজনৈতিক শিক্ষায় কিছুটা শিক্ষিত করে তুলেছে।

জনসাধারণের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অধিকার ভোটাধিকার প্রয়োগ বিস্তৃততর হয়েছে। ভোট দিয়ে লোক বাছাইয়ের রীতি আজ সর্বক্ষেত্রে গৃহীত। তবে নগরাঞ্চলের জনসাধারণ রাজনৈতিক চেতনায় গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের চেয়ে অধিক অগ্রসর। শিক্ষায় অগ্রসরতাই হয়ত এ পার্থক্যের মূল কারণ।

সংঘবদ্ধ হবার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আজ জনসাধারণ অঞ্চল-নির্বিশেষে সচেতন। শাসক সম্প্রদায়ের সমালোচনা আজ সর্বত্র সব লোকের মুখে শোনা যায়। তবে, বলা বাহুল্য যে সমালোচনা সমস্ত ক্ষেত্রে সঠিক বা গঠনমূলক হয় না এবং সমালোচনার এই ত্রুটির মূলে আছে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব। সভা-সমিতিও সর্বক্ষেত্রে খুব সুশৃংখল নয়। স্বাধীনতার সংগে সংযম ও অধিকারের সংগে ত্যাগ স্বীকার করার বা কার্যতৎপরতার শুভমিলন সর্বক্ষেত্রে দেখা যায় না। তবুও জনসাধারণের চেতনা আশাজনক।

অধিকার আদায় বা রক্ষার জন্যে সংঘবদ্ধ চেষ্টা ও আন্দোলন এবং আবেদন-নিবেদনের অধিকারের প্রয়োগ দুই-ই জনসাধারণ করে থাকে।

জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও অধিকারবোধ বর্তমানে অনেক বেড়েছে। এই চেতনা ও অধিকারবোধ গণতন্ত্রের ও অন্যান্য সব শাসনতন্ত্রেরই রক্ষাকবচ। জনসাধারণ সচেতন ও স্বাধিকারবোধসম্পন্ন হলে শাসক-সম্প্রদায় আত্মানুসন্ধানী ও আত্মশোধনপ্রয়াসী হয়।

আধুনিক রাজনীতিতে স্ত্রী-পুরুষের অধিকারভেদ নেই। রাজনৈতিক সাম্য সমাজের বিভিন্নক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য এনেছে, স্ত্রী-স্বাধীনতা বেড়েছে ও বহু কর্মক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সংগে সহযোগিতা করছে।

রাষ্ট্র তথা রাজনীতি আধুনিক নাগরিকের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং সামাজিক জীবন জটিলতর হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক জীবনের নানা জটিল সমস্যা ভাববার ও সমাধান করার মত বিদ্যাবুদ্ধি আজও কোন জনসমষ্টির অধিকাংশের নেই। একথা প্রায় সমস্ত মানবগোষ্ঠী সম্বন্ধে সত্য এবং আমাদের দেশের মত বহু প্রাচ্যদেশেই একথা অধিকতর সত্য। জনসাধারণের এই অনগ্রসরতার ফলে আজও প্রকৃত লোকায়ত্ত সরকার কোথাও গড়ে ওঠে নি—সব সরকারই মূলতঃ বিশেষ প্রতিভা বা শক্তিসম্পন্ন বা সুবিধাভোগী কতিপয়দ্বারা চালিত হচ্ছে। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র আজ এক পরীক্ষার সম্মুখীন এবং এ পরীক্ষার ফলাফল অনিশ্চিত।

গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ ঃ গণতান্ত্রিক সমাজের মূল আদর্শ **সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা**।

সাম্য বা সমতা অর্থে সমান সুযোগের অধিকার বুঝতে হবে। জাতি-শ্রেণী-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে। সরকার পরিচালনে বা শাসনকার্যে অংশগ্রহণ, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার, মতামত প্রকাশ করার, বিবাহাদি করে পরিবার গঠন করার, বৃত্তি নির্বাচন করার সুযোগ বা অধিকার সবার সমান হবে। সমাজে বা রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করার, রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ পাবার, আইনের কাছে সমান বিচার পাবার অধিকার ও নির্বাচনের (ভোট দেবার ও ভোট প্রার্থী হবার) অধিকার সকলের সমান হবে।

আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা এমন জটিল হয়েছে যে একে অপরের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। আধুনিক সমাজে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় প্রভৃতি মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে হয় পরস্পরের সহযোগিতায় এবং প্রতিক্ষেত্রে সহযোগিতার ভিত্তি হল মৈত্রী বা বন্ধুত্ব। মানুষ কখনও শত্রুর সংগে সহযোগিতা করে না—সহযোগিতা করে মিত্রের সংগে।

সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজে পরস্পরের সংগে মৈত্রী সহজ ও স্বাভাবিক। অসাম্য স্বভাবতঃ পরস্পরের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করে।

মৈত্রী সমাজের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে এবং সমবেত চেষ্টায় সমষ্টির মংগল-প্রয়াসে বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীকে ব্রতী করে। মৈত্রীহীন সমাজে ব্যক্তি বা শ্রেণীর শাসন চলতে পারে কিন্তু গণতন্ত্র অসম্ভব।

আগেই বলা হয়েছে যে গণতান্ত্রিক সমাজে জাতি-শ্রেণী-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব পূর্ণক্ষমতা বিকাশের সুযোগ পাবে। ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্যেই ব্যক্তিস্বাধীনতা দরকার। গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় নিজ ধর্মমত অনুযায়ী অনুষ্ঠান, উপাসনা-আরাধনা প্রভৃতি করতে পারবে। প্রত্যেক অঞ্চল বা সম্প্রদায় তার ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে—এক অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি অপর অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের ওপর জোর করে চাপান চলবে না।

গণতান্ত্রিক কল্যাণকর সমাজ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ পালন করে প্রতিটি নাগরিকের সর্বথা কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করে। কিন্তু, সমাজের সর্বত্র যদি শান্তি না থাকে তবে কোন আদর্শ পালন বা কারো কোন কল্যাণ সাধন অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ শান্তিকামী হয়।

প্রাত্যহিক জীবনে গণতান্ত্রিক আচরণ ঃ গণতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্রের সুনাগরিক হতে হলে ব্যক্তির কতগুলো বিশেষ গুণ অর্জন ও কতগুলো সু-অভ্যাস গঠন করতে হয়। সে সমস্ত গুণ অর্জন ও অভ্যাস গঠনের প্রকৃষ্ট উপায় প্রাত্যহিক জীবনে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করা।

আমরা বাড়ীতে, বিদ্যালয়ে, সমাজে সবলের হাতে দুর্বলের পীড়ন, বড়দের কাছে ছোটদের অপমান প্রত্যক্ষ করি। আমরা আমাদের চেয়ে দুর্বল বা ছোটদের কখনও পীড়ন বা অপমান করব না।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থ বা লোভবশতঃ আমরা অপরকে বঞ্চিত করি। এ বঞ্চনা অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হলেও এর ফলে যে স্বার্থপরতা বা লোভ আমাদের জন্মায় সে স্বার্থপরতা বা লোভ জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে

আমাদের অসামাজিক ও অগণতান্ত্রিক করে তোলে। গণতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্রের সুনাগরিক হয়ে ওঠার জন্য আমরা আমাদের স্বার্থ ও অপরের স্বার্থের সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করব এবং ব্যক্তি-স্বার্থের চেয়ে সমষ্টির স্বার্থকে বড় করে দেখব।

গণতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা নাগরিকেরা সম্মিলিতভাবে ভাবে, বোঝে ও সমাধান করে। ব্যক্তি তার নিজের মত থেকে পৃথক মতাবলম্বীর মতামত শোনে ও বিবেচনা করে এবং অধিকাংশের মত মেনে নেয়। দশে মিলে কোন সিদ্ধান্ত করলে নিজের মতামত ভুলে সে-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে কাজে আত্মনিয়োগ করে।

আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে স্কুল কলেজে, আপিসে-কারখানায় এমন বহু সমস্যার সম্মুখীন হই যেগুলোর সমাধানের জন্যে আমাদের দশের সংগে মিলে ভাবতে হয়, কাজ করতে হয়। এরকম ক্ষেত্রে আমরা যদি সমবেতভাবে চিন্তা ও কাজের অভ্যাস করি, পরমত সহ্য করতে শিখি, নিজের ইচ্ছাকে অপর বহুর ইচ্ছার অধীন করতে কুণ্ঠাবোধ না করি, তবে আমরা গণতান্ত্রিক শিক্ষা লাভ করতে পারি ও আমাদের গণতান্ত্রিক অভ্যাস গঠিত হয়।

গণতন্ত্রের নাগরিকদের নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। দায়িত্ব-গ্রহণ ও কর্তব্য-পালনের অভ্যাস আমরা বাড়ীতে, স্কুলে, গ্রাম-সেবায়, সমাজ-সেবায় ও নানা কার্য উপলক্ষে গঠন করতে পারি। আধুনিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদের দায়িত্ব গ্রহণ ও দায়িত্ব পালন অভ্যাস করার জন্যে বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক নানা কাজ ও কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে দেওয়া হয়।

মোটকথা, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপরের ইচ্ছা ও মতকে শ্রদ্ধা করব, কোন সমস্যা সম্বন্ধে সমবেত চিন্তা ও কার্যে অভ্যস্ত হব, নিঃস্বার্থ ন্যায়বান ও সমদর্শী হব এবং মঙ্গলকর্মে নিরলস হব। প্রাত্যহিক জীবনে এ আদর্শ পালন করতে পারলে আমাদের মনে গণতান্ত্রিক আদর্শবোধ জাগবে এবং আমাদের চরিত্র ও জীবন গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে, তখন আমরা গণতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক হব।

॥ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনযুক্ত প্রতিষ্ঠান ॥

বিভিন্ন ধরণের স্বায়ত্তশাসনযুক্ত প্রতিষ্ঠান : ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনযুক্ত প্রতিষ্ঠান হল মোটামুটি দু-রকমের—(১) গ্রামীণ বা গ্রাম অঞ্চলের (Rural), আর (২) পৌর বা শহর অঞ্চলের (Urban)। গ্রাম অঞ্চলে আছে পঞ্চায়েত আর ইউনিয়ন বোর্ড। এদের ক্ষমতার সীমা হল এক-একটি গ্রাম নিয়ে অথবা পরস্পর-সংলগ্ন কয়েকটা গ্রাম জুড়ে। এইসব পঞ্চায়েত আর ইউনিয়ন বোর্ডের ওপর রয়েছে স্থানীয় তালুক বোর্ড বা লোক্যাল বোর্ড, মহকুমা অবধি তাদের ক্ষমতার সীমা। জেলা বোর্ডের ক্ষমতার এলাকা হল সমস্ত জেলাটা জুড়ে। এছাড়া শহর অঞ্চলের মধ্যে প্রেসিডেন্সি শহরগুলোতে রয়েছে কর্পোরেশন, অন্যান্য শহরে আছে পৌরসভা ও মিউনিসিপ্যালিটি। আবার যে-সমস্ত এলাকায় সৈন্য মোতায়েন থাকে সেই সমস্ত এলাকার জন্যে রয়েছে ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড বা সেনানিবাস সংঘ। প্রেসিডেন্সি শহরগুলোতে উন্নতি-বিধায়ক প্রতিষ্ঠান বা ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাস্ট, আর বন্দর অঞ্চলে বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান বা পোর্ট ট্রাস্ট্‌ নামে স্বায়ত্তশাসনযুক্ত প্রতিষ্ঠানও আছে।

গ্রাম-পঞ্চায়েত : বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতে গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চলে আসছে। ভারতের সংবিধানেও গ্রাম-পঞ্চায়েতের গুরুত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে। উত্তর প্রদেশে ইতোমধ্যেই বহু 'গাঁও সভা' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও ৫০০ গ্রাম-পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামের বাসিন্দাদের যাতে সর্বতোভাবে মংগল হয়, গ্রামে যাতে আইন আর শৃংখলা বজায় থাকে, তারই জন্য গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। বয়স্কদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা, পথ-ঘাট তৈরী করা, চাষবাসের যাতে উন্নতি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রভৃতি কাজের ভার গ্রাম-পঞ্চায়েতের ওপর দেওয়া হয়েছে। ছোটখাটো দেওয়ানী আর ফৌজদারী মামলা মীমাংসার ভারও গ্রাম-পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়েছে।

ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েত সভার গঠন : কমপক্ষে ৬ জন আর

বেশি হলে ৯ জন নির্বাচিত সভ্য নিয়ে এই বোর্ড বা সভা তৈরী হয়। সভ্যদের কাজের মেয়াদ চার বছর, তারপর আবার নতুন করে নির্বাচন করতে হয়। সভ্যরা নিজেদের মধ্যে থেকেই বোর্ডের একজন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করেন। তিনিই প্রধান কার্য-নির্বাহক (Chief Executive) হিসেবে বোর্ডের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। একুশ বছরের ওপর যাঁদের বয়স সেই সমস্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে যাঁরা অন্ততঃ ৬ আনা হারে ইউনিয়ন রেট কি চৌকিদারী ট্যাক্স দেন, কি বছরে অন্ততঃ ৮ আনা হারে সেস দেন, কি যাঁরা প্রবেশিকা (Matriculation বা School Final) বা এই রকম কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, কেবল তাঁরাই এই নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন। **সার্কল অফিসার** নামের সরকারী কর্মচারীই বোর্ডের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করেন। এক একজন সার্কল অফিসারের ওপর একাধিক ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়।

কাজ ঃ ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েত সভার কর্তব্য রয়েছে অনেক। গ্রামে শান্তিরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, গ্রামে পুল ইত্যাদি তৈরী বা রক্ষা করা—এই সমস্ত হলো এই সভার প্রধান প্রধান কর্তব্য। গ্রাম অঞ্চলের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা, কুয়ো খুঁড়ে কি নলকূপ বসিয়ে কিংবা পুকুর কাটিয়ে বা পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা, নালা-নর্দমা পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা, জন্মমৃত্যুর হিসেব রাখা, মেলা প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, আর গো-মড়ক কি মহামারী যাতে ঘটতে না পারে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রভৃতি কাজও পঞ্চায়েত সভার কর্তব্যের মধ্যে পড়ছে। তাছাড়া, জেলা বোর্ড বদি কোন কাজের ভার দেয় তো সেই কাজের জন্যেও পঞ্চায়েত সভা দায়ী থাকবে। পঞ্চায়েত সভার কিছু কিছু বিচার-ক্ষমতাও আছে—একথা আগেই বলেছি।

স্থানীয় বোর্ড ঃ ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েত সভার ওপরে রয়েছে স্থানীয় বোর্ড। একে কোথাও বলে তালুক বোর্ড, কোথাও মহকুমা বোর্ড আবার কোথাও-বা সার্কল বোর্ড। কমপক্ষে ছ'জন মনোনীত আর নির্বাচিত

সভ্য নিয়ে বোর্ড তৈরী। সভ্যরা নিজেদের মধ্যে থেকেই সভাপতি আর সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন।

সাধারণতঃ, জেলা বোর্ড যেসব কাজের ভার দেয় স্থানীয় বোর্ড সেই সবই পরিচালনা করে থাকে। তাই বলা যায় যে, স্থানীয় বোর্ড জেলা বোর্ডের মহকুমাস্থ শাখা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বোর্ডের কোন গুরুত্বই নেই আজকাল। অনেক রাজ্য থেকেই এই বোর্ড উঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

জেলা বোর্ড

জেলা বোর্ডের গঠন ঃ জেলা বোর্ডের সভ্যরা সকলেই নির্বাচিত। সভ্য-সংখ্যা ৯ জনের কম বা সাধারণতঃ ৩৩ জনের বেশি হয় না। জেলা বোর্ডের সভ্যরা সাধারণতঃ চার বছর সভ্যপদে বহাল থাকেন। সভ্যদের মধ্যে থেকেই বোর্ডের সভাপতি আর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

জেলা বোর্ডের কাজ ঃ গ্রামের সর্বথা উন্নতির জন্যে ইউনিয়ন বোর্ড যে-ধরণের কাজ করে থাকে, সমগ্র জেলার সর্বাংগীণ উন্নতির জন্যে জেলা বোর্ডও সেই ধরণের কাজই করে থাকে—তবে, বলাই বাহুল্য যে জেলা বোর্ডের কর্মক্ষেত্র ইউনিয়ন বোর্ডের কর্মক্ষেত্রের চেয়ে ঢের বেশি ব্যাপক। এই সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে জেলা বোর্ডের অধীনে অনেক স্থায়ী বেতনভোগী কর্মচারী কাজ করেন,—যেমন জেলার ইঞ্জিনীয়ার, জেলার স্বাস্থ্যাধিকারিক (District Health Officer), ইত্যাদি।

মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসংঘ

প্রেসিডেন্সি শহরগুলোতে কর্পোরেশন আর অন্যান্য শহরে মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসংঘ আছে—একথা আগেই বলা হয়েছে। এবার আমরা পশ্চিম বাংলার এই পৌরসংঘগুলো সম্বন্ধে মোটামুটি একটু আলোচনা করছি।

পৌরসংঘের গঠন ঃ প্রতি শহরেই একটি করে পৌরসংঘ আছে। পৌরসংঘের সভ্যরা সকলেই নির্বাচিত। তাঁদের বলা হয় **কমিশনার** বা

পৌরাধ্যক্ষ। পৌরাধ্যক্ষের সংখ্যা এক-এক মিউনিসিপ্যালিটিতে এক-এক রকম। পৌরাধ্যক্ষদের কাজের মেয়াদ সাধারণতঃ চার বছর, তবে সরকার ইচ্ছে করলে এক বছর বাড়িয়ে দিতে পারেন। তারপর আবার নতুন করে পৌরাধ্যক্ষ নির্বাচন করা হয়।

পৌরাধ্যক্ষরা পৌরসংঘের **সভাপতি** (Chairman) আর এক বা একাধিক **সহ-সভাপতি** (Vice-Chairman) নির্বাচিত করেন। সভাপতি পৌরাধ্যক্ষদের নির্দেশ মতোই পৌরসংঘের সব কাজ পরিচালনা করে থাকেন। তবে রাজ্য সরকার ভুক্তিপতি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি কর্মচারী মারফৎ পৌরসংঘের কাজকর্মের ওপর কড়া নজর রাখেন, এবং কোনও প্রকার অব্যবস্থা, অপব্যবহার, কর্তব্যের ত্রুটি প্রভৃতি দেখলে সরকার পৌরসংঘ বাতিল করে দিয়ে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা-শাসক মারফৎ নিজেই পৌরসংঘের কাজ পরিচালনা করতে পারেন।

পৌরসংঘের কর্তব্য ঃ পৌরসংঘের কর্তব্য অনেক। শহরের বাসিন্দাদের প্রায় সব রকমের স্থবিধের ব্যবস্থা পৌরসংঘকে করতে হয়। রাস্তা তৈরী করা, রাস্তার যত্ন নেওয়া, সেই সব রাস্তা পরিষ্কার করা, রাস্তায় জল আর আলো দেওয়ার ব্যবস্থা করা; স্কোয়ার, পার্ক, বাগান, খেলার মাঠ প্রভৃতি তৈরী আর দেখাশোনা করা ইত্যাদি পৌরসংঘের প্রধান প্রধান কর্তব্য। জনস্বাস্থ্য রক্ষাই পৌরসংঘের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা; মড়ক মহামারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা; দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা বা ঐ-সমস্তের স্থ-পরিচালনার জন্যে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা; ভেজাল-মেশানো ওষুধ বা খাবার জিনিস যাতে অসাধু ব্যবসায়ীরা বাজারে চালাতে না পারে সে-বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা; শহরের ময়লা ও ময়লা-জল নিয়মিত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, প্রভৃতি পৌরসংঘের জন-স্বাস্থ্যরক্ষা-সংক্রান্ত অবশ্য-করণীয় কাজ। শিক্ষাব্যবস্থা পৌরসংঘের আর একটি প্রধান কর্তব্য। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা, আর মধ্য আর উচ্চ বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, যাদুঘর প্রভৃতিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করাও পৌরসংঘের কর্তব্য।

শ্মশান বা কবর-ভূমি প্রভৃতির জন্যে জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখা; ঐ সমস্তের দেখাশোনা করা; জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখা; দমকল, অ্যাম্বুল্যান্স ইত্যাদির ব্যবস্থা করা; বাড়ীঘর তৈরীর জন্যে পরিকল্পনা অনুমোদন করা; বাটখারার ওজন মাপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদিও পৌরসংঘের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

আমাদের কলকাতার কর্পোরেশনই ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পৌরসংঘ।

কলকাতা কর্পোরেশন

গঠন ঃ কলকাতা কর্পোরেশনের মোট সভ্যসংখ্যা হল ৮১ জন। তার মধ্যে ৭৬ জন হলেন কাউন্সিলার আর ৫ জন হলেন অল্ডারম্যান। এই কাউন্সিলারদের মধ্যে ৭৫ জনকে ভোটদাতারা নির্বাচিত করেন; বাকী ১ জন হলেন কলকাতা ইম্প্রুভ্মেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। অল্ডারম্যানদের নির্বাচিত করেন কাউন্সিলাররা। প্রতি তিন বছর অন্তর কর্পোরেশনে কাউন্সিলার আর অল্ডারম্যানদের নির্বাচন হয়।

কলকাতায় বাড়ী বা বস্তির মালিক যাঁরা; যে-সমস্ত লোক কর্পোরেশনকে রেণ্ট, ট্যাক্স আর লাইসেন্স ফি দেন; কলকাতা কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত জায়গায় কোন ভাড়া বাড়ীর বাসিন্দা হিসেবে যাঁরা মাসিক অন্ততঃ আট টাকা করে ভাড়া দেন; কলকাতা কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত জায়গার যে-সমস্ত বাসিন্দা স্কুল-ফাইন্যাল বা অনুরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন—এই সমস্ত ধরণের প্রাপ্তবয়স্ক (অর্থাৎ অন্যূন একুশ বৎসর বয়স্ক) লোকেরাই কলকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচক হিসেবে ভোট দিতে পারেন।

বছরের প্রথম অধিবেশনে কর্পোরেশনের সভ্যদের মধ্যে থেকে একজন **মেয়র** (Mayor) বা মহানাগরিক এবং একজন **ডেপুটি মেয়র** (Deputy Mayor) বা উপ-মহানাগরিক হিসেবে নির্বাচিত হন। কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন মেয়র, তাঁর অনুপস্থিতিতে ডেপুটি মেয়রই সভাপতিত্ব করেন।

মেয়র আর ডেপুটি মেয়র ছাড়াও কর্পোরেশনের কাজের তত্ত্বাবধানের জন্যে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী থাকেন। এঁকে নিয়োগ করেন পশ্চিম বাংলা সরকার; রাজ্যের পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের (West Bengal Public Service Commission) সুপারিশ অনুসারেই সরকার এই কর্মচারীটিকে নিয়োগ করেন। এই কর্মচারীটিকে বলা হয় **কমিশনার** (Commissioner)। এঁর কাজের মেয়াদ হল পাঁচ বছর, তবে সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর কর্পোরেশন রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে এঁকে আরও পাঁচ বছরের জন্যে রাখতে পারেন। কর্পোরেশনের কার্যনির্বাহের ব্যাপারে কমিশনারকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে; কর্পোরেশনের কাউন্সিলররা পর্যন্ত তাঁর আইন-সংগত ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

এ ছাড়া, শিক্ষা, হিসাবপত্র, কর ও অর্থাদি, স্বাস্থ্য, শহরের পরিকল্পনা আর উন্নতি, পূর্তকাজ, বাড়ীঘর তৈরী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে একটি করে **স্থায়ী কমিটি** (Standing Committee) থাকতে পারে। যে সভ্য কোন একটি স্থায়ী কমিটির সভ্য, তিনি অন্য কোন স্থায়ী কমিটির সভ্য হতে পারেন না। বিভিন্ন কাজের জন্যে খরচপত্রের তদারক করা, হিসেবের খাতাপত্র পরীক্ষা করা, অডিট করা প্রভৃতির ক্ষমতা স্থায়ী কমিটিকে দেওয়া হয়েছে।

স্থায়ী কমিটি ছাড়াও চার পাঁচটি করে ওয়ার্ড বা পল্লী নিয়ে এক-একটি এলাকা তৈরী করে ঐ ঐ এলাকার কাউন্সিলারদের নিয়ে একটি করে **এলাকা কমিটি** (Borough Committee—বরো কমিটি) কর্পোরেশন গঠন করতে পারে।

কর্তব্য ঃ পশ্চিমবংগের পৌরসংঘগুলি বিভিন্ন শহরের জন্যে যে সমস্ত কাজ করে থাকে, কলকাতা মহানগরীর জন্যে কলকাতা কর্পোরেশনও সেই ধরণের কাজ করে। তবে, ঐ সমস্ত পৌরসংঘের চেয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের বাৎসরিক আয় অনেক বেশি, তাই ঐ সমস্ত পৌরসংঘের চেয়ে বেশি টাকাই কর্পোরেশন তার বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে খরচ করতে পারে।

॥ সমাজের রক্ষা-ব্যবস্থা ॥

সমাজ জীবন নিরুপদ্রবে যাপন করার জন্যে, সে-জীবন সম্পূর্ণ বিকশিত করে তোলার জন্যে মানুষের সব কিছুর আগে যা দরকার তা প্রাণ ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা। মানুষ যদি নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাঁচতেই না পায় তা হলে কেমন করে সে তার জীবন বিকশিত করে তুলতে পারে? আদিম মানুষের সমাজ-গড়ার মূলে যে সব তাগিদ ছিল প্রাণরক্ষার তাগিদ তার মধ্যে অন্যতম; ধন-প্রাণের নিরাপত্তা প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রের কাছে সংগত দাবী। রাষ্ট্র যদি নাগরিকের ধনপ্রাণের নিরাপত্তা রক্ষা না করতে পারে তবে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সার্থকতা থাকে না।

জনসাধারণের ধনপ্রাণের সংকট দুদিক থেকে আসতে পারে—দেশের বাইরে থেকে কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও সমাজ-বিরোধী লোকের উপদ্রবে।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশের সীমান্ত বা সমগ্র দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের। আমাদের দেশে সে দায়িত্ব ভারত সরকারের ওপর ন্যস্ত। এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রত্যেক দেশ সৈন্যবাহিনী পোষণ করে এবং দেশরক্ষা ব্যবস্থার জন্য এক স্বতন্ত্র বিভাগ থাকে। ভারত সরকারের দেশরক্ষা মন্ত্রীর অধীনে দেশরক্ষা বিভাগ আছে। শান্তির কালে যত সৈন্য সৈন্যবাহিনীতে থাকে যুদ্ধের কালে প্রয়োজন বোধে তা বাড়ান হয়। যুদ্ধের সময় নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার সুস্থ সবল সকল নাগরিককে সৈন্যদলে যোগ দিতে বাধ্য করার অধিকারও রাষ্ট্রের আছে।

আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা, উপদ্রব রোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা দেশের আরক্ষা বাহিনীর (Police force) ওপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু পুলিশ-ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের অধীন। কোন বিশেষ উপদ্রবে রাজ্য সরকার সৈন্যবাহিনীর সাহায্য চাইতে ও পেতে পারে।

প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রীর অধীনে পুলিশ বিভাগ পরিচালিত হয়।

রাজ্যের পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্তা Inspector-General of Police। কলকাতা মহানগরীর পুলিশ-প্রধান হলেন Commissioner of Police। রাজ্যস্তরের নীচে, জেলা মহকুমা ও থানা প্রভৃতি আঞ্চলিক ভিত্তিতে পুলিশব্যবস্থা সংগঠিত; জেলার পুলিশ ব্যবস্থা পরিচালনা করেন District Superintendent of Police, মহকুমার পুলিশ ব্যবস্থা Sub-Divisional Police-Officer-এর অধীনে; থানার ভার থাকে একজন প্রবীণ বা সুদক্ষ Sub-Inspector of Police-এর হাতে।

কয়েকটি থানা মিলে এক একটি Circle গঠিত হয়। Circle-এর পুলিশ-প্রধানকে Inspector of Police বলা হয়।

গ্রামাঞ্চলের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম-পঞ্চায়েতের ওপর ন্যস্ত। গ্রামের শান্তিরক্ষক চৌকিদার ও দফাদারেরা পঞ্চায়েত বা বোর্ড ও থানা-পুলিশ দুয়েরই সহযোগিতা করে। তবে তাদের নিয়োগ ও বেতন দেওয়া পঞ্চায়েত বা বোর্ডের দায়িত্ব।

কোন কোন গ্রামে, গ্রামকে উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্য গ্রাম-রক্ষী দল নামে স্বেচ্ছাসেবীর দল গঠিত হয়। নগরের অধিবাসীদের মধ্যেও এরকম স্বেচ্ছাসেবকেরা Special Constable-এর কাজ করেন।

একথা মনে রাখতে হবে যে কোন সমাজের জনসাধারণ যদি আইন ও শৃংখলা মানতে অভ্যস্ত না হয়, একজন অপরের অধিকার না মানে বা সে অধিকার রক্ষায় অপরের সংগে সহযোগিতা না করে, এবং দুষ্কৃতকারী সম্পর্কে সারা সমাজে একটি বিরূপ ভাব গড়ে না ওঠে, তবে পুলিশ বাহিনী যথাসম্ভব শক্তিশালী হলেও সমাজে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করতে সমর্থ হয় না ও জনসাধারণের ধন-প্রাণ নিরাপদ হয় না।

॥ ভারত-রাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতি ॥

স্বাধীনতা পাবার আগে পর্যন্ত ভারতের শাসন-ভার ছিল ইংরেজদের হাতে। ইংরেজদের পার্লামেণ্টের নির্দেশ অনুযায়ীই ততদিন চলছিল ভারতের শাসন-ব্যবস্থা। ১৯৪৭ **খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট** স্বাধিকার লাভ করার পর ভারতের গণপরিষদ্ (Constituent Assembly) স্বাধীন ভারতের জন্যে সংবিধান রচনা করার কাজে ব্রতী হয়। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতের গণপরিষদ্ এই নবরচিত সংবিধান অনুমোদন করে। **১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী চালু হয় এই নতুন সংবিধান।**

সংবিধানের আদর্শ ও মূলনীতিঃ সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, ভারতে **সার্বভৌম**[১] **গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** (Sovereign Democratic Republic) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছে এই সংবিধান। জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ-ইত্যাদি-নির্বিশেষে ভারতের প্রতিটি নাগরিকই যেন সামাজিক, আর্থিক আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার পায়; চিন্তা, বাক্য, প্রত্যয়, ধর্মবিশ্বাস আর ঈশ্বরের আরাধনায় তারা যেন সমান অধিকার ভোগ করে; মর্যাদা ও আত্মবিকাশের সুযোগ তাদের প্রত্যেকেই যেন সমান ভাবে পেতে পারে; ব্যক্তিগত মর্যাদা আর জাতীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ না করে ভারতের নাগরিকেরা যেন পরস্পরের সংগে ভ্রাতৃত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়তে পারে—এই সমস্ত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই এই সংবিধান রচনা করা হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের গঠনঃ ব্রিটিশ আমলে ভারত মোটামুটি দুটো প্রধান ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একটা ভাগ ছিল সরাসরি ইংরেজ সরকারের অধীন। এই ভাগটাকে বলা হত **ব্রিটিশ ভারত**। আর একটা ভাগে ছিল

---

১ ভারত অবশ্য 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' (United Nations) আর 'কমন্‌ওয়েল্‌থ অফ নেশন্‌স্'-এর সভ্য বটে; তবে এই সভ্যপদ ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক নয়—তাই এর দ্বারা ভারতের সার্বভৌমত্বের হানি হয় নি মোটেই।

সংখ্যায় ৫৬০-এর বেশি ছোট বড় **দেশীয় রাজ্য**। দেশীয় রাজ্যের রাজারা করদ রাজা হিসেবে, ইংরেজ সরকারের সংগে সন্ধি বা চুক্তির জোরে, নিজেদের খেয়াল-খুশিমতোই—অবশ্য ইংরেজ রেসিডেন্টদের নির্দেশ লংঘন না করে—তাঁদের রাজ্য শাসন করতেন।

ফলে ব্রিটিশ ভারত আর দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে শাসন-ব্যবস্থাগত অসামঞ্জস্য সমস্ত ব্রিটিশ আমল ধরেই চলে আসছিল। স্বাধীন ভারত এ অ-সামঞ্জস্য বরদাস্ত করতে রাজী হল না। এই সব দেশীয় রাজ্যের মধ্যে যে-সমস্ত রাজ্য পাকিস্তানে যোগ দিল সেই রাজ্যগুলো ছাড়া বাকী প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজ্যের প্রধানদের সংগে চুক্তি করে তাঁদের রাজ্যগুলোকে সে আপনার অংগীভূত করে নিল। এই সব দেশীয় রাজ্যের রাজারাও দেখলেন যে ইংরেজ ভারত ছাড়ার পর তাঁরা আইনতঃ স্বাধীন হলেও, নানা ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে তাঁদের স্বাধীনতা বেশি দিন বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই তাঁরাও তাঁদের রাজ্যগুলোকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে অসম্মত হলেন না। ভারত সরকারের সংগে চুক্তি করে এইসব দেশীয় রাজ্য ক্রমে স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

যে সমস্ত প্রদেশ আর রাজ্য নিয়ে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে সেইগুলো এবং পর্টুগীজ-অধিকৃত ছোট কয়েকটা অঞ্চল ছাড়া অবিভক্ত ভারতের বাকী প্রায় সমস্ত প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য আর দ্বীপপুঞ্জ নিয়েই গঠিত হয়েছে আমাদের স্বাধীন ভারত। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর **রাজ্য-পুনর্গঠন আইন** প্রবর্তিত হবার আগে পর্যন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত ছিল ঃ

(১) **'ক' অংশভুক্ত রাজ্য** (Part A States)—এর মধ্যে পড়েছিল অন্ধ্র, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব (পূর্ব), পশ্চিম বাংলা, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ আর মাদ্রাজ—এই দশটি রাজ্য। রাজ্য-পুনর্গঠন আইন প্রবর্তনের আগে পর্যন্ত কেবল 'ক' অংশভুক্ত রাজ্যের শাসককেই বলা হত **রাজ্যপাল**। বর্তমানে জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া বাকী সমস্ত রাজ্যের শাসককেই রাজ্যপাল বলা হয়।

(২) **'খ' অংশভুক্ত রাজ্য** (Part B States)—এর মধ্যে ছিল জম্মু ও কাশ্মীর, ত্রিবাংকুর-কোচিন, পাতিয়ালা ও পূর্বপঞ্জাব রাজ্যসম্মেলন, মধ্যভারত, মহীশূর, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র আর হায়দরাবাদ—রাজ্য ও রাজ্যসম্মেলন মিলিয়ে এই আটটি। জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া এই অংশভুক্ত অন্যান্য রাজ্যের শাসককে বলা হত **রাজপ্রমুখ**[১]। বর্তমানে এই 'রাজপ্রমুখ' উপাধি তুলে দেওয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শাসককে আগেও বলা হত, এবং এখনও বলা হয় **সদর্-ই-রিয়াসৎ**।

(৩) **'গ' অংশভুক্ত রাজ্য** (Part C States)—এর অন্তর্ভুক্ত ছিল আজমীর, কচ্ছ, কুর্গ, ত্রিপুরা, দিল্লী, বিন্ধ্যপ্রদেশ, ভূপাল, মণিপুর, হিমাচল প্রদেশ (বিলাসপুর সমেত)—এই ন'টি রাজ্য। রাজ্য-পুনর্গঠনের ফলে এই রাজ্যগুলোর মধ্যে আজমীরকে রাজস্থানের, কুর্গকে মহীশূরের, এবং ভূপাল ও বিন্ধ্যপ্রদেশকে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বাকী রাজ্যগুলোকে 'কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'গ' অংশভুক্ত রাজ্যগুলো আগেও অবশ্য কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন ছিল।

(৪) **'ঘ' অংশভুক্ত এলাকা** (Part D Territories)—এই তিন ধরণের রাজ্য ছাড়া আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে রাজ্য না বলে 'ঘ' অংশভুক্ত এলাকা বলে অভিহিত করা হত। এখন এই দ্বীপপুঞ্জ দুটোকেও 'কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শাসন-ব্যাপারে ইতঃপূর্বেও এগুলো কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন ছিল।

---

১ ভারত স্বাধীন হবার পর ভারত সরকারের সংগে দেশীয় রাজ্যের রাজাদের যে চুক্তি হয়, সেই অনুসারে রাষ্ট্রপতি কোন কোন রাজাকে 'রাজপ্রমুখ' হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন এবং এক-একটা 'খ' অংশভুক্ত রাজ্যের শাসন-ভার এঁদের এক-এক জনের হাতে দিয়েছিলেন।

সংবিধান অনুসারে, রাজপ্রমুখদের মর্যাদা আর ক্ষমতা সর্বাংশে 'ক' অংশভুক্ত রাজ্যের রাজ্যপালের মর্যাদা আর ক্ষমতারই অনুরূপ ছিল। তবে চুক্তির সর্ত অনুসারে নিজেদের ব্যক্তিগত তহবিল রাখার অধিকার এঁদের দেওয়া হয়েছিল। দেশীয় রাজ্য হিসেবে আগে এই সমস্ত রাজ্যে যে-সৈন্যবাহিনী ছিল, সেই সৈন্যবাহিনীও এই সমস্ত রাজপ্রমুখদের অধিনায়কত্বে রাখা হয়েছিল বটে, তবে তাও ভারতের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল।

রাজ্য পুনর্গঠন আইন প্রবর্তিত হবার পর নতুনভাবে রাজ্যবিভাগ করা হয়েছে। ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি অংশ-বিভাগের পরিবর্তে ভারতের সমস্ত এলাকাকে এখন দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে—**কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল ও রাজ্য**। **কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলগুলোর** (Union Territories) মধ্যে পড়েছে :—(১) দিল্লী, (২) হিমাচল প্রদেশ, (৩) মণিপুর, (৪) ত্রিপুরা, (৫) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এবং (৬) লাক্ষাডিভ, মিনিকয়, আমিন-ডিভি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ—এই ছ'টি অঞ্চল। এই অঞ্চলগুলোর প্রত্যেকটিই কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনের অধীন। কেন্দ্রীয় সরকার 'চাফ কমিশনার' বা 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটার' উপাধিধারী কর্মচারীদের মারফৎ এই সমস্ত অঞ্চলের শাসন-কাজ পরিচালনা করে।

রাজ্য হল : (১) অন্ধ্র প্রদেশ, (২) আসাম, (৩) বিহার, (৪) বোম্বাই* (৫) মধ্যপ্রদেশ, (৬) কেরল, (৭) মাদ্রাজ, (৮) মহীশূর, (৯) উড়িষ্যা, (১০) পঞ্জাব, (১১) রাজস্থান, (১২) উত্তর প্রদেশ, (১৩) পশ্চিমবংগ, (১৪) জম্মু ও কাশ্মীর—এই চোদ্দটি। রাজপ্রমুখের পদ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া বাকী সমস্ত রাজ্যের শাসককেই রাজ্যপাল নামে অভিহিত করা হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের শাসনকর্তাকে এখনও 'সদর্-ই-রিয়াসৎ'ই বলা হয়।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন : আগেই বলা হয়েছে ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের সংবিধানেও তাই আইন-কানুন তৈরী করার ক্ষমতার দিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে বিভিন্ন রাজ্যের সরকারের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত রাজ্য সরকারকে তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনেকখানি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু কয়েকটা বিষয়ে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের অধীন। দেশরক্ষা, সেনাবিভাগ, নৌবাহিনী, আগ্নেয় অস্ত্র, আণবিক শক্তি, যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় শিল্প ইত্যাদি, বিদেশের সংগে সম্পর্ক, ডাক ও তার, বেতার, মুদ্রা, তৈলক্ষেত্র ও খনিজ সম্পদ প্রভৃতি যে-সমস্ত বিষয় সারা দেশের স্বার্থের সংগে সংশ্লিষ্ট, সে-সমস্ত

* সম্প্রতি বোম্বাই রাজ্যটিকে ভেঙে দুটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করা হয়েছে।

বিষয় সম্পর্কে কেবল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা অর্থাৎ পার্লামেণ্টই আইন তৈরী করতে পারে। সংবিধানে এই সমস্ত বিষয়কে **কেন্দ্রীয় তালিকা**র (Union List) অন্তর্ভুক্ত করে ধরা হয়েছে।

আর যে সমস্ত বিষয়ের সংগে বিভিন্ন রাজ্যের কেবল আপন আপন স্বার্থ ই সংশ্লিষ্ট সেই সমস্ত বিষয়ে সাধারণ অবস্থায় ঐ ঐ রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভাকেই আইন তৈরী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য, পুলিশ, শিক্ষা, কৃষি, সেচ, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়কে সংবিধানে **রাজ্য তালিকা**র (State List) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যে-সমস্ত বিষয়ের সংগে কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্যসরকারের স্বার্থ সমানভাবেই সংশ্লিষ্ট, সংবিধানে সেই সমস্ত বিষয়কে **যুগ্ম তালিকা**র (Concurrent List) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভা আর কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট দুয়েরই এ-সমস্ত বিষয়ে আইন তৈরী করার অধিকার আছে। ফৌজদারী আইন, আর্থিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, শ্রমিক সংঘ সম্পর্কিত আইন, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

এই তিনটি তালিকায় যে-সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ নেই সংবিধানে সেই সমস্ত **বক্রী বিষয়ে** (Residual Subjects) আইন তৈরী করার ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টকেই দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া, জরুরী অবস্থা বর্তমান বলে যদি রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন, তাহলে দেশের যে-কোন অংশের জন্যে আইন তৈরী করার অধিকার কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের থাকবে। কিন্তু জরুরী অবস্থা চলে গেলে পর ছ'মাসের বেশি আর ঐ আইন বলবৎ থাকতে পারবে না।

রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে যদি রাজ্যসভা মনে করে যে ঐ বিশেষ বিষয়ে আইন তৈরী করার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হাতে থাকাই দেশের পক্ষে কল্যাণকর, তা হলে পার্লামেণ্ট ঐ রাজ্য বিষয়েও আইন তৈরী করতে পারে। তবে এই আইন সাধারণতঃ মাত্র এক বছর বলবৎ থাকতে পারে।

দুই বা তার চেয়ে বেশি রাজ্য নিজের নিজের ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করে কোন বিশেষ বিষয়ে আইন তৈরী করার জন্যে পার্লামেণ্টকে অনুরোধ জানালে পার্লামেণ্ট ঐ বিষয়েও আইন তৈরী করতে পারে।

এ-ছাড়া কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি কাজে পরিণত করার জন্যে প্রয়োজন হলে পার্লামেণ্ট ভারত-রাষ্ট্রের যে-কোন অংশের জন্যেই আইন তৈরী করতে পারবে।

পার্লামেণ্টের তৈরী কোন আইনের সংগে যদি কোন রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার তৈরী কোন আইনের বিরোধ ঘটে, তাহলে সেক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের তৈরী আইনই খাটবে—রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার তৈরী আইন খাটবে না। তবে যদি রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার তৈরী এই আইনটি রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমেই চালু হয়ে থাকে তাহলে আর একে বাতিল করা চলবে না।

পার্লামেণ্টের তৈরী আইন-কানুনের মর্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষা করেই যাতে বিভিন্ন রাজ্যের শাসন-কাজ চলে, সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দরকার মতো নির্দেশ দিতে পারবে। আবার রাষ্ট্রপতি, প্রয়োজন মনে করলে, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন কাজের ভার যে-কোন রাজ্য সরকারের ওপরও অর্পণ করতে পারেন, অবশ্য ঐ রাজ্যসরকারের সম্মতি নিয়ে।

রাজ্যে রাজ্যে নদীর জল নিয়ে যদি কোন বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দেয় তাহলে তার মীমাংসার জন্যে পার্লামেণ্ট প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

বিভিন্ন রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা যাতে সুশৃংখলভাবে চলে তার জন্যে রাষ্ট্রপতি একটি অন্তঃরাজ্য পরিষদ্ (Inter-State Council) গঠন করতে পারেন।

রাষ্টপতি যদি মনে করেন যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোন রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসন-কাজ চালানো সম্ভব নয়, তাহলে ঘোষণাপত্র (Proclamation) জারি করে তিনি ঐ রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে নিয়ে পার্লামেণ্টকে ঐ রাজ্যের জন্যে আইন তৈরী করার অধিকার দিতে পারেন।

মোট কথা, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো দ্বৈত শাসনব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলো, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে

অনেকখানি স্বাধীন হলেও, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয় এবং রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের ক্ষমতার চেয়ে অনেক কম। এইখানেই প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের সংগে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতির তফাৎ। প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য বা প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতার চেয়ে বেশি থাকে, রাজ্য বা প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারের চেয়ে বেশি হয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটা বিশেষত্ব এই যে প্রয়োজন হলে সাময়িকভাবে একে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রেও পরিণত করা যেতে পারে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে তাই প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র না বলে এক-কেন্দ্রিকতা-প্রবণ যুক্তরাষ্ট্র বলাই ঠিক। ভারতের সংবিধানেও ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র না বলে **রাজ্যসম্মেলন** (Union of States) আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ঃ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য-সরকার কী কী ধরণের কাজ করে তা পূর্ববর্তী আলোচনায় জেনেছ। সরকারের কাজ তিন রকমের ঃ (১) আইন-কানুন তৈরী করা, (২) দেশের লোকেরা সেইসব আইন-কানুন মানছে কিনা তার তদারক করা, অর্থাৎ আইন-শৃংখলা বজায় রাখা এবং (৩) কোন আইন ভংগ করার অভিযোগে অভিযুক্তদের বিচার করা।

এই তিন ধরণের কাজের জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ থাকে—(১) **ব্যবস্থা বিভাগ** (Legislature), (২) **শাসন বিভাগ** (Executive) ও (৩) **বিচার বিভাগ** (Judiciary)। ব্যবস্থা বিভাগ আইন-কানুন তৈরী করে, শাসন বিভাগ দেশের লোক আইন-কানুন মানছে কিনা তার তদারক করে ও দেশে আইন শৃংখলা বজায় রাখে এবং বিচার বিভাগ আইনভংগকারীদের বিচার করে। এই তিন বিভাগের মধ্যে ব্যবস্থা বিভাগের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

কোন কোন দেশে, যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, এই তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হয়। এই পৃথক-করার ব্যবস্থাকে ক্ষমতা-পৃথকীকরণ (Separation of Powers) বলে। ইংলণ্ডে এ ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি এবং আমাদের দেশে আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে। আমাদের সংবিধানে বিচার বিভাগকে অন্য দুই বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র রাখার নির্দেশ আছে।

বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য না থাকলে গণতান্ত্রিক নীতির অমর্যাদার আশংকা থাকে। শাসন বিভাগই শাসন ও শৃংখলার জন্যে আইন প্রয়োগ করেন। স্বভাবতঃ তাতে ভুলত্রুটি থাকতে পারে। তাই যদি শাসন বিভাগের হাতে বিচার ক্ষমতা থাকে অথবা বিচার বিভাগের ওপর যদি শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব থাকে, তবে আইন প্রয়োগে শাসন-বিভাগের ভুল-ত্রুটি শোধরাবার উপায় থাকে না এবং জনসাধারণেরও ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা থাকে না।

তবে এই তিন বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ অসমীচীন। পরস্পরের সহযোগিতা রেখেও যতটা স্বাতন্ত্র্য ন্যায়সংগতভাবে রাখা যায় ততটা স্বাতন্ত্র্যই প্রত্যেকটি বিভাগের থাকা উচিত।

॥ ক ॥ ভারতের শাসন-বিভাগ

ভারত রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক গঠনের কথা আলোচনা করার সময় সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার যে আমাদের এই রাষ্ট্রের পরিচালনার দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে **কেন্দ্রীয় সরকার** আর **রাজ্য সরকার**—এই দুই সরকারের হাতে।

কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন—কেন্দ্রে রয়েছেন **রাষ্ট্রপতি, পার্লামেন্ট** (Parliament), আর রাষ্ট্রপতির অধীন এবং পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বযুক্ত **মন্ত্রিমণ্ডলী**। এই পার্লামেন্টে রয়েছে দুটি কক্ষ (Houses)—**রাজ্যসভা** (Council of State) আর **লোকসভা** (House of the People)। রাষ্ট্রপতি, তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী আর পার্লামেন্টের ওপরই রয়েছে সামগ্রিক ভাবে ভারতের উন্নতি আর নিরাপত্তার দায়িত্ব। ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতির ভারও রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর।

রাষ্ট্রপতি—রাষ্ট্রপতি (President) হলেন সমগ্র ভারতের সংবিধান-সম্মত কর্তা। রাষ্ট্রপতির পদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ করার ব্যবস্থাই দেওয়া হয়েছে আমাদের সংবিধানে—বংশপরম্পরাক্রমে বা উত্তরাধিকারসূত্রে কেউই এই পদের অধিকারী হতে পারেন না। পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সমস্ত নির্বাচিত

সদস্য আর সমস্ত রাজ্য বিধান সভার (মনে রাখা দরকার, বিধান পরিষদের নয়) নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে তৈরী একটি **নির্বাচক-সংস্থার** (Electoral College) ওপর থাকে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করার ভার অর্থাৎ **জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপরই থাকে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করার ভার—জনগণ প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে নির্বাচিত করেন না।** একে বলে **পরোক্ষ নির্বাচন**। নির্বাচক-সংস্থা এক অতি জটিল পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন।

এখন জানা দরকার, কেন এমন পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করা হয়। ভারতে ভোটদাতার সংখ্যা হল প্রায় আঠারো কোটি। এই আঠারো কোটি ভোটদাতার ভোট নিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। তাই যাতে এত হাংগামা না করে সহজে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা যায় তারই জন্যে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদের সংবিধানে। কিন্তু পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হলেও রাষ্ট্রপতি জনগণেরই প্রতিনিধি।

অন্যূন পঁয়ত্রিশ বছর যাঁর বয়স, আইনতঃ লোকসভায় নির্বাচিত হবার যিনি যোগ্য, বেতনওয়ালা বা লাভজনক সরকারী পদে যিনি অধিষ্ঠিত নন—এমন যে-কোন ভারতীয় নাগরিকই রাষ্ট্রপতি-পদের প্রার্থী হতে পারেন। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল সাধারণতঃ পাঁচ বছর, তবে স্বেচ্ছায় তার আগেও তিনি পদত্যাগ করতে পারেন। আবার একই ব্যক্তি একাধিক বারও রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন।

কাজের ভার নেবার আগে রাষ্ট্রপতিকে নির্দিষ্ট রীতি অনুসারে ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতির সামনে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ (Oath) নিতে বা স্বীকৃতি (Affirmation) জানাতে হয়। সংবিধান অমান্য করলে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ (রাজ্যসভা ও লোকসভা) সম্মিলিত ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাঁর পদচ্যুতি দাবি করতে পারে। এই ধরণের অভিযোগ আনাকে বলে ইম্‌পীচ্‌মেণ্ট (Impeachment)। এই অভিযোগ অনুসারে তখন রাষ্ট্রপতির বিচার হবে এবং বিচারের সময় রাষ্ট্রপতিকে আত্মপক্ষ

সমর্থন করার সুযোগ দিতে হবে। বিচারে দোষী প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতিকে বিনা ভাড়ায় বাস করতে দেওয়া হয় সরকারী প্রাসাদে। মাসে দশ হাজার টাকা বেতন আর নির্দিষ্ট অন্যান্য ভাতাও তিনি পান।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা—সংবিধানে বাহ্যতঃ রাষ্ট্রপতিকে অনেক ক্ষমতাই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ক্ষমতাগুলো তিনি কার্যতঃ প্রয়োগ করেন না—মন্ত্রীদের পরামর্শ-মতোই চলে থাকেন। তাই তাঁকে বলা হয় **নিয়মতান্ত্রিক শাসক**। রাষ্ট্র-শাসনের সমস্ত কাজ তাঁর নামে চললেও এই সমস্ত কাজের দায়িত্ব তাঁর মন্ত্রীদেরই। মন্ত্রীরাই রাষ্ট্র-শাসনের সমস্ত কাজ করেন, তবে সমস্ত আদেশ বা নির্দেশ জারি হয় রাষ্ট্রপতির নামে।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে যে-সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এখন তাই বলা হচ্ছে।

প্রথমতঃ রাষ্ট্রপতি হলেন কেন্দ্রের শাসক। তাই তাঁরই নামে পরিচালিত হয় কেন্দ্রের শাসন-কাজ। এই কাজের পরিচালনে তাঁকে 'সাহায্য ও পরামর্শ দেবার' জন্যে (to aid and advise) যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তার প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন তিনিই; পরে প্রধান মন্ত্রীর সংগে পরামর্শ করে অন্যান্য মন্ত্রীদেরও তিনি নিযুক্ত করেন এবং প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেন। মন্ত্রিসভার সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রধান মন্ত্রী জানান রাষ্ট্রপতিকে। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র-শাসন বা আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত যে-কোন খবর জানতে চাইবেন, প্রধান মন্ত্রীকে তা জানাতে হবে। রাষ্ট্রপতির যতদিন খুশি ততদিনই মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্ব করতে পারেন, কিন্তু তাঁরা যৌথভাবে দায়ী থাকেন লোকসভার কাছে।

এ ছাড়াও রাষ্ট্রপতির আরও অনেক রকম ক্ষমতা রয়েছে। ভারতের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী আর বিমান-বাহিনীর, কার্যতঃ না হলেও, আইনতঃ সর্বপ্রধান অধিনায়ক তিনিই।

ভারতের অ্যাটর্নী-জেনারেল, কম্প্‌ট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল ও চীফ ইলেক্‌শন্ কমিশনার; বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল; ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণ ও বিভিন্ন ধর্মাধিকরণের বিচারপতি; 'ইউনিয়নে'র 'পাব্লিক সার্ভিস কমিশন'-এর

সমস্ত সভ্য প্রভৃতি বড় বড় কর্মচারীকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। বিদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রভৃতিকেও তিনিই নিয়োগ করেন।

সংবিধানে **বিচার-সংক্রান্ত ক্ষমতাও** রাষ্ট্রপতিকে যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের কোন আদালত যদি কাউকে কোন অপরাধের জন্যে দণ্ডিত করে, তাহলে সেই দণ্ডিত অপরাধীকে তিনি ইচ্ছে করলে ক্ষমা করতে পারেন কিংবা তার দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখতে বা দণ্ড হ্রাস করে দিতে পারেন।

কেন্দ্র ছাড়া বিভিন্ন **রাজ্যের ওপরও ক্ষমতা** রয়েছে রাষ্ট্রপতির। প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ের ভার কোন রাজ্য-সরকারের হাতে সমর্পণ করতে পারেন। আবার বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিবাদ বাধলে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্যে এবং বিভিন্ন রাজ্যের সাধারণ স্বার্থে কোন বিষয়ে তদন্ত ও আলোচনা করার জন্যে তিনি একটি আন্তঃরাজ্য পরিষদও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন অঞ্চলগুলো রাষ্ট্রপতি তাঁর নিযুক্ত কোন চীফ কমিশনার বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর-এর সাহায্যে শাসন করেন।

এ-ছাড়া দেশে নির্বাচন-ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে **নির্বাচন কমিশন** (Election Commission), বা তপশীলভুক্ত শ্রেণীর বা বর্ণের (Scheduled Castes) আর তপশীলভুক্ত উপজাতিদের (Scheduled Tribes) স্বার্থ রক্ষা আর উন্নতি বিধানের জন্যে **বিশেষ কর্মচারী** (Special Officer), তপশীলভুক্ত অঞ্চল (Scheduled Areas) শাসন করার আর তপশীলভুক্ত উপজাতিদের মংগলামংগল সম্বন্ধে খবর জানবার জন্যে **বিশেষ কমিশন** (Commission) নিয়োগ করা প্রভৃতি শাসন-সংক্রান্ত অন্যান্য ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়েছে আমাদের সংবিধানে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আয়কর প্রভৃতি কর বণ্টন সম্বন্ধে সুপারিশ করবার জন্যে রাষ্ট্রপতি প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বা তার আগেই '**ফিনান্স কমিশন**' (Finance Commission) নিযুক্ত করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেণ্ট—রাজ্যসভা, লোকসভা ও রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে পার্লামেণ্ট তৈরী। সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের এক অংশ বলা যায়।

রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের রাজ্যসভায় ১২ জন সভ্য আর লোকসভায় অনধিক তুজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সভ্যকে মনোনীত করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে (রাজ্যসভায় বা লোকসভায়) উপস্থিত হয়ে ভাষণ দিতে বা যে কোন কক্ষে যে কোন বিষয়ে বাণী পাঠাতে পারেন। পার্লামেণ্টের কোন নির্দিষ্ট অধিবেশনের আগে কেন অধিবেশন ডাকা হয়েছে, কী কী বিষয়ে অধিবেশনে আলোচনা করা হবে, কোন্ কোন্ 'বিল' পার্লামেণ্টের ঐ অধিবেশনে উপস্থিত করা হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে একটি ভাষণ দিতেই হয়। পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করা বা স্থগিত রাখার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির রয়েছে। প্রয়োজন মনে করলে তিনি মেয়াদ ফুরোবার আগেই লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া পার্লামেণ্টে গৃহীত কোন বিল-ই (Bill) আইন (Act) হিসেবে গ্রাহ্য হবে না।

পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত থাকার সময়ে, প্রয়োজন হলে, রাষ্ট্রপতি, জরুরী আইন (Ordinance) জারি করতে পারেন। তবে পার্লামেণ্টের পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ হবার ছ-সপ্তাহের মধ্যে যদি এই জরুরী আইন কক্ষতুটি দ্বারা সমর্থিত না হয়, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

কোন রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত কোন বিল যদি সেই রাজ্যের রাজ্যপাল বিবেচনার জন্যে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠান, তাহলে রাষ্ট্রপতি সেই বিলে সম্মতি দিতেও পারেন না দিতেও পারেন, আবার পুনর্বিবেচনার জন্যে সেই বিলটিকে সেই রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় ফেরৎ পাঠাবার জন্যেও নির্দেশ দিতে পারেন।

পার্লামেণ্টের কক্ষ তুটোতে রাষ্ট্রপতিই (মন্ত্রী-মারফৎ) সারা বছরের আর্থিক বিবৃতি (Annual Financial Report) উপস্থাপিত করেন। সরকারী ব্যয় বাবদ কোন বরাদ্দ প্রস্তাবই (Demand of Grant রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া লোকসভায় উপস্থাপিত হতে পারে না। হঠাৎ যদি কোন বিশেষ প্রয়োজনে খরচ করার দরকার হয়ে পড়ে তাহলে পার্লামেণ্টের অনুমোদন পাবার আগেই রাষ্ট্রপতি তাঁর কর্তৃত্বাধীন একটি বিশেষ তহবিল থেকে এই ব্যয় নির্বাহ করার অনুমতি দিতে পারেন।

জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা (President's Emergency Powers) :

(১) রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ কিংবা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে সমগ্র ভারতের, বা রাষ্ট্রের কোন এক অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন হবার উপক্রম হয়েছে, তবে তিনি ঘোষণা-পত্র (Proclamation) জারি করে জরুরী অবস্থা (Emergency) ঘোষণা করতে পারেন। জরুরী অবস্থা যতদিন থাকে, ততদিন রাষ্ট্রপতি, পার্লামেণ্ট আর কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলো বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন।

(২) কোন রাজ্যে সংবিধানের ব্যবস্থা অনুযায়ী শাসন-পরিচালনা সম্ভব নয় বলে যদি রাষ্ট্রপতি বিবেচনা করেন, তাহলে ঘোষণাপত্র (Proclamation) জারি করে তিনি ঐ রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে নিতে পারেন এবং পার্লামেণ্টকে ঐ রাজ্যের জন্যে আইন তৈরী করবার অধিকার দিতে পারেন।

(৩) যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে ভারতের, অথবা তার কোন অংশের, আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম ক্ষুণ্ণ হবার উপক্রম হয়েছে, তবে তিনি ঘোষণাপত্র (Proclamation) জারি করে সে-সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার দায়িত্ব নিজের হাতে নিতে পারেন কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিতে পারেন।

এখানে মনে রাখা দরকার যে **আইনতঃ এত সব ক্ষমতা দেওয়া থাকলেও রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারেই সব কাজ করেন। নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছে বা বিচার-বুদ্ধি অনুসারে তিনি তাঁর কোন ক্ষমতাই প্রয়োগ করেন না।**

উপ-রাষ্ট্রপতি (Vice-President) : পার্লামেণ্টের দুই কক্ষের মিলিত অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যদের বেশির ভাগের ভোটে ভারত-রাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করা হয়। ইনিও রাষ্ট্রপতির মতোই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বছর যাঁর বয়স এমন যে কোন ভারতীয় নাগরিকই ভারত-রাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্যে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন। সাধারণতঃ পাঁচ বছর

হল এঁর কার্যকাল ; তবে একই ব্যক্তি একাধিক বার উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন।

এক রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করা ছাড়া এঁর আর কোনও শাসনতান্ত্রিক কর্তব্য সাধারণতঃ থাকে না। তবে রাষ্ট্রপতি কোন কারণে সাময়িকভাবে অনুপস্থিত থাকলে উপ-রাষ্ট্রপতি তখনকার মতো তাঁর কাজ চালান। এ-ছাড়া মৃত্যু, পদচ্যুতি প্রভৃতি কারণে যদি রাষ্ট্রপতির পদ কিছুদিনের জন্যে খালি থাকে তাহলে যতদিন না নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি কাজের ভার নেন ততদিন উপ-রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করবেন।

রাজ্যসভার অধিকাংশ সভ্য যদি তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করেন, আর ঐ প্রস্তাব যদি লোকসভাও সমর্থন করে, তাহলে উপ-রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হবেন।

মন্ত্রিসভা (Concil of Ministers) : আগেই বলা হয়েছে যে, প্রধান মন্ত্রী আর অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। সংবিধানে যদিও বলা হয়েছে যে প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে এক মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য আর পরামর্শ দানের জন্যে ('aid and advise') গঠিত হবে, আসলে কিন্তু এই মন্ত্রি-সভাই রাষ্ট্রপতির নামে দেশ শাসন করে। তবে রাষ্ট্রশাসন-সংক্রান্ত সমস্ত নির্দেশই রাষ্ট্রপতির নামে প্রচারিত হয়। শাসন-কাজ বা আইন তৈরী সম্পর্কে মন্ত্রীরা যা করতে চান তা রাষ্ট্রপতিকে জানাতে হয়। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র-শাসন বা আইন-প্রণয়ন ইত্যাদি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন খবর জানতে চাইলে প্রধান মন্ত্রী তাঁকে তা জানাতে বাধ্য। মন্ত্রিসভার কোন সিদ্ধান্ত কিন্তু রাষ্ট্রপতি নাকচ করে দিতে পারেন না। তবে কোন মন্ত্রী যদি মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ না করে নিজেই কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করেন, তবে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি না দিয়ে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্যে সেই সিদ্ধান্তটি পাঠিয়ে দিতে পারেন। মন্ত্রিসভা সেই সিদ্ধান্তটি মেনে নিলে রাষ্ট্রপতিকেও তাতে সম্মতি দিতে হবে।

সাধারণতঃ পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যিনি নেতা রাষ্ট্রপতি তাঁকেই প্রধান মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। অন্যান্য মন্ত্রীদেরও রাষ্ট্রপতিই নিয়োগ করেন, তবে

প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে। সমস্ত মন্ত্রীকেই পার্লামেণ্টের সভ্য হতে হবে। তবে কোন মন্ত্রী যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সময় পার্লামেণ্টের সভ্য না থাকেন, তাহলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ছ-মাসের মধ্যেই তাঁকে পার্লামেণ্টের সভ্য হতে হবে, নাহলে তিনি আর মন্ত্রী থাকতে পারবেন না।

রাষ্ট্রপতির যতদিন খুশি ততদিনই **মন্ত্রীরা** স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন, তবে তাঁরা **যৌথভাবে দায়ী থাকেন লোকসভার কাছে।** এর মানে অবশ্য আসলে দাঁড়ায় এই যে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছে করলেই মন্ত্রীদের বরখাস্ত করতে পারেন না। কারণ, তা করতে গেলেই এক শাসনতান্ত্রিক সংকট দেখা দেবে। **লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন যতদিন থাকবে মন্ত্রীরা কার্যতঃ ততদিনই মন্ত্রিত্ব করতে পারেন।** কেননা, লোকসভার সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল যে মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করবে তাকে বরখাস্ত করলে নতুন আর একটা মন্ত্রিসভা গঠন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ এই নতুন মন্ত্রিসভা তো আর লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন পাবে না; ফলে পদে পদে এই নতুন মন্ত্রিসভাকে ভোটে হেরে যেতে হবে। তখন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বরখাস্ত হওয়া ছাড়া এই নবগঠিত মন্ত্রিসভার আর কোন গত্যন্তর থাকবে না।

যৌথ দায়িত্ব কথাটার অর্থ হল এই যে সমগ্র মন্ত্রিসভাই যে-কোন মন্ত্রীর কাজের জন্যে লোকসভার কাছে সম্মিলিতভাবে দায়ী থাকবে। কোন একজন মন্ত্রীর বা সমগ্র মন্ত্রিসভার কোন কাজ যদি লোকসভার অনুমোদন না পায় তাহলে সমগ্র মন্ত্রিসভাকেই পদত্যাগ করতে হবে। লোকসভা চার রকম উপায়ে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা জানাতে পারে—হয় কেবল একজন মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে; কিংবা কোন মন্ত্রীর আনা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 'বিল' অগ্রাহ্য করে; কি 'বাজেট' বা বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য বা ভীষণ রকম রদ-বদল করে; কিংবা কোন গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে মূলতুবী প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই চার রকম উপায়ের মধ্যে যে-কোন উপায়ের সাহায্যে লোকসভা মন্ত্রিসভার

বিরুদ্ধে তার অনাস্থা জানাতে পারে। তখন মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। না করলে রাষ্ট্রপতি এই অনাস্থাভাজন মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করতে পারেন। তবে মন্ত্রিসভার অনুরোধে লোকসভা ভেঙে দিয়ে তিনি আবার নতুন করে লোকসভা নির্বাচন করার নির্দেশও দিতে পারেন। এই নব-নির্বাচিত লোকসভা যদি ঐ মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করে তাহলে আগের লোকসভার অনাস্থাভাজন হওয়া সত্ত্বেও এই মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে বা পদচ্যুত হতে হয় না। তবে নব-নির্বাচিত লোকসভাও সমর্থন না করলে রাষ্ট্রপতি ঐ মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে দেবেন।

প্রধান মন্ত্রী—প্রধান মন্ত্রীই মন্ত্রিসভার দলপতি। মন্ত্রিসভার বৈঠকের সভাপতিও তিনিই। মন্ত্রী-নিয়োগ, মন্ত্রীদের মধ্যে কার্যভার বণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে তিনিই রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেন। আইন তৈরীর আর শাসন-কাজ-পরিচালনার ব্যাপারে মন্ত্রিসভা কোন্ নীতি মেনে চলবে তা-ও তিনিই ঠিক করে দেন। পার্লামেণ্টে সরকার পক্ষের তিনিই মুখপাত্র। রাষ্ট্রপতির তিনি প্রধান পরামর্শদাতা। লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা তিনি। এই সব নানা কারণে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রীই সবচেয়ে ক্ষমতাশালী লোক।

মন্ত্রিমণ্ডলীর গঠন: (১) পরিষদ্-ভুক্ত মন্ত্রী (Cabinet Minister), (২) রাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister of State) আর (৩) উপমন্ত্রী (Deputy Minister) —এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রী নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী তৈরী। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে পদমর্যাদায় আর ক্ষমতায়। রাষ্ট্রমন্ত্রীরা পরিষদ্‌ভুক্ত মন্ত্রীদের চেয়ে পদমর্যাদায় নিচু; নিমন্ত্রিত না হলে (অর্থাৎ স্বাধিকার-বলে) তাঁরা মন্ত্রি-পরিষদ্-এর (Cabinet) সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন না। সাধারণতঃ স্বাধীনভাবে কোন বিভাগের ভারও তাঁরা নেন না। উপমন্ত্রীরা পদমর্যাদায় আরও অনেক নিচু।

মন্ত্রীদের কাজে সাহায্য করার জন্যে কয়েকজন পার্লামেণ্টিয় সচিবও (Parliamentary Secretary) আছেন। এঁরা কিন্তু কখনোই স্বাধীনভাবে কোন বিভাগের ভার নিতে পারেন না।

॥ খ ॥ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা

আগেই বলা হয়েছে, কেন্দ্রে একটি পার্লামেণ্ট অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভা রয়েছে। রাজ্যসভা (Council of States) আর লোকসভা (House of the People)—এই দুটি কক্ষ আর রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে এই পার্লামেণ্ট গঠিত।

রাজ্যসভা ঃ সংবিধান অনুসারে রাজ্যসভার সভ্য-সংখ্যা ২৫০ জনের বেশি হতে পারবে না। এই অনধিক ২৫০ জনের মধ্যে থাকবেন বিভিন্ন রাজ্যের অনধিক ২৩৮ জন প্রতিনিধি আর রাষ্ট্রপতি-মনোনীত ১২ জন সভ্য। বর্তমানে রাজ্যসভার সভ্য-সংখ্যা ২৩৪ জন। তার মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতির মনোনীত, বাকী ২২২ জন এসেছেন বিভিন্ন রাজ্য আর কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল থেকে। জম্মু আর কাশ্মীর ছাড়া প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন ঐ ঐ রাজ্যের বিধান সভার নির্বাচিত সভ্যেরা। জম্মু আর কাশ্মীরের প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রপতির মনোনীত। রাষ্ট্রপতি যে ১২ জন সভ্যকে মনোনীত করেন, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের বিশেষ জ্ঞান বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

অন্যূন তিরিশ বছর বয়সের যে-কোন ভারতীয় নাগরিকই রাজ্যসভার সভ্যপদ-প্রার্থী হতে পারেন, তবে উন্মাদ, দেউলে, গুরুতর অপরাধের জন্যে দণ্ডিত কোন লোক, কিংবা সরকারী কর্মচারী কি কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে ব্যবসাতে নিযুক্ত কোন লোক এর সভ্য হতে পারেন না।

রাজ্যসভা স্থায়ী কক্ষ, তবে দু-বছর অন্তর অন্তর এর সভ্যসংখ্যার $\frac{1}{3}$ অংশকে বিদায় নিতে হয়।

রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি। রাজ্যসভা তার একজন সভ্যকে সহ-সভাপতি নির্বাচিত করতে পারে। উপ-রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে তিনি রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন।

লোকসভা ঃ স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে বিভিন্ন রাজ্যের প্রাপ্তবয়স্ক (অর্থাৎ অন্যূন একুশ বৎসর বয়স্ক) নাগরিকদের ভোটে লোকসভার সভ্যেরা

প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। লোকসভার সভ্য-সংখ্যা অনধিক ৫০০ জন (বর্তমানে সভ্য-সংখ্যা ৪৯৭ জন)। রাজ্যগুলোকে বহু আঞ্চলিক নির্বাচন-এলাকায় (Territorial Constituencies) ভাগ করে, প্রত্যেক ৫০০,০০০ লোক পিছু অন্ততঃ একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। কেবল জম্মু ও কাশ্মীরের জন্যে নির্দিষ্ট আসনগুলোতে সভ্য মনোনয়নের ভার রয়েছে রাষ্ট্রপতির ওপর। এ-ছাড়া, সংবিধান চালু হবার পর থেকে দশ বছর পর্যন্ত লোকসভার কয়েকটি আসন তপশীলভুক্ত জাতি আর উপজাতিদের জন্যে সংরক্ষিত রাখার জন্যেও সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইংগ-ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে এই সভায় রাষ্ট্রপতি অনধিক দুজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সভ্যও মনোনীত করতে পারেন।

লোকসভার সভ্যদের অধিকাংশই নাগরিকদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাই বলা যেতে পারে যে রাজ্যসভার চেয়ে লোকসভার সংগঠন বেশি গণতান্ত্রিক। তাই লোকসভাকে ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে বেশি। আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে সমস্ত কর্তৃত্ব লোকসভারই হাতে, এ-ব্যাপারে রাজ্যসভার কোন কর্তৃত্ব নেই। মন্ত্রিসভাও তাদের কাজের জন্যে লোকসভার কাছেই দায়ী, রাজ্যসভার কাছে নয়।

অন্যূন পঁচিশ বছর যাঁর বয়স এমন যে-কোন ভারতীয় নাগরিকই এই কক্ষের সভ্যপদের জন্যে প্রার্থী হতে পারেন। কিন্তু উন্মাদ, দেউলে, গুরুতর অপরাধের জন্যে দণ্ডিত কোন ব্যক্তি কিংবা কোন সরকারী কর্মচারী কি কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে ব্যবসাতে নিযুক্ত কোন লোক এর সভ্য হতে পারে না।

এই কক্ষে একজন অধ্যক্ষ (Speaker) ও একজন উপাধ্যক্ষ (Deputy Speaker) থাকেন। এঁরা দুজনেই এই কক্ষের সভ্যদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হন। লোকসভা সাধারণতঃ পাঁচ বছরের জন্যে নির্বাচিত হয়ে থাকে; অবশ্য রাষ্ট্রপতি তার আগেই এই সভা ভেঙে দিতে পারেন, আর জরুরী-অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি লোকসভার মেয়াদ নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে আরো এক বছর বাড়িয়েও দিতে পারেন।

পার্লামেন্টের সভ্যদের বিশেষ অধিকারঃ পার্লামেন্টের সদস্যরা কয়েকটা বিশেষ বিশেষ অধিকার ভোগ করে থাকেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল বাক্-স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার। পার্লামেন্টে দেওয়া কোন বক্তৃতা বা ভোটের জন্যে কোন সভ্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে মামলা-মোকদ্দমা করা যাবে না। আর আর বিষয়ে পার্লামেন্টের সভ্যদের ক্ষমতা, বিশেষ অধিকার ইত্যাদি পার্লামেন্টের নির্দেশ অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হবে।

পার্লামেন্টের নিয়মাবলীঃ পার্লামেন্টের কক্ষ-দুটোকে বছরে অন্ততঃ দুবার ডাকতেই হবে। রাষ্ট্রপতিই পার্লামেন্টের কক্ষ-দুটোর অধিবেশন ডাকতে বা স্থগিত রাখতে পারেন। দরকার মনে করলে লোকসভা তিনি ভেঙেও দিতে পারেন, তবে রাজ্যসভা ভাঙতে পারেন না।

পার্লামেন্টের ক্ষমতাঃ পার্লামেন্টের প্রধান কাজ আইন তৈরী করা। কেন্দ্রীয় বিষয়গুলোর জন্যে (অর্থাৎ দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার, রেলপথ, বিমানপথ, ডাক ও তার, বীমা প্রভৃতি বিষয়ে) আইন তৈরী করবার সমস্ত ক্ষমতা কেবল পার্লামেন্টেরই আছে। পার্লামেন্ট যুগ্ম বিষয় সম্পর্কেও (অর্থাৎ কেন্দ্রে আর রাজ্যে যে-সমস্ত আইন একই রকম থাকা দরকার, যেমন—ফৌজদারী মামলা, কারখানা, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে) আইন প্রণয়ন করতে পারে। রাজ্য-বিষয়গুলো সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা সাধারণতঃ পার্লামেন্টের থাকবে না। তবে রাষ্ট্রপতি যদি জরুরী-অবস্থা ঘোষণা করেন, কি রাজ্যসভা যদি মোট সভ্য-সংখ্যার অন্ততঃ $\frac{2}{3}$ অংশের ভোটে স্থির করে যে রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে কোন রাজ্য-বিষয় সম্পর্কে পার্লামেন্টেরই আইন প্রণয়ন করা উচিত, কিংবা দুই বা তার বেশি রাজ্য যদি কোন রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন তৈরী করার জন্যে পার্লামেন্টকেই অনুরোধ করে, তাহলে পার্লামেন্ট ঐ ঐ রাজ্য-বিষয় সম্পর্কেও আইন তৈরী করতে পারে।

রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভার সভাপতি ও সহ-সভাপতি, লোকসভার

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ প্রভৃতির বেতন ও ভাতা, প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচার-পতিদের আর কম্প্‌ট্রোলার ও অডিটার-জেনারেল প্রভৃতির বেতন-ভাতা-পেন্সন ইত্যাদির ব্যয়, সরকারী ঋণ বাবদ ব্যয় ইত্যাদি কেন্দ্রীয় তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় ছাড়া অন্য সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যয় মঞ্জুর করার ও কর বসানোর ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে। পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া কর বসানো বা সরকারী ঋণ সংগ্রহ করা যায় না। ঋণ-সংগ্রহ-পদ্ধতি বা কর-নীতিতে কোন রদ-বদল করতে গেলেও পার্লামেণ্টের অনুমোদন চাই। অবশ্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া এ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাবই পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হতে পারে না।

এইখানে মনে রাখা দরকার যে, এই অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে কর্তৃত্ব লোকসভারই রয়েছে, রাজ্যসভা এ ব্যাপারে কর্তৃত্ব করতে পারে না। অর্থসংক্রান্ত বিল লোকসভাতেই উত্থাপিত করা যায়, রাজ্যসভায় নয়। তবে লোকসভায় এই ধরণের কোন বিল অনুমোদিত হবার পর, অনুমোদনের জন্যে আবার রাজ্যসভায় পাঠান হয়। রাজ্যসভা সে বিল বাতিল করে দিতে পারে না, তবে সংশোধনের জন্যে সুপারিশ করে বিলটি লোকসভায় ফেরত পাঠাতে পারে। এই সুপারিশ গ্রাহ্য করা বা না করা লোকসভার মর্জির ওপর নির্ভর করে। লোকসভা যদি এই সুপারিশ অগ্রাহ্য করে তাহলে ঐ বিল দুই কক্ষেরই অনুমোদন পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

এছাড়া, শাসনতন্ত্রের সংশোধন, রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি প্রভৃতিকে পদচ্যুত করার বিষয়েও পার্লামেণ্টকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

* * *

রাজ্য সরকারের গঠন ঃ ভারতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ঐ সমস্ত রাজ্যের সরকারের হাতে। এই সমস্ত রাজ্যের (কাশ্মীর ও জম্মু ছাড়া) শাসককে বলা হয় **রাজ্যপাল** (Governor)। এই সমস্ত রাজ্যপালের অধীনে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রি-সমেত কয়েকজন মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিব প্রভৃতি। আর রয়েছে একটি **ব্যবস্থাপক সভা**। কোন কোন রাজ্যে

এই ব্যবস্থাপক সভায় থাকে দুটি কক্ষ—**বিধান পরিষদ্** (Legislative Council) আর **বিধান সভা** (Legislative Assembly) ; আবার কোন কোন রাজ্যে শুধু **বিধান সভাই** রয়েছে।

কাশ্মীর ও জম্মু ঃ রাজ্যগুলোর মধ্যে একমাত্র কাশ্মীর ও জম্মুকে অনেকগুলো বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছে। এক হল এই যে, মাত্র তিনটি বিষয়ে (দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি আর যোগাযোগ ব্যবস্থা) কাশ্মীর ও জম্মু কেন্দ্রীয় সরকারের পার্লামেণ্টের অধীনে। অন্য অন্য বিষয়ে কাশ্মীর ও জম্মুকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হলেও, কাশ্মীর ও জম্মুর গণপরিষদ বর্তমানে কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত অধিকাংশ বিষয়েই কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। এ ছাড়া আর একটা পার্থক্য হল এই যে অন্য অন্য রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন কি ভাবে চালাতে হবে তা ঠিক করে দিয়েছে ভারতের গণপরিষদ্, কিন্তু কাশ্মীর ও জম্মুর আভ্যন্তরীণ শাসন-পদ্ধতি কি হবে তা ঠিক করবে ঐ রাজ্যেরই গণপরিষদ্। তৃতীয়তঃ, কাশ্মীর ও জম্মুর গণপরিপদ্ যদি দাবি করে তাহলে ঐ রাজ্য ভারত-রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যেতে পারবে। এই স্বাতন্ত্র্যের অধিকার অন্য কোন রাজ্যকে দেওয়া হয় নি।

আর একটা কথা—কাশ্মীর ও জম্মুর গণপরিষদ্ যাঁকে সদর্-ই-রিয়াসৎ হিসেবে নির্বাচিত করবে, রাষ্ট্রপতি তাঁকেই কাশ্মীর ও জম্মুর শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নেবেন।

রাজ্যপাল (Governor) ঃ কেন্দ্রের শাসনভার যেমন রয়েছে রাষ্ট্রপতির ওপর, তেমনি কাশ্মীর ও জম্মু ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত রয়েছে এক-একজন রাজ্যপালের ওপর। কার্যপরিচালনার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবার ও পরামর্শ দেবার জন্যে কেন্দ্রের মন্ত্রিসভার মতো তাঁরও একটি মন্ত্রিসভা আছে, এবং রাষ্ট্রপতির সংগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার যা সম্বন্ধ রাজ্যপালের সংগে রাজ্য-মন্ত্রিসভার সম্বন্ধও সেইরকম।

রাজ্যপালদের নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি। এঁদের কার্যকাল সাধারণতঃ থাকে পাঁচ বছর। তবে, স্বেচ্ছায় তার আগেও এঁরা পদত্যাগ করতে পারেন কিংবা

অযোগ্য বা অনাস্থাভাজন প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পদচ্যুতও হতে পারেন। অন্যূন পঁয়ত্রিশ বছর যাঁর বয়স এমন যে-কোন ভারতীয় নাগরিকই রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগযোগ্য হতে পারেন। একই ব্যক্তি একাধিক বার একই রাজ্যের বা বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হতে পারেন।

রাজ্যপাল ভারতের কোন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হতে পারেন না, কিংবা লাভজনক অন্য কোন পদেও অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। তিনি বিনাভাড়ায় একটি বাড়ী এবং পার্লামেণ্ট-বিহিত পারিশ্রমিক (বর্তমানে ৫৫০০৲), ভাতা আর বিশেষ বিশেষ সুবিধে পেয়ে থাকেন।

অসুস্থতা ইত্যাদির জন্যে রাজ্যপাল যদি অনুপস্থিত থাকেন কিংবা মৃত্যু, পদত্যাগ, পদচ্যুতি প্রভৃতি কারণে কোন রাজ্যপালের পদ যদি সাময়িকভাবে শূন্য হয় তাহলে তাঁর কাজ চালাবার জন্যে রাষ্ট্রপতি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।

রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ সংবিধানে অবশ্য রাজ্যপালকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে প্রচুর, কিন্তু কার্যতঃ তিনিও রাষ্ট্রপতির মতো নিয়মতান্ত্রিক শাসক। মন্ত্রীদের সাহায্য আর উপদেশ ছাড়া স্বেচ্ছাধীনভাবে কোন কিছুই করতে পারেন না তিনি। শুধু এক আসামের রাজ্যপালেরই উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা সম্বন্ধে কিছু **'ইচ্ছাধীন'** (Discretionary) ক্ষমতা রয়েছে। অন্য কোন রাজ্যপালের কোনরকম 'ইচ্ছাধীন' ক্ষমতা নেই।

শাসন-সংক্রান্ত ক্ষমতা—শাসন-সংক্রান্ত নানা কাজ তিনি ভাগ করে দেন তাঁর মন্ত্রীদের মধ্যে। মুখ্য মন্ত্রীর (Chief Minister) কাছ থেকে তিনি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বিবরণী শোনেন। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা কী ভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে-সম্বন্ধে সমস্ত খবর জানাবার জন্যে মুখ্য মন্ত্রীকে তিনি অনুরোধ করতে পারেন।

নিয়োগ-সংক্রান্ত ক্ষমতাও রাজ্যপালের অনেকটা রাষ্ট্রপতিরই মতো। রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী আর অন্যান্য মন্ত্রীদের এবং রাজ্যের মহা-ব্যবহারিক (Advocate-General), জেলার বিচারক (District Judges) প্রভৃতিকে

তিনিই নিয়োগ করেন। রাজ্যের 'পাব্লিক সার্ভিস কমিশন'-এর (State Public Service Commission) বড় বড় পদগুলোতে কর্মচারী নিয়োগ করেন তিনিই। মহাধর্মাধিকরণের (High Court) বিচারক নিয়োগ করার সময় রাষ্ট্রপতি পরামর্শ করেন তাঁরই সংগে।

যে-সমস্ত রাজ্যে দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থাপক সভা আছে (Bicameral Legislature), সেই সমস্ত রাজ্যের রাজ্যপাল বিধান পরিষদে (Legislative Council) কয়েকজন সভ্যকে মনোনীত করতে পারেন। ইংগ-ভারতীয় (Anglo-Indian) সম্প্রদায় নির্বাচনে উপযুক্ত সংখ্যায় প্রতিনিধি পাঠাতে পারে নি বলে মনে হলে তিনি সংবিধান চালু হবার পর (২৬ জানুয়ারী, ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে প্রথম দশ বছর পর্যন্ত রাজ্যের বিধান সভায় (Legislative Assembly) উপযুক্ত সংখ্যক ইংগ-ভারতীয় সভ্য মনোনীত করতে পারেন।

আইন-প্রণয়ন সম্বন্ধে ক্ষমতা—রাজ্যপাল রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার এক অংশ, যদিও তিনি তার সভ্য নন। রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার কক্ষ বা কক্ষদ্বয়ের অধিবেশন তিনি ডাকতে বা স্থগিত রাখতে পারেন। দরকার মনে করলে, বিধান সভা তিনি ভেঙেও দিতে পারেন।

ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদিত 'বিল' (Bill) তাঁর অনুমোদনের জন্যে তাঁর কাছে হাজির করা চাই-ই। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোন বিল-ই আইন (Act) হিসেবে গণ্য হতে পারে না। তবে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ বিল তিনি সরাসরি অনুমোদন করতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্যে ঐগুলো তাঁকে ধরে রাখতে হয়। অন্যান্য বিল-ও প্রয়োজন মনে করলে, তিনি এইভাবে ধরে রাখতে পারেন।

রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন স্থগিত থাকার সময়ে রাজ্যপাল 'অর্ডিন্যান্স' অর্থাৎ জরুরী-আইন জারি করতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার পুনরধিবেশনের পর ছ-সপ্তাহের মধ্যে যদি ঐ সভা ঐ অর্ডিন্যান্স অনুমোদন না করে, তাহলে ঐ জরুরী-আইন বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ

ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে নির্দেশ না পেলে রাজ্যপাল কোন অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন না।

বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা—রাজ্যের আইন সম্পর্কিত অপরাধের ব্যাপারে অপরাধীকে ক্ষমা করবার কিংবা তার দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখবার কি নাকচ করবার বা কমিয়ে দেবার ক্ষমতা রাজ্যপালের রয়েছে।

অর্থসম্বন্ধীয় ক্ষমতা—কোন কর বসাবার জন্যে কোন প্রকার দাবি বা কোন অর্থ-বিল (Money-Bill) অথবা অর্থসম্বন্ধীয় কোন বিষয় রাজ্যপালের অনুমোদন ছাড়া ব্যবস্থাপক সভায় তোলা যায় না।

কিন্তু সংবিধানে যদিও এত সমস্ত ক্ষমতা রাজ্যপালকে দেওয়া হয়েছে, তবুও কার্যতঃ তিনি মন্ত্রিসভার উপদেশমতোই এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন—নিজের ইচ্ছে বা বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সাধারণতঃ কোন কাজ করতে পারেন না।

মন্ত্রিসভা ঃ প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করে মন্ত্রিসভা রয়েছে—**মুখ্য মন্ত্রী হলেন এই সভার নেতা**। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় প্রধান মন্ত্রীর যে স্থান, মর্যাদা ও দায়িত্ব, রাজ্যের মন্ত্রিসভায় ও মুখ্য মন্ত্রিসভায় মুখ্য মন্ত্রীর স্থান, মর্যাদা আর দায়িত্বও সেই রকমই।

রাজ্যপাল মুখ্য মন্ত্রীকে এবং মুখ্য মন্ত্রীর পরামর্শমতো অন্যান্য মন্ত্রীদেরও নিয়োগ করেন। সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালের যতদিন খুশি ততদিনই মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্ব করতে পারেন; কিন্তু যেহেতু মন্ত্রীদের যৌথভাবে দায়ী থাকতে হয় বিধান সভার কাছে (মনে রেখো, বিধান পরিষদের কাছে নয়), তাই একথা বললে ভুল হবে না যে যতদিন তাঁরা বিধান সভার আস্থাভাজন হয়ে থাকতে পারেন, আসলে ততদিনই তাঁদের মন্ত্রিত্ব বজায় থাকে।

সব মন্ত্রীকেই রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হতে হয়। কোন মন্ত্রী যদি একাধিক্রমে ছ-মাস পর্যন্ত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য না থাকেন (অবশ্য মনোনীত সভ্য হলেও চলবে), তাহলে ছ-মাস পরে তিনি আর মন্ত্রী থাকতে পারেন না। মন্ত্রিসভা যৌথভাবে রাজ্যের বিধান সভার কাছে দায়ী থাকবে। রাজ্যপাল

সাধারণতঃ ব্যবস্থাপক সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই মুখ্য মন্ত্রী রূপে নির্বাচিত করে থাকেন। অন্যান্য মন্ত্রীদেরও সাধারণতঃ ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকেই নেওয়া হয়। নির্দেশ রয়েছে যে সংবিধান অনুসারে যে-সমস্ত বিষয়ে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary Power) প্রয়োগ করতে পারেন সে-সমস্ত বিষয় ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে মন্ত্রিসভা তাঁকে সাহায্য করবে আর উপদেশ দেবে। রাজ্যের শাসন বা আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত সমস্ত আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি রাজ্যপালের নামে জারি হলেও আসলে কিন্তু মন্ত্রীরাই রাজ্যের শাসন-কাজ পরিচালনা করেন, বাজেট তৈরী করেন, প্রয়োজনমতো ব্যবস্থাপক সভায় 'বিল' ইত্যাদিও হাজির করেন; অর্থাৎ রাজ্যের শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ তাঁরাই করেন, অবশ্য রাজ্যপালের নামে। শাসন-সংক্রান্ত কাজের জন্যে কার্যতঃ তাঁরাই দায়ী। তাই বলা চলে যে, **যদিও নামে রাজ্যপালই রাজ্যের শাসন ও পালনের কর্তা আসলে কর্তৃত্ব কিন্তু মন্ত্রীদেরই হাতে।**

॥ গ ॥ বিভিন্ন রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভা

কাশ্মীর ও জম্মু ছাড়া প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্যপালকে নিয়ে রয়েছে একটি করে ব্যবস্থাপক সভা। বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, পশ্চিমবংগ, মধ্যপ্রদেশ আর মহীশূর রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় দুটো করে কক্ষ রয়েছে, অন্যান্য রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় একটা করে। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থাপক সভার অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সভ্যবিশিষ্ট কক্ষকে বলা হয় **বিধান পরিষদ্** (Legislative Council), আর অধিকতর সভ্যবিশিষ্ট কক্ষকে বলা হয় **বিধান সভা** (Legislative Assembly)।

বিধান পরিষদ্ঃ বিধান পরিষদের সভ্য-সংখ্যা সাধারণতঃ বিধান সভার সভ্য-সংখ্যার $\frac{১}{৪}$ এর বেশি কিংবা মোট চল্লিশের কম হবে না। মোট সভ্য-সংখ্যার $\frac{১}{৩}$ নির্বাচিত করেন মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড ইত্যাদি স্বায়ত্তশাসন-যুক্ত প্রতিষ্ঠান; $\frac{১}{১২}$ নির্বাচিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততঃ তিন বছরের পুরনো

গ্রাজুয়েটরা। মাধ্যমিক আর তার চেয়েও উচ্চমানের শিক্ষায়তনের অন্ততঃ তিন বছরের পুরনো শিক্ষকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা মোট সভ্যসংখ্যার $\frac{১}{১২}$ বা তার কাছাকাছি হওয়া চাই। $\frac{১}{৩}$ সভ্য নির্বাচিত করেন বিধান সভার সভ্যেরা, তবে তাঁদের নিজেদের মধ্যে থেকে কেউই বিধান পরিষদে নির্বাচিত হতে পারেন না। বিজ্ঞান, চারুকলা, সমবায়-আন্দোলন, সমাজ-সেবা প্রভৃতিতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বাকী সভ্য মনোনীত করেন রাজ্যপাল। বিধান পরিষদের সভ্যের বয়স অন্ততঃ ত্রিশ বছর হওয়া চাই এবং তাঁকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

বিধান পরিষদ্ কোন দিন ভেঙে দেওয়া যাবে না, তবে দু-বছর অন্তর অন্তর সভ্যদের $\frac{১}{৩}$ অংশকে বিদায় নিতে হয়। এই পরিষদের সভ্যদের মধ্যে থেকেই একজনকে **সভাপতি** আর একজনকে **সহ-সভাপতি** নির্বাচিত করা হয়। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিই বিধান পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

বিধান সভা ঃ প্রাপ্তবয়স্ক (অর্থাৎ অন্ততঃ ২১ বছর বয়সের) নাগরিকদের অধিকাংশের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত সভ্যদের নিয়ে তৈরী হয় প্রত্যেক রাজ্যের বিধান সভা। বিধান সভার সদস্য-সংখ্যা ৫০০র বেশি কিংবা ৬০এর কম হবে না। বিধান সভার সভ্যদের বয়স অন্ততঃ ২৫ বছর হওয়া চাই। তাঁকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। সংবিধান চালু হবার পর থেকে প্রথম দশ বছর পর্যন্ত তপশীলভুক্ত জাতি আর উপজাতির প্রতিনিধিদের জন্যে কয়েকটি আসন সংরক্ষিত থাকবে। আসামে কয়েকটি স্বায়ত্তশাসনযুক্ত জেলা আছে। ঐ সমস্ত জেলার প্রতিনিধিদের জন্যে বিশেষ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও আসাম রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় করা হয়েছে। তাছাড়া শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর থেকে প্রথম দশ বছর কোন রাজ্যপাল, প্রয়োজন মনে করলে, মন্ত্রিসভার সংগে পরামর্শ করে বিধান সভায় কয়েকজন ইংগ-ভারতীয় (Anglo-Indian) সভ্যও মনোনীত করতে পারেন।

প্রত্যেক রাজ্যের বিধান সভার কার্যকাল সাধারণতঃ হবে পাঁচ বছর ;

কিন্তু রাজ্যপাল, প্রয়োজন হলে, তার আগেও সভা ভেঙে দিতে পারেন ; আবার, জরুরী-অবস্থায় পার্লামেন্ট আইন করে বিধান সভার মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত বাড়িয়েও দিতে পারে।

বিধান সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্যে একজন **অধ্যক্ষ** (Speaker) এবং একজন **উপাধ্যক্ষ** (Deputy Speaker) ঐ সভার সভ্যদের ভেতর থেকেই নির্বাচিত করা হয়। অধ্যক্ষ অনুপস্থিত থাকলে তাঁর জায়গায় উপাধ্যক্ষই সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের বিশেষ অধিকার ঃ প্রত্যেক রাজ্যেই ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের বাক্-স্বাধীনতা রয়েছে। ব্যবস্থাপক সভায় কোন সভ্য যে বক্তৃতা বা ভোট দেন তার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে কোন ধর্মাধিকরণে মামলা করা যায় না।

রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার কাজ ঃ রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার কাজ হল পুলিশ, জেলখানা, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, সমবায় প্রভৃতি রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে আইন তৈরী করা, কর ধার্য করা, ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করা (এই ক্ষমতা অবশ্য কেবল বিধান সভারই আছে, বিধান পরিষদের নেই, বিধান পরিষদ্ আয়-ব্যায় সম্বন্ধে শুধু আলোচনাই করতে পারে), আর মন্ত্রিমণ্ডলীর কাজের খবরদারী করা (এই প্রসংগে মনে রাখা দরকার যে কেবল বিধান সভার অনাস্থভাজন হলেই মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করতে বাধ্য ; এ বিষয়ে বিধান পরিষদের কোন ক্ষমতা নেই)। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় ছাড়াও কেন্দ্রের আর রাজ্যের স্বার্থের সংগে যা সমভাবেই জড়িত এমন কোন যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়েও (যেমন —ফৌজদারী আইন, শ্রমিক সঙ্ঘ সম্বন্ধীয় আইন প্রভৃতি) আইন তৈরী করার ক্ষমতা রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার রয়েছে ; তবে ঐ যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে যদি পার্লামেন্টবিহিত কোন আইন থাকে, তাহলে রাষ্ট্রপতির বিশেষ নির্দেশ ছাড়া, ঐ বিষয়ে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের আইনই বলবত্তর বলে মেনে নেওয়া হবে। ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করার ক্ষমতা সম্বন্ধে এখানে কিন্তু এই কথাটা মনে রাখা দরকার যে ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিধান সভার নেই। কতকগুলো

ব্যয়—যেমন, রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা, বিধান পরিষদের সভাপতি আর সহসভাপতির বেতন আর ভাতা, মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিদের বেতন আর ভাতা, রাজ্যের ঋণসংক্রান্ত ব্যয়—প্রভৃতি বিধান সভার অনুমোদন-সাপেক্ষ নয়। তবে কর নির্ধারণের বা সরকারী ঋণসংগ্রহ করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিধান সভার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। আর একটা কথাও এই প্রসংগে মনে রাখা দরকার যে, ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করার ক্ষমতা বিধান সভার আছে বটে, কিন্তু রাজ্যপালের স্থপারিশ ছাড়া কোন ব্যয়-বরাদ্দের দাবিই বিধান সভায় উত্থাপিত করা যায় না।

প্রতি বছর ব্যাবস্থাপক সভার অন্ততঃ তুবার করে অধিবেশন হওয়া দরকার। রাজ্যপাল ব্যবস্থাপক সভার কক্ষতুটিকে ডাকতে বা তাদের অধিবেশন স্থগিত রাখতে পারেন। তিনি বিধান সভা ভেঙেও দিতে পারেন।

যে-সমস্ত রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় তুটি করে কক্ষ আছে সেখানে এই তুই কক্ষের অনুমোদন ছাড়া সাধারণতঃ কোন বিলই আইন বলে গণ্য হতে পারে না। তবে, বিধান পরিষদের অনুমোদন না পাওয়া গেলে, বিধান সভা ও রাজ্যপালের অনুমোদনের জোরেও কোন বিল আইন-হিসেবে গণ্য হতে পারে। স্তরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিধান সভাকে অর্থ-বিল (Money Bill) এবং অন্যান্য আইন তৈরীর ব্যাপারে বিধান পরিষদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিধান সভার সভ্যদের নাগরিকরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত করেন। বিধান সভার গঠন তাই অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। সেইজন্যেই বিধান পরিষদের চেয়ে বিধান সভাকে অনেক বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের আয়, মন্ত্রিসভার কাজ—এ সবই বিধান সভার কর্তৃত্বের অধীন। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে বিধান পরিষদের কোন কর্তৃত্ব নেই।

আইন প্রণয়নের নীতিঃ কোন আইন প্রণয়ন করার জন্যে প্রথম একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরী করতে হয়। তাকে **বিল** (Bill) বলে। প্রস্তাব সরকার পক্ষের হলে, প্রস্তাবটি যে বিভাগ সংক্রান্ত সেই বিভাগের মন্ত্রী প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। যে-কোন বে-সরকারী সদস্যও আইনের প্রস্তাব আনতে পারেন। কোন বে-সরকারী সদস্য কোন বিল উত্থাপন করতে চাইলে তাঁকে

একমাস আগে নোটিশ দিতে হয়, ও নোটিশের সংগে বিলটির নকল দিতে হয়। পার্লামেণ্টে বা রাজ্য ব্যবস্থাপক সভায় বিলটি উত্থাপনের জন্যে তাঁকে অনুমতি চাইতে হয়। নির্দিষ্ট দিনে তাঁকে পার্লামেণ্ট বা রাজ্য ব্যবস্থাপক সভা অনুমতি দিলে বিলটি গেজেট-এ প্রকাশ করতে হয়। কোন মন্ত্রী-প্রস্তাবিত সরকারী বিল শুধু গেজেট-এ প্রকাশ করলেই চলে, নোটিশ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না।

পার্লামেণ্ট বা রাজ্য ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক অনুমোদিত বিল প্রথমে পার্লামেণ্টে বা রাজ্য ব্যবস্থাপক সভায় একবার পড়া হয়। এই প্রথম পাঠ (First reading) শেষ হয়ে গেলে প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্যে একটি নির্বাচিত কমিটির (Select Committee) হাতে যায়। সেই কমিটি প্রস্তাবটি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করে কোন সংশোধন ছাড়া বা সংশোধনসমেত পার্লামেণ্টে বা রাজ্য ব্যবস্থাপক সভায় একটি রিপোর্ট দেন। তখন বিলটি পার্লামেণ্টে বা রাজ্য ব্যবস্থাপক সভায় দ্বিতীয়বার পড়া হয় এবং প্রস্তাবের প্রত্যেকটি ধারা (Clause) পার্লামেণ্টে বা রাজ্য ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যেরা আলোচনা করেন। তারপর প্রত্যেকটি ধারার উপর ভোট নেওয়া হয় এবং প্রস্তাবটি ভোটাধিক্য অনুসারে গৃহীত বা বর্জিত হয়। দ্বিতীয় পাঠের পর বিলটি যদি গৃহীত হয় তাহলে উত্থাপক বিলটির তৃতীয় পাঠের প্রস্তাব আনেন। তখন বিলটি তৃতীয়বার পড়া হয় ও সাধারণ আলোচনার পর গৃহীত হয়।

কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে এবং যে রাজ্য ব্যবস্থাপক সভায় দুটি কক্ষ আছে তাতে, যে কোন কক্ষেই আইনের প্রস্তাব আনা যায়। একটি কক্ষে গৃহীত হলে প্রস্তাবটি অপর কক্ষে প্রেরিত হয়। দ্বিতীয় কক্ষে গৃহীত হলে আইনটিকে রাষ্ট্রপতি (কেন্দ্রীয় সরকারের আইন হলে) বা রাজ্যপালের (রাজ্য সরকারের হলে) কাছে অনুমোদনের জন্যে পাঠান হয়।

দুই কক্ষে কোন প্রস্তাব নিয়ে মতভেদ হলে যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করা হয়। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের সম্মতি হল আইন-প্রণয়নের শেষ ধাপ। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল কোন বিল পুনর্বিবেচনার জন্যে ব্যবস্থাপক সভায় ফেরত পাঠাতে পারেন। দ্বিতীয়বারও প্রস্তাবটি গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল সম্মতি দেন।

অর্থ-বিল (Money bill) রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের অনুমতি ছাড়া প্রস্তাবিত হতে পারে না এবং সমস্ত অর্থ-বিল প্রস্তাব করার অধিকার কেবল নিম্ন কক্ষের—ভারত সরকারের ক্ষেত্রে লোকসভার এবং রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে বিধান সভার (Legislative Assembly)।

অনেক বিল আবার জনমত সংগ্রহের জন্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। এ ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নে একটা ধাপ বেড়ে যায়।

॥ ঘ ॥ ভারতের বিচার-বিভাগ

প্রধান ধর্মাধিকরণ (Supreme Court) : ভারতের বিচার-বিভাগের শীর্ষদেশে রয়েছে **প্রধান ধর্মাধিকরণ**। প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) আর অনধিক সাতজন বিচারপতি নিয়ে এই ধর্মাধিকরণটি গড়া। পার্লামেন্ট অবশ্য প্রয়োজন বোধ করলে আইন করে বিচারপতির সংখ্যা বাড়াতেও পারে। সমস্ত বিচারপতিকেই নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত বিচারপতিরা কাজে বহাল থাকতে পারেন। প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করার সময় রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির পরামর্শ নেন। ভারতের কোন নাগরিক আগে অন্ততঃ পাঁচ বছর যদি কোন মহাধর্মাধিকরণের (High Court) বিচারপতি হিসেবে, কি অন্ততঃ দশ বছর যদি কোন মহাধর্মাধিকরণের ব্যবহারিক (Advocate) হিসেবে কাজ করে থাকেন, কিংবা রাষ্ট্রপতির মতে কেউ যদি একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ (Eminent Jurist) বলে গণ্য হন, তাহলেই তিনি প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হতে পারেন। কোন বিচারপতির প্রমাণিত অসদাচরণ (Misbehaviour) কি অযোগ্যতা সম্বন্ধে যদি পার্লামেন্টের দুই কক্ষই অভিযোগ করে আবেদন জানায় তাহলে রাষ্ট্রপতি সেই বিচারপতিকে ৬৫ বছর পূর্ণ হবার আগেই পদচ্যুত করতে পারেন। প্রধান বিচারপতি বেতন পান মাসিক ৫০০০৲ টাকা, অন্যান্য বিচারপতিরা পান মাসিক ৪০০০৲ টাকা করে।

প্রধান ধর্মাধিকরণের কাজ মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) মৌলিক বিভাগ, (২) আপীল বিভাগ, আর (৩) পরামর্শদান বিভাগ।

১। **মৌলিক বিভাগ** (Original Jurisdiction)—কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকারের মধ্যে, কিংবা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের পরস্পরের মধ্যে যদি সংবিধান-সংক্রান্ত কোন বিবাদ বাধে তবে সংবিধানের উপযুক্ত ব্যাখ্যা করে সেই বিবাদের মীমাংসা করাই হল প্রধান ধর্মাধিকরণের মৌলিক বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ।

২। **আপীল বিভাগ** (Appellate Jurisdiction)—বিশেষ ক্ষেত্রে, ভারতের যে-কোন মহাধর্মাধিকরণের সংবিধান-সংক্রান্ত কি ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা (অন্যূন কুড়ি হাজার টাকার দাবি-দাওয়া যাতে রয়েছে) সম্পর্কিত রায়ের বিরুদ্ধে প্রধান ধর্মাধিকরণের কাছে আপীল করা চলে।

৩। **পরামর্শদান বিভাগ** (Advisory Jurisdiction) — রাষ্ট্রপতি, প্রয়োজন হলে, আইন-কানুন সংক্রান্ত যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই প্রধান ধর্মাধিকরণের পরামর্শ নিতে পারেন।

রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধান ধর্মাধিকরণই হল সংবিধান-সংক্রান্ত জটিল মামলার আর দেওয়ানী ও ফৌজদারী সব রকম মামলার সব চেয়ে বড় আদালত।

ওপরে যে-সমস্ত ক্ষমতার কথা বলা হল তা ছাড়াও সামরিক আদালত ভিন্ন যে-কোন আদালতের বিচার সংশোধন করার ক্ষমতা প্রধান ধর্মাধিকরণের রয়েছে।

ভারতের যে-কোন নাগরিকই তার মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) রক্ষা করার জন্যে প্রধান ধর্মাধিকরণের শরণ নিতে পারে। তবে জরুরী-অবস্থা (Emergency) দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি সাময়িক ভাবে এই অধিকার রদ্ করে দিতে পারেন।

প্রধান ধর্মাধিকরণ যাতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে সেইজন্যে তাকে কর্মচারী নিয়োগ করার এবং কর্মচারীদের চাকরী সংক্রান্ত আইন-কানুন তৈরী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রধান ধর্মাধিকরণের যা ব্যয় হবে তা পার্লামেন্টের ভোটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না।

মহাধর্মাধিকরণ (High Court) : বিচার-বিভাগে প্রধান ধর্মাধিকরণের নিচেই হল **মহাধর্মাধিকরণের** স্থান।

ক্ষমতা—প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করে মহাধর্মাধিকরণ আছে। ঐ সমস্ত রাজ্যের এলাকার জন্যে মহাধর্মাধিকরণই হল দেওয়ানী আর ফৌজদারী মামলার বিচারের সর্বোচ্চ আদালত। তবে আগেই বলা হয়েছে যে, মহাধর্মাধিকরণের রায়ের বিরুদ্ধেও প্রধান ধর্মাধিকরণের কাছে আপীল করা চলে।

জেলা আদালত আর অন্যান্য ছোট আদালত থেকে দেওয়ানী আর ফৌজদারী দু-রকমের মামলারই আপীল মহাধর্মাধিকরণে করা যায়। কোন কোন রাজ্যে মহাধর্মাধিকরণের মৌলিক বিভাগও রয়েছে। এই বিভাগে বড় বড় দেওয়ানী মামলার বিচার হয়। গুরুতর বিশেষ বিশেষ ফৌজদারী মামলার দায়রা বিচারও এই সব ধর্মাধিকরণে হয়ে থাকে।

আপীল বা আবেদন শোনা ছাড়াও রাজ্যের সমস্ত দেওয়ানী আর ফৌজদারী আদালতের কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান মহাধর্মাধিকরণই করে থাকে। এ-ছাড়া নিম্নতর কোন আদালতের কোন মামলায় যদি সংবিধানসংক্রান্ত কোন জটিল সমস্যা জড়িত থাকে তাহলে সেই নিম্নতর আদালত থেকে ঐ মামলাটি উঠিয়ে এনে বিচার করার ক্ষমতা মহাধর্মাধিকরণের রয়েছে। রাজ্যের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার ভারও মহাধর্মাধিকরণকে দেওয়া হয়েছে।

প্রধান ধর্মাধিকরণের মতো মহাধর্মাধিকরণগুলোকেও স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতার সংগে বিচার-কার্য পরিচালনা করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, এবং তার জন্যে কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। এ-সম্পর্কে মহাধর্মাধিকরণের যা ব্যয় হবে তা রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদন-সাপেক্ষ নয়।

গঠন—একজন প্রধান বিচারপতি আর একাধিক সাধারণ বিচারপতি থাকবেন মহাধর্মাধিকরণে। ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি আর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সংগে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। মহাধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি মাসিক ৪,০০০৲ টাকা আর অন্যান্য বিচারপতিরা মাসিক ৩,৫০০৲

টাকা হিসেবে বেতন পান। প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ মহাধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ নেন। ভারতের কোন নাগরিক যদি অন্ততঃ দশ বছর ধরে ভারতের কোন বিচারালয়ে বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন কিংবা কমপক্ষে দশ বছর ধরে যদি কোন এক মহাধর্মাধিকরণে ব্যবহারিক (Advocate) রূপে কাজ করে থাকেন, তাহলেই তিনি কোন মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি হতে পারেন।

পদত্যাগ না করলে বা রাষ্ট্রপতি আগেই পদচ্যুত না করলে মহাধর্মাধিকরণের যে-কোন বিচারপতিই ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন। তবে পার্লামেণ্টের আবেদনে, প্রমাণিত অসদাচরণ কি অযোগ্যতার জন্যে যে কোন মহাধর্মাধিকরণের যে-কোন বিচারপতিকেই রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করতে পারেন।

দেওয়ানী আদালত ও ন্যায়াধিকরণ ঃ কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় শহরে ছোটখাট দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্যে **ছোট আদালত** (Small Causes Court) আছে। এছাড়া, জেলা আর মহকুমা শহরে এবং চৌকিতে আছে **মুনসেফ আদালত**, তার ওপর আছে **সাব-জজের আদালত**। আবার প্রত্যেক জেলার সদরে রয়েছে **জেলা আদালত।** সমগ্র জেলার বিচারের কাজ তত্ত্বাবধান করার ভার রয়েছে **জেলার বিচারপতির** (District Judge) ওপর।

এই সমস্ত আদালত ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে ছোটখাটো দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তি করার ভার থাকে গ্রামের **পঞ্চায়েত-সভার** ওপর। কোন কোন রাজ্যে এই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের আদালতকে বলা হয় **ইউনিয়ন কোর্ট** (Union Court)।

ফৌজদারী আদালত বা দণ্ডাধিকরণ ঃ প্রত্যেক রাজ্যে বিভিন্ন অংশে এই সমস্ত দেওয়ানী আদালত ছাড়া আবার অনেক ফৌজদারী আদালতও থাকে। শহর অঞ্চলে ছোট-খাটো ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার থাকে **অবৈতনিক** (Honorary) **ম্যাজিস্ট্রেটদের** হাতে। এই সমস্ত ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে জেলার বিচারপতির কাছে আবেদন করা চলে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিম্নতর

আদালত থেকে ফৌজদারী মামলার আপীল শোনার ক্ষমতা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের রয়েছে। কলকাতার মতো প্রেসিডেন্সি শহরগুলোতে গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার করেন **প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটরা**।

মহকুমার ফৌজদারী মামলার বিচার করেন **ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট** বা **সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা**। এ-ছাড়া, গ্রাম অঞ্চলে ছোট-খাটো ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্যে আছে **ইউনিয়ন বেঞ্চ**। ফৌজদারী আদালতের মধ্যে ইউনিয়ন বেঞ্চ-ই হল সবচেয়ে ছোট।

জেলার সবচেয়ে গুরুতর মামলার শুনানী নেন প্রথম শ্রেণীর বিচারকরা। মামলার শুনানী নেবার পর তাঁরা অভিযুক্তদের দায়রায় সোপর্দ করতে পারেন। জেলায় মামলার বিচারের ভার থাকে **জেলা আর দায়রা জজের** (District and Sessions Judge) ওপর। দায়রা জজ আর প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে মহাধর্মাধিকরণে আপীল করা যেতে পারে।

॥ ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়ন ॥

রাষ্ট্রব্যবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও, বর্তমান পৃথিবীর সকল দেশেই কোন সার্বজনীন উন্নয়ন-প্রচেষ্টা আরম্ভ করার আগে স্থচিন্তিত ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করে নেওয়া হয়। তারপর পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে জনসাধারণের উন্নয়ন-প্রচেষ্টা স্থরু হয়। পূর্ব-পরিকল্পনার স্থবিধা এই যে এতে অর্থ, শ্রম ও সময়ের মিতব্যয়িতা সম্ভব হয়।

ভারতবর্ষেও দেশের সর্বাংগীণ উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত ও গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়াও প্রস্তুত হয়ে গেছে ; তবে এখনও তা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় নি।

প্রথম দুই পরিকল্পনা অনুসারে দেশে উন্নয়নের কাজ ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে। প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে বিশেষ বিশেষ বিভাগের উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উন্নয়নের প্রত্যেক ধাপের জন্যে পাঁচ বছর করে সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। প্রতি পাঁচ বছরের মধ্যে সমাপ্য প্রচেষ্টাসমূহের পরিকল্পনাকে এক একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলা হয়।

ভারতবর্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক। জনগণের সহযোগিতায় কতগুলো কর্মসূচীকে রূপায়িত করে, ১৯৭৭ সালের মধ্যে জনপ্রতি আয় দ্বিগুণ করাই পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য। যতখানি সম্ভব সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করেই ভারতকে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : ভারতের প্রধানতম সমস্যা দারিদ্র্য। তাই উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করার আগে, দেশের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং একটা দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলা দরকার। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ স্থরু হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনসাধারণের জীবন উন্নততর করাই ছিল এর লক্ষ্য। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সাল।

দারিদ্র্য দূর করে জনসাধারণের জীবন ধারণের মান উন্নয়নের জন্য কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বাড়ান অত্যাবশ্যক এবং শিল্পোৎপাদন বাড়াতে গেলে যে মূলধন

ও কাঁচা মাল দরকার তা সংগ্রহ করতে কৃষির উন্নতি-ই সর্বপ্রথম প্রয়োজন। এ কথা বিবেচনা করেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উন্নয়ন এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ঃ

(ক) কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ঃ

(খ) জলসেচ ও শক্তি উৎপাদন ঃ

(গ) যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ

(ঘ) শিল্প ঃ

(ঙ) সমাজ কল্যাণ ঃ

(চ) পুনর্বাসন ঃ

(ছ) কর্মসংস্থান।

প্রথম পরিকল্পনার অধিকাংশ লক্ষ্যই পূর্ণ হয়েছে। মোট ১৯৬০ কোটি টাকা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করার ফলে, জাতীয় আয় শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ বেড়েছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ধরে নিলেও জনপ্রতি আয় শতকরা ১১ ভাগ (২৫৪ টাকা থেকে ২৮১ টাকা) বেড়েছে। প্রথম পরিকল্পনার সময় কৃষি ও শিল্পোৎপাদন অনেক বেড়েছে। উৎপাদন বাড়ান ও আয়ের বৈষম্য হ্রাস করার জন্যে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তার ইংগিত প্রথম পরিকল্পনায় পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড় কথা হল প্রথম পরিকল্পনা সমগ্র দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্যে জনগণের মধ্যে বিপুল প্রেরণা সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের ভিত্তিতে প্রথমটির চাইতে বৃহত্তর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ সাল। জনসাধারণের শুধু পার্থিব কল্যাণের জন্যেই এই দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি রচিত হয় নি, জনগণের সাংস্কৃতিক জীবন ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পক্ষে সুযোগ সৃষ্টি করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। তবে অগ্রগতির পথ স্থির করতে গিয়ে ব্যক্তিগত লাভের দিকে দৃষ্টি রাখা হয় নি, লক্ষ্য রাখা হয়েছে সমগ্র সমাজের কল্যাণের দিকে। এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে যেমন জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে তেমনি আয় ও সম্পদের মধ্যে

বৈষম্যও হ্রাস পাবে। 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-ব্যবস্থা' দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। সাধারণভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য—

(ক) জাতীয় আয় বাড়িয়ে দেশবাসীর জীবনধারণের মান বাড়ানো ঃ

(খ) মূল ও ভারী শিল্পের উন্নয়ন দ্বারা দেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করা ঃ

(গ) কর্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্ট বাড়ানো ঃ

(ঘ) আয় ও সম্পদের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করা ও অর্থনৈতিক শক্তির সুষম বণ্টন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৮০০ কোটি টাকা। পরিকল্পনা ও কর্মসূচী দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশের জন্যে ৪৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। যে সব কর্মসূচী মুখ্যতঃ কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করবে, যেগুলি মূল কর্মসূচী, যে সব পরিকল্পনার কাজ অনেকখানি এগিয়েছে এবং যে সব কাজ বাদ দেওয়া যায় না—এই সব রয়েছে প্রথম অংশে।

দেশের সম্পদ্ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করে, পরিকল্পনার সময়ে কী পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে প্রথম অংশ বাদ দিয়ে তা বোঝা যাবে। দ্বিতীয় অংশের কর্মসূচীর জন্যে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে ও যে পরিমাণ টাকা অতিরিক্ত পাওয়া যাবে সেই অনুসারে কাজে হাত দেওয়া হবে।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় **শিল্পোন্নয়নের** ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। তবুও পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যে **খাদ্য উৎপাদন** বাড়ানো প্রয়োজন। বেশি সার ও ভাল বীজের ব্যবহার, ভূমি সংরক্ষণের উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন, চাষের উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন এবং জলসেচের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে জাতীয় সম্প্রসারণসূচী, সমষ্টি-উন্নয়ন কর্মসূচী, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনায় ফল-চাষ, মৎস্য-চাষ, পশু-পালন ও বন সংরক্ষণ ইত্যাদির জন্যেও বিশেষ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য ও পণ্যশস্য উৎপাদনে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

১৯৫০-৫১ সালে ৫ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরো ১ কোটি ২৪ লক্ষ একর জমিতে **জলসেচের ব্যবস্থা** হবে বলে আশা করা যায়। প্রথম দু'বছরে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা মারফত ৩৫ লক্ষ এবং বড় ও মাঝারি সেচ পরিকল্পনা মারফত ১৭ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনায় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের পরিমাণ ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট থেকে ৩৫ লক্ষ কিলোওয়াট হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরো ৩০ লক্ষ কিলোওয়াট **বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন** করা হবে। প্রথম দু'বছরে প্রায় ৬ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনায় **জাতীয় সম্প্রসারণ সূচী** ও **সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী** মারফৎ পল্লী-জীবনে নতুন প্রেরণার সঞ্চার হয়েছে। ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত মোট ২৯৯৬৯৪টি গ্রামে ২৩৬১ ব্লক (Block)-এ এই কর্মসূচীগুলি চালু করা হয় (অর্থাৎ ভারতের শতকরা ৫০টি গ্রামে এই কর্মসূচী অনুসারে কাজ হচ্ছে)। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে সমগ্র দেশে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী চালু হবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে।

জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা লাভের জন্যে (এই সহযোগিতা লাভ সমষ্টি উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল নীতি) ব্লক-পঞ্চায়েত সমিতির মত জনপ্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নয়ন কর্মসূচী রচনা ও সেই সূচী কার্যকর করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হবে।

প্রথম পরিকল্পনায় মোট **শিল্পোৎপাদন** শতকরা ৪০ ভাগ বাড়ে।

বস্ত্রোৎপাদন, চিনি, সেলাই কল, কাগজ, কাগজের বোর্ড, বাইসাইকেল, সিমেণ্ট, সাধারণ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প ও ভারী রাসায়নিক শিল্পে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ে। বে-সরকারী ও সরকারী দুই তরফেই অর্থ নিয়োগ করা হয়। বে-সরকারী তরফেও উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও বেসরকারী বিভাগে যথেষ্ট উৎপাদন বাড়বে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োজিত অর্থের অধিকাংশ লৌহ, ইস্পাত, কয়লা, সার, ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মতো মূল শিল্পগুলির উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে। রাউরকেল্লা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়েছে। বোকারোতে চতুর্থ ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। লৌহ আকর, জিপসাম, ম্যাংগানীজ, বক্সাইট ও খনিজ তৈল উত্তোলনের কাজে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সরকারী শিল্পগুলিতে রেলের ইঞ্জিন, রেলের কামরা, ডি. ডি. টি., পেনিসিলিন, সংবাদপত্রের কাগজ, বিদ্যুৎবাহী তার ও মেসিন (machine-tool)-এর উৎপাদন অনেক বেড়েছে।

কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এই সব শিল্প গ্রামবাসীদের মধ্যে সাময়িক কর্মহীনতা, বেকার অবস্থা এবং আয়ের বৈষম্য দূর করে সম্পদের সুষম বণ্টনে অনেকখানি সাহায্য করবে।

প্রথম পরিকল্পনায় **রেলওয়ে, জাহাজ চলাচল ও রাস্তাঘাটের উন্নয়নে** খুব বেশি অগ্রগতি সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্য পূরণ করতে হলে রেলওয়ে, জাহাজ ইত্যাদি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ আবশ্যক। তাই, রেলওয়ের মাল বহনের ক্ষমতা ও সাজসরঞ্জাম বাড়ানর পরিকল্পনা করা হয়েছে। জাহাজের সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল তা কাজে লাগান হয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনার শেষে, সমষ্টি পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ কর্মসূচীর অঞ্চলসমেত ১ লক্ষ ২২ হাজার মাইল পাকা রাস্তা ও ১ লক্ষ ৯৫ হাজার মাইল কাঁচা রাস্তা তৈরী হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার মাইল পাকা রাস্তা ও ২ লক্ষ ৩৫ হাজার মাইল কাঁচা রাস্তা হবে বলে আশা করা যায়।

দেশে দ্রুত শিল্পোন্নতিসাধনের জন্যে ইস্পাত কারখানা স্থাপন, ইস্পাত ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি, রেলওয়ে ও বন্দরসমূহের উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল কর্মসূচী। বে-সরকারী তরফে ইস্পাত কারখানা ও কয়লা খনিগুলির সম্প্রসারণও এই মূল কর্মসূচীর অন্তর্গত।

সকলের জন্যে সমান সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্য-সাধন-চেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা ও চিকিৎসা লাভের সুযোগ, শিল্প-শ্রমিকদের সুবিধে, উদ্বাস্তু, তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতিসমেত অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচী রচিত হয়েছে।

শিক্ষা বিষয়ে—মৌলিক (fundamental) শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, বিভিন্নমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, সামাজিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচীসমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ে—চিকিৎসালয়গুলির উন্নয়ন, স্বাস্থ্যশিক্ষা, গবেষণা, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, মাতৃমংগল, শিশুকল্যাণ, পরিবার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

সমাজকল্যাণ বিষয়ে—সামাজিক আইন-কানুন, নারী-ও শিশু-কল্যাণ, পরিবার-কল্যাণ, যুব-কল্যাণ, এবং বিকলাংগ ও জড়বুদ্ধিদের কল্যাণসাধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনায় সাড়ে চল্লিশ লক্ষ ব্যক্তির **কর্মসংস্থান** হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৫০০ কোটি টাকা হলে সাড়ে ষাট লক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থান হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করার উদ্দেশ্যে দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়াতে হবে। এর দুটি উপায় আছে: (১) উৎপাদন বাড়ান, এবং (২) বর্ধিত সম্পদের অধিকাংশ সঞ্চয় করে তা আবার বিনিয়োগ করা। জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্যে জাতীয় ভিত্তিতে **স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে সঞ্চয় আন্দোলনের** গতি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদ এখনও শেষ হয় নি। এ যাবৎ লব্ধ অভিজ্ঞতায় মনে হয় যে, এ পরিকল্পনার লক্ষ্য পূর্ণ হবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ চূড়ান্ত রূপ না নিলেও, এর মধ্যেই তৃতীয় পরিকল্পনার কাজও বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।

প্রাথমিক আলোচনায় এই মতই প্রাধান্যলাভ করেছে যে বিনিয়োগের ব্যবস্থায় খাদ্য ও কৃষিকেই সর্বাগ্রাধিকার দিতে হবে। সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি প্রভৃতি পল্লী-প্রতিষ্ঠান কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে বিশেষ সচেষ্ট হবে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খনিজ তৈল অনুসন্ধান ও আহরণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হবে। বর্তমানে ভারতকে চড়া দামে বিদেশ থেকে তৈল আমদানী করতে হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কয়েকটি ভারী ও মূল শিল্প, বিশেষ করে যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন-শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হবে।

কৃষিকর্ম ও ক্ষুদ্রশিল্প সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রাম ও শহর অঞ্চলে আরো বেশি লোকের কর্মসংস্থানের চেষ্টা তৃতীয় পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার লাভ করবে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকে জনসাধারণের আগ্রহ ও উৎসাহ সঞ্চারিত করার জন্যে সকল শ্রেণীর সকল লোককে কতকগুলি ন্যূনতম সুখ-সুবিধে দেওয়া হবে। সেগুলি হবে—পানীয় জলের ব্যবস্থা, ৬ থেকে ১১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্যে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং নিকটতম বাজার, প্রধান সড়ক অথবা রেলওয়ে স্টেশনের সংগে প্রত্যেক পল্লীর সংযোগ-সাধনের জন্যে রাস্তা নির্মাণ।

তৃতীয় পরিকল্পনায় পল্লী ও শহরের মধ্যে, ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং বিদ্যুৎ ও যোগাযোগের ব্যবস্থা করে পল্লী অঞ্চলে সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে শিল্পস্থাপনে উৎসাহ দিতে হবে।

ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বর্তমান বৈষম্য দূর করার জন্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় অনগ্রসর শ্রেণী, বিশেষ করে শহরের বস্তিবাসী ও ঝাড়ুদার শ্রেণী এবং পল্লীবাসী ভূমিহীন চাষী, শ্রমিক ও হরিজনদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে বিশেষ কর্মসূচী থাকবে।

॥ বহির্জগৎ ও ভারতের সংযোগ ॥

অতি-প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সংগে বহির্জগতের সংযোগ রয়েছে। ভারতীয় বণিক বাণিজ্য বিস্তারের জন্যে, আর ভারতীয় সাধকেরা প্রেম ও মৈত্রীর বাণী নিয়ে বহু দূর দূর দেশের সংগে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। ভারতীয় জীবন-দর্শনের সংগে দূর-কে নিকট করার, পর-কে আপন করার সাধনা জড়িত।

স্বরাট্ ভারতবর্ষ স্বাভাবিকভাবে সে সাধনায় আজও নিযুক্ত। সে সাধনার সুযোগ বেড়েছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে, সহজ দ্রুত যাতায়াত-ব্যবস্থার ফলে। আজ ভৌগোলিক দূরত্ব, পাহাড়, নদী, বন আর মরুভূমির বাধা ও ব্যবধান এক মানবগোষ্ঠীকে অন্য মানবগোষ্ঠী থেকে দূরে রাখতে পারছে না।

আন্তর্জাতিক মৈত্রীতে দৃঢ় বিশ্বাসী ভারত সরকার বহির্জগতের সংগে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করেছে ও করছে।

রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনে ভারতের রাষ্ট্রনীতি বিশেষ সহায়ক হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির মূল কথা উদারতা। ভারত নিঃস্বার্থভাবে সকলের সহযোগিতা ও বিশ্বশান্তি কামনা করে। কারো প্রতি তার বিদ্বেষ নেই। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের সংগে ভারতবর্ষ রাষ্ট্রদূত, হাই-কমিশনার বা কনসাল-জেনারেল মারফত রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপন করেছে। ভারতের রাজধানী দিল্লীতে প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা আছেন। ভারত-ভ্রমণে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের আগমন ও ভারতের রাষ্ট্রনায়কদের দেশ-বিদেশে গমন ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক নানা আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্রভৃতি ভারতের সংগে বহির্জগতের সংযোগ ব্যাপার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতের নিরপেক্ষ রাজনীতির জন্যে আন্তর্জাতিক শালিসী প্রভৃতিতে ভারতের নাম প্রস্তাবিত হয়।

বাণিজ্য মারফত বিভিন্ন দেশের সংগে ভারতের অর্থনৈতিক সংযোগ অতি প্রাচীন। ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি বাণিজ্য করতে এসেই এদেশে রাজ্য স্থাপন করেছিল। বর্তমানে ভারতের সংগে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য বহুগুণ

বেড়েছে। আজ শুধু বাণিজ্য-দ্রব্যের লেন-দেন বা অর্থ-বিনিময়ের মধ্যে ভারতের সংগে অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ সীমাবদ্ধ নয়। ভারতবর্ষের প্রস্তাবিত উন্নয়ন ও শিল্পপ্রসার-সাধনের জন্যে বিদেশ থেকে বহু গুণীজন—বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রবিদ্যাবিশারদ, কৃষিবিদ্যাবিশারদ—ভারতবর্ষে আসছেন এবং ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা বিদেশে যাচ্ছেন। আধুনিক অর্থনৈতিক সংযোগ মারফত সাংস্কৃতিক যোগাযোগও স্থাপিত হচ্ছে।

বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের জন্যে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা আছেন। ভারত থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল নানা দেশে প্রেরিত হয় এবং নানা দেশ থেকে প্রতিনিধি দল ভারতবর্ষে আসে। বিদেশী গ্রন্থের ভারতবর্ষে অবাধ আমদানী ও দেশ-বিদেশে ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ, প্রচার ও রপ্তানীর ফলেও ভারতের সংগে বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় ঘটছে।

আধুনিক ভারতের সংস্কৃতিধারায় নানা সংস্কৃতির মিলনের ফলে এক মহাভারত গড়ে উঠছে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ঃ ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি **পঞ্চশীল**-এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট। এই পঞ্চশীল বা পাঁচটি নীতি হল ঃ

(ক) বিভিন্ন রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা ঃ

(খ) অনাক্রমণ নীতি ;

(গ) অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ;

(ঘ) সাম্য ও পারস্পরিক সাহায্যের নীতি ;

(ঙ) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান।

এই পঞ্চশীল নীতি বহু রাষ্ট্র মেনে নিয়েছে, তারাও এবং যে সকল রাষ্ট্র মেনে নেয় নি তারাও এ নীতির প্রশংসা করে। ভারতের এই পররাষ্ট্র-নীতি এবং কাজেও এই নীতির প্রয়োগ বিশ্বের জনসাধারণের কাছে ভারত-রাষ্ট্রের মান বাড়িয়েছে।

॥ রাষ্ট্রসংঘ (U N.) ॥

বিশ্বমৈত্রীর সুমহান্ আদর্শ উপলব্ধি করার জন্যে যতখানি প্রয়োজন নিজের নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র একসংগে মিলে গঠন করবে এক বিশ্বরাষ্ট্র—এ-ধরণের কল্পনা বহুদিন থেকেই বাসা বেঁধেছে পৃথিবীর বহু চিন্তা-নায়কের মনে। একমাত্র তাহলেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হানাহানি, স্বার্থ নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ, প্রবল রাষ্ট্র কর্তৃক দুর্বল রাষ্ট্রকে শোষণ প্রভৃতি যে-সমস্ত অন্যায় ঘটে আসছে পৃথিবীতে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। যুদ্ধের বিভীষিকা আর থাকবে না, পৃথিবী হবে এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আগার। মানুষে-মানুষে জাতিতে জাতিতে মিলতে পারবে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে—এই হল এই সমস্ত চিন্তা-নায়কদের ধারণা।

জাতিসংঘ (League of Nations): চিন্তানায়কদের এই সমস্ত কল্পনা বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টাও যে একেবারে হয় নি তা নয়। বিরাট যুদ্ধের বীভৎস ধ্বংসলীলা যখনই চোখে পড়ে, তখনই শিউরে উঠে মানুষ এমনি ধারা এক বিশ্বরাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-সম্মেলন গড়ে তোলার কথা ভাবতে আরম্ভ করে দেয়। তাই, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষেও এই ধরণের এক বিশ্বরাষ্ট্র তৈরীর চেষ্টা দেখা দিয়েছিল। ১৯১৯ সালে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার এক বছরের মধ্যেই তৈরী হল **জাতিসংঘ** (League of Nations)। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্মিলিত হয়ে যাতে পৃথিবী থেকে যুদ্ধের মূলোচ্ছেদ করতে ও আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপন করতে পারে, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল এই জাতিসংঘ। কিন্তু জাতিসংঘের অবস্থা ছিল ক্ষমতাহীন গৃহকর্তার মতো। তার না ছিল কোন শক্তিশালী আন্তর্জাতিক পুলিশ বা সামরিক বাহিনী। তাই কয়েক বছর যেতে না যেতেই জাতিসংঘের হাস্যকর ব্যর্থতা বুঝতে পারল পৃথিবীর মানুষ। তখন জাতিসংঘকে অগ্রাহ্য করে দুর্বল আবিসিনিয়ার ওপর শক্তিশালী ইটালী চালালো নিষ্ঠুর আক্রমণ, মাঞ্চুরিয়ার ওপর চললো জাপানের ভয়ংকর অভিযান। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়ে

গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অপমান আর ব্যর্থতা নিয়ে অবলুপ্ত হয়ে গেল জাতিসংঘ।

রাষ্ট্রসংঘ (U. N.) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যেমন গড়ে উঠেছিল জাতিসংঘ, তেমনি আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভীষণতর বিভীষিকা থেকে জন্ম নিয়েছে **রাষ্ট্রসংঘ** (United Nations)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে (২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ খ্রীঃ) এই রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। (১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা ; (২) যদি কোন দেশ পৃথিবীর শান্তি ভংগ করে বা অন্য দেশকে আক্রমণ করে, তাহলে সেই শান্তিভংগকারী বা আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে যুক্তভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করা ; (৩) শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করা ; (৪) বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করা ; (৫) বিভিন্ন জাতির সহযোগিতায় পৃথিবীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক নানা সমস্যার সমাধান করা—এই সমস্ত আদর্শ আর উদ্দেশ্য নিয়েই শুরু হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের কাজ। আমাদের ভারতও এই রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম সভ্য।

রাষ্ট্রসংঘের প্রধান প্রধান বিভাগ হল ঃ—

(১) **সাধারণ পরিষদ** (General Council)—আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা এবং রাষ্ট্রসংঘের বিধানের (U. N. Charter) অন্তর্ভুক্ত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যে রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সভ্য নিয়ে এই পরিষদ তৈরী।

(২) **নিরাপত্তা** বা **স্বস্তি পরিষদ** (Security Council)—এগারো জন সভ্য নিয়ে এই পরিষদ তৈরী। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে এবং প্রয়োজনমতো সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য দেবার জন্যে এই পরিষদ রাষ্ট্রসংঘের সভ্য-রাষ্ট্রগুলিকে আহ্বান করতে পারে। কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মীমাংসার জন্যেও স্বস্তি পরিষদের সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

(৩) **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ** (Economic and Social

Council)—বিভিন্ন জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আঠারো জন সভ্য নিয়ে এই পরিষদ তৈরী হয়েছে।

(৪) **অভিভাবক** বা **অছি পরিষদ** (Trusteeship Council)—রাষ্ট্রসংঘ যে-সমস্ত অনুন্নত দেশের ভার এই পরিষদের হাতে ন্যস্ত করবে সেই সমস্ত দেশের উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করা এই পরিষদের কাজ।

(৫) এই সমস্ত পরিষদ ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের একটি **আন্তর্জাতিক আদালত** (International Court of Justice) রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিরোধের বিচারের জন্যে এই ধর্মাধিকরণ গঠিত।

(৬) এ ছাড়া, রাষ্ট্রসংঘের একটি **স্থায়ী সম্পাদকীয় দপ্তর** (Secretariate) রয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদনের জন্যে সাধারণ সম্পাদক পরিচালিত এই দপ্তর লেক সাকসেস-এ (Lake Success) প্রতিষ্ঠিত।

রাষ্ট্রসংঘের এই ছ'টি প্রধান বিভাগ ছাড়াও কয়েকটি বিশিষ্ট **কার্যনির্বাহী শাখা** (**Specialised Agency**) রয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান হল :

(১) **ইউনেস্কো (UNESCO) : (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)**—পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে সহযোগিতা স্থাপন এই শাখার প্রধান কাজ। **(২) এফ-এ-ও (FAO : Food and Agriculture Organisation)**—বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগবিদ্যাসম্মত উপায়ে বিভিন্ন জাতিকে অধিকতর খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করা এই শাখার কাজ। (৩) **ডব্লু-এইচ-ও (WHO : World Health Organisation)**—পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ বিধান এই শাখার লক্ষ্য।

এ ছাড়া, **আই-এম-এফ** (**IMF : International Monetary Fund**), **আই-বী-আর-ডি** (**IBRD : International Bank of Reconstruction and Development**), **আই-এল্-ও** (**ILO : International Labour Organisation**) প্রভৃতি আরও কয়েকটি বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী শাখা রাষ্ট্রসংঘের মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

১। মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন কি ভাবে গড়ে উঠলো, সংক্ষেপে বল।

[Describe, in brief, how the different social organisations of man have grown up.]

২। কি ভাবে প্রথমে পরিবার গঠিত হয়েছিল? মানুষের চরিত্র গঠনে তার পারিবারিক ও স্থানীয় জীবনের প্রভাব কতখানি?

[How did family originate? Estimate the extent of influence exerted on man by his family and local environment.]

৩। বহিরংগ গোষ্ঠী বলতে কি বোঝ? মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে এই বহিরংগ গোষ্ঠীর প্রভাব কতখানি?

[What do you mean by the outer circle of man's local life? What is the influence of this outer circle on the development of a man's personality?]

৪। রাষ্ট্র কাকে বলে? (স্কুল ফাইন্যাল, ১৯৫৫, ১৯৫৬) কি কি উপাদানে রাষ্ট্র তৈরী? পশ্চিমবংগকে রাষ্ট্র বলা যায় কি?

[Define State. What are the essential elements of a State? Is West Bengal a state in the strict sense of the term?]

৫। সরকার বলতে কি বোঝ? রাষ্ট্র আর সরকারের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? (স্কুল ফাইন্যাল, ১৯৫৫)

[Define Government. Distinguish Government from State.]

৬। গণতন্ত্র কাকে বলে? আদর্শে আর বাস্তবে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় কোন পার্থক্য আছে কি?

[Define Democracy. Is there any difference between an ideal and a real Democratic form of Government?]

৭। পরোক্ষ গণতন্ত্র বলতে কি বোঝ? তার গুণাগুণ বর্ণনা কর। (স্কুল ফাইন্যাল, ১৯৫৮)

[What is meant by Indirect Democracy? Describe its merits and demerits.]

৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

[Distinguish between a Federal and a Unitary form of Democratic Government.]

৯। মন্ত্রিপরিষদ্-শাসিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কাকে বলে ? এই দুই ধরণের শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ সংক্ষেপে বুঝিয়ে বল।

[Distinguish between a Cabinet and a Presidential form of Democratic Government. Clearly explain the merits and demerits of the above two forms of Government.]

১০। একনায়কতন্ত্র কাকে বলে ? তার দোষ-গুণ কি ?

[What is Dictatorship ? What are its merits and demerits ?]

১১। ভারতীয় গণতন্ত্রে নির্বাচন রীতি সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

[Write a short essay on the system of election in the Indian Republic.]

১২। নাগরিক কাকে বলে ? [Who can be called a citizen ?]

১৩। গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ কি ? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব কি ? কি ভাবে সে তার প্রাত্যহিক জীবনে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করবে ?

[What is the ideal of a Democratic Society ? Enumerate the rights and duties of a citizen in a Democratic State. How should he observe democratic principles in his everyday life ?]

১৪। সু-নাগরিকের কি কি গুণ থাকা উচিত ? (স্কুল ফাইন্যাল, ১৯৫৮)

[Describe the qualities that a good citizen should possess.]

১৫। 'অসুস্থ বা অক্ষম নাগরিক তার দায়িত্ব পালন করতে পারে না এবং সে সমাজের ভারস্বরূপ'—এই উক্তিটি আলোচনা করে ব্যক্তিগত এবং সামুদয়িক স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নাগরিকদের কি করা কর্তব্য সংক্ষেপে লেখ।

[A diseased or infirm citizen cannot carry out his duties as a citizen and is a burden on the society. Discuss and briefly describe what the citizens should do to improve their personal and collective health.]

১৬। আমাদের দেশের জনস্বাস্থ্যের নিম্ন মানের কারণ কি? জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়নে দেশের সরকার ও নাগরিকদের কি করা কর্তব্য এবং সে কর্তব্য তাঁরা কতদূর পালন করছেন, সংক্ষেপে লেখ।

[What are the causes of the low standard of the health of our people ? Describe, in brief, the duties of the Government and the citizens for the improvment of the standard of our health, and also state how far do they carry out their duties.]

১৭। 'সামাজিক আমোদ-প্রমোদ সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে'—এই উক্তির আলোচনা প্রসংগে আমাদের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সামাজিক আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ। সরকার সামাজিক আমোদ-প্রমোদ ও কৃষ্টিগত উন্নতি বিধানের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন বল।

[Social festivals tighten social ties.—Discuss and write a short essay on the ancient and modern social festivals of our country. What steps has our Government taken for the improvement of our cultural and social festivities ?]

১৮। 'নাগরিক দায়িত্ব পালন করার জন্য নাগরিকদের শিক্ষারও প্রয়োজন' —আলোচনা কর। এই প্রসংগে সরকার আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কতখানি চেষ্টা করেছেন ও করছেন লেখ।

[To carry out his civil duties a citizen should have education.—Discuss. In this connection describe what our Government has done or is doing for the spread of education in the country.]

১৯। স্বাধীন ভারতের গঠন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

[What do you know of the constitution of free India ?]

২০। স্বাধীন ভারতকে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র বলা যায় কি?

[Can free India be called a true federation ?]

২১। ভারতের সংবিধানের আদর্শ ও মূল নীতি কি, সংক্ষেপে বল।

[Describe in brief the ideal and fundamental principles of the Constitution of India.]

২২। কেন্দ্রীয় সরকার আর বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ। (স্কুল ফাইন্যাল, ১৯৫৫)

[Write in brief what you know about the allocation of power between the Central and State Governments in India.]

২৩। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন আর পদচ্যুতি সম্বন্ধে যা জান লেখ। (স্কুল ফাইন্যাল, ১৯৫৩, ১৯৫৭)

[What do you know about the election and removal of the President ?]

২৭। সংবিধানে রাষ্ট্রপতির কি কি বিশেষ ক্ষমতা আছে, বল। (স্কুল ফাইন্যাল, ১৯৫৪, ১৯৫৬)

[Write what you know about the special Constitutional powers of the President ?]

২৫। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গঠন আর ক্ষমতা সম্বন্ধে যা জান বল।

[Write what you know about the composition and functions of the Council of Ministers in the Centre.]

২৬। ভারতের প্রধান মন্ত্রী কি ভাবে নিযুক্ত হন ? তাঁর সংগে রাষ্ট্রপতি আর মন্ত্রিসভার সম্বন্ধ কি বুঝিয়ে বল।

[How is the Prime Minister of India appointed ? Explain his relation with the President and the Council of Ministers.]

২৭। রাজ্যসভার গঠন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

[Write what you know about the composition of the Council of State.]

২৮। পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

[What do you know about the power of Parliament ?]

২৯। লোকসভার গঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে যা জান বল। (স্কুল ফাইন্যাল, ১৯৫০)

[Write what you know of the composition and functions of the House of the People.]

৩০। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (স্কুল ফাইন্যাল, ১৯৫০)

[Give a short description of the Federal Legislature in India.]

৩১। রাজ্য সরকারের গঠন সম্বন্ধে যা জান বল।

[What do you know about the composition of the State Government ?]

৩২। রাজ্যপাল কাকে বলে ? তাঁর নিয়োগ, ক্ষমতা, আর কার্যাবলী সম্বন্ধে ছোট একটা প্রবন্ধ লেখ।

[Who is called a Governor of a State ? What do you know about his appointment, powers and fuuctions ?]

৩৩। রাজ্যপাল ও রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার সংগে রাজ্যের মন্ত্রীদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। (স্কুল ফাইন্যাল, ১৯৫৩)

[Analyse the relation of the Ministers of a State Government with the Governor and the State Legislature.]

৩৪। বিধান সভা ও বিধান পরিষদের গঠন আর কার্যকাল সম্বন্ধে যা জান লেখ।

[Write what you know about the composition and tenure of the Legislative Council and Legislative Assembly.]

৩৫। রাজ্য ব্যবস্থাপক সভার কাজ সম্বন্ধে ছোট একটা প্রবন্ধ লেখ।

[Write a short essay on the functions of the State Legislature.]

৩৬। কেন্দ্রে বা রাজ্যে কি ভাবে আইন প্রণয়ন করা হয়, সংক্ষেপে লেখ।

[Write what you know about law-making in the Centre and the States.]

৩৭। ভারতের বিচার-ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (স্কুল ফাইন্যাল, ১৯৫৩, ১৯৫৮)

[Give a short account of the Judicial System in India.]

৩৮। ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের গঠন ও কার্যাবলী ইত্যাদি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

[Write what you know about the composition, functions, etc. of the Supreme Court of India.]

৩৯। মহাধর্মাধিকরণের গঠন ও কার্যাবলীর কথা যা জান লেখ।

[Give a short account of the composition and functions of the High Courts in India.]

৪০। বিভিন্ন জেলার ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান ?

[What do you know about Civil and Criminal Courts in the districts ?]

৪১। বহির্জগতের সংগে ভারতের যোগাযোগ সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ। এই প্রসংগে ভারতের পররাষ্ট্র-নীতির মূল ভিত্তি কি সংক্ষেপে লেখ।

[Write a short essay on India's relation with the outside world. In this connection write what you know about the basis of India's foreign policy.]

৪২। রাষ্ট্রসংঘ কি ? রাষ্ট্রসংঘের গঠন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখ।

[What do you know about U. N., its composition and functions ?]

৪৩। গ্রাম পঞ্চায়েত সম্বন্ধে যা জান বল।

[Write what you know about Village Panchayats.]

৪৪। পশ্চিমবংগের জেলা বোর্ডের গঠন, কাজকর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে যা জান বল। (স্কুল ফাইন্যাল, ১৯৫৩)

[Write what you know about the composition and functions of the District Boards of West Bengal.]

৪৫। পশ্চিমবংগের মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসংঘের গঠন, কাজকর্ম

প্রভৃতি সম্বন্ধে যা জান তা নিয়ে নিজের ভাষায় সংক্ষেপে আলোচনা কর। (স্কুল ফাইন্যাল, ১৯৫৯)

[Write in brief and in your own words what you know about the composition and functions of the Municipalities of West Bengal.]

৪৬। কলিকাতা কর্পোরেশনের গঠন, আর কর্তব্য সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

[Give a brief account of the composition and functions of Calcutta Corporation.]

৪৭। ভারতের প্রধানতম সমস্যা দারিদ্র্য—এই সমস্যা দূর করে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার জন্যে ভারত সরকার কীভাবে চেষ্টা করছেন, সংক্ষেপে লেখ।

[India's burning problem is her proverty. Write what you know about the efforts of the Government of India to solve this problem and build up a healthy and beautiful society.]

৪৮। সমাজের রক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

[Write in brief what you know about Police administration in the country.]

নৈর্ব্যক্তিক-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

সমাজবিদ্যা (Social Studies) বিষয়ে শিক্ষার্থীর অনুশীলনের জন্যে বিশেষ ধরণের প্রশ্ন আবশ্যক। সেই বিশেষ ধরণের প্রশ্নের নমুনা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ প্রকাশ করেছেন। পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকার নাম Objective Test in Social Studies.

সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য, ঐ বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানদান মাত্র নয়। ছাত্রের মধ্যে কতকগুলো মনোভাব ও অভ্যাস গঠন করাই প্রধান উদ্দেশ্য। ছাত্রকে কেবলমাত্র পরীক্ষা করে তার সঠিক মনোভাব ও অভ্যাস গঠিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত সহজসাধ্য নয়। সে সিদ্ধান্তের জন্যে পরীক্ষা ছাড়াও ছাত্রের কার্য ও আচরণ শিক্ষককে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

সমাজবিদ্যা বিষয়ে পরীক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধক বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের কিছু নমুনা দেওয়া গেল।

(ক) কোন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বা সামাজিক ঘটনার সঠিক কারণ অনুধাবনের জন্যে, ঐ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে, ঐ ঘটনার সম্ভাব্য নানা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ছাত্রগণ সঠিক ব্যাখ্যাটি চিহ্নিত করবে।

ভুল ব্যাখ্যাগুলোর সামনে "**ভু**" লিখতে, সঠিক বা সত্য ব্যাখ্যার সামনে "**স**" লিখতে ও যে ব্যাখ্যা ভুল বা সঠিক কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় থাকবে সে ব্যাখ্যার সামনে '?' (জিজ্ঞাসার চিহ্ন) দিতে ছাত্রদের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

বর্ণনা বা উক্তি:

১। প্রাচীন আন্দামানবাসীরা জাতি হিসাবে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে: কারণ,

(ক) প্রকৃতির উপর তাদের অতিনির্ভরশীলতা:

(খ) তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ:

(গ) আধুনিক সভ্যতার সংগে সংঘর্ষ: অথবা,

(ঘ) তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি সভ্য মানুষের লোভ ও সভ্য জাতিসমূহের প্রতি তাদের নিষ্ঠুরতা।

২। আলমোড়া অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার অত্যধিক ঃ বহু স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে ও বহু স্ত্রীলোক স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয় ঃ কারণ,

(ক) স্ত্রীলোক পশুর মত কেনা-বেচা হয় ঃ

(খ) কন্যার পিতৃ-সম্পত্তিতে অধিকার নেই ঃ

(গ) স্ত্রীলোকের জীবনে বিশ্রাম, বিলাস বা বিনোদন নেই ঃ

(ঘ) স্ত্রীলোকদের দিবারাত্র পরিশ্রম করতে হয় ঃ

(ঙ) পুরুষ তার দুঃসাধ্য পরিশ্রমে সাহায্য করার জন্যে স্ত্রীলোকদের কেনে ঃ

(চ) আলমোড়া অঞ্চলের জলবায়ু স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়।

৩। পশ্চিমবংগের অধিবাসীরা সূতী কাপড়-জামা পরে ঃ কারণ,

(ক) সূতী কাপড়-জামা সস্তা ;

(খ) সূতী কাপড়-জামা সহজে ধোওয়া যায় ঃ

(গ) পশ্চিমবংগে অনেক সূতী কাপড়ের মিল আছে।

(ঘ) পশ্চিমবংগে অনেক তুলা জন্মে ঃ অথবা,

(ঙ) পশ্চিমবংগের জলবায়ুতে সূতী কাপড়-জামা বিশেষ উপযোগী।

৪। ১৯৫১ সালে কলকাতার অধিবাসীর সংখ্যা ১৭০৩ সালের অধিবাসী-সংখ্যার ৩০০ গুণের অধিক বেড়েছে ঃ কারণ,

(ক) কলকাতা স্বাস্থ্যকর স্থান ঃ

(খ) কলকাতায় থাকা-খাওয়ার খরচ খুব কম ঃ

(গ) কলকাতা বৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্র ঃ অথবা,

(ঘ) কলকাতায় কর্মসংস্থানের বহু সুযোগ আছে।

৫। আকবর দীন-ইলাহী নামে এক নূতন ধর্ম প্রবর্তন করেন—কারণ,

(ক) তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এক নূতন ধর্মের প্রয়োজন ছিল ঃ

(খ) প্রচলিত কোন ধর্মমত তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি ঃ

(গ) মুসলমানদের দলাদলি তিনি পছন্দ করতেন না ঃ অথবা

(ঘ) ভারতের সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে তিনি এক মহা-ভারত গড়তে চেয়েছিলেন।

(খ) বিভিন্ন সমাজ ও সমাজ-জীবন সম্পর্কে সঠিক মনোভাব ছাত্রের জন্মেছে কিনা পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্ন রচনা করা যেতে পারে ঃ

[**নির্দেশ** ঃ তোমার মতে সঠিক উত্তরের সামনে ✓ চিহ্ন দাও]

১। আন্দামানবাসীরা বরাবর বাসস্থান বদল করে ঃ কারণ,

(ক) তারা সৌন্দর্যপ্রিয় ঃ

(খ) একস্থানে দীর্ঘকাল তারা তাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না ঃ

(গ) প্রকৃতির নির্দয়তার জন্যে তাদের বাসস্থান বদলাতে হয়।

২। আন্দামানবাসীরা সেরকম জায়গায়ই নূতন বাসস্থান স্থাপন করে যেরকম জায়গায় এইসব স্থবিধা তারা পায়—

(ক) প্রচুর মাছ ঃ

(খ) স্থপেয় জল ঃ অথবা,

(গ) অনেক বড় বড় গাছ।

৩। আন্দামানবাসীদের মধ্যে স্থদৃঢ় সামাজিক বন্ধন আছে ঃ যেহেতু—

(ক) তাদের ধর্মবিশ্বাস এক ;

(খ) তারা যৌথ পরিবারে বাস করে ঃ অথবা,

(গ) তারা শক্রর বিরুদ্ধে একযোগে লড়াই করে।

(গ) ছাত্রের বিচার-বুদ্ধির পরীক্ষার জন্যে নিম্নলিখিতরূপে প্রশ্ন রচনা করা যেতে পারে ঃ

[**নির্দেশ** ঃ প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক উপাদান সম্পর্কে নীচে কতকগুলো মত উল্লেখ করা গেল। তোমার বিচারে যে মতটি সঠিক তার সামনে ✓ চিহ্ন দাও, ভুল মতের সামনে × (cross mark) চিহ্ন দাও, আর যে মত সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ আছে তার সামনে '?' (জিজ্ঞাসার) চিহ্ন দাও।]

(ক) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রমাণসমূহ অভ্রান্ত ও যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ বলে গৃহীত হইতে পারে ঃ

(খ) সাহিত্যের প্রমাণসমূহ আংশিক সত্য মাত্র ঃ

(গ) সাহিত্যের প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয় ;
(ঘ) প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঐতিহাসিক প্রমাণ বলে গ্রাহ্য ;
অথবা,
(ঙ) সাহিত্যিক প্রমাণ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দ্বারা সমর্থিত হলে সর্বদা গ্রাহ্য।

(ঘ) প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুসারে ছাত্রের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার ক্ষমতা পরীক্ষার জন্যে নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে।

[**নির্দেশ** : প্রদত্ত পরিসংখ্যান লক্ষ্য কর ও তদনুসারে নিম্নলিখিত উক্তি-সমূহের সত্যাসত্য নিরূপণ কর। সত্য উক্তির সামনে **স** ও মিথ্যা উক্তির সামনে **মি** লেখ।]

বৎসর	**হাসপাতাল সংখ্যা**	**রোগীর সংখ্যা**	**শয্যা সংখ্যা**
১৯৪৭	৩৮২৫	৪৩০১৯৭৭২	৬০৯৭৪
১৯৪৮	৪৩৮৩	৫৪৭৬৮ ২৩	৬০০৮৯
১৯৪৯	৪৭৫৬	৭০০৯৫১১৫	৭৩৫৮০

(ক) প্রত্যেক বছর হাসপাতালের সংখ্যা বেড়েছে ;
(খ) প্রত্যেক বছর রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ;
(গ) প্রত্যেক বছর শয্যাসংখ্যা বেড়েছে ;
(ঘ) রোগীর সংখ্যা অনুপাতে হাসপাতালের সংখ্যা বেড়েছে ;
(ঙ) রোগীর সংখ্যা অনুপাতে শয্যাসংখ্যা বেড়েছে ;
(চ) হাসপাতালের সংখ্যা বাড়াই রোগীর সংখ্যা বাড়ার কারণ।

(ঙ) ছাত্রের সঠিক সামাজিক মনোভাব জন্মেছে কিনা পরীক্ষার জন্যে নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে।

[**নির্দেশ** : তোমাদের স্কুলের আঙ্গিনায় অনেক আবর্জনা ছড়ান থাকে। এ অবস্থার প্রতিকার বিষয়ে বিভিন্ন মনোভাব হতে পারে। নীচে সেগুলো দেওয়া গেল। যেটা তোমার মতে সঠিক সেটার নীচে দাগ দাও।]

(ক) আমি আবর্জনা ফেলব না।
(খ) আমার এ ব্যাপারে কোন করণীয় নেই।
(গ) এর কোন প্রতিকার ব্যবস্থা হলে আমি সে ব্যবস্থা সমর্থন করব।
(ঘ) এর কোন প্রতিকার ব্যবস্থা হলে আমি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করব।
(ঙ) আমি আবর্জনা সাফ করব।

(চ) ছাত্রের লব্ধ জ্ঞানের নির্ভুল পরিমাপের জন্য অধুনা প্রচলিত নিম্নলিখিত নানারূপ পরীক্ষা করা যেতে পারে।

১। প্রদত্ত উত্তরসমূহের মধ্যে কোনটি কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ণয় কর। সঠিক উত্তর প্রত্যেক প্রশ্নের সামনে শূন্যস্থানে লিখ :

(ক) দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ হলে তার নিষ্পত্তির জন্যে তারা যায়·········অথবা······ ········ ।

(খ) দুই গ্রামবাসীদের মধ্যে বিবাদ হলে সে বিবাদের মীমাংসা হয়························মাধ্যমে।

(গ) আধুনিক দুই জাতির বিরোধের মীমাংসা হয়·········মাধ্যমে।

(প্রদত্ত উত্তর : U. N. গ্রাম পঞ্চায়েৎ, আদালত।)

২। শূন্য স্থান পূর্ণ কর :—

(ক) প্রাচীন আন্দামানবাসীরা—জাতীয়।

(খ) আলমোড়া অঞ্চলে গোপালকদের অস্থায়ী বাসগৃহকে—বলে।

(গ) আলমোড়া অঞ্চলের অধিবাসীদের যৌথ গোচারণভূমিকে——বলে।

(ঘ) অলেমোড়া জেলার সবচেয়ে বড় মেলা—মেলা।

(ঙ) রাষ্ট্রের উপাদান চারিটি : (১)—, (২)—, (৩)—এবং (৪)—।

(চ) মৌর্যদের রাজধানী ছিল—।

(ছ) —যুদ্ধের ফলে বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস হয়।

(জ) —যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজের নিকট পরাজিত হন।

(ঝ) কোন রাজ্যের বিধান সভার(State Legislative Assembly) সভাপতিকে—বলে।

৩। সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দাও :—

(ক) মালয়ের আদিম অধিবাসীদের বলা হয় ওলন্দাজ, রেড্ ইণ্ডিয়ান, সেমাঙ।

(খ) প্রেইরী-অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা নিগ্রো, রেড্ ইণ্ডিয়ান, ওলন্দাজ।

(গ) ভারতবর্ষের অধিকাংশ পাটকল আসামে, উত্তরপ্রদেশে, পশ্চিমবংগে অবস্থিত।

(ঘ) রেলওয়ে ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা স্থাপিত হয়েছে ভিলাইতে, চিত্তরঞ্জনে, দুর্গাপুরে।

(ঙ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবে ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৩ সালে।

(চ) চতুর্থ বৌদ্ধ-ধর্ম-মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় অশোকের, কণিষ্কের, হর্ষবর্ধনের, সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে।

(ছ) U. N. এ-র সদর দপ্তর লণ্ডনে, জেনেভায়, নিউইয়র্কে।

(জ) গণতন্ত্রে (Democracy) রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে সৈন্যদলের, মন্ত্রীদের, সরকারী কর্মচারীদের, জনগণের হাতে।

৪। নীচে, ডানে ও বামে দুই সারিতে কতগুলো কথা দেওয়া আছেঃ বামের সারিতে যে কথাটির সংগে ডানের সারির যে কথাটি খাটে বামের সারির কথাটির পাশের বন্ধনীতে সেই কথাটির সংখ্যা বসাও।

[উদাহরণ ঃ

১. রামায়ণ (৪)	১. উইলিয়াম বেণ্টিংক
২. অর্থশাস্ত্র (৩)	২. নানাসাহেব
৩. সতীদাহ নিবারণ (১)	৩. কৌটিল্য
৪. সিপাহী বিদ্রোহ (২)	৪. বাল্মিকী]

১. আন্দামান ( )	১. সেমাঙ
২. মালয় ( )	২. নিগ্রো
৩. হল্যাণ্ড ( )	৩. রেড্ ইণ্ডিয়ান
৪. প্রেইরী অঞ্চল ( )	৪. জুইডার জী
৫. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ( )	৫. লর্ড ডালহৌসী
৬. স্বত্ববিলোপ নীতি ( )	৬. লর্ড কর্ণওয়ালিশ
৭. ভারতের স্বাধীনতা ( )	৭. মহাত্মা গান্ধী
৮. অসহযোগ আন্দোলন ( )	৮. ১৯৪৭
৯. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ( )	৯. ১৭৫৭
১০. পলাশীর যুদ্ধ ( )	১০. সিরাজউদ্দৌলা
১১. বিধান সভা (Legislative Assembly) ( )	১১. জনসাধারণের শাসন
১২. গণতন্ত্র (Democracy) ( )	১২. আইন প্রণয়ন করে।

———